সমর সেন

কবির জীবন ও কবিতায় জীবন

বৃন্দাবন কর্মকার

২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯

বাবা ও মায়ের স্মৃতির উদ্দেশে

মুখবন্ধ

সমর সেন : কবির জীবন ও কবিতায় জীবন—একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাধর্মী অভিসন্দর্ভ। যুদ্ধোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতায় কবি সমর সেন অনিবার্য নাম হলেও তাঁকে নিয়ে গ্রন্থাকারে আলোচনা খুব বেশি হয়নি। সেই একান্ত জরুরি কাজটিই করেছেন তরুণ কবি-প্রাবন্ধিক বৃন্দাবন কর্মকার।

মনস্বী কবি-সাংবাদিক সমর সেন ছিলেন বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রথিতযশা ঐতিহাসিক, পূর্ববঙ্গগীতিকা, ময়মনসিংহগীতিকার রূপকার ও প্রচারক সুপণ্ডিত আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের পৌত্র। রক্তে সেই মহান ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে বাংলা কবিতার জগতে সমর সেনের উদয় ও অস্তগমন পাঠককে যুগপৎ মুগ্ধ ও চকিত করেছিল। তুলেছিল বিতর্কের ঢেউ।

জীবনচর্চায় বিপুল বৈচিত্র্য তাঁর কাব্যভাবনায় এনেছিল নিজস্বতা ও অভিনবত্ব। সুতানুটি শহর কলকাতার উত্তর প্রান্তে বাগবাজার অঞ্চলের নগরজীবনে যে নাগরিক-মনের সৃষ্টি, রাজধানী দিল্লি নগরজীবন হয়ে কয়েক বছর সোভিয়েত রাশিয়ার মস্কো শহরের জীবনযাপনে সেই নগর-বৃত্তির পুরিপুষ্টি। জীবনের শেষ আড়াই দশক আবার কলকাতা শহরের নগরজীবনের সঙ্গে ক্রমশ নিবিড় ঘনিষ্ঠতা। এইভাবেই কবি-সাংবাদিক সমর সেনের নাগরিক-আবেগ ও নাগরিক-মনন ঋদ্ধ জীবন নানান ঘটনা-দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে।

আধুনিক বাংলা কবিতার কোনো কোনো গবেষক-সমালোচক তাঁদের কাব্যালোচনার পরিধিতে কবি সমর সেনকে উপেক্ষা করলেও যুদ্ধোত্তর বাংলা কাব্যসংসারে কবি সমর সেনের প্রতিভাকে অস্বীকার করার উপায় ও অবসর নেই। কারণ তাঁর মননঋদ্ধ কবিতাগুলিতে সেই সময়কার যুগযন্ত্রণা যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তাতেই তিনি কবি হিসাবে অনিবার্য হয়ে উঠেছেন। তাছাড়া, আধুনিকতার যুগলক্ষণগুলির মধ্যে প্রধান কয়েকটি, যেমন—নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার অভিঘাত, জীবনে ক্লান্তি ও নৈরাশ্যবোধ, অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের দ্বন্দ্ব, আত্মবিরোধ ও শিকড়হীনতার যন্ত্রণা, শরীরী সন্তাপের দ্বিধাহীন প্রকাশ, ছন্দে গদ্যরীতির ব্যবহার, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক মনোভঙ্গি প্রভৃতি একদিকে যেমন কবি সমর সেনের কবিতার অঙ্গরাগ সৃষ্টি করেছিল, তেমনি অন্যদিকে প্রাণরস সিঞ্চন করেছিল—তাঁর নগরজীবনের গ্লানিময় অভিজ্ঞতা, যুগোচিত একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতা, বিষাদ-বিষণ্ণতা, শ্রেণীবৈষম্য, যুদ্ধোত্তর সমাজ-পরিবেশে হা-অন্নের ছবি; সর্বোপরি তাঁর সুগভীর সমাজচেতনা ও তীব্র মানবতাবোধ। তাই কবি সমর সেনকে উপেক্ষা করে সমকালীন কাব্যালোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না।

কবি সমর সেন তাঁর কবি-জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে উচ্চারণ করেছিলেন—

> 'যৌবনের প্রেম শেষ প্রবীণের কামে
> বছর দশের বাদে যাবো কাশীধামে।'

অর্থাৎ বছর দশেক কবিতাচর্চার পরে তাঁর বানপ্রস্থে যাওয়ার ইচ্ছের কথা ঘোষিত হয়েছিল। ১৯৩৫/৩৬ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত ধারাবাহিক কাব্যচর্চায় ছেদ টেনে তিনি কাব্যজগৎ থেকে স্বেচ্ছায় বিদায় নিয়েছেন এবং সংবাদপত্রের জগতে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। এর বছর দশেক বাদে আরো কয়েকটি কবিতা লিখলেও সেই ধারাবাহিকতা

আর ছিল না। তাঁর কবিতার বইয়ের সংখ্যাও খুব বেশি নয়। তাঁর ক্ষীণকায় কবিতার বইগুলির নাম—'কয়েকটি কবিতা', 'গ্রহণ', 'নানাকথা', 'খোলাচিঠি' ও 'তিনপুরুষ'। তবু আধুনিক বাংলা কবিতায় তাঁর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। পরবর্তী পর্বে বামপন্থায় বিশ্বাসী সমর সেন ক্রমশ বামপন্থী বুদ্ধিজীবী হয়ে উঠেছেন। সমকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বীক্ষায় আপোসহীন কলমকে প্রায় শানিত তরবারি করে তুলেছেন।

একদা কবিতায় তাঁর সত্যবদ্ধ উচ্চারণ ছিল এই রকম—

'জানি, এরা নয় বৈশ্য সভ্যতার জারজ সন্তান
গলিত ধনতন্ত্রের চতুর বিভীষণ,
তাই সক্রিয় আশা মৃত্যুহীন জাগে অনেকের মনে;
অপরের শস্যলোভী পরজীবী পঙ্গপাল
পিষ্ট হবে হাতুড়িতে, ছিন্ন হবে কাস্তেতে।'

তিনি আবার পরবর্তীকালে সমকালীন অগ্রজ কবি বিষ্ণু দে-কে লিখে জানান 'গদ্য কবিতা কেন, কোনো কবিতা সম্পর্কেই এখন আর উৎসাহ নেই।'

ইংরেজী সাহিত্যের দুর্ধর্ষ ছাত্র সমর সেন তাঁর কাব্যজীবনের শুরুতেই পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা আর বুদ্ধদেব বসুর নির্ভরযোগ্য প্রশ্রয়। রবীন্দ্রনাথ সমর সেনের কবিতায় দেখেছেন—'গদ্যের রূঢ়তার ভিতর দিয়ে কাব্যের লাবণ্য প্রকাশ।' বুদ্ধদেব বসু পেয়েছেন—'বাংলা গদ্যছন্দে সম্পূর্ণ নতুন একটি সুর।'

বিতর্কিত কবি-ব্যক্তিত্ব সমর সেনের জীবন ও কাব্য নিয়ে গবেষণাধর্মী সুদীর্ঘ এই অভিসন্দর্ভটি লেখা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী বৃন্দাবন কর্মকার তাঁর নানান ব্যস্ততার মধ্যেও প্রভূত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমে এই কাজটি করেছেন। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বহু তথ্য সংকলন করে তা সুন্দরভাবে বিন্যাসের ভেতর দিয়ে একজন প্রতিভাধর কবির আন্তর-সত্তাটিকে ধরার এই প্রয়াসটি লেখকের অশেষ কৃতিত্ব দাবি করে।

বহুল তথ্য, উদাহরণ ও পাদটীকা সহযোগে সাতটি অধ্যায়ে সমর সেনের জীবনকথা ও কাব্য ভাবনার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। কবিধর্ম ও কবিস্বভাবকে যথাযথভাবে অনুধাবন করতে হলে সমকালীন যুগ-প্রেক্ষিতে কবিজীবনের বিশ্লেষণও জরুরী। সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দেশ-কাল-সমাজের অবক্ষয়, ব্যক্তিগত বিষাদ-বিষণ্ণতা, প্রেম-অপ্রেম, সমসময়ের সাহিত্যভাবনা ও কবির নিজস্ব কাব্যাদর্শের নিরিখে তাঁর কাব্যের বিস্তৃত আলোচনা ও কাব্যচর্চার মানসিক আধার-ভূমি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে কবি সমর সেনের রূপটি প্রতিভাত হয়েছে। গ্রন্থের 'কবিতা নির্মাণ' ও 'কবিতার পাঠান্তর' অধ্যায়-দুটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। একটিতে সমর সেনের কবিতার ভাষা ও শব্দ ব্যবহারের রীতি-নীতি, কলাকৌশল ও ঐতিহ্যানুবৃত্তি আলোচিত হয়েছে, অন্যটিতে তাঁর কবিতার রূপসৃষ্টিতে নিরন্তর অদল-বদলে কবিমনের নিয়ত অতৃপ্তি-অসন্তোষের দিকটি ফুটে উঠেছে। সবমিলিয়ে অভিসন্দর্ভটি সুধী পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলেই আশা রাখি।

অনির্বাণ রায়চৌধুরী

নিবেদন

সমর সেনের কবিতা পড়তে পড়তে মনে হল এঁর উপরে একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন প্রয়োজন। যদিও ইতিমধ্যে নন্দরাণী চৌধুরীর "জীবন অন্বেষায় কবি সমর সেন" কলকাতার পিপলস্ বুক পাবলিশিং থেকে ১৯৮২ সাল প্রকাশিত হয়। অতএব কাজ শুরু হল।

কাজ করতে করতে ততদিনে "অনুষ্টুপ" পত্রিকার অনিল আচার্য ও পুলক চন্দের সম্পাদনায় "সমর সেন বিশেষ সংখ্যা" এবং সব্যসাচী দেব ও সোমেশ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় "সংকলিত সমর সেন" প্রকাশ করে আপামর সমর সেনের কবিতা অনুরাগীদের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

দীর্ঘদিন আগে শুরু করা আমার এই রচনাটি বিভিন্ন ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণে বিঘ্নিত হয়েছে বলে এতদিন প্রকাশের আলো দেখতে পারেনি।

রচনাটিকে কয়েকটি অধ্যায়ে বিন্যাস করে এখানে দেখানো হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে 'জীবন কথা'য় কবি জীবনের নানাদিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'দেশ-কাল-কবিতা'য় সমকালীন সামাজিক রাজনৈতিক পরিবেশ, কাব্য পরিমণ্ডল-রবীন্দ্র কাব্য, আধুনিক কবিগোষ্ঠী ও আধুনিক কবিতা এবং প্রগতি লেখক সংঘ ইত্যাদির আলোচনা উপস্থাপিত। তৃতীয় অধ্যায়ে 'আধুনিকতা ও সমর সেনের কবিতা'য় বাংলা কবিতায় আধুনিকতার সন্ধান করতে গিয়ে সমর সেনের আগের কবিদের মন ও মানসিকতার সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে 'সমর সেনের কাব্যাদর্শ'য় তুলে ধরা হয়েছে সমর সেনের নিজস্বতাকে। পঞ্চম অধ্যায়ে 'কাব্যালোচনা'য় প্রাধান্য পেয়েছে বিষয় বস্তুর উপস্থাপনা। মধ্যবিত্ত জীবন, নাগরিকতা, প্রেম, নৈরাশ্য বিষাদ-বিচ্ছিন্নতা অবক্ষয় ইত্যাদি। ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'কবিতা নির্মাণ'-এ কবিতার ভাষা, ঐতিহ্যানুসৃতি ইত্যাদির উল্লেখ করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে 'কবিতার পাঠান্তর'-এ নিয়ত কবির শিল্পী মনের অতৃপ্তি ও অসন্তোষকেই নির্দেশ করে।

এই রচনাটির প্রথম দিকের বেশ কিছু অংশের পুর্নবিন্যাসে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. অঙ্কুশ ভট্ট সহৃদয়তার সঙ্গে সাহায্য করেছেন। আমি তাঁর কাছে সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

এই পাণ্ডুলিপিটি প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত লক্ষ্য রেখে যেভাবে অধ্যাপক-সাহিত্যিক-সাংবাদিক ড: অনির্বাণ রায়চৌধুরী মুখবন্ধ লিখে দিয়েছেন, তাতে তাঁকে শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছোটো করতে চাই না।

এছাড়া যখনই উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতায় গিয়ে গল্পকার ও প্রাবন্ধিক বীরেন্দ্র দত্তের সঙ্গে দেখা হয়েছে তখনই তিনি সাগ্রহে খোঁজ নিয়েছেন এই রচনাকর্মটির অগ্রগতি সম্পর্কে।

রচনাটি প্রস্তুত করতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে বিভিন্নজন সাহায্য করেছেন।

তাঁদের প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা স্মরণ করছি। বিশেষ করে কলকাতার লিটিল ম্যাগাজিন লাইব্রেরীর সন্দীপ দত্ত যেভাবে প্রয়োজনীয় রচনা নিজ দায়িত্বে জেরক্স করে পাঠিয়েছেন তা তুলনারহিত।

শ্রী অরুণকুমার পাল তথ্যাদি দিয়ে বন্ধুকৃত করেছেন। কলকাতার "জাতীয় গ্রন্থাগারে"র তদানীন্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী কল্পনা দাশগুপ্ত এবং তদানীন্তন উপ গ্রন্থাগারিক জগদীশ গুপ্তা ব্যক্তিগতভাবে আমাকে বোদলেয়র-এর বই ইত্যাদি দেখতে দিয়ে যে সহায়তা করেছিলেন তা অতুলনীয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা পরিষদের শ্রীযুক্ত বাসুদেব মোশেলের সাহায্যও এপ্রসঙ্গে স্মরণীয়। সময়মত তিনি যদি কলকাতা থেকে রচনার উপাদান উত্তরবঙ্গে পৌঁছে না দিতেন তাহলে খুবই অসুবিধা হত। তাই তাঁকে সামান্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছোটো করতে চাই না।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিভাগের আমার সহকর্মীদের অকৃপণ সহায়তা ব্যতীত আমার রচনাটি প্রস্তুত করতে আরো সময় লেগে যেত। বিশেষ করে এখানকার অস্থায়ী কর্মী স্নেহভাজন প্রদীপ রায় যেভাবে আমাকে দৈনন্দিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে প্রয়োজনীয় বইপত্র হাতের কাছে যোগান দিয়েছে, তাতে অবশ্যই তার কথা আলাদাভাবে বলতে হয়।

এছাড়াও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ গ্রন্থাগারিকরা বিশেষত ড. রণজিৎকুমার মিত্র, শ্রী শুভ্রাংশুকুমার মিস্ত্রী, শ্রী বিজয়কুমার ছেত্রী, শ্রী পরিমল রায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক বিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কম্প্যুটার সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক রঞ্জিৎকুমার সামন্ত ও সোসিওলজি বিভাগের শতসিদ্ধ সরকার প্রমুখদের বই প্রকাশে নিয়ত আগ্রহ মনে রাখার মতন।

একান্ত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও রচনাটির প্রকাশকালে পারিবারিক সহযোগিতা, বিশেষ করে শ্রীমান ঋক এবং তার মা শ্রীমতী কাকলির সহৃদয় সহমর্মিতা এবং সাগ্রহ ঔৎসুক্যের কথা উল্লেখ করতেই হয়।

পরিশেষে বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে এস বি এন্টারপ্রাইজের শ্রীযুক্ত যুধিষ্ঠির হালদার আমাকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত প্রশান্ত ভট্টাচার্যকেও ধন্যবাদ জানাতে হয়। তাঁর একান্ত আগ্রহেই বইটি প্রকাশের দায়ভার কাঁধে তুলে নিয়েছেন এস বি এন্টারপ্রাইজ এবং তাঁরই সহায়তায় 'পুস্তক বিপণি'র শ্রীযুক্ত অনুপকুমার মাহিন্দার বইটির পরিবেশনার দায়িত্ব সানন্দে গ্রহণ করেছেন। তাঁদেরকেও ধন্যবাদ জানাই।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার
দোল

বৃন্দাবন কর্মকার

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
জীবন কথা

"যে কোন সৃষ্টির পেছনে স্রষ্টার জীবন, পরিবেশ, মতামত, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে থাকতে বাধ্য।... ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাব অনস্বীকার্য; কিন্তু যৌথভাবে অনেকে সেটা পেরিয়ে অন্যলোকে উপস্থিত হতে পারেন।"

(প্রস্তুতিপর্ব; অক্টোবর '৭৬)

পরিবার এবং পরিপার্শ্ব থেকে মানুষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, আর তার উপর থেকেই তার জীবনের একটা দিগ্‌দর্শন লাভ হয়। এই অভিজ্ঞতাগুলিই সৃষ্টিকারের সৃজন-শীলতায় নানান ভাবে নানান স্তরে স্বাক্ষর রাখে। আর এই জন্যেই বলতে হয়, সাহিত্যিকদের ব্যক্তিগত জীবন কি আমরা উপেক্ষা করতে পারি? পারি না। 'প্রথম কথা, দেখা অনেকের পক্ষে সম্ভব নয়; জানতে পারলে ভালো, কারণ জীবন ধারার ছাপ চেতনা ও সৃষ্টিশক্তিকে গড়ে, চেতনা নয়। অপরপক্ষে এটা পরে বলা হয়েছে যে উপরিকাঠামোর প্রভাব জীবন ধারার পরিবর্তনে সাহায্য করে। এটা যৌথ জীবনে যতটা সম্ভব ব্যক্তিগত জীবনে ততটা নয়'।[১] অর্থাৎ কবিও যেহেতু একজন সাহিত্যিক, তাঁর জীবনের একটা খসড়া বিবরণী তাই কাব্যালোচনার প্রাক্কালে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। আমাদের আলোচ্য কবি, সমর সেনের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটে না।

সমর সেনের জন্ম কোলকাতার বাগবাজারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর দু বছর পরে। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের পৌত্র তিনি। 'গৃহস্থ বিলাপ' কবিতায় কবি নিজে তাঁর পিতামহের কথা লিখেছেন :

> 'গ্রাম ছেড়ে পিতামহ প্রথম শহরে আসেন।
> রক্তে তার কিছু ছিল নদীর উদ্দাম বেগ,
> সাক্ষী তার ষোড়শ সন্তান।
> গুজব আছে যে গৃহত্যাগ কালে
> দেবী তাঁকে স্বপ্নে করেছেন বরদান :
> দুধে ভাতে বাঁচিবেক তোমার সন্তান।
> সুতরাং
> সবুজ চশমা চোখে আমরণ ছিল,
> সে সবুজ আদিভিটের জমি জমার,
> কিছু বা আপন পৌরুষের।'[২]

—পদ্মাপারের গ্রাম থেকে কোলকাতায় এসেছিলেন কবির পিতামহ। তিনি ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ থানার সুয়াপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। সেস্থান পরিত্যাগ করে

কোলকাতায় সপরিবারে এসে বসবাস করতে থাকেন স্থায়ীভাবে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের কার্তিক/অগ্রহায়ণ মাস থেকে। যাই হোক, সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন তাঁরা। এঁদের পূর্বপুরুষ ছিলেন 'পবন দূত' কাব্যের প্রসিদ্ধ কবি ধোয়ী।[৩] রক্তেই ছিল কবির কাব্যচর্চার উত্তরাধিকার। পিতামহ দীনেশচন্দ্রও কবিতা লিখতেন একদা। উল্লেখ্য, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে দীনেশচন্দ্রের সঙ্গে জোড়াসাঁকো-ঠাকুর বাড়ীর গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের প্রথম পরিচয় ঘটে। ক্রমে তিনি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন নানাভাবে। সাহিত্যিক মহলেও বিশেষভাবে পরিচিত হন দীনেশচন্দ্র। বিশেষ করে, তিনি 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থ রচনা করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার রূপে পরিগণিত হন। তৎকালীন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক হিসাবে সাহিত্যানুরাগী শিক্ষিত বাঙালী সমাজের সঙ্গে তাঁর ব্যাপক এবং গভীর যোগ ছিল।

দীনেশচন্দ্রের ষোড়শ সন্তানের মধ্যে উল্লেখ্য, প্রথম পুত্র কিরণ চন্দ্র সেন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবস্থাপনা বিভাগে কাজ করতেন। মধ্যম পুত্র অরুণ চন্দ্র সেন ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। ইনি দিল্লীর সেন্ট স্টিফেন্স কলেজ, রংপুর কারমাইকেল কলেজ এবং অন্য একটি কলেজে পড়িয়ে যোগ দিয়েছিলেন স্কটিশচার্চ কলেজে। তৃতীয় পুত্র বিনয় চন্দ্র সেন প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অত্যন্ত কৃতী ছাত্র ও অধ্যাপক ছিলেন। পড়াতেন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইনি পি.এইচ.ডি করেন লণ্ডন থেকে। চতুর্থ পুত্র বিনোদ চন্দ্র সেন এবং পঞ্চম পুত্র সুধীর চন্দ্র সেন যথাক্রমে কাস্টমস্ ও ম্যাকমিলনে কাজ করতেন। কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীচন্দ্র সেন ইংরেজীর ছাত্র ও অধ্যাপক ছিলেন। ইনি দীনেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর বেহালার বাগান বাড়ীর একটা অংশ বিক্রি করে সপরিবারে কেমব্রিজ চলে যান।

দীনেশচন্দ্র, পুত্র অরুণকে শান্তিনিকেতনে পড়তে পাঠিযেছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কোন এক বিষয়ে মতান্তর হওয়ায় তাঁকে শান্তিনিকেতন থেকে ফিরিয়ে আনেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ও দীনেশচন্দ্রের মধ্যে পত্র বিনিময়ে এই মতান্তর মিটেও যায়। পরবর্তী কালে অরুণ চন্দ্র আবার তাঁব প্রথম পুত্র অমল চন্দ্রকে শান্তিনিকেতনে পাঠ নিতে পাঠিয়েছিলেন।[৪]এই অরুণচন্দ্রেরই প্রথম পক্ষের সন্তান সমর সেন। অরুণচন্দ্রের প্রথম পক্ষের পুত্র কন্যা মিলিয়ে মোট ৯টি সন্তান। ৬ জন পুত্র এবং ৩ জন কন্যা। সমর সেন তাঁর জন্ম সম্পর্কে জানিয়েছেন :

> 'শুনেছি পঞ্জিকা মতে
> শুভক্ষণে জন্ম অভাগার,
> সে লগ্নে গৃধিনীমুখে বাজোনি অশুভ চিৎকার
> কিম্বা অদৃষ্টের ব্যঙ্গে
> অতি ধূর্ত কাক সহসা কর্কশ ডাকে
> ভাঙেনিকো জননীর প্রসব আবেশ।
> সপ্তম সন্তান আমি;'[৫]

—এই কবিতায় কবি নিজেকে সপ্তম সন্তান বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ অন্যত্র

তিনি জানিয়েছেন , 'আমি তৃতীয় সন্তান, আমার উপরে দু ভাই।'[৬] আমাদের মনে হয়, প্রকৃত অর্থে তিনি 'সপ্তম' সন্তানই ছিলেন; কিন্তু তাঁর উপরের সহোদর বা সহোদরদের মৃত্যু হওয়ায় কবি হয়ে যান 'তৃতীয়' সন্তান।

কবির বিদ্যাশিক্ষা শুরু হয় ঘরোয়া ভাবে। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে। কবিরই অদম্য উৎসাহে। তাঁর হাতে খড়ি হয় আট বছর বয়সে। এ সম্পর্কে কবির মন্তব্য : 'সেজ মাসিমার বাড়ী গিয়ে দেখি আমার চেয়ে এক বছরের ছোট মাসতুতো বোন পড়াশুনো দিব্যি শিখেছে। পৌরুষে আঘাত লাগলো; বাড়ী ফিরে মাকে ব'লে অ-আ-ক-খ, এ-বি-সি-ডি শুরু করি। দেরিতে আরম্ভ করাতে চটপট এগিয়ে যাই, দু-তিন বছরের মধ্যে সন্ধ্যেবেলায় মা গা ধুতে গেলে খাটের নিচে টর্চ জ্বালিয়ে অনেক নিষিদ্ধ বই পড়ে ফেলি।[৭] তার আগে গীতার শ্লোক শুনে মুখস্থ করতে পারলে কয়েকটি শ্লোক পিছু মা'র কাছে পয়সা পেতাম, ...।'[৮] এই সূত্রে মনে আসে কবির ছেলেবেলার প্রখর স্মৃতি শক্তির কথা। বাংলা বা ইংরেজি কবিতার দু-একবার পাঠ শুনেই মুখস্থ হয়ে যেত। কবির পিতামহ বাড়িতে অভ্যাগত ব্যক্তিদের সামনে কবিকে আবৃত্তি করতে প্ররোচনা করতেন। কবিও সেটা অক্লেশে মেনে নিতেন। স্মৃতিশক্তির প্রখরতার দরুন কবি এমন অনেক ঘটনা কোনোদিন ভুলতে পারেন নি—যেগুলির কয়েকটি তাঁর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। এমনি এক ঘটনার উল্লেখ করেছেন তিনি নিজেই, 'ছেলেবেলায় মেয়েদের সভায় মা সোনার বালা খুলে গান্ধীজীকে দেওয়াতে তিনি আমাকে একটি মাত্র কমলালেবু দিয়েছিলেন—সেই অসম বিনিময়ের ব্যাপারটি কখনো ভুলিনি।'[৯]

কবির মা ছিলেন বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বন্ধু জগদীশ নাথ রায়ের ('বিষবৃক্ষ' এঁকেই উৎসর্গ) দৌহিত্রী, চন্দ্রমুখী দেবী। তিনি ছিলেন পরমা সুন্দরী। নাগপুরের প্রবাসী বাঙালী ছিলেন তাঁরা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঐ পরিবারের ঘনিষ্ঠতা ছিল। রবীন্দ্রনাথই কবির বাবা-মায়ের বিয়ের ঘটকালি করেছিলেন।[১০] এ ব্যাপারে কবির বর্ণনা : 'বাবার চেয়ে মা মাত্র দু-বছরের ছোট ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের মেয়ে, নাগপুরে চার বোন (কোন ভাই ছিল না) অনেকদিন ছিলেন। দাদামশাইকে দেখিনি। তিন মাসির বিয়ে হয় পূর্ববঙ্গীয় পরিবারে। বিয়ের সময় বাবার বয়স ১৮, মা'র ১৬।'[১১] এই মায়ের কথা বলতে গিয়ে কবির বোন, কমলা রায় ওরফে টুনু জানাচ্ছেন, 'মাকে সকলে যেমন ভালোবাসতেন, ভয়ও করতেন খুব। এমনকি আমাদের দাদু দীনেশচন্দ্র সেনও। মা খুব ভালো গান করতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাকি আসতেন। মা'কে অনেক গানও শিখিয়েছিলেন।'[১২] কবির মা কিন্তু ক্রমাগত রোগে ভুগে ভুগে খিটখিটে মেজাজের হয়ে গিয়েছিলেন। কারণে অকারণে অল্পেতেই রেগে যেতেন। তবু অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও রান্না বান্না করতেন নিজের হাতে, যতক্ষণনা শয্যাশ্যায়ী হন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে সূতিকা রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। তখন তাঁর বয়স ৩৪ অথবা ৩৬ বছর। এ সম্পর্কে কবি লিখেছেন : 'তিন তলার ঘরে মশারির নিচে ঘুমোচ্ছি, বেশ রাতে আমাদের দোতলার ঘরে ডাকা হ'ল। মা'র তখন নাভিশ্বাস, কথাবার্তা বন্ধ, এক-একবার

চোখ মেলে ছেলেমেয়েদের দেখছিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমাদের ওপরে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। বিছানায় শুয়ে প্রার্থনা করলাম—'ভগবান, তুমি থাকলে মা বেঁচে যাবেন।' ভোর বেলায় মা মারা গেলেন। ভগবান নিয়ে অতঃপর মাথা ঘামাই নি।'[১৩]

অন্যদিকে কবির পিতা ছিলেন পিতামহের মতনই, বন্ধুবৎসল। কমলা রায়ের মতে—'ভালো মানুষ বলতে যা বোঝায় আমার বাবা ছিলেন সেই রকম।'[১৪] আর রাধারমণ মিত্রের চোখে কবির পিতা ছিলেন : 'অরুণ খুবই বন্ধু বৎসল ছিল। কিন্তু লোকে ওকে বলত ক্র্যাঙ্ক। ওর কোন কন্‌সিসটেন্সি ছিল না।'[১৫] অর্থাৎ বন্ধুত্ব গভীরতায় পৌঁছেও দেখা যেত অরুণ বাবুর সঙ্গে বন্ধুর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। যাইহোক, কবির পিতৃবন্ধুরা কবিদের বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। পরে পরে আমরা জানতে পারবো এঁদের মধ্যে কেউ কেউ সাহিত্য অনুরাগীও ছিলেন।

কবি সমর সেনের বাল্যে ডাক নাম ছিল 'খোকা'। বাচ্ছা বয়সে কবির চেহারা গোলগাল ফর্সা ছিল। একান্নবর্তী পরিবারে কবির বাল্যের কয়েকটি বছর অতিবাহিত হয়। বাগবাজারে। বিশ্বকোষ লেনের তিনতলা বাড়িতে। তাঁর পিতামহ, দীনেশচন্দ্র ছিলেন ডায়াবেটিসের রুগী; তবু আফিম সেবনের গুণে থাকতেন খোশ মেজাজে। প্রচুর মিষ্টি খেতেন। ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও। পিতামহীর সঙ্গে পিতামহের দীর্ঘ দিন বাক্যালাপ বন্ধ ছিল। পিতামহের বাঙাল ভাষায় কথা বলা কবিদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। কবিকে কবির বাবা-মা সে ভাষা উচ্চারণ করতে দিতেন না। তবে জ্যেঠা-কাকাদের সঙ্গে ঐ বয়সেই কবির সম্পর্ক ছিল সহজ। সরল। কিন্তু একান্নবর্তী পরিবারে থাকার ফলে, গুরুজনদের অজ্ঞাতসারে শৈশবেই অনেক রকম কু-অভ্যাস আয়ত্ব করেছিলেন তিনি। রকে ব'সে আড্ডা দিতেন। দু-একটা রসালো গোপন কথাও কানে ধরে রাখতেন তিনি। পরে মা কে জানালে—ওই সব ছেলেদের সঙ্গে মেশেন বলে মারও খেতেন। প্রায় প্রতি ছুটিতেই কবিরা স-পরিবারে বেড়াতে বেরুতেন। পুরী, কোনারক, দার্জিলিং, রাঁচী প্রভৃতি জায়গায়। একবার ভুবনেশ্বর থেকে সারারাত গরুর গাড়ীতে শুয়ে বসে কবিরা গিয়েছিলেন পুরী বা কোনারকে। ভুবনেশ্বরে সেবারেই দেখেন উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি। অনুরূপে রাঁচীতে একদা ভ্রমণকালে, কবিকে কুকুরে কামড়ালে যেতে হয় জলাতঙ্কের চিকিৎসার জন্য শিলঙে। ক্রমশ ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কবির মায়ের উদ্বেগ হেতু, বাবা-মা দীনেশচন্দ্রের যৌথ পরিবার ছেড়ে পৃথক হয়ে যান। অবশ্য বাড়ি বদল হলেও বিশ্বকোষ লেনেই কবিরা রয়ে গেলেন। আর যৌথ পরিবার ছেড়ে বেরিয়ে আসার জন্যে এবং পুত্র-কন্যাদের সংখ্যা বৃদ্ধিহেতু খরচ বাড়ায় বাইরে যাওয়াটা ক্রমেই কমে আসে।

কবির বাল্যকালেই পিতা অরুণচন্দ্র সেন, রাধারমণ মিত্রের সহযোগিতায় একটা পত্রিকা প্রকাশ করেন। নাম 'অনাগত'। রাধারমণ মিত্র সম্পাদক, আর অরুণ বাবু হন এর ম্যানেজার। চিত্তরঞ্জন দাশের একদা সচিব, প্রবন্ধ-কবিতা-কার্টুনে সিদ্ধহস্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় কর্তৃক এটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকা প্রকাশের টাকা জুগিয়েছিলেন কবির মা। গয়না বন্ধক দিয়ে। তিন মাস চলার পর, অরুণচন্দ্রের একদা শান্তিনিকেতনের

বন্ধুদের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত, 'নেবুতলার ইস্কুলে'র মতন এটারও অবলুপ্তি ঘটে। এই পত্রিকার কথা বলতে গিয়ে কবি বলেছেন—'অনাগত' খাল পাড়ে বিক্রির চেষ্টা করতাম, অনেকে কৌতূহল বশে ডেকে দেখতেন, কিন্তু কিনতেন না। অল্পদিন পরে পত্রিকাটি উঠে যায়।'[১৬]

মা'র মৃত্যুর পর কবিদের পারিবারিক অবস্থায় নিয়মশৃঙ্খলার দৈন্য দশা উপস্থিত হয়। কবির মাতামহী কিছু দিন চেষ্টা করেছিলেন শৃঙ্খলা ফেরাতে। কিন্তু বিচিত্র স্বভাবের নাতি-নাতনীদের সামলানো তাঁর সাধ্যাতীত জেনে. কবিরই সেজমাসিমার বাড়ি চলে যান তিনি। আর কবির বাবার দিন কাটতো কলেজে এবং আড্ডায়। পুত্র কন্যাদের তদারক করা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। ফলে কবিরা প্রায় নিজেদের ইচ্ছামতোই বেড়ে উঠতে লাগলেন। অবশ্য মা'র মৃত্যুর পর পরই সমর সেন স্কুলে ভর্তি হন। ক্লাশ সেভেনে। কাশিমবাজার পলিটেকনিক স্কুলে। কবির বর্ণনা : 'বারো বছর বয়েসে অর্থাৎ মা'র মৃত্যুর পরে স্কুলে ভর্তি হই। বাবা স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়াতেন বটে, কিন্তু স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলে আমাকে নিল না অনুপযুক্ত বলে। গেলাম মহারাজা কাশিমবাজার পলিটেক্‌নিক স্কুলে। শাজাহান কার বাবা গোছের প্রশ্ন ও দু একটা ইংরেজী সেন্টেন্স রচনা পরীক্ষার পর চতুর্থ ক্লাসে (এখন ক্লাস vii) নেওয়া হ'ল।'[১৭] এই সময়ে কবি তাঁর পরিচিতির বাইরে কারো সঙ্গে গায়ে প'ড়ে মিশতে চাইতেন না। অথচ তাঁর মধুর উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব তখন থেকেই সকলের দৃষ্টি কাড়তো। আর পরিচিত গণ্ডীর ভিতরে কবির স্বভাব ছিল অকুতোভয় প্রচণ্ড দুরন্ত। নির্ভীকতায় উজ্জ্বল। কমলা রায় জানিয়েছেন, 'বাবা কলেজ চলে গেলেই অবাধ রাজত্ব। পর পর সব বাড়ী। এ ছাদ থেকে ও ছাদে যাওয়া যেত। খোকাদার তখন এগারো কি বারো বছর বয়েস হবে; কালুদা আর লালুদাকে [কেশব সেন ও অনিল সেন] নিয়ে এ ছাদ থেকে ও ছাদ থেকে আচার নিয়ে আসতেন। বেচারা বাবা কলেজ থেকে ফিরলেই পাড়ার লোক এসে নালিশ করতেন। রাস্তায় কাকে ঘুঁষি মেরে নাক ফাটিয়েছেন—এসব তো আছেই।'[১৮] বলা বাহুল্য কবি এ সময়ে শরীর চর্চায় যত্নবান হন। সাঁতার, কুস্তি, বক্সিং, লাঠিখেলা ইত্যাদি শেখেন। পরে আমেরিকা প্রত্যাগত পিতার বাল্যবন্ধু, ব্রহ্মবিহারী সরকারের উৎসাহে তিনি আরো বেশী শরীর চর্চায় উৎসাহী হন। যিনি কবিকে গঙ্গায় নিয়মিত সাঁতার শেখাতে নিয়ে যেতেন, কবিরই অন্য সহোদরদের সঙ্গে।

কবির জীবন যাত্রা এসময়ে খুবই অনাড়ম্বর ছিল। ঘটা করে জন্ম দিন পালিত হয়নি তাঁর বেলায়। পক্ষান্তরে এই জন্মদিন উপলক্ষে বাড়িতে পায়েস হলেই যথেষ্ট ছিল। এবং মাসে একবার মাংস হলেই তাঁরা খুশী হতেন। অবশ্য মাছের টুকরো দুবেলাই তাঁদের পাতে পড়ত। ডিমের চলন খুব একটা ছিল না বললেই চলে। উপোস বা বেলের মোরব্বা দিয়ে কারো পেট খারাপ হলে সারাবার ব্যবস্থা হ'ত। ওয়ালফোর্ড বাসের ছাদ-হীন দোতলায় চড়ে কবিদের বেশ ফূর্তি হ'ত। ট্রামে বাসে ভীড় খুব একটা ছিল না। যদিও তখন কবিরা পায়ে হেঁটেই বিভিন্ন গন্তব্যস্থানে যেতে উৎসাহী ছিলেন। এ সময়ে

হাতে ভক্তিভরে কপালে তিলক আঁকার দৃশ্য, গলিত শব ভেসে যাওয়ার দৃশ্য, গঙ্গার পুল তুলে রাখা ইত্যাদির বর্ণনা কবির হাতে দুর্মর হয়ে উঠেছে। এছাড়াও রাস্তার কলে বাববধূদের ক্লান্ত কোলাহলের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার কথা, মন্দিরে পুরোহিতের পুজোর এবং পুজোর অব্যবস্থার চরম দুর্দশার কথা কবির দৃষ্টিতে ধবা পড়েছে। তিনি স্কুল ছুটির পর বাড়িতে একা একা থাকলেও ঐ শৈশবেই বাগবাজারের বখাটে ভাবকে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তাঁর নিজের মন্তব্য এখানে লক্ষণীয়—'স্কুলে 'লাল ছেলে'র প্রসঙ্গ উঠলে ব্যাপারটা বুঝতাম না, স্কুলের পবে একা একা থাকতাম কিন্তু একটা বাগবাজারি বখাটে ভাব কখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি।'[২৫]

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে সমর সেন ম্যাট্রিক পাশ কবে পিতা ও বি-মাতাব সংসার ছেড়ে বেহালায় দীনেশচন্দ্র সেনের বাগানবাড়িতে ওঠেন। এখান থেকে স্কটিশ চার্চ কলেজে যাতায়াত করে পড়াশুনা শুরু করেন। এখানে তিনি অনেকটা গ্রাম্য পরিবেশ পেয়েছিলেন। ডায়মণ্ড হারবার রোডের পাশেই অবস্থিত বাগানবাড়িটা তিনতলা। প্রায় ছ'বিঘে জমি নিয়ে বাগানবাড়িটি। কবির বোনেব মতে অবশ্য ১০ কাঠা জমি নিয়ে। তাঁর মতে—'বেশ কিছু দূরে একটা বাগানবাড়ি কিনেছিলেন ১০ কাঠা জমির ওপর [দীনেশচন্দ্র]।'[২৬] তবে একথা যথার্থ নয়। কারণ এ সম্পর্কে কবি নিজেই জানিয়েছেন :'বাগানবাড়িটা তিনতলা, প্রায় ছ বিঘে জমি, পুকুর, ফল-মূল ফলের ছড়াছড়ি।'[২৭] অর্থাৎ বাগানবাড়িতে বাঁধানো পুকুর ঘাট সমেত পুকুর, নিচে বাইরের ঘব, ভাঁড়ার ঘর— ভেতরে মস্ত উঠোন, তার পাশে রান্নাঘর, গোয়াল, দেবদারু, সুপুবি, তেজপাতা, নারকেল, এলাচ, আম, কাঁঠাল, জাম, সবেদা, লিচু প্রভৃতি সবুজ গাছ গাছালি ভর্তি ছিল। সাপের উৎপাত ও ম্যালেরিয়ার আতঙ্কে থেকেও বেহালা জায়গাটা কবিব ভালোই লাগতো। একটু বেরিয়ে পড়লে আদিগন্ত মাঠ, সবুজের সম্ভার, কৃষ্ণচূড়ার লালচে আভা কবিকে মুগ্ধ করতো। নিজেদের বাগানে সময় কাটাতেন ঘণ্টাব পর ঘণ্টা, পুকুরে সাঁতাব কেটে এবং ফলমূল কুড়িয়ে খেয়ে। আর মুসলমান প্রতিবেশীদের পরবের পরে পাঠানো, নিষিদ্ধ মাংস দেখলে তো কবিদেব উৎসাহ বেড়ে যেত শতগুণে।

এখান থেকে স্কটিশ কলেজে নিত্য যাতায়াতেব সময় পথে গ্রাম ও শহরের পাশাপাশি সহাবস্থান কবির চোখে ধরা পড়তো। পরবর্তী কালে কবিতায় যা ছন্দোবদ্ধ হয়েছে। আই.এ. পড়বার সময় থেকেই ইংরেজির ভালো ছাত্র হিসেবে খ্যাতি প্রকাশ পায়। স্ফুরিত হতে থাকে কবির সাহিত্যবোধ। তাঁর পিতামহ রসিকতা করে কবিকে বলতেন—'তুই একটা ব্যাংলো ইণ্ডিয়ান।' অন্যদিকে শুরু হয় 'কল্লোল', 'কালিকলম'-এর মাধ্যমে কবির চিত্ত চাঞ্চল্য। কবি মনে করতেন এই সব পত্রিকার লেখকবাও এক হিসেবে বিপ্লবী। কারণ এঁরা স্থবির ভণ্ড সমাজেব বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। জীবনের সবগুলো দিক অকপটে স্বীকার করে নিতে এঁরা আগ্রহীও। কবির মনে এঁদের কাবো কারো কাব্যপংক্তি স্মরণীয় হয়ে মুদ্রিত রয়েছে।

সমর সেনের তুলনামূলক সমালোচনা করার শক্তিও এসময় থেকে দৃঢ়তার সঙ্গে

প্রকাশ পায়। এ প্রসঙ্গে সহপাঠী বন্ধু দেবীভূষণের স্মৃতিচারণায় ধরা পড়ে কবির প্রতিভা : 'তার হাতের চটি বইটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কি বই?' নিঃশব্দে বইটা এগিয়ে দিলেন। দেখলাম এক ইংরেজ কবিব বই। কবির নাম ডবল্যু.বি.ইয়েটস্। আমার দিকে তাকিয়ে সমব জিজ্ঞেস করল, 'আপনার ইয়েটস্ কেমন লাগে?' আমার দ্রুত উত্তর, 'আমি তো কবিতা টবিতা পছন্দ করি না। এই ভদ্রলোকের নামে একটা গুজব শুনেছি—নাকি রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি ইনি অনুবাদ করেছেন? আপনি কিছু জানেন?' একটু চুপ করার পর ও উত্তর দিল, 'ওটা মনে হয় গুজবই। আপনি এই বইটা নিয়ে যান। গীতাঞ্জলির সঙ্গে কবিতা গুলো মিলিয়ে দেখবেন। দুটোর স্টাইল সম্পূর্ণ আলাদা। ভাষার জাতও আলাদা। দুটো এক হাতের বলে মনে হয় না। তবে ও ব্যাপার নিয়ে আমি মাথা ঘামাই নি।'[২৮] অনুরূপে শেকস্‌পীয়রের নাটক 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' এর পোর্শিয়া চরিত্রেব সমালোচনা করাতে ক্লাশের ইংরেজ অধ্যাপক, মাওয়াট সাহেব কবিকে ডেকে পাঠান। যখন কবির বয়েস ষোল বছরও পূর্ণ হয়নি। আর শেকস্‌পীযর সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যের দাবি করার যোগ্যতাও হয নি। শুধু মূল নাটকটা পড়েছিলেন দু-একবার অন্যান্য ছাত্রদের মতনই। তাই বলে ধারাবাহিক ভাবে পড়াশুনা খুব একটা করতেন না। এ ব্যাপাবে তাঁর বোন জানান 'পরীক্ষার আগে পড়াশুনা করতেন না। তা নিয়ে বাবা খুব চিন্তায় পড়তেন।' আর কবিও নিজে জানিয়েছেন—'পড়াশুনা যে বিশেষ কবতাম তা নয়'। গতানুগতিক ভাবে কলেজ আর বাড়ি করে কাটাতেন তিনি। আশে পাশের অঞ্চল ঘুবতেন। কখনো বা ফাঁকা মাঠে মেজ দাদার বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতেন। এই আড্ডার একজন, সুধীন চট্টোপাধ্যায় সুগায়ক ছিলেন। আবার সময় বিশেযে পিতামহের ঘোড়ার গাড়ী ধার নিতেন। মোট কথা পড়াশুনার ব্যাপারে বইপত্র বেশী না কিনলেও, লাইব্রেরী বা অন্য কারুর কাছ থেকে চেয়ে এনে বই পড়তেন। আর স্কলারশিপের টাকা অন্যখাতে খরচ করতেন। এটা তাঁর বরাবরের স্বভাব। তাই কবির মা ছোটবেলায় বলতেন 'মাকাল ফল'। কিন্তু পড়াশুনা বেশী না করলেও তীক্ষ্ণ মেধার কথা তুলতেই হয়। যার সাহায্যে তিনি বি.এ পরীক্ষায় ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। কবির মা বেঁচে থাকলে দেখতেন তাঁর ধারণা কত ভুল। কবির এই তীক্ষ্ণতা বোধ এবং স্মরণ শক্তি এম.এ. পরীক্ষার সময়ও অব্যাহত ছিল। কত কম পড়ে, কত নতুন ভাবে তথ্যকে পরিবেশন করা যেতে পাবে, এ ব্যাপারেও সমর সেন যত্নবান ছিলেন। এ সম্পর্কে বিষ্ণু দে-জায়া, প্রণতি দের মন্তব্য : 'সমর বাবু .... এসে প্রায়ই বলতেন—এ বইটা পড়তে হবে, বলুন তো, এর minimum কী পড়লে চলবে! বোধহয় এম. এ. পরীক্ষার সময়েই একটি লিস্ট দিয়েছিলেন, বইগুলি প্রয়োজন এবং তার উপরে পড়ার বই—সব থেকে সংক্ষিপ্ত লিস্ট চাই। অন্য ছাত্ররা ওঁর [বিষ্ণুদে] কাছে এসে বই এর নাম চাইতেন যত বেশী হয় ততই ভালো—সমর বাবু কিন্তু ঠিক বিপরীত—যত সংক্ষিপ্ত হয় ততই ভালো! সমরবাবু modern বই খুঁজতেন, আমার স্বামীরও সেই দিকে মন ছিলো, কাজেই মিলেছিল ভালো। সমরবাবুর তো অসম্ভব স্মরণশক্তি ও মেধা, লেখারও অসাধারণ

ক্ষমতা কিন্তু সব কিছুই সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা! সেই জন্য আমার স্বামী ওঁর নাম দিয়েছিলেন 'ফুকফুক সেন'।[২৯]

আর এ সম্পর্কে নিত্যপ্রিয় ঘোষ মন্তব্য করেছেন : 'সমর বাবু খুব ভালো ছাত্র ছিলেন, এটা সবাই জানেন। এ বিষয়ে দুটো মত আছে। একটা মত তিনি, সব সময়েই মনে রাখতেন, তিনি ভালো ছাত্র ছিলেন। আর একটা মত, তাঁর ফার্স্ট হওয়া নিয়ে তিনি মোটেই গর্বিত ছিলেন না। এ বিষয়ে আমার মত, দুটো মতই সত্য। তিনবার আমি তাঁর কাছে একই কথা শুনেছিলাম, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে। —বি.এ. তে আমি ফার্স্ট হয়েছিলাম, অশোক সেকেণ্ড হয়েছিল (অশোক মিত্র)। অশোক বলে ও আমার থেকে চার নম্বর কম পেয়েছিল। আসলে ও ছয় নম্বর কম পেয়েছিল।'[৩০] যাইহোক, ছাত্র জীবনে পরীক্ষা আসন্ন-শিরে সংক্রান্তি না হওয়া পর্যন্ত পড়াশুনোয় মনোযোগ দিতেন না।

ক্রমে বেহালায় থাকাকালীন একটি উদার মননশীল মানসিক আবহাওয়ার উত্তরাধিকার অর্জন করতে থাকেন কবি। এই বাড়িতে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে রাধারমণ মিত্র বহু বছর ছিলেন কবিদের সঙ্গে। ছিলেন বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়ও। জীবনের নানা বিচিত্র দিকে রাধারমণ বাবু কবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। বেহালার বাসায় লোক শিল্পের গবেষক, অজিত মুখোপাধ্যায়ও থাকতেন। ক্রমে পরবর্তী কালে আসেন শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধায়, জসীমউদ্দিন। আসেন বিষ্ণু দে, চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়, অশোক মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সমর সেনের প্রথম মুদ্রিত হয় কবিতা। এ সম্পর্কে কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য 'পূর্বাশা' পত্রিকায় সমর সেনের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে—'তাঁর [সমর সেন] প্রথম কবিতা পূর্বাশায় বেরোয়, পরে তিনি 'কবিতা' পত্রিকায় বিশিষ্টতা অজন করেন।'[৩১] আবার বুদ্ধদেব বসুর দাবি অন্য রকম—'আমরা একটি ত্রৈমাসিক কবিতা পত্র বার করেছি—তাব প্রথম সংখ্যা আজ আপনাকে পাঠালাম। .... একজন কবিব রচনা আমরাই প্রথম প্রকাশ করলাম—সমর সেন।'[৩২] রবীন্দ্রনাথকে লেখা বুদ্ধদেব বসুর চিঠি, ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৫।

সময়ের হিসেবে সমর সেন ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে নিয়মিত কবিতা লিখতে থাকলেও সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মন্তব্য ঠিক নয়। এবং 'কবিতা' পত্রিকা ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়; ফলে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্যও গ্রহণযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে, পুলক চন্দ জানিয়েছেন—'১৯৩৩-এ 'শ্রীহর্ষ', ছাত্র-ছাত্রীদেব আন্তর্বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকায় [সমর সেনের] প্রথম মুদ্রিত কবিতা : 'তুমি ও আমি'। 'তুমি বসে আছো, /বসে আছ স্তব্ধভাবে আমার পাশে।/আমি বসে আছি,/ রক্ত মোর কাঁপিছে উল্লাসে।/তুমি বসে আছো,/ তোমার দুই চোখে জাগে রাত্রির ভালোবাসা।/ আমি বসে আছি,/ আমার চোখে কাঁপে প্রভাতের রক্তিম আশা।'[৩৩] পুলক চন্দের বক্তব্যই ঠিক। তাঁর বক্তব্যের সমর্থন মেলে মনীন্দ্র রায়ের কণ্ঠেও '...... তাঁর [সমর সেনের] নামের সঙ্গে পরিচয় ছিল আগেই। .... সে কালে 'শ্রীহর্ষ' বলে ছাত্রদের একটি কাগজ ছিল। কিংবা একটি না বলে বলা উচিত

দুটি কাগজ। কেননা পরে ইংরেজী বাংলা দুই ভাষাতেই আলাদা দুটি কাগজ বেরিয়েছে। যাই হোক তখনকার বাংলা শ্রীহর্ষের সম্পাদক ছিলেন সমর সেন। ব্যবস্থাপনা ছিল ছাত্রগোষ্ঠীর হাতে। ফলে শ্রীহর্ষের সেই রমানাথ মজুমদার স্ট্রীটের অফিসে আনাগোনা ছিল সমস্ত মতের ছাত্রেরই, সকলেই স্বেচ্ছায় সাহায্য করতেন।'[৩৪]

এই একই বছরে সমর সেন যৌথভাবে 'Today' নামক একটি ইংরেজী দ্বিমাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করেন। পত্রিকাটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে কবি নিজেই স্মৃতিচারণ করেছেন : 'কয়েকজন ছাত্র এবং একটি ছাত্রী মিলে দ্বিমাসিক বের করা হল, নাম Today। পাঁচ সংখ্যা বেরিয়েছিল, শেষ সংখ্যায় পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ ছাপা হওয়াতে আর কাট [অধ্যক্ষ] আমার উপর অসম্ভব চটে গিয়ে কৈফিয়ৎ তলব করেন। (ও-সংখ্যাটির প্রকাশ কালে আমি ছিলাম বার্মায়); উপ-অধ্যক্ষ ক্যামেরণ আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের মালমসলা যারা বানায় তারা 'কিছু' দিয়েছিল কিনা? যা হোক তখন আমরা কলেজের এক্তিয়ারের বাইরে বলে কর্তৃপক্ষ অসহায়।'[৩৫] মোট কথা অল্প বয়েস থেকেই পত্রিকা সংক্রান্ত ব্যাপারেও কবি যে ওয়াকিবহাল ছিলেন তাতে সন্দেহ থাকে না।

অন্যদিকে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দেই কবির বয়ঃসন্ধিজনিত অস্থিরতা ও যন্ত্রণার শুরু। পিতার সঙ্গে মত বিরোধের ফলে গৃহত্যাগ করেন। উঠেছিলেন হোস্টেলে এবং আত্মহত্যার চেষ্টায় পটাসিযাম সায়নাইডও সংগ্রহ করেছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য: '১৯৩৩-এর শেষাশেষি জীবন যাত্রায় পবিবর্তন ঘটতে শুরু করলো। আমার মেজমাসিমা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যাবার আগে কলকাতায় গিয়ে রাত জেগে তাঁর সেবা করতাম। সেই বয়েসে রোগটা ছোঁয়াচে বলে বাবা আপত্তি করাতে রাগ ক'রে একটা হোস্টেলে উঠি মাস তিনেকের জন্য। .... হোস্টেলে আবাসিকদের অনেকে ছিলেন বিজ্ঞানেব ছাত্র। একজনকে বলে পটাসিয়াম সায়নাইড যোগাড় করি। একটি 'অন্তিম' রাত্রে কিছুটা মুখে দিয়ে সৃষ্টির আগে ব্রহ্মার মতো অবর্ণনীয় অবস্থায় থাকি—কিছু হলো না—জিনিসটা সুগার অফ মিল্ক।'[৩৬] পবে অবশ্য সত্যিসত্যিই পটাসিয়াম সায়নাইড যোগাড় করেন, কিন্তু তার আস্বাদ নিজে গ্রহণ কবেন নি।

কিন্তু বয়ঃসন্ধিতে পিতার সঙ্গে মত বিরোধ বা যৌনতা উন্মেষের চেয়ে ইতিহাসে উপনিবেশিক সমাজের সংকট ও সংক্রান্তিকে অনেক বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন কবি। বিশেষ করে পরবর্তীকালে লেখা, অর্থাৎ ফেব্রুয়ারী ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে লেখা এক কবিতায় কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তীর্ণ হ'বার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে মদন রাজত্ব থেকে বিতাড়িত হবার কথা থাকলেও, ব্যক্তিজীবনের সেই বিশেষ অভিজ্ঞতার স্থান এখানে অসহযোগ, সন্ত্রাসবাদ, শ্রমিক-কৃষকদের সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি ইত্যাদি বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে নিহিত :

'বয়ঃসন্ধির সময়
মহাত্মাজীর আন্দোলন শুরু হলো।

লবণ আইন ভাঙে, দলে দলে জেলে যায়,
মাঝে মাঝে বিপ্লবী বোমা ফাটে—
হাতে হাত কড়া, নানাবিধ রদ্দা, চরম শাস্তি।
বন্ধ সংবাদপত্র, রাস্তায় নিষিদ্ধ পোস্টার;
জর্মানরা বুঝি-বা বঙ্গোপসাগরে এল।
লাল পাগড়ির লাঠির সামনে
(বঙ্কিমী সে লাঠি)
দেশবন্ধু পার্কে এলো মেলো পলায়ন,

তারপর কলেজে প্রবেশ, প্রথম যৌবন;
শ্রেষ্ঠ দিনগুলি একে-একে গেল,
ইতিমধ্যে ইতস্তত, অনেকের মতো
মদনরাজত্ব থেকে বার কয়েক বিতাড়িত।
ওদিকে হাওয়ায় বর্ধমান শব্দ :
কারখানায় ধর্মঘট,
গ্রামে খাজনা বন্ধ করো,
জমিদার, বণিক বরবাদ,
ইন্‌কিলাব্ জিন্দাবাদ,
অর্থাৎ বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।'[৩৭]

—কাব্যে যাই-ই লিখুন না কেন সমর সেন, বাস্তব জীবনে কিন্তু এই বয়ঃসন্ধির অস্থিরতা হেতু তাঁর সে সময় অনেক মনোভাবই পরিবর্তিত হয়েছিল। তার মধ্যে পড়াশুনা সম্পর্কে কবির মনোভাব ও দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে ফুটে উঠেছিল। এই সূত্রেই তিনি আই. এ. পরীক্ষায় বসতে নারাজ ছিলেন। পরে পরীক্ষার দিন বারো আগে গভীর অধ্যয়ন সহযোগে পরীক্ষায় বসেন ঠিকই।

আই. এ. পরীক্ষা দেওয়ার পর কবি সহপাঠী দেবীভূষণের সঙ্গে এবং আরো কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে রাঁচী বেড়াতে যান। পনেরো দিনের জন্য। এখানের একটি হোটেল—ইম্পিরিয়াল হোটেলে আশ্রয় নেন। এখানে থাকাকালীন কবি সাতটার আগে ঘুম থেকে উঠতেন না। তবে এখানের সুন্দর পরিবেশের মধ্যে প্রতিদিন তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় হাঁটতেন; সন্ধ্যেবেলায় ডুরাণ্ডায় যেতেন। কখনো বা বাজারের মধ্যে চায়ের দোকানে বসে কেক খাওয়া, কোনদিন মোরাবাদী হিল, কোনদিন কাঁকে ইত্যাদি এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে তাঁদের ভ্রমণ সম্পূর্ণ হয়। রাঁচীর পাগলা গারদের রহস্য কবির অনির্বার আকর্ষণের বস্তু ছিল। প্রায়শ সেখানে যাওয়ার ফলে রাঁচীর সবচেয়ে দর্শনীয় হুড্রু ফলস-এ আর সেবারে সমর সেনদের দেখা হয়নি।

পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আই. এ. পাশ করে সমর সেন স্কটিশ কলেজেই বি.এ. ক্লাশে ভর্তি হন। এই স্কটিশ সম্পর্কে তিনি উচ্চকিত ছিলেন। কখনো মন্তব্য করেছেন, 'স্কটিশ চার্চ কলেজ ছিল গণতান্ত্রিক, নানা শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী আসতো স্কটিশে।' আবার কখনো বলেছেন—'স্কটিশ চার্চ কলেজে তখন মাঝে মাঝে রাজনৈতিক আন্দোলন দেখা দিলেও উল্লেখযোগ্য ভাবে কিছু হয়নি। তবে এখানে পড়াশুনার মান ছিল খুব উঁচু। কলেজে ইংরেজিতে শিক্ষক হিসাবে নাম ছিল মোয়াট, বি.বি.রয়, সুশীল দত্তের, বিশেষ করে প্রথম দুজনের। কলেজের অধ্যক্ষ আরকার্ট দর্শন পড়াতেন। বাংলায় সুধীর দাশগুপ্তের বাঙাল উচ্চারণ সত্ত্বেও ক্লাশে টু শব্দটি হতো না।'[৩৮] সহপাঠিনীদের মধ্যে ডবলিউ. সি ব্যানার্জীর পৌত্রী, অনিলা ব্যানার্জী অন্যতমা। যিনি ঐ কলেজ থেকে ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে বি. এ. পরীক্ষায় অর্থনীতি বিষয়ে প্রথম হন। বি.এ. পড়ার কালেও সমর সেন পাঁচ মেশালি আড্ডায় জড়িয়ে পড়েন। প্রথম দুবছর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে দু-একজনের বেশী না থাকলেও পরে বন্ধুত্বের পরিধি বেড়ে চলে। এই বন্ধুত্বের টানে টানে অন্য অনেকের মতন এসেছেন চঞ্চল কুমার চট্টোপাধ্যায়, অশোক মিত্র (I.C.S.), কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দেব সঙ্ঘ-এর দেবু চৌধুরী, স্নেহাংশুকান্ত আচার্য প্রমুখ। এঁদের মধ্যে আবার চঞ্চলকুমারের সঙ্গে কবির হৃদ্যতা বেশী ছিল, কারণ তাঁরা একদা প্রতিবেশী ছিলেন। আর স্নেহাংশু ছিলেন তাঁদের খিস্তি খেউড় ক্লাসের অধ্যাপক; যে খিস্তি খেউড় তথা অশ্লীল শব্দের প্রতি কবির দুর্বলতা অধিক ছিল। যে গুলিকে কবি অতি অল্প বয়েস থেকেই আয়ত্ব করেছিলেন। এমনকি কবি এই খিস্তির পাঠ দিয়েছেন একদা নিজের ভাগ্নেকে পর্যন্ত। বলাবাহুল্য, সেই ভাগ্নার আধো আধো বুলি-মুখের খিস্তি উচ্চারণ বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতেন তিনি। কবির পিতা পর্যন্ত এ প্রশ্রয় মেনে নিয়েছিলেন। তাঁর বোনের মতে, 'খোকাদাদের খুব প্রিয় ছিল রবি, (ভাগ্না)—অসম্ভব দুরন্ত। আর দুই মামাতে (কবি ও জে.পি. সেন) ওকে এমন সব অশ্লীল কথা শিখিয়েছিলেন যে মাঝে মাঝে বাইরের লোকের সামনে দিদিকে খুব মুস্কিলে পড়তে হতো। ভাগ্যিস খুব কম লোক ওর ওই আধো আধো খারাপ কথা বুঝতে পারতো। বাবা কিন্তু রবির খারাপ কথাগুলো খুব উপভোগ করতেন।'[৩৯]

১৯৩৪-এ সমর সেন বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা' কাব্য পড়ে প্রচণ্ডভাবে অভিভূত হয়ে পড়েন। কয়েকটি কাব্য পংক্তি তখন কবিকে ইষ্টমন্ত্রের মতন তাড়া করে ফেরে। অনেক পংক্তি মুখস্থ পর্যন্ত হয়ে যায়। বিশেষত, 'রতিক্লান্ত রমনীর কেশের মতন', 'রমণীরমণ রণে পরাজয় ভিক্ষা মাগে নিতি', 'বেপাড়ায় গিয়ে কটুগন্ধ অন্ধকারে শুধিলাম বিধাতার দেনা' অবিস্মরণীয় পংক্তি। আর বুদ্ধদেব বসুর কবিতার কয়েকটি ইংরেজী অনুবাদ নিয়ে বুদ্ধদেবের কাছেই হাজির হন সমর সেন। ১৯৩৩-এ একদা কবির যে মানসিকতার অস্থিরতায় টানাপোড়েন শুরু হয়েছিল, সেই মনেরই আশ্রয় মিলল বুদ্ধদেবের কবিতা প্রীতির উদার অঙ্গনে। তাঁর ভাষায়—'১৯৩৪-এ গ্রীষ্মকালে দারুণ মর্মবেদনা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য একবার সাহস করে গেলাম বুদ্ধদেব বসুর বাড়ীতে, ভবানীপুরে। 'বন্দির বন্দনা'র কয়েকটি কবিতার ইংরেজী অনুবাদ পড়ে খুশী হয়ে জিজ্ঞেস

করলেন আমি কবিতা লিখি কিনা। কয়েকটি লেখা দিন কয়েক পরে দেখাতে, বললেন নিয়মিত ছন্দের চেষ্টা ছেড়ে গদ্য ছন্দে যেতে।'[৪০] আর বুদ্ধদেব বসু মুগ্ধ হলেন তরুণ কবির ইংরেজীর দখল ও কবিত্ব শক্তিতে। তাঁর দৃষ্টিতে—'এক গ্রীষ্মের সকালে আমার ঘরে এলো একটি ক্ষীণাঙ্গ ছেলে—প্রায় বালক, সবে পা দিয়েছে যৌবনে-গায়ের রং হলদে ঘেঁষা ফর্সা, ঠোঁটে গোঁফের ছায়া, চোখে চশমা, গালে একটি ব্রণের উপর একফোঁটা চুন লাগানো। কিছুমাত্র ভূমিকা না করে বললো, আমি আপনার 'শাপভ্রষ্ট' কবিতার একটা ইংরেজি করেছি—আপনি দেখবেন?....তর্জমাটি পড়ে চমক লাগলো আমার—এত অল্প বয়েস, অথচ ইংরেজি ভাষায় তার দখল অসামান্য, কবিতার দিকে মনের টান আছে বোঝা যায়। লেখাটা আমি পাঠিয়ে দিলাম বোম্বাইয়ের নতুন বেরোনো ওরিয়েণ্ট পত্রিকায়, সম্পাদক সেটি সমাদর পূর্বক গ্রহণ করলেন।'[৪১] বুদ্ধদেবের প্রশ্রয়ে যে অতীব ফল লাভ হয়েছিল, তা 'কবিতা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা পাঠ করলেই জানা যায়। আর এই ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই কবি সমর সেনের নিয়মিত কবিতাচর্চার শুরু। কবির বয়েস তখন মাত্র আঠারো। একেবারেই যৌবনের প্রারম্ভে।

ক্রমে বুদ্ধদেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ টানে কবি ১৯৩৫-এর আশ্বিন মাস থেকে ২০২ রাসবিহারী এভেনিউ-এ, বুদ্ধদেবের 'কবিতা ভবন'-এ আড্ডা জমান। এখানের আড্ডা ছিল অন্যধরনের। অনেক বেশী ঘরোয়া। তাত্ত্বিক আলোচনা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। মূলত এ আড্ডায় কবি শ্রোতার ভূমিকা গ্রহণ করতেন। মাঝে মধ্যে ছোট খাটো মন্তব্য করতেন। কবির এই স্বভাব বরাবরের। পরবর্তীকালেও সাহিত্য, অ-সাহিত্য সমস্ত ধরনের আড্ডাতেই এ বৈশিষ্ট্য বজায় থাকতো। সঙ্গে রসিকতা। অদ্ভুত সেন্স অব্ হিউমারের জন্য আর পাঁচজনের সঙ্গে খুব সহজেই স্বতন্ত্র ছিলেন তিনি। 'কবিতা ভবন' থেকে প্রকাশিত 'কবিতা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই লেখেন এজরা পাউন্ডের উদ্ধৃতি দিয়ে শিরোনাম 'Amor stands upon you : মুক্তি, স্মৃতি, প্রেম' কবিতা। (এ বিষয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ে, 'দেশ-কাল-কবিতা'র 'কাব্য পরিমণ্ডল'-এ বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ)। কবিতা পত্রিকার প্রথম সংখ্যা পাঠান্তে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেন : 'সমর সেনের কবিতা কয়টিতে গদ্যের রূঢ়তার ভিতর দিয়ে কাব্যের লাবণ্য প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্যে এঁর লেখা ট্যাকসই হবে বলেই বোধ হচ্ছে।'[৪২] উত্তরে বুদ্ধদেব আরও প্রসারিত হয়ে রবীন্দ্রনাথকে ১৬.১০.১৯৩৫ তারিখে জানান—'সমর সেনের কবিতা আপনার ভালো লেগেছে জেনে বিশেষ খুশি হলাম। এঁর বয়েস অল্প, লিখছেন অল্পদিন ধরে, কিন্তু এঁর কবিতা প্রথম দেখেই আমার মনে হয়েছিলো বাঙলা গদ্য ছন্দে সম্পূর্ণ নতুন একটি সুর ইনি ধরেছেন। তাছাড়া, যেটা প্রকৃত কাব্যবস্তু, তারও অভাব নেই।[৪৩] বলার অপেক্ষা রাখে না প্রথম আত্মপ্রকাশেই সমর সেনের কবিখ্যাতি যে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল—তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত কবিসাহিত্যিকদের কাছে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কবির বয়েসও কবির দৃষ্টিভঙ্গির যে বর্ণনা উপরে বণিত, তাতে তাঁর কবি মেজাজটি নিখুঁত ভাবেই ধরা পড়েছে।

'কবিতা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা পাঠাতে লন্ডনের 'Times Literary Supplement' (T.L.S.)-এর এডোয়ার্ড টমসন এজরা পাউন্ড, টি.এস.এলিয়ট এবং ডি. এইচ, লরেন্সের সঙ্গে সমর সেনের কবিতার তুলনামূলক সমালোচনা করেন। এ প্রসঙ্গে আত্মপ্রচার বিমুখ সমর সেন স্বয়ং কোথাও কোনো মন্তব্য করেন নি। অথচ সমসাময়িক কবি-সাহিত্যিকদের চোখে এটি বিশেষ ভাবে রেখাপাত করে। কেননা তখনকার দিনে বিশ্বসাহিত্যের ক্ষেত্রে এই পত্রিকার মূল্য সর্বাধিক। আর এডোয়ার্ড টমসনও খ্যাতনামা সমালোচক—যাঁর রবীন্দ্রনাথের বই আছে। তাছাড়া T.L.S. এ কিছু প্রকাশ হওয়া মানেই সারা পৃথিবীতে সাহিত্য রসিকদের মধ্যে তা ছড়িয়ে যাওয়া। সমর সেনের বয়েসের তুলনায় এটা একটা বড়ো মাপের সম্মান ও স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে। অন্য কারোর ক্ষেত্রে এটা ঘটলে হয়তো তার জীবন যাত্রার মানই পাল্টে যেত। সে হয়তো এখান থেকেই বাকী জীবনের রসদ কুড়িয়ে নিয়ে বিস্তর কবিতা লিখে খ্যাতির চূড়োয় উঠতো। নাম যশ হত। বিদেশে পাড়ি জমাতো। অথচ সমর সেনের ক্ষেত্রে সে সব কিছুই হল না। নির্লোভ, যশাকাঙ্ক্ষাহীন সমর সেনকে হুজুগের ধাক্কা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না যে, তাই লক্ষ্য করা যায়।

১৯৩৬-এর গোড়ার দিকে, বন্ধু চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহায়তায় বিষ্ণু দের সঙ্গে সমর সেনের আলাপ ঘটে। বিষ্ণুদের বাড়িতেই। প্রথম সাক্ষাৎকারটি ধরা আছে কবিরই স্মৃতিতে আশ্চর্যভাবে। 'The first time I meet Bishnu Dey was in 1936. The visit left mixed impressions. He looked a sickman, with his nose and eyes, so remarkable when he is normal, having almost a me-phistophelian glamour. He was then the victim of some chronic stomach trouble and undergoing ayurvedic treatment.'[৪৪] বিষ্ণু দের প্রতি ক্রমে আকৃষ্ট হন কবি। বিষ্ণু দের বাড়িতে পাশ্চাত্য উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জন্য তিনি প্রায়ই হানা দিতেন। কখনো একা। কখনো সঙ্গে চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়। প্রতিদিন বেলা দুটো নাগাদ বিষ্ণু দের বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে রাত আটটার আগে উঠতেন না। যদিও বিষ্ণুবাবু তার্কিক ছিলেন না, তবে মাঝে মাঝে টিপ্পনি কাটতেন। অবশ্য বেশী কথা বলতেন না। এ বছরেই সমর সেন বি এ. পরীক্ষায় ইংরেজী অনার্স নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। সেই সঙ্গে প্রিয়নাথ ঘোষ, গঙ্গাতারা দাসী পদক ও জুবিলী পি.জি. স্কলারশিপ লাভ করেন।

বি. এ. পরীক্ষার পর সমর সেন সহপাঠী বন্ধু দেবীভূষণ ভট্টাচার্যের সহায়তায় দেবীভূষণেরই মামাতো ভাই, সন্তোষকুমার চক্রবর্তীর কর্মস্থল ব্রহ্মদেশে বেড়াতে যান। ব্রহ্মদেশে যাওয়া হয়েছিল প্রায় দুমাস।[৪৫] সহযাত্রী ছিলেন দেবীভূষণ ছাড়াও অজিত মুখোপাধ্যায়। গিয়েছিলেন জাহাজের ডেকে চড়ে। রেঙ্গুনে তাঁরা সাতদিন কাটিয়ে, মেমিওতে যান। মেমিও ছোটখাটো সুন্দর হিল স্টেশন। সেখানে তাঁরা ছিলেন মাস দেড়েক। মাঝে ওখান থেকে মান্দালয়ে গিয়ে এক সপ্তাহ মতন কাটান। এখানের দৃশ্য এবং বর্মী মেয়েদের অতিথি পরায়ণতা দেখে কবি এত অভিভূত হয়েছিলেন যে, মনে করেছিলেন যদি একটা চাকরি ব্রহ্মদেশে পেয়ে যান তাহলে থেকে যাবেন। দিনের পর দিন তাঁরা গ্রামাঞ্চলেও ঘুরতেন। একবার গিয়েছিলেন আমেরিকানদের তৈরী গোটিকব্রিজ দেখতে।

যুদ্ধের সময় এই ব্রিজটা আমেরিকানরাই আবার বোমা ফেলে ভাঙে। এখানে এসে সমর সেনের উপলব্ধি হয়েছিল যে, নিজের দেশে যারা অবাধ লুণ্ঠন, অবমাননা লাঞ্ছনার শিকার, তারাই অন্য স্থানে গিয়ে লুণ্ঠনকারীর ছোট শরিকের ভূমিকা নেয়। তাঁর অন্তরাত্মা ককিয়ে উঠেছিল, কেননা ব্রহ্মদেশের প্রতিটি ইঞ্চি চাষের জমিই তখন বাঁধা পড়েছে মাদ্রাজী মহাজনদের কাছে। নিজদেশে ব্রহ্মবাসীরা পরবাসী।

বেহালার বাগানবাড়িতে ততদিনে সেই সব সাহিত্যিকদের আনাগোনা শুরু হয়েছে— ঘনিষ্ঠভাবে যাঁদের সঙ্গে কবি মিশতেন। বলাবাহুল্য, এঁরা কোলকাতার পণ্ডিত সমাজের মধ্যমণি। বিষ্ণু দে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠতা হয়েছে যথারীতি আগেই সেই সঙ্গে নতুন ভাবে আলাপ হয় এসময় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে। যাঁর ইংরেজী ভাষা, সাহিত্য, অলংকার সম্পর্কে পাণ্ডিত্য তখন অক্সফোর্ডের অধ্যাপকদের ঈর্ষা জাগানোর পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ক্রমে ক্রমে সমর সেন সুধীন্দ্রনাথের আড্ডাতেও প্রবেশাধিকার পান। প্রায় প্রতি শুক্রবার শ্যামবাজারের সুধীন্দ্রনাথের 'পরিচয়' পত্রিকার আড্ডায় অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তি আসতেন। বিভিন্ন মতামত নিয়ে তর্ক বিতর্ক হত। নিয়মিত এই আড্ডায় যেতেন সুরেন্দ্র গোস্বামী, নীরেন্দ্রনাথ রায়, হিরণকুমার সান্যাল, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, অপূর্ব চন্দ, সুরাবর্দী (রাজনীতিবিদের ভাই), শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, গিরিজাশঙ্কর ভট্টাচার্য, হামফ্রে হাউস, আবু সয়ীদ আইয়ুব, সুশোভন সরকার, হারীত কৃষ্ণ দেব; ছুটির সময় ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মাঝে মাঝে আসতেন, সত্যেন বসু ও অবাঙালী এবং বিদেশী অতিথি বৃন্দ। এই সাহিত্য জগতের আড্ডা ছাড়াও সমর সেনের আরেকটি অন্যতম আড্ডা ছিল। সেটি ছিল তরল, হালকা মেজাজের। কবির হোমিওপ্যাথ দাদার ভবানীপুরের মজুমদার ক্লিনিকে সন্ধ্যেবেলায় এ আড্ডা জমতো। এ সম্পর্কে কবির স্বীকারোক্তি : 'সাড়ে সাতটা নাগাদ আমরা সেখানে একা একে একে জমায়েত হতাম। পরস্পরের পকেটের অবস্থা বুঝে গন্তব্যস্থান ঠিক করা হতো। খিদিরপুরের একটা হোটেলে প্রায়ই যেতাম ডায়মণ্ডহারবারের বন্ধু রাম নারায়ণ সিং এর বাড়ীতে।'[৪৬] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'তিন ভাই'-র কথা যে কবিকণ্ঠে উচ্চারিত, সেই তিন ভাইয়ের অন্তর্মিলের কথা না তুলে পারা যায় না। পারিবারিক ব্যাপারে অনেক মনোমালিন্য থাকলেও তাঁদের ভাইয়ে ভাইয়ে আন্তরিক সম্পর্ক সর্বদা হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল। এই হৃদ্যতা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অটুট ছিল। এরি মধ্যে, সমর সেন কিন্তু কম বেশি আগে পরে করে পড়ে শেষ করেছেন টি.এস.এলিয়ট, ডবল্যু.বি.ইয়েটস্, এজরা পাউণ্ড, অডেন স্পেণ্ডর, ডে.লুইস, ক্রিস্টোফার কডওয়েলের লেখা। শেষ করেছেন এড্‌গার স্নোর 'Red Star Over China'। তবে এঁদের মধ্যে তাঁর বেশি অনুরাগ টি.এস. এলিয়টের প্রতি।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সমর সেন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগের ছাত্র হিসেবে ভর্তি হ'ন। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার মান তাঁর দৃষ্টিতে খুব একটা প্রশংসার ছিল না। অবশ্য Extra-mural ক্লাশ যে সমস্ত অধ্যাপক নিতেন, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। এরি ফাঁকে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, রিপন

কলেজের রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, স্কটিশের মোয়াট, রিপন কলেজের হামফ্রে হাউস, সেন্ট পল্‌সের মিলফোর্ড প্রমুখ অধ্যাপককে শ্রদ্ধা জানাতে কার্পণ্য করেন নি কবি। সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের পরিবেশেরও নিন্দা করেছেন। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের একতলায় দোকান পাটের দমবন্ধ করা আবহাওয়া, সর্বদা যানবাহনের শব্দ পড়াশুনার পরিবেশের পক্ষে প্রতিকূল। এখানের ক্লাশ ফাঁকি দিয়ে সমর সেন সহপাঠীদের সঙ্গে নিয়ে প্রায় যেতেন আড্ডা দিতে 'বসন্ত কেবিন'-এ। তাঁর কবি চিত্তে তখন দানা বাঁধছে এ কবিতার—

'বই-এর পাতায় পড়ি লাবণ্যের প্রেম
আর কখনো বা পড়ি
রক্তের অন্ধকারে নতুন জীবনের স্বপ্ন;
উপরে মেঘ,
আর চিরকালের গভীর আকাশ।'[৪৭]

এবছরেই সমর সেন বাচ্চাদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে গিয়ে পায়ে চোট লাগিয়ে তিনমাস গৃহবন্দী অবস্থায় কাটান। তখন একদিন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে দেখতে আসেন। অসুস্থ অবস্থায় কবি পড়ে শেষ করেন কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য : 'অসুস্থতার দীর্ঘ অবসরে কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদিত মহাভারত শেষ করি। বদহজমের প্রমাণ আছে নিজের কয়েকটি কবিতায়; যাদের বক্তব্য এখন ঠিক বুঝতে পারি না।'[৪৮]

১৯৩৭ এর মার্চ মাসে (চৈত্র ১৩৪৩) সমর সেনের প্রথম কাব্য 'কয়েকটি কবিতা' প্রকাশিত হয়। উৎসর্গ করেন রাধারমণ মিত্রের মাধ্যমে পরিচিত মুজাফর আহমেদকে। স্বর্ণপদক বিক্রি করে এ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বৃহৎ সমাজ স্বার্থের সঙ্গে ক্ষুদ্র শ্রেণীস্বার্থের বিরোধে সৌন্দর্য উপলব্ধি যে ব্যাহত হয়, সামাজিক দুর্ব্যবস্থায় মানুষের আত্মার যে কলুষ রূপ কতখানি মর্মন্তুদ হতে পারে—তাই-ই কবি এ কাব্যে আমাদের প্রত্যক্ষ করালেন। বণিক শক্তির ব্যভিচারী প্রতাপে মানবজীবনের ভারসাম্য নষ্ট হয় ক্রমশ—

'গভীর বনে আর হরিণ নেই,
সবুজ পাখি গিয়েছে মরে,
আর পাহাড়ের ধূসর অন্ধকারে
দুরন্ত অন্ধকার ডানা ঝাড়ে
উড়ন্ত সাপের মতো।'[৪৯]

এবছরেই সমর সেন 'শ্রীহর্ষ' পত্রিকার ইংরেজী সংস্করণের সম্পাদক নির্বাচিত হন। আর মে মাসে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, রথীন মৈত্র, চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে পুরী ভ্রমণে যান তিনি। উঠেন Sea-view-Hotel-এ। পুরী বেড়াতে গিয়ে তাঁরা সকলে প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে পড়েন। এই ঝড়ের কথা অনেকদিন সমর সেনের মনে ছিল। জুলাই মাসে 'অমৃতবাজার' পত্রিকায় জীবনানন্দ দাশের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যের সমালোচনা করেন। 'প্রগতি লেখক সংঘ' কর্তৃক 'Towards Progressive Literature' এবং 'প্রগতি' নামে যে দুটি সংকলন এবছর প্রকাশিত হয়, সেগুলির মধ্যে 'প্রগতি'

সংকলনে সমর সেনের একটি কবিতা স্থান পায়। ১৯৩৭ এ নির্বাচনে কম্যুনিস্ট নেতা বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়ের পক্ষে প্রচারে যান সমর সেন আসানসোলে। সেবার এই নির্বাচনে বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় জিতে যান। ক্রমশ রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন তিনি। এ বছরের 'পরিচয়' জয়ন্তী সংকলনে (ভাদ্র ১৩৪৪) 'উদাব নীতিবাদ প্রসঙ্গে' নামের এক প্রবন্ধ লেখেন তিনি। এ বছরের আশ্বিন সংখ্যা 'কবিতা' পত্রিকার (৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৩৪৪) যুগ্ম সম্পাদক হন সমর সেন।

১৯৩৮-র এপ্রিল মাসে সবান্ধবে তাঁরা শান্তিনিকেতনে বেড়াতে যান। সমর সেন ছাড়া আর যাঁরা সঙ্গী ছিলেন—কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সস্ত্রীক বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, জ্যোতির্ময় রায় প্রমুখ। পরের দিন সকালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথোপকথন কালে ভুল কবে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র রবীন্দ্রনাথের বয়েস হয়েছে জানালে, তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সমর সেনেব উপর পড়ে। এ প্রসঙ্গের বর্ণনা করেছেন প্রণতি দে,—'জ্যোতিরিন্দ্র বাবু ভুল করে বলে ফেলেছিলেন—আজ্ঞে, বয়স তো হোলো! এই কথা বলেই জ্যোতিরিন্দ্র বাবু বুঝেছিলেন ভুল কবেছেন, আমার স্বামীর দিকে মুখ ফিরিয়ে জিভ্ কাটলেন! রবীন্দ্রনাথ তখন চুপ হয়ে গেছেন। তারপর সমর সেনের পালা। সমব বাবুকে বললেন, 'আপনার বাবা আমাদের ছাত্র ছিলো'।' (অরুণবাবু শান্তিনিকেতনে পড়াশুনা করেছিলেন)। আমার স্বামী বলেছিলেন মনে পড়ে সমর ফর্সা লোক, রংটা লাল টক্‌টকে হয়ে উঠলো। পরে বেবিয়ে এসে ও জ্যোতিরিন্দ্র বাবুকে বলল—আপনি করলেন ভুল—আব আমি তার শাস্তিটা পেলাম।'[৫০] দু'একদিন পরে কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও সমর সেন ছাড়া আর সকলে শান্তিনিকেতন থেকে চলে আসেন।

সমর সেন তাঁর 'কয়েকটি কবিতা' কাব্যটি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়ে এসময়েই মতামত চেয়ে পাঠান। এবং এর ঠিক এক সপ্তাহ পরে তিনি পুনরায় রবীন্দ্রনাথকে আতিথেয়তার প্রশংসা করে, ২২শে এপ্রিল ১৯৩৮ তারিখে এক চিঠি লেখেন। সেখানে জানান : 'শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় ফিরে এসে অশান্তিতে সময় কাটছে। ওখানকার কাঁকরের রক্তলাল সৌন্দর্য আপনার শান্তমূর্তি এবং ললিতমধুর ব্যঙ্গ বরাবর মনে থাকবে।'[৫১] উত্তরে রবীন্দ্রনাথও ঠিক এ সপ্তাহের মাথায়, ১৭ই বৈশাখ ১৩৪৫ তারিখে যে চিঠি লেখেন, সেখানে আধুনিক কবিদের সম্পর্কে কবির ধারণা উপস্থিত হয়। '.......তোমাদের লেখায় 'হালকা' কথাটি অত্যন্ত বেশী ব্যবহার করে থাকো, হালকা ঝড়, হালকা হাতি, হালকা ঢেউয়ে নৌকোডুবি ইত্যাদি, আমাব সম্বন্ধে গদ্য কবিতা যদি লেখো তবে ঐ 'হালকা' বিশেষণটা সহজে ব্যবহার করতে পারবে।'[৫২]

এ সময় 'কবিতা' পত্রিকায় (তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায়) সমর সেনের কবিতা বিষয়ক বাংলা প্রবন্ধ 'বাংলা কবিতা' প্রকাশিত হয়। মে মাসে তিনি দেবীভূষণের সঙ্গে ডাল্‌টনগঞ্জে বেড়াতে যান। এখানে প্রায় মাস খানেক থাকেন। এখানের আকর্ষণ সম্পর্কে কখনো মন্তব্য করেছেন এই বলে—'এখানকার আকাশ এতো গভীর ও গম্ভীর যে না

দেখলে বুঝতে পারবেন না।' আবার কখনো বলেছেন—'দূরে ধূসব পাহাড় সাঁওতালদের পরিচ্ছন্ন বসতি, মহুয়ার গন্ধ, মাদলের শব্দ, ভোরে মুরগির ডাক। মধুপুর গিরিডি লাইনে মহেশমুণ্ডায় গিয়েছি কয়েকবার।'[৫৩] পরবর্তীকালে এই সাঁওতাল পরগণা, মহুয়া, মাদল তাঁর কবিতায় বিশেষভাবে স্থান দখল করে আছে। যদিও আগেই লিখেছেন 'মহুয়ার দেশ' নামের কবিতাটি।

১৯৩৮-র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'বাংলাকাব্য পরিচয়' নামের সংকলনে তিনজন আধুনিক কবির একজন—সমর সেন অন্তর্ভুক্ত হন নি। অন্য দুজন বিষ্ণু দে এবং জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। এ সম্পর্কে সমর সেন নিজে মনে করতেন—সজনী কান্ত দাসের[৫৪] সহযোগিতায় ও পরামর্শে রবীন্দ্রনাথ সংকলনটি প্রকাশ করেছেন বলে তাঁকে এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। কবি বন্ধু অশোক মিত্র (I.C.S.) প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিনে এর জন্য এক তীব্র ও তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেন সংকলনটির। পরে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় আশ্বিন সংখ্যায় (১৩৪৫) তিনি জানান—'গদ্য রীতি সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বর্তমান যুগের পথ প্রদর্শক, সে সম্বন্ধে তাঁর বিচারই শিরোধার্য্য করে নিতে হবে। .... গদ্যরীতির প্রতিষ্ঠাতা সমর সেনের রচনা যে আদ্যন্ত পদ্যছন্দোময় সে সম্বন্ধে কারুর কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। এবং সে যুক্তি অনুসরণ করলে সমর সেন যে কেন কাব্য পরিচয়ে স্থান পেলেন না সেটা একটা রহস্য। ....' এখানে বন্ধুর জন্য উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেতেই পারে। কিন্তু সমালোচক বুদ্ধদেব বসুও যখন লেখেন : 'সমর সেনকে নিতে হবে বলেই গদ্য ছন্দকে স্বীকার করা অযৌক্তিক হত না, তবে রবীন্দ্রনাথ যখন গদ্যছন্দকে নেনই-নি, তখন ভুল ক্রমেও কোনো গদ্য কবিতা যাতে ঢুকে না পড়ে সে বিষয়ে তাঁর নিশ্চয়ই লক্ষ্য প্রখর ছিল। কিন্তু নিশিকান্তর 'পণ্ডিচেরির ঈশান কোণের প্রান্তর' কেমন করে ঢুকলো ? .... '[৫৫] তখন নিঃসন্দেহে ভাবনার বিষয়।

কাব্য সংকলনে সমর সেন নিয়ে বাদ্ বিতণ্ডার মধ্যেই কিন্তু কবি ইংরেজী সাহিত্যে নিয়ে এম.এ. পরীক্ষায় রেকর্ড মার্কস পেয়ে (একটা সময় পর্যন্ত) প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন। এবং এম. এ. পাশ করে একটি বৃত্তি নিয়ে গবেষণা করতে শুরু করেন। দুবছর সময় কেটে যাওয়ার পরও বারো পাতার বেশি কাজ এগোয় নি। এই এম.এ. পাশের পর সমর সেনের পুনরায় মানসিক অবস্থা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। প্রথম কথা জীবিকার ব্যাপারে। দ্বিতীয়ত, তিনি কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেবেন কিনা—এ নিয়ে নিজের সঙ্গে নিজেরই বেশ বোঝা পড়া চলে। কারণ অল্প কিছুদিন আগেই তাঁর সঙ্গে কৃষ্ণনগরে আলাপ হয়েছে অমৃতেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুশীল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে। এছাড়া কবির ওঠা বসা তো বাম ঘেঁষা লোকজনদের সঙ্গেই ছিল। অবশেষে স্থির করেন যে, তাঁর দ্বারা সক্রিয় রাজনীতি করা পোষাবে না। তার কারণ তাঁর ধাতে বক্তৃতা করা আসে না। পক্ষান্তরে পার্টিতে কিছু অর্থ সাহায্য করলে এবং কিছু 'বিপ্লবী' কবিতা লিখলে মনের দিক থেকে পার্টির প্রতি আনুগত্য বর্তমান থাকবে।

তাঁর এই মানসিক অবস্থার কথা ডালটনগঞ্জে নিজেদের পরিবার সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে

গিয়েও ভুলতে পারেন নি। বিষ্ণু দেকে ২৬-৯-৩৮ তারিখের এক চিঠিতে সমর সেন লেখেন—'মোক্ষহীন ভিক্ষুকের বিষণ্ণ আবেগে ঘুরতে আর ভালো লাগছে না।' পরের চিঠিতে বিষ্ণু দেকে আরও পরিষ্কার ভাবে তিনি লেখেন—বাবার সংসারে বসবাস করা আর পোষায় না। .... আপনারা যে রেটে বামপন্থী হচ্ছেন তাতে অশোক বাবু এবং আমি বিচলিত এবং চিন্তিত। .... আজকাল নিয়মিত ভাবে অমৃতবাজার পত্রিকার বিজ্ঞাপন গুলি অধ্যয়ন করি। .... আপনাদের কলেজে ত বিশেষ সুবিধে হবে না এবছর। মফঃস্বলের কোনো কলেজে চাকরি পেলে শুষ্কপ্রায় কবিপ্রেরণা জীবনানন্দ-বাবুর মতো আবার চাগিয়ে উঠবে বোধ হয়।'[৫৬] (৮-১০-৩৮ তারিখে লেখা) এর ঠিক তিন দিন আগের, ৫-১০-৩৮ তারিখে লেখা বুদ্ধদেব বসুকেও অনুরূপ ভাষায় তাঁর মনোবেদনা জানান : 'জামতাড়া থেকে একদিন আসানসোল, আর একদিন মহেশমুণ্ডা গিয়েছিলুম। মোক্ষহীন ভিক্ষুকের বিষন্ন আবেগে ঘুরতে আর ভালো লাগছে না। সুতরাং কয়েকদিন এখানেই কাটাবো।'[৫৭] কবি যখন এ চিঠি লিখছেন, তখন তিনি জামতাড়ায় দেবীভূষণ ভট্টাচার্যের বাবা, পঞ্চানন বাবুর বাসায় অবস্থান করছেন।

জামতাড়ায় সমর সেন বেশ কিছুদিন দেবীভূষণদের পরিবারে থাকেন। প্রতিদিন বিকেলে ওস্তাদী গান শোনেন তিনি। এ সময় তাঁকে বুদ্ধদেব বসুর স্ত্রী, প্রতিভা বসু বিয়ের প্রস্তাব দিলে, তিনি সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে রসিকতার সঙ্গে পত্রে (১৪-১০-৩৮) লেখেন : 'আমার চঞ্চলতার জন্য আপনারা চিন্তিত শুনে নিশ্চিন্ত বোধ করছি। বর্মা যাওয়ার পর আপনি যে প্রস্তাব করেছিলেন, তারই পুনরুক্তি করেছেন। কিন্তু সুদূর নেপাল কেন, সোনার বাংলার কোনো অধিবাসিনীকেই ঠিক করুন না! আমি ইতিমধ্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করে একটি পাত্রী প্রায় ঠিক করে ফেলেছি, ফিরে গিয়ে দেখা হলে বিস্তারিত বিবরণ দেবো।'[৫৮] এখানের 'একটি পাত্রী' বলতে দেবীভূষণ ভট্টাচার্যের ছোট বোন অপর্ণা ভট্টাচার্যর কথা বুঝিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কবি নিজেই 'বাবু বৃত্তান্তে' স্বীকারোক্তি করেছেন—'দেবীর ছোটবোন অপর্ণা কথা বার্তায়,ব্যবহারে বেশ সপ্রতিভ। চেহারা ও রঙের কথা উঠলে বলতো আমাকে দেখতে ছাড়ানো মুরগির মতো। অপর্ণার প্রতি আমার বিশেষ টান ছিল।' আবাব কখনো বা বলেছেন—'তিরিশের দশকের শেষে প্রায় যেতাম কৃষ্ণনগরে, দেবীর বাড়ীতে। ওখানে যাওয়া নিয়ে অনেকে পরিহাস করতেন।'[৫৯] আসলে কবি এই ঘটনাটিকে প্রকাশ্যে আনতে চান নি। তার প্রমাণ মেলে বুদ্ধদেবকে লেখা ২৫-১১-৩৮ তারিখের চিঠিতে। 'কোনো অনিবার্য্য কারণে মঙ্গলবার রাত্রের ট্রেনে হঠাৎ আমাকে এখানে [জামতাড়া] চলে আসতে হয়েছে। .... কাল মিহিজাম গিয়েছিলুম, কামাক্ষীও এখানে এসেছিল। ওর কাছ থেকে জামতাড়া রহস্যের সমাধান করতে আশা করি চেষ্টা করবেন না। আমি জামতাড়ায় এসেছি, সেটা অনুগ্রহ করে কাউকে জানাবেন না। বাড়ীতে এবং অন্যান্য জায়গায় অন্যান্য নানা জায়গার কথা বলে এসেছি।'[৬০] কিন্তু দুঃখের বিষয়, কবির একান্ত অভিপ্রেত অপর্ণা ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সম্ভব হয়নি। এ সম্পর্কে দেবীভূষণও অকপটে স্বীকার করেছেন ; 'সামাজিক প্রতি

বন্ধকতা না থাকলে আত্মীয়তার বন্ধনে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনাও উজ্জ্বল হয়েছিল। সম্পর্কটা হত আমারই বোন অপর্ণার সঙ্গে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে নি।'[৬১] অতএব অন্য অনেকের মতনই সমর সেনের মদন রাজত্ব থেকে সাময়িক বিতাড়ন ঘটে।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ও ২৫শে ডিসেম্বর 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘে'র দ্বিতীয় সম্মেলন কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানের তৃতীয় অধিবেশনে সমর সেন পাঠ করেন 'In Defence of the Decadents' প্রবন্ধটি।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে পারিবারিক কারণে বেহালায় থাকা তাঁদের অসম্ভব হয়ে পড়ে। যদিও ১৯৩২ থেকে ১৯৩৯ শুরু পর্যন্ত কবিরা বেহালায় থাকতেন। তিনি এই বেহালার পাঠ তুলে দেওয়ার কারণ হিসেবে আভাসে সামান্যই জানিয়েছেন। বেহালার পৌর রাজনীতিতে কবির পিতা, অরুণচন্দ্র সেখানকার জমিদার বাড়ির বীরেন সাহার সহযোগিতা করলে—কবির সেজকাকার সঙ্গে মনোমালিন্য শুরু হয়। কবির সেজকাকা ছিলেন বিরোধী পক্ষে। তাঁকে প্রকাশ্যে অপদস্থ করার একটা প্রয়াসের ফলে বাগানবাড়ি ও ঠাকুর্দার বাড়ীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ফলে বাগানবাড়ি ছেড়ে কবিদের চলে আসতে হয়। বাগানবাড়ি ছেড়ে সমর সেনরা বালিগঞ্জ ষ্টেশনেব কাছে একটা বাড়িতে যান। এই বালিগঞ্জের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কবির কাছে তখনো পর্যন্ত গুরুতর ভাবে প্রতিভাত হয় নি। তবে একেবারে বালিগঞ্জের উল্লেখ তিনি করেন নি— এমন কথা ভাবাও যথার্থ নয়। বিশেষত কবিতায় যখন তিনি স্বয়ং তাঁর প্রতি প্রযুক্ত উপদেশ দেন এই বলে :

> 'এ লক্ষ্মীছাড়া দেশ ছাড়ুন মশাই,
> ব্যক্তিত্বের মৃত্যু এখানে।'[৬২]

—তখন অনায়াসেই উপদেষ্টাকে বালিগঞ্জ এলাকার অধিবাসী বলেই মনে হওয়া স্বাভাবিক। অথবা পুনরায় যখন সমর সেন স্মরণ করেন—

> 'দুনিয়ার সমস্যার সমাধান চলে,
> অর্থহীন চালে, লপেটা চালে, শৌখিন সঙ্গে দিন যায়;'[৬৩]

তখনও বালিগঞ্জকে অভিহিত করা যায়। কারণ এ জাতীয় উক্তি এবং চাল চলন প্রথম বালিগঞ্জেই প্রচলিত হয়ে 'বালিগঞ্জীয় রীতি' হয়ে ওঠে। সাধারণত বালিগঞ্জ তখন ছিল উচ্চবিত্ত, উন্নাসিকদের বাসস্থান। লণ্ডন ছিল যাঁদের কাছে 'সুইট হোম'। যাঁদের ছেলেমেয়েদের ইংরেজী মাতৃভাষা ছিল, বালিগঞ্জ ছিল তাঁদেরই চেলসী বা ব্লুমস্‌বেরী। সেই বালিগঞ্জকে সমর সেনের কবিতায় বিশেষভাবে খুঁজে না পেলেও বালিগঞ্জের লপেটা চাল-এর কথা আমরা বিস্মৃত হতে পারি না।

পরে বিষ্ণু দে সস্ত্রীক প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডে সমর সেনদের একটি বাড়ি ঠিক করে দেন। যে বাড়িটির পরে একটা পুকুরের পাড়ে বিষ্ণু বাবুরা স্বয়ং থাকতেন। বলা বাহুল্য কবির পিতা, অরুণচন্দ্র বন্ধু বৎসল হওয়াতে এ বাড়িতেও অতিথি সমাগম হ'ত

আগের মতোই। লোকে এ বাড়িকেও হোটেল আখ্যা দিয়েছিল। এবাড়িতে থাকাকালীন পিতার সঙ্গে সমর সেনের প্রায়শ রাজনীতি নিয়ে বচসা বিতর্ক হত। মাঝে মাঝে মতান্তর এমন জায়গায় চলে যেত যে, তিনি তখন এই বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র থাকার কথা চিন্তা শুরু করেন। পরবর্তী কালে বিষ্ণু দে এ সম্পর্কে এক তারিখ বিহীন পত্রে কবিকে জানান : "...অরুণবাবুর সঙ্গে আজকাল মধ্যে মধ্যে দেখা হয়—তোমার সম্বন্ধে একেবারে হতাশ, তাই বোধহয় আমার প্রতি পুর্নবৎসল। রাধারমণবাবু, গোস্বামী (সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী), হীরেন দের সম্বন্ধে অরুণবাবু ভীষণ ক্ষিপ্ত। সুভাষ[৬৪] ও বুদ্ধদেব বাবুকেও সাবধান করে দিয়েছেন....।"[৬৫]

১৯৩৯-এ 'প্রগতি লেখক সংঘের' কেন্দ্রীয় মুখপত্র, 'New Indian Literature' এর দ্বিতীয় সংকলনে মুদ্রিত হয় কবির 'In Defence of the Decadents' প্রবন্ধটি। যেটি 'প্রগতি লেখক সংঘের' কলকাতা সম্মেলনে আগেই পঠিত। সমর সেন এ বছর সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ সাঁওতাল পরগণার কাছাকাছি জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। আর ঠিক এ সময়েই তাঁর পিতামহ দীনেশচন্দ্র সেন-এর দেহান্ত ঘটে। নভেম্বর মাসে তিনি তিন দিন মাত্র শিমূলতলায় কাটান। তারপর সেখান থেকে লক্ষ্ণৌ এ চলে যান। সেখানে দিন রাত্রি রেডিও শুনে ও ওস্তাদী গানের সুরে শূন্যে তুড়ি মেরে সময় কাটান।

সমর সেনের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'গ্রহণ' প্রকাশিত হয় ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে। উৎসর্গ করেন বুদ্ধদেব বসু ও রাধারমণ মিত্রকে। এ কাব্যের মূল সুর বৈশ্য আদর্শে পীড়িত কবিমন—

> 'দিন শেষ হয়,
> বিশাল শূন্যে কার করতালি বাজে,
> অদৃশ্যে অট্টহাসি,
> কোন দৈব রসিকের নিদারুণ পরিহাস
> ছিন্ন ভিন্ন করে বাচাল অন্তর।'[৬৬]

'গ্রহণ'র সর্বপ্রথম সমালোচনা করেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। তিনি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য 'পদাতিকে'র সঙ্গে তুলনামূলকভাবে সমালোচনা করেন। মে মাসে 'অগ্রণী' পত্রিকায় সরোজ কুমার দত্ত, সমর সেনের 'In Defence of the Decadents' সমালোচনা করে 'অতি আধুনিক বাংলা কবিতা' নামে যে প্রবন্ধ লেখেন—সেখানে 'গ্রহণ' ও অন্যান্য কবিতাকে তিনি সামনে রাখেন। পরের সংখ্যায় সমর সেন জবাবী উত্তরও লেখেন। এবং সেই সঙ্গে ঐ একই সংখ্যায় সরোজকুমারের প্রত্যুত্তরও প্রকাশ পায়। এ বছরের আবু সৈয়দ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলনে সমর সেনের আটটি কবিতা—'স্মৃতি', 'মুক্তি', 'একটি মেয়ে', 'মহুয়ার দেশ', 'নাগরিক', 'কয়েকটি দিন', 'For thine is the kingdom', 'বকধার্মিক' ইত্যাদি স্থান পায়।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সমর সেনের কর্মজীবনের শুরু। অর্থাৎ কবির জীবনকথার মধ্যপর্ব। তিনি কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপনার জন্য প্রথম ইন্টারভ্যু দিয়েছিলেন, কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাবে কাজটি পাননি। পরে আশুতোষ কলেজে (কলকাতা) অধ্যাপনার চেষ্টা করাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার তাঁকে জানান যে, অশ্লীল কবিতা লেখার জন্য তাঁর চাকরি হবে না। উল্লেখ্য, এই রেজিস্টারই আশুতোষ কলেজে চাকরি খালির সংবাদটি কবিকে দিয়েছিলেন। তখন তিনি জানতেন না যে, সমর সেন অশ্লীল কবিতা লেখেন। উপস্থিত চাকরি না পেলেও ইতস্তত প্রাইভেট টিউশনী করছেন তখন সমরবাবু। আর কবির সঙ্গে তাঁর পিতার যে পারিবারিক অসন্তোষের সংবাদ আগেই আমাদের গোচরে এসেছে, তার জের তখনো মেটেনি। এসম্পর্কে বুদ্ধদেবকে লেখা ১৬.৫.৪০ তারিখের এক চিঠিতে তিনি জানান—'বাড়ী ছাড়িনি, বয়কটের চেয়ে স্টেইন্ স্ট্রাইক বোধহয় ভালো।....আমি এখনো বিরসবদনে ছাত্রী পড়াচ্ছি, এবং লক্ষ্যহীন ভাবে এদিক ওদিক ঘুরছি। আপাতত পাশের ঘরে বাবা এবং কাকা সম্পত্তি ভাগের আলোচনা করছেন...।'[৬৭]

অবশেষে কাঁথির প্রভাতকুমার কলেজে ১৯৪০ এর অগস্ট মাসে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন সমর সেন। ইংরেজীর অধ্যাপক হিসেবে। ১০০ টাকা বেতনে। কাঁথি কলেজ এবং সেখানে থাকা নিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন . 'কাঁথির কলেজ ছিল বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ির শুরুতে, সে বালিয়াড়ি নাকি গিয়েছে বালাসোর পর্যন্ত। বালি ভেঙে যেতাম কলেজে। চাঁদের আলোয় বেড়াতাম ফনিমনসাকীর্ণ বালিয়াড়িতে। বেশ রাতে কানে আসতো সমুদ্রের ক্ষীণ শব্দ। কাঁথি থেকে দীঘা ও 'কপালকুণ্ডলা'র জুনপুট খুব দূরে নয়। ছোট কলেজে দলাদলি ছিল খুব। এসবে নাক না গলিয়ে একটি শান্তিপ্রিয় অধ্যাপক বালিয়াড়ির ছোট বাড়িতে টিম্‌টিম্ আলোয় সন্ধে বেলায় বেহালা বাজাতেন। তাঁর ওখানে ভালো লাগতো। থাকতাম বাজারের কাছে একটি দোতলা ঘরে—এককালে বোধহয় গুদাম ছিল, ঘরটা অতিশয় লম্বা, রাস্তার উপরে এক ফালি বারান্দা। আসবাব পত্রের মধ্যে ছিল শুধু একটা 'আরাম কেদারা'। একটা গড়গড়া সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম....।'[৬৮] মোটামুটি এখানের পরিবেশ সমর সেনকে প্রথমে অপ্রসন্ন করলেও পরে সাময়িকভাবে মুগ্ধ করেছিল। এই মুগ্ধতার বশেই তিনি বুদ্ধদেবকে ৭-৮-৪০ তারিখে লেখা এক পত্রে কাঁথিতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে লেখেন : প্রথমে কাঁথিতে পাঠাবার জন্য আপনাদের উপরে চটেছিলাম, কিন্তু এখন মেজাজ সরিফ, কারণ জায়গাটা বেশ ভালো লাগছে।.....মনে হচ্ছে কাঁথিতে টিকে যেতে পারবো।...এখানকার আবহাওয়া খুব ভালো, পুজোর সময় থেকে সুরু করে। এখনো বাংলাদেশের যে কোনো গ্রামের চেয়ে বোধহয় ভালো, ঝাড়গ্রাম ছাড়া (এসব তথ্য লোকের কাছে সংগ্রহ)। মনে করছি পুজোর ছুটি শেষ হবার দিন দশ বারো আগে কাঁথিতে ফিরে আসবো। সে সময় আপনি যদি সস্ত্রীক আসেন, তাহলে কয়েকদিন হৈ চৈ করা যাবে।' কিন্তু এক সপ্তাহ পরে লেখা আর এক চিঠি থেকে জানা যায় যে, এ সময়ে তিনি[৬৯] দিল্লীর রামযশ কর্মাশিয়াল কলেজেও ইংরেজীর অধ্যাপক পদের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন।

কাঁথিতে সমর সেনের কাছে বেড়াতে আসেন বন্ধু কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। এ সময়ে পুনরায় কবির বিয়ের জন্য যোগাযোগ শুরু হয়। কামাক্ষীপ্রসাদের ছোটভাই দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে এ প্রসঙ্গে রসিকতা করে তিনি ১৮-৮-৪০-এ লেখা এক পত্রে মন্তব্য করেন 'আমার জন্য যে মেয়ে দেখা হচ্ছে, তার বয়স কতো? দশের বেশী হলে ভয়ানক আপত্তি। অরক্ষণীয়া কন্যা শাস্ত্রে বারণ। বয়সটা ঠিক করে দেখবেন। সন্ধ্যেবেলায়, সকালে, মাঝরাতে মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়। কিছুই ভালো লাগে না, মনে হয় সব সময় মুর্গী খাই। লক্ষণ ভালো নয় মনে হচ্ছে, তাড়াতাড়ি আমাকে বুঝিয়ে দেবার বন্দোবস্ত রেখাকে (কামাক্ষীপ্রসাদের স্ত্রী) করতে বলবেন।'[৭০] কবির কাঁথিতে থাকাকালীন সময়ে একবার বন্যা হয়। খুব সম্ভব অগস্ট মাসের শেষ ও সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে। এ সময়ে তাঁর কাছে বেড়াতে যান দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই সমর সেন দিল্লী যাওয়া স্থির করেন। আর অক্টোবরে দিল্লী রওনা হন। ১৯৪০ এর অক্টোবরে দিল্লী কলেজে যোগ দেন তিনি। একদা কাঁথি কলেজের Principal কবির হাবভাব দেখে মন্তব্য করেছিলেন 'Bird of Passage' বলে—তা সত্যে পরিণত হয়। অর্থাৎ কাঁথিতে সমর সেন বেশী দিন টিকলেন না।

দিল্লীতে এসে সমর সেন প্রথমে ওঠেন আগ্রা হোটেলে। এই কলেজেও তিনি কাঁথি কলেজের মতোই ১০০ টাকা বেতন পেতেন। হোটেলের সঙ্গে তাঁর চুক্তি হয় মাসের শেষে পয়সা দেবেন। অর্থাৎ মাসিক ভিত্তিতে হোটেলে থাকেন সমর সেন। সব মিলিয়ে ৪৫ টাকা পড়বে। গরমকালে এটা কমে ৩০ টাকায় দাঁড়াবে। কলেজ হোটেল থেকে মাত্র চার মিনিটের পথ। কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন শ্রীযুক্ত শৈলেশ্বর সেন। এই কলেজ সম্পর্কে জানিয়েছেন : 'কলেজের বাড়ী ও লাইব্রেরী চমৎকার, ছেলেদের মধ্যে বাঙালী, শিখ, পাঞ্জাবী মুসলমান, মাড়োয়ারী, মারাঠী, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ইত্যাদি আছে। অনেক ধর্ম ও প্রদেশ থাকায় গোলমালের বিশেষ সুবিধে হয় না। কলেজে সবই পড়ানো হয়, সঙ্গে কমার্স নেওযাটা বাধ্যতামূলক, সে জন্য কমার্শিয়াল কলেজ নাম। আমাকে This Modern World (1st year), Abraham Lincon (3rd year) ও Modern Symposium (4th year) পড়াতে হচ্ছে। আপাতত ১০ ঘণ্টা ক্লাশ (সপ্তাহে), তবে শিগ্‌গীরই সপ্তাহে ঘণ্টা কুড়ি হবে বলে প্রিন্সিপাল আশ্বাস দিয়েছেন। দু একটা বাংলা বই বোধহয় পড়াতে হবে, মেঘনাদবধ কাব্য, সংকলন গোছের বই।'[৭১] এখানের ছাত্ররা ছিল তাঁর চোখে ভদ্র; বোকা নয়, কিন্তু দুর্দান্তও নয়।

দিল্লীর আগ্রা হোটেলে থাকাকালীনই সমর সেন কুতুব মিনার, হুমায়ুনের কবর, জাহানারার কবর ঘুরে দেখেন। দেখেন নয়াদিল্লীর বিভিন্ন স্থানও। এসব দেখে তাঁর মনে হয়েছে যে, গুচ্ছের টাকা পয়সা খরচ করে আজগুবি জিনিস তৈরী হয়েছে। পুরোনো কেল্লা দেখে বিলাসের চূড়ান্ত হয়েছে বলে মত প্রকাশ করলেও, সমর সেনের মোগলাই রুচির প্রশংসা করতে কার্পণ্য হয় না। তথাপি তাঁর ধারণা কোলকাতা তথা বাঙলা দেশের তুলনা রহিত। অকপটে সেকথা জানাতে তিনি ভোলেন না। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যাযকে ২৯.১০.৪০

তারিখে লেখা এক পত্রে লিখলেন : 'অনেক তীর্থ ঘুরে দেখছি বাংলা দেশ এবং বিশেষ করে কলকাতার মত জায়গা হয় না। তবে এসব কথা শুনে যদি মনে করেন যে চাকরী ছেড়ে আমি সত্বর ফিরে যাবো তাহলে ভুল বুঝবেন।'[৭২] এখানে থেকে সমর সেন কোলকাতার বন্ধু-বান্ধবদের সম্পর্কে ও পরিচিত জন সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। কখনো বুদ্ধদেব বসুকে, কখনো বা দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে চিঠিতে তাঁদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকেন। দিল্লীর স্থানীয় St. Stephen's College-এ আধুনিক বাংলা কবিতার উপর একটি প্রবন্ধ পড়েন সমর সেন। নভেম্বর মাসে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় খুব ব্রিলিয়ান্ট একটি ছেলের—নাম অমিতাভ সেন। ডাক নাম 'ঘুচু'। যিনি দিল্লীর দরিয়াগঞ্জের কেমব্রিজ স্কুলে পড়াতেন। ওঁর সঙ্গে একই স্কুলে পড়াতেন জ্যোতির্ময় লাহিড়ী। ওরফে 'জুটলু'। তাঁর সঙ্গেও সমর সেনের আলাপ হয়। এঁরা কবিব চোখে বিশেষ ভাবে নজরে আসেন। আলাপ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুচুর ইংরেজী বচন-ভঙ্গিমা, সাহিত্য-দর্শন আলোচনার গভীর ও সূক্ষ্ম মনোনিবেশ. সমর সেনকে মাঝে মাঝেই বিভ্রান্ত করে তুলতো। পক্ষান্তরে জুটলু বেশী কথা না বললেও সাহিত্য ও সঙ্গীত বিষয়ে তাঁর দখল দেখে কবি চমৎকৃত হতেন। ক্রমে আলাপ হয় কবির সঙ্গে দিল্লীর বাঙালীদের পরম পরোপকারী. আদুবাবু তথা রাসবিহারী সেনের সঙ্গে। আলাপ হয় ডাক্তার রাম সেনেব ছেলে নিখিল সেনের সঙ্গে। এ সময়ে সমর সেন অতি মনোযোগেব সঙ্গে পড়েন টি.এস এলিয়টের 'The Idea of a Christian Society'.

হোটেলে খরচা খুব বেশী হচ্ছে বলে ডিসেম্বর মাসে আদুবাবুর ব্যবস্থাপনায় সমর সেন ১২বি দরিয়াগঞ্জের নতুন বাসায় ওঠে আসেন। দিল্লী ফোর্টের পশ্চিম কোণে এই বাড়িটির অবস্থান ছিল। বাড়িটি রামবাবুর সহোদর ডাক্তার পাঁচু সেনের বাংলো থেকে আধ মিনিটের পথ। সমর সেনের এই বাড়িতে সঙ্গে থাকতেন ঘুচু এবং জুটলু দুজনেই। কিছু দিন পরে জুটলু কাশ্মীরি গেটের কাছে এক মেসে উঠে গেলে, ঘুচু ও কবি ঐ বাড়িতেই থাকতেন। ভাড়া ১৮ টাকা। মাসকাবারি মুদির দোকানের বিল হত প্রায় ৩৫ টাকা। তার মধ্যে দুজনের সিগারেট খরচা ছিল ২২ টাকার কাছাকাছি। ডিসেম্বর মাসে সমর সেন যে সমস্ত বই পত্রাদি পড়েন, তার মধ্যে উল্লেখ্য কান্টের 'Critique of Pure Reason' এবং Flambert-এর 'Salammbo'। সঙ্গে সঙ্গে উর্দু শেখার চেষ্টাও তিনি করেন।

ডিসেম্বর মাসে সমর সেনের সঙ্গে আলাপ হয় ভাবী স্ত্রী সুলেখা সেনের। আলাপ হয় সুলেখা সেনের জাঠতুতো দাদা নিখিল সেনের মাধ্যমে। সুলেখা সেন ছিলেন রাম সেনের ছোট ভাই হরিপ্রসন্ন সেনের কন্যা। হরিপ্রসন্ন সেনের ডাক নাম 'পাঁচু'। এঁদের পিতা ছিলেন জয়পুরের একদা দেওয়ান, সংসার চন্দ্র সেন। হরিপ্রসন্ন সেন সম্পর্কে সমর সেনের পিতার নিষেধাজ্ঞা ছিল এই বলে যে, 'পাঁচু দাম্ভিক', অতএব কবি যেন তাঁদের সঙ্গে না মেশেন। সমর সেনও প্রথম দিকে পিতৃআজ্ঞা পালন করেছেন। তখন তিনি পাঁচু বাবু বাদে অন্যদের সঙ্গে আলাপ করেন। কিন্তু তাঁর পাঁচু বাবু সম্পর্কে ধারণা

দ্রুত পাল্টায়। তিনি তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দাম্ভিকতার চিহ্নমাত্র দেখতে পাননি। পক্ষান্তরে তাঁর চোখে পাঁচু বাবু সুপুরুষ, সৌম্য, স্নেহশীল ব্যক্তি। কারো বিষয়ে বিদ্বেষপোষণ করেন না। ১৯৪০ এর শেষে এবং ১৯৪১-এর শুরুতে, কোলকাতায় যখন যুদ্ধের ডামাডোলে জাপানী বোমার আতঙ্কে মানুষজন দিশেহারা, দিল্লীতে বসেও সমর সেন তাঁর আঁচ টের পান। কোলকাতার মতন দিল্লীর লোকজনও উদ্বিগ্ন। তবে মোটামুটিভাবে দিল্লীর জীবনযাত্রা যথারীতি নির্বিঘ্নেই চলেছে। কবির আপাতত লেখাপত্রও বন্ধ। তিনি পড়াশুনা করছেন নতুন ভাবে। পুরোনো বইপত্রও এই সঙ্গে নাড়াচাড়া করছেন পুনরায়। 'Weels and butterflies'-আবার পড়ছেন তিনি। 'Golden Bough'-র প্রথম সংস্করণের প্রথম খণ্ড কিনছেন সমর সেন এ সময়েই। সাহিত্য সভাতেও উপস্থিত থাকছেন। সুলেখা সেনদের বাড়িতে সমর সেন যাতায়াত করছেন ঘনিষ্ঠভাবে। সুলেখা সেনকে বন্ধু বান্ধবদের গল্পের বই পড়াচ্ছেন। ছোট ছোট দলে বসে আড্ডা মেরে সময় কেটে যায় এ সময় তাঁর।

অবশেষে, ১৯৪১ এর ২৮শে এপ্রিল সুলেখা সেনের সঙ্গে সমর সেনের বিয়ে হয়। বিয়ের সময় তিনি কোলকাতার বন্ধু-বান্ধবদের আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু বিয়ের সময় শেষ পর্যন্ত বন্ধুরা কেউ আসতে পারবেন না জেনে ব্যথা পান। এই বিয়েতে সবচেয়ে বেশী আপত্তি ছিল সমর সেনের পিতা, অরুণচন্দ্র সেনের। কারণ সমর বাবুর দিদিমা এবং সুলেখা সেনের ঠাকুমা সহোদরা ছিলেন। বিয়েতে অবশ্য তিনি এসেছিলেন দিল্লীতে। অরুণচন্দ্রের সঙ্গে এসেছিলেন রাধাবমণ মিত্র ও কয়েকজন নিকট আত্মীয়। বরপণে অরুণচন্দ্রের আগ্রহ থাকলেও সমর সেনের আপত্তি হেতু বরপণ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তাই আনুষ্ঠানিক বৌ-ভাত অনুষ্ঠান বাতিল হয। বিয়ে সম্পর্কে সমর সেন ২৮-৪-৪১ তারিখের এক পত্রে বিষ্ণু দেকে লেখেন—'বিযেটা খুব মজার হচ্ছে। বাড়ির পাশেই আমার ভাবী স্ত্রী থাকেন; বিয়ের সমস্ত অনুষ্ঠান তাদের বাড়ির মেয়েরা জোগাড় যন্ত্র করে সম্পন্ন করছেন। এমনকি যে জামা কাপড় পরে বিয়ে কবতে যাবো সেটাও বাগিয়েছি! আমার হাতে মাত্র পাঁচ টাকা আছে। এর কাছে কাপড়, ওর কাছে রুমাল, রাধারমণ বাবুর কাছে টাকা, কোনোরকমে manage করেছি। বাবা শুনলাম মেয়েকে আশীর্বাদ করার সময় শ্বশুরমশায়ের কাছ থেকে গিনি নিয়ে সেটাই দিয়েছেন। মজা মন্দ নয়, আপনারা এলে খুব উপভোগ করতেন,...।'[৭৩] বিয়ের সময় বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের মধ্যে অনেক বাদ্‌বিতণ্ডা হয়। ক্রমে তা মিটে যায়। কিন্তু বিয়ের দিন সমর সেন জ্বরে আক্রান্ত হন।

বিয়ের পরে, জায়গার অকুলান হেতু ঘুচু আলাদা বাসায় উঠে যান। আর সমর সেন বিয়ের দু একদিন পর পরই তাঁর পুরোনো জীবন যাত্রায় ফিরে যান। কোলকাতা ছেড়ে এসে তিনি যে কাজটা খুব একটা ভালো করেন নি—এই মানসিক পীড়া পুনরায় টের পান। তাঁর কাছে দিল্লীতে লেখাপড়া করার এবং সাহিত্যিক আবহাওয়া তখনো পর্যন্ত বিশেষ প্রতিকূলই মনে হয়েছে। তাই বলে তিনি নিস্তেজ হয়ে পড়েন নি। উদ্যমী হয়ে

জোগাড় করেন বিলেতী পত্রিকা সমূহ। টি. এস. এলিয়টের 'East Coker' কবিতা ও পুরোনো বইপত্র পড়তে উৎসাহী হন। কোলকাতায় ফেরার ইচ্ছাও কিন্তু তলে তলে অনুভূত হয় তাঁর। শুরু হয় সমর সেনের আত্মগ্লানির আর এক পর্যায়ের। কিন্তু লেখার জন্য এসময় তিনি রজনীপাম দত্তের 'India Today' বইটি পড়তে শুরু করেন। অন্যদিকে ১৯৪১ এর ২২ শে জুন হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করাতে সাম্রাজ্য যুদ্ধ রাতারাতি জনযুদ্ধে পরিণত হয়েছিল। ব্যাপারটা সমকালের কবি সাহিত্যিকদের চোখে বিশেষ মাত্রা পায়। বিশেষভাবে ভাবিত হয়ে তাঁরা নতুন উদ্দীপনায় জনযুদ্ধের কবিতা লিখতে শুরু করেন। বিষ্ণু দে যার অনুসৃতিতে লেখেন '২২ শে জুন' কাব্যগ্রন্থ। আর এ ঘটনা সমর সেনকেও ভাবিত করে। এক বছর পরে হলেও তিনি লেখেন :

'প্রবল আক্রমণে,
সশস্ত্র সোরগোলে মৃত্যুর কলরোল,
প্রাণপণে লড়ে পাথুরে সেভাস্টোপোল।
কৃষ্ণ সাগরে ছায়া পড়ে, কারঘভে, লিবিয়ায
বিষাক্ত বিছের দুটি দাঁড়া নড়ে।
মরণ কামড়ে মত্ত শোষকের সর্পক্ষুধা?
নিরুদ্দেশ অন্ধকারে কি যাত্রী বসুধা?
'আজ ২২শে জুন' দেশে দেশে প্রতিধ্বনি শুনি,'[৭৪]

১৯৪১ এর জুলাই মাসে তিনি কোলকাতায় আসেন। এবং অগস্ট মাসে দিল্লী ফিরে তিনি জানতে পারেন যে, কলেজের গভর্নিং বডির [G.B] সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি ওখানেই স্থায়ী হচ্ছেন। আর অক্টোবর মাস থেকে বেতন বেড়ে মাসিক ১০০ টাকার পরিবর্তে মাসিক ১৫০ টাকা হবে। এমাসেই তিনি বিষ্ণু দের 'পূর্বলেখ' কাব্য এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'উত্তর ফাল্গুনী' পড়েন। নভেম্বর মাসে B.B.C. তে টি.এস. এলিয়টের বক্তৃতা শোনার জন্য বন্ধু-বান্ধবদের অনুরোধ জানিয়ে চিঠিপত্র লেখেন। ডিসেম্বর মাসে তিনি হেমিংওয়ের স্পেন সম্পর্কে লেখা, 'For Whom the Bell Tolls' পড়েন। পড়েন পুনরায় রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পুরোনো উপন্যাস। বিষ্ণু দেকে অনুরোধ জানান 'Ode to West Wind' রেকড পাঠানোর জন্য।

১৯৪২ এর ৮ই মার্চ ঢাকায় নিহত হন তরুণ সাম্যবাদী লেখক সোমেন চন্দ। ১৯৪১ এর ২২শে জুনকে সামনে রেখে যে 'ফ্যাশিস্ত বিরোধী' আন্দোলনের সূচনা— তারই ধারা অব্যাহত রাখতে ঢাকায় মিছিল পরিচালনার নেতৃত্ব দান কালে আততায়ীর হাতে নিহত হন সোমেন চন্দ। আর ২৮শে মার্চ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এই ঘটনার প্রতিবাদে 'ফ্যাশিস্ত বিরোধী লেখক' সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। এখানে প্রায় সর্বমতের লেখক-সাহিত্যিকই নিজেদের যুক্ত করেছিলেন। এই সূত্রে সমর সেনও নিহত সোমেন চন্দকে স্মরণ করে লেখেন 'নববর্ষের প্রস্তাব' কবিতাটি। এখানে তিনি চারিপার্শ্বে আত্মার আত্মীয়দের মৃত্যু দেখে উপলব্ধি করেছেন—

'সমাজে মধ্যপদ ধীরে ধীরে লোপ পায়,
বণিকেরা প্রাকার বানায়,
দিনে দিনে চক্র বৃদ্ধি হারে
নিরন্ন বেকারের মজুরের ভিখিরির সংখ্যা বাড়ে,
সারি সারি রক্তমুখে সৈন্য চলে যমের দক্ষিণ দুয়ারে,
দিন হতে দিনে, মৃত্যু হতে আর এক মৃত্যুতে এ কী যাত্রা,'[৭৫]

১৯৪২ এর গোড়ার দিকেই সমর সেনের হাতে আরেকটি বই করার মতো কবিতা জমে। তাঁর ইচ্ছা তিন ফর্মার বই করার। কিন্তু কলেজের বেতন দিন তিনেকের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। আবার কোলকাতায় যাওয়াও হয় না। কারণ একে তো অর্থাভাব। দ্বিতীয়ত, বোমাতঙ্কে কোলকাতার জীবন যাত্রা পুরোপুরি বিপর্যস্ত। সমর সেনের কোলকাতার বাড়ির মেয়েরা এবং ছোটছেলেরা কোলকাতার বাইরে। তাঁর দাদা এসময় কোলকাতায় যেতে নিষেধ করে পত্র লিখেছেন। এপ্রিলের শেষে ছুটির জন্য চেনাশুনা কোলকাতায় কেউই থাকতে পারছেন না বলে, সেকথাও জানান। অন্যদিকে দিল্লীতেও কোলকাতার মতন লোক পালাতে শুরু করে। দিল্লীতেও তৈরী হয় 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'। হিন্দী, উর্দু, ইংরেজীতে এই সমিতির প্রচার কার্য চালানো হবে বলে ঠিক হয়। ইংরেজী বিভাগে যথারীতি সমর সেন দায়িত্ব সহকারে আসীন হন। আর সমর সেনের বড়ো মেয়ে বীথির জন্মও হয় এই এপ্রিল মাসে। তাঁর হাতে 'পঞ্চম বাহিনী'র মতো কবিতা।

'জল আনতে কেউ যায় না ঘাটে
কি সবজি কিনতে শূন্য হাটে।
দুষমণেরা হাঁটে অনেক ঠাটে
শকুনের ছায়া পড়েছে মাঠে।
শোনো গণিকার গান হাওয়ায় ওঠে :'[৭৬]

যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে মিত্রশক্তিদের অবস্থা যখন সঙ্গীন, বিদেশী শাসকদের সমস্ত সতর্ক প্রহরা এড়িয়ে সুভাষ চন্দ্র বসু যখন উধাও এবং সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকে মূলধন করে তখনকার জাতীয় নেতারা শাসকদের সঙ্গে দর কষাকষির চাল চালছিলেন যখন— সেই সুযোগে নব বলশেভিক সাঙ্গ পাঙ্গ সমেত সমস্ত রাজনৈতিক দলের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়। তখনকার সেই অবস্থাকেই সমর সেন 'পঞ্চম বাহিনী' কবিতায় উপজীব্য করে দেখিয়েছিলেন একদিকে যেমন দেশের স্বাধীনতা লাভের স্বপ্নে মশগুল সাধারণ মানুষের আনন্দ উচ্ছ্বাস—বিশেষত অবাঙালী মহলে, অন্যদিকে তেমনি বাঙালীর ঘরে গোপন সুড়ঙ্গ পথে মীরজাফরদের প্রচ্ছন্ন আনাগোনার কুটিলতা।

মে মাসে সমর সেন কোলকাতায় আসেন। প্রকাশ করেন তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'নানাকথা'। বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন এটি। ১৯৪১এর ২২শে জুনের সময় কম্যুনিস্ট পার্টি আইন সংগত হলেও এই পার্টির কাজ তখনো পর্যন্ত --মে, ১৯৪২ পর্যন্ত

বেআইনী ছিল। 'প্রগতি' আন্দোলন পক্ষান্তরে গতি পায়। কবির মানসিক পরিবর্তন ঘটে এ সময়ে। আর তাঁর এই মানসিক পরিবর্তনে যে জিনিসটি কার্যকরী ভূমিকা নেয়—তা হল মার্কসিজম্। এর প্রেরণাতেই সমর সেন নতুন ভাবে আর একবার উপলব্ধি করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের কবিতাব অস্তি ও আনন্দের সুর থেকে বর্তমান কাব্য কবিতা অনেক দূরে সরে এসেছে। 'নানাকথা'য় যে খণ্ড খণ্ড দৃশ্য miniature painting এর মতো করে উপস্থাপনা করেছেন তিনি, সেখানে ভবিষ্যত নিয়েও উদ্বিগ্ন,—

'এরা নয় বৈশ্য সভ্যতার জারজ সন্তান,
গলিত ধনতন্ত্রের চতুর বিভীষণ,
তাই সক্রিয় আশা মৃত্যুহীন জাগে অনেকের মনে;
অপরের শস্যলোভী, পরজীবী পঙ্গপাল
পিষ্ট হবে হাতুড়িতে, ছিন্ন হবে কাস্তেতে।'[৭৭]

—কবিতাটি অবশ্য একটু আগেরই রচনা —সেপ্টেম্বর ১৯৪১-এ। কোলকাতায় থাকার সময়ে মে মাসে বিষ্ণু দে, সমর সেনকে যামিনী রায়ের গ্রামের বাড়ি—বাঁকুড়ার বেলেতোড়ে যাবার আমন্ত্রণ জানান। সেই সময় বিষ্ণু বাবু সস্ত্রীক বেলেতোড়েই অবস্থান করছিলেন। সমর সেন সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারেননি। অর্থনৈতিক কারণে এই আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেন নি। তবে আপ্রাণ চেষ্টা করে ছিলেন বেলেতোড়ে যাবাব জন্য। একই সময়ে বুদ্ধদেব বসুও শান্তিনিকেতনে যাবার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। সেখানেও যাওয়া সম্ভব হয় নি তাঁর। কোলকাতায় থাকাকালীন অবশ্য তিনি পুরোনো সব আড্ডা ও পরিচিত জনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বিশেষ করে স্নেহাংশুকান্ত আচার্য চৌধুরী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্র কুমার সান্যাল, অজিত মুখোপাধ্যায় প্রমুখদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

১৯৪২ এর জুন মাসে কোলকাতা থেকে দিল্লী ফিরে এসে সমর সেন জানতে পারেন তাঁদের কলেজ থেকে লোক তাড়ানো শুরু হয়েছে। অবস্থা বিশেষে এরা প্রত্যেকেই বাঙালী। কলেজের প্রিন্সিপালকে রিটায়ার করতে বলা হয়েছে। অঙ্কের অধ্যাপক, ডক্টর দাশগুপ্ত—যিনি কলেজে একটানা সাতবছর অধ্যাপনা করেছেন, তাঁকেও কলেজ ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে। কারণ তিন জন ছাত্রের মধ্যে দুজন ছাত্র তাঁর বিষয়ে ফেল্ করাতে এই আদেশ । ভূগোলে ৪৫ জন ছাত্রের মধ্যে ৮জন ফেল্ করাতে অধ্যাপক মি. দাসের কাছে explanation চাওয়া হয়েছে। কলেজের এ সমস্ত ঘটনা দেখে সমর সেন মনে মনে পুলকিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে, তাহলে তিনিও বিতাড়িত হয়ে কোলকাতায় ফিরে যেতে পারবেন। তা হয় নি। তাঁকে কলেজ থেকে ঐ রকম নির্দেশ দেওয়া হয়নি। যাই হোক, তিনি এ সময়ে পড়েছেন টি.এস. এলিয়টের 'The Dry Salvages'। দিল্লীর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মী বন্ধুদের অনুরোধে, তিনি সুবোধ ঘোষের গল্প, 'কর্ণফুলি ডাক' অনুবাদ করে 'আনন্দবাজারে' (১০ই জুন, ১৯৪২) প্রকাশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে

সোমেন চন্দের গল্প 'ইঁদুর' এর অনুবাদেও হাত দেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এসময় কর্মসূত্রে দিল্লীতে আসেন। তাঁর সঙ্গে সমর সেনের সাক্ষাৎ হয় কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে বার কয়েক। কোনো ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠেনি তাঁদের মধ্যে।

সমর সেন ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কোলকাতা ছাড়া হলেও, কোলকাতার বামপন্থী বন্ধু এবং নেতৃত্বের সঙ্গে একেবারে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যান নি যেমন, তেমনি তাঁর মার্কসবাদে এক ধরনের আস্থাও ছিল। যদিও মার্কসবাদী দলের সঙ্গে —বিশেষ করে, বাঙলার দলের সঙ্গে তাঁব সংযোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তবে দিল্লীর কম্যুনিস্ট পার্টি ও পার্টির নানা ফ্রন্টের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। তিনি দিল্লীতে বসে অনুভব করছেন ব্রিটেন ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মিত্র স্থানীয় হলেও প্রকৃত বন্ধু নয়। কবিতা লিখতে গিয়ে তিনি লেনিনের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়েছেন এই বলে—'I support Henderson with my vote as the rope supports a man who is being hanged.' লেনিনের বক্তব্য ছিল, কম্যুনিস্টরা প্রয়োজন মতো শোধনবাদী সোশ্যাল ডেমোক্রাট্‌দের সমর্থন করবে, এমনকি তাদের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠন কববে। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য,বিপ্লবী কম্যুনিজমের প্রসার ও জয়। আর লেনিনের দেশ--সোভিয়েত ইউনিয়ন, যেখানে প্রতিষ্ঠিত বাস্তব সমাজতন্ত্র—তা ছিল বামপন্থীদের ধ্রুবতারা। যুদ্ধের সময়ের অসাধারণ বীরত্ব,দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ অ-রাজনৈতিক মানুষেবও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। সমর সেনের কাছেও তা ছিল 'প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞা'র প্রতীক। যুদ্ধে সোভিয়েত জয়ের জন্য তাঁর আকুল আকুতি সাগ্রহ প্রতীক্ষা থেকেই জন্ম নেয এ কবিতা।

> 'গভীর রাতে অনেক লোক জাগে,
> বিপুল বিক্ষুব্ধ পৃথিবীর
> হৃৎপিণ্ডে এখনো গরীয়ান,
> কত বর্বরের গোরস্থান এ শহরে
> রাত্রে ভয়ংকর মৃত্যুর মুখে জীবনের জয়গান বাজে,'[৭৮]

দিল্লী রাজধানী বলেই বুঝি এখানের সমস্ত ব্যাপার তাঁর কাছে সৌখীন মনে হয়। তাই এখানের প্রতিষ্ঠিত F.S.U. সংঘ থেকে উল্লেখযোগ্য ভাবে কিছু কাজ হয় নি, যেমনটি কোলকাতা থেকে হয়েছে। এই সংগঠনটি শুরু হবার পর থেকে কোনো বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে পারে নি বলেই তিনি মনে করেছেন। সেজন্যে এখানের সংঘ প্রায় ছত্রভঙ্গ। ম্যানিফেস্টো সই করানো তো দূরের কথা ছাপানোই হয় না।[৭৯]

১৯৪২ এর অগস্ট মাসে দিল্লী কোলকাতার মতোই উত্তাল। ১০ই অগস্ট থেকে সমর সেনদের কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। স্বাধীনতা না এলে ছাত্রবা কলেজে ফিবতে রাজী নয়। চারদিকে এত বিশৃঙ্খলা—নিরর্থক বাদ্‌বিতণ্ডা, উত্তেজনা যে কম্যুনিস্ট পার্টির কথা কেউ শুনছে না। এমন অবস্থায় পার্টির দিল্লীস্থিত নেতা, জগদত্ শর্মার মতে সভাসমাবেশ বিলকুল পাগলামি ছাড়া কিছু নয়। তিনি মজুরদের ধর্মঘটে যেতে নিষেধ করেন। তা সত্ত্বেও মজুররা দিন দশেক মতো ধর্মঘট করে মিলে যায় নি। ছাত্ররাও ক্লাসে হাজির

হয় নি। পারিপার্শ্বিক অস্থিরতায় সমর সেনকে কয়েকটি দিন নিষ্ফল আক্রোশে কাটাতে হয়। নিষ্ফল আক্রোশ এই জন্যে যে, তিনি মাস্টার মশাই এবং সাহিত্য চর্চা করেন। কিষাণ বা মজুর-কর্মী হলে হয়তো ধর্মঘটে সামিল হতেন। সমকালকে স্মরণে রেখে তিনি 'দুর্দিন' নামে একটি কবিতা লেখেন। অক্টোবর মাসে সমর সেন পড়েন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শহর বাসের ইতিকথা' এবং 'চতুষ্কোণ' উপন্যাস দুটি। তাঁকে তেমন ভাবে এগুলি নাড়া দিতে পারেনি। এ মাসেই তিনি রেডিও B.B.C.মাধ্যমে টি.এস. এলিয়টের স্বকণ্ঠের 'East Coker' , 'Burnt Norton' এবং 'Dry Salvages' -র আবৃত্তি শোনেন। সঙ্গে সঙ্গে কোলকাতায় ফেরার জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বন্ধুদেরকে নানান চিঠিপত্রে সে কথা বারে বারে জানান। এরই মধ্যে তিনি 'কয়েকটি কবিতা' কাব্যের '১৯৩৭' কবিতাটির ইংরেজী অনুবাদ 'January 1937' ক'রে বুদ্ধদেব বসুবে পাঠান। ক্রমে ২০শে অক্টোবর কলেজ খুললে পুনরায় তিনি ছাত্রদের ক্লাস নিতে শুরু করেন। নভেম্বর মাসের শেষ দিকে কবি-বন্ধু, স্নেহাংশুকান্ত আচার্য দিল্লী এলে সমর সেনের আড্ডার সুবিধে হয়। আর ডিসেম্বরে তাঁর অন্য বন্ধু, কৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত [কেষ্ট] এবং বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় দিল্লীতে উপস্থিত হ'লে সে আড্ডা উজ্জ্বলতা পায়। তাঁর মনেব কোণে কোলকাতার প্রতি টান কিন্তু তখনো প্রবল।

১৯৪৩ এর জানুয়ারী মাসে কোলকাতায় ফেরার জন্য সমর সেন আপ্রাণ চেষ্টা চালান। সফল হন না। এ সময়ে তিনি পড়েন ওড়িশী প্রগতিবাদী কবি ও গল্পকার, শচীবাউৎ বায়েব অনুবাদ কবিতা 'Boatman Boy' । কবিতাটি তাঁর মনে খুব একটা রেখাপাত করতে পাবেনি। তিনি নিজে এই সময়ই 'জাতীয় সংকট' শিরোনামে কবিতা লিখতে শুরু করেন নতুন ভাবে। ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি স্ত্রীর হার্নিয়া অপারেশনের জন্য তৎপর হন। মার্চ মাসে কবি-পত্নী হার্নিয়া অপারেশন করে বাড়ি ফিরলে সাময়িকভাবে কবির আড্ডা বন্ধ হয়। বিকেলে বিকেলে কোথায় বেড়াতে যাবেন তার স্থিরতা খুঁজে পান না তিনি। নতুন বইও পান না। সঙ্গীত শুনতে পান না। কবিতা লিখতে পারেন না। এক অস্বস্তিকর অবস্থায় দিন যাপন কবেন। বুদ্ধদেব বসুকে ১৩.৩.৪৩-এ লেখা এক চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন— 'দিন দিন জীবনযাত্রা একঘেয়ে হচ্ছে, বিকেলে বাড়ি থেকে বেরুতে ইচ্ছে করেনা (পত্নী প্রেমের জন্য নয়), কোথায় যাবো ভেবে পাই না। একজনের বাড়িতে প্রায়ই যেতাম, কিন্তু সম্প্রতি সে রাতারাতি বড়লোক হবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে, সাহিত্যানুরাগ বেমালুম উবে গিয়েছে। সুতরাং বাধ্য হয়ে কয়েকদিন কয়েকটা পুরোনো বাংলা উপন্যাস পড়লাম। 'অপরাজিত' গাঁজা খেয়ে লেখা মনে হল, 'বিপ্রদাস' পড়ে শবৎবাবু যে কতখানি নির্বোধ ছিলেন সেটা উপলব্ধি করলাম। দেশের কথা আর বলবেন না। মধ্যবিত্তদেব সমূহ বিনাশ না হলে আমাদেব কোনো আশা নেই। আমাদের কলেজের হিন্দুস্থানী লোকেরা সবাই বড়ো পেট্রিয়ট, গান্ধিভক্ত। আজকে মহামান্য বড়োলাট বাহাদুরের বাড়িতে বিভিন্ন কলেজ অধ্যাপকদের চায়ের নিমন্ত্রণ. সবাই সুর সুর কবে গেলেন। আমি না যাওয়াতে অনেকেই চটেছেন। এদেশের যে কি হালৎ হবে ভেবে পাই না।'[৮০]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অন্য অনেক কিছুর মতোই বাংলার রাজনীতি-সমাজনীতি ও অর্থনীতির পরিবর্তন ঘটে। বিশেষত অর্থনৈতিক মন্দার ধাক্কায় মানুষের অতীত মূল্যবোধ-গুলির লোপ পায়। ব্যক্তিগত জীবন ও সংঘগত জীবনের জীবনী শক্তির দ্রুত অপসারণ' উৎকট আকার ধারণ করে। মানুষের সংশয়ী মনোভাব ক্রমশ প্রকট হয়। যার পূর্ণ পরিণতি ১৯৪৩-র দুর্ভিক্ষে। সমর সেনের কলমের ডগায় চিত্র ফুটে ওঠে :

'রাস্তায় রক্তের দাগে
মৃতেরা স্মরণ মাগে।
শীতের সন্ধ্যায় কুয়াশায
ট্যাক সই সংসার ধীরে-ধীরে লুপ্ত প্রায়,
শবলোভী শকুনেরা স্তব্ধতায় উড়ে যায়।
বাজারে দারুণ ভিড়; দুর্ভিক্ষের নিদারুণ ছাপ
অনেকের মুখে।'[৮১]

অন্যদিকে, এসময়ই সমর সেন দিল্লীর কাশ্মীরী গেটের বেঙ্গলী ক্লাবের লাইব্রেরী থেকে পুরোনো বাংলা বই এনে ক্রমাগত পড়তে থাকেন।

গরমের ছুটিতে সমর সেন কোলকাতায় আসেন। যোগাযোগ করেন বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে। 'একপয়সার একটি গ্রন্থমালা' সিরিজের বই প্রকাশের জন্য। এই সিরিজের ১২নং গ্রন্থ 'খোলাচিঠি' সমর সেনের চতুর্থ কাব্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ কাব্যের বিভিন্ন কবিতা তিনি যাঁদের উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন দিল্লীর বন্ধু অমিতাভ সেন, চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়, অশোক মিত্র, কে.আহমেদ প্রমুখ। সাম্রাজ্যবাদের নাভিশ্বাসের মুহূর্তে, প্রতিবিপ্লবের ঝঞ্ঝা বাহিনী যখন সমস্ত দেশ দেশান্তরে নতুন সাম্রাজ্য প্রয়াসী— তখন তার প্রতিরোধ কল্পে এদেশের সমস্ত শ্রেণীর সাধারণ মানুষ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ফ্যাসিজমের বর্বর অভিযানের বিরুদ্ধে। সমর সেনও সেই সব সাধারণ মানুষদের একজন হয়েই, অশুভ বুদ্ধির বিরুদ্ধে শব্দ সাজান এ কাব্যে। যার প্রমাণ মেলে এ কাব্যের 'নাম' কবিতায়—

'যদি চায় হিন্দুস্থান লোলুপ জাপান
তবে জবাব তাদের হাতে, এ দেশ যাদের,
যারা লাঙলে তিলে তিলে সোনা ফলায়,
অন্নের প্রাণের কাঙাল,
নয়নাভিরাম নীল মেঘ দেখে যারা ফসলের দিন গোনে,
কারখানায় কলে যারা দধীচির হাড়ে সভ্যতার বনিয়াদ গড়ে
শহরে শহরে।
দেশে বিদেশে, বন্যার মুখে জাঙাল বেঁধে,
তারা বলে, দুনিয়াব দুশ্‌মণের প্রতিরোধে
দুনিয়াকো কিষাণ মজদুর মজদুর কিষাণ এক হো।'[৮২]

১৯৪৩-র অক্টোবর মাসে সমর সেন পুনরায় দিল্লী থেকেই কোলকাতায় চাকরির চেষ্টা শুরু করেন। এর পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য আবার নতুনভাবে পড়তে শুরু করেন। তিনি উপলব্ধি করেন কোলকাতা ছাড়া সহজ, সেখানে চাকরি নিয়ে ফিরে যাওয়া বেশ কঠিন ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' তাঁর ভালো লাগে, কিন্তু 'মানসী' ভালো লাগে না। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও তিনি পড়ছেন পুরোনো বাংলা কবিতা; কিছু কিছু জোগাড় করে বাংলা কবিতা পড়ে, বিষ্ণু দে কে ২৫.১০.৪৩ তারিখে লেখা এক চিঠিতে তিনি অনুযোগ করেন—'বাঙালী কবিদের (পুরাতন) নিয়ে আলোচনা করলে আমরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হবো। আমাদের সাহিত্য দিগ্‌গজেরা দেশীয় সাহিত্য অবহেলাই করেছেন। স্বগতও [সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সমালোচনা গ্রন্থ] দুর্ভাগ্য ক্রমে এর ব্যতিক্রম নয়।'[৮৩] কবি লিখছেন 'গৃহস্থ বিলাপ' নামের দীর্ঘ কবিতা।

অনেক চেষ্টার পর ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে, সমর সেন দিল্লীর কলেজে পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে কোলকাতায় চলে আসেন। কোলকাতায় যোগ দেন যুধাজিৎ চক্রবর্তীর বিজ্ঞাপন সংস্থায়। যুধাজিৎ চক্রবর্তীর 'Service Advertising Agency' -তে মাত্র এক সপ্তাহ কাজ করার পরে তিনি দিল্লী ফিরে যান। তবে কোলকাতায় চাকরি না হোক তাঁর, পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের প্রস্তুতি কিন্তু শেষ করে ফেলেন। গ্রন্থটি 'তিনপুরুষ' নামে জুন মাসে সংকেত ভবন থেকে প্রকাশিত হয়। ইতিহাসের ব্যাপক পটভূমিতে কবি সমাজ বিবর্তনের ধারাবাহিকতা দেখাবার চেষ্টা করেছেন এখানে। সেই সঙ্গে তিনি আত্ম-সমালোচনাচ্ছলে সমকালীন 'মার্ক্সিস্ট' নামে অভিহিত কবিদের সততা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েন। তাঁদের সম্বন্ধে ব্যঙ্গে ফেটে পড়ে তাঁর কাব্য পংক্তি :

> 'দু-নৌকায় স্বচ্ছন্দে পা দিয়ে চলি,
> বুর্জোয়া মাখন আর মজুরের ক্ষীর
> ভাগ্যবান এ-কবিকে বিপুলা যশোদা
> নিশ্চয় দেবেন বলে আমার বিশ্বাস।' [৮৪]

দিল্লীতে ফিরে গিয়ে সমর সেন ২০শে জুন তারিখে, 'All India Radio' -র সংবাদ বিভাগে যোগ দেন। রেডিওর এই চাকরি, সরকারী চাকরি-তাই তিনি এই চাকরি সর্ম্পকে উষ্মা প্রকাশ করেন। সম্ভব হলে এ চাকরি ছেড়ে দিতেন। উপায়ান্তর না দেখে এ চাকরিতেই বহাল হতে হয়। সংবাদ বিভাগে তাঁর কাজের ডিউটি সকাল আটটা থেকে রাত আড়াইটে পর্যন্ত। এখানে কাজে যোগ দিলেও তিনি ভিতরে ভিতরে কোলকাতার বিজ্ঞাপন সংস্থার ঐ মালিককে সংবাদ জানাতে বলেন। যদি বিজ্ঞাপন সংস্থার কোনো লোকের প্রয়োজন হয়, তাহলে অবশ্যই তিনি যেন সমর সেনকে সংবাদ দেন। বিজ্ঞাপন সংস্থার কাজটি হাত ছাড়া করতে রাজী নন সমর সেন। যেহেতু তিনি কলেজে আগেভাগেই পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে বসে আছেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ অবশ্য তাঁর পদত্যাগ সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত জানায় নি। তিনি উপযাচক হয়ে খোঁজ নিতেও যেতে পারেন না। রেডিওর চাকরিও ভাল লাগে না। অর্থনৈতিক অনটনও চূড়ান্ত। এমন অবস্থায়, ৬.৭.৪৪ তারিখে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে

লেখা এক চিঠি থেকে জানা যায় তাঁর মানসিক অবস্থা।—'............তাড়াহুড়ো করে কলেজের চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে বোধ হয় ভালো করিনি। যেখানে ঢুকেছি সেখানে একবছর কাজ করলে সতেরো দিন ছুটি। আর একটা Shift যখন অভ্যেস হয়ে আসে তখন নতুন সময়ে আসতে বলে। এখন সাড়ে দশটা-সাড়ে চারটা করছি। যাতায়াতের সময় গরমে মাথার চাঁদি ফাটে। কিন্তু খাটুনির ফলে, লোকে বলছে, শরীর ভালো হয়েছে। পায়ে দিব্যি muscles হয়েছে। .... এসব ছাড়াও, চাকরী ছাড়তে অনেক হাঙ্গামা। মাইনে পেতে কেউ বলছে দুমাস হবে, কেউ বলছে মাস চারেক হলেও হতে পারে। কলেজ থেকে কী করবে সেটাও জানি না।' [৮৫] এই মানসিক টানাপোড়েনেই তাঁকে রেডিও-তে সাড়ে পাঁচ বছরের মতো কাটাতে হয়।

১৯৪৪-র মাঝামাঝি সময় থেকে সমর সেনের কবিতা লেখায় ভাটার টান লক্ষিত হয়। এরপরে তিনি 'লোকের হাটে' নামে একটা দীর্ঘ কবিতা লিখে বিষ্ণু দে কে পাঠান। সেখানে বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁর অবস্থিতি কোথায়—তা পরিস্ফুট। তবু কবিতা লেখার স্বচ্ছন্দতা সমর সেনের বন্ধ হয়ে যায় এ সময় থেকেই। ১৯৪৫ -র প্রথম দিকে তাঁকে কোলকাতার জন্য পুনরায় কাতর হতে দেখা যায়। রেডিও অফিসে মুখে মুখে জবাব দেওয়ার জন্য তাঁকে নীরদ চৌধুরীর বিভাগের সঙ্গে যুক্ত করেন কর্তৃপক্ষ। এতে অবশ্য তিনি খুশীই হন। বিশেষ করে নীরদ চৌধুরীর সঙ্গে কাজ করতে পেরে তিনি বিশেষ উপকৃত হন। মূলত নীরদবাবু সংবাদ বুলেটিন দেখতেন। পরবর্তীকালে, 'Now' পত্রিকা সম্পাদনা কালে সমর সেনের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে তাঁর সঙ্গে। নীরদবাবু ছাড়া রেডিও অফিসে সমর সেনের সহকর্মী হিসেবে অনেকে ছিলেন পাঞ্জাবী মুসলমান। তাঁদের সঙ্গেও সমর সেনের হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল।

১৯৪৫-র ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি নিজের লেখা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিষ্ণু দেকে মন্তব্য করেন—'গদ্য কবিতা কেন, কোনো কবিতা সম্পর্কেই এখন আর উৎসাহ নেই।'[৮৬] তবে পাশাপাশি বন্ধুবান্ধবদের কবিতা পড়েন না যে একেবারে তাও ঠিক নয়। জুলাই মাসে বিষ্ণু দের 'সাতভাই চম্পা' কাব্য পড়ে উচ্ছ্বসিত। তাঁকে জানান—'ভালো লেগেছে। কেন জিজ্ঞাসা করলেই মুশকিল।' সমর সেন ইতস্তত বিচ্ছিন্নভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ঘোরালো ধাক্কায়, ভারতীয় রাজনীতির—বিশেষত কংগ্রেসী রাজনীতির ব্যর্থতাকে ফুটিয়ে তোলেন '৯ই অগস্ট ১৯৪৫' কবিতায়। একদা কবির উচ্চারিত : 'এখানে রাজনীতি শুধু পরনিন্দা, পরচর্চা, বুড়োর ঝামেলা'—শেষ পর্যায়ের কবিতা রচনাকালেও সতত কাজ করেছে। তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছেন রাজনীতির রাজ-নীতি। আর রেডিওর চাকরিতে যোগ দিয়ে তাঁর মত প্রকাশের স্বাধীনতা অনেকটাই খুন্ন হয়েছে। এখানে তিনি বুলেটিনে নেহেরু কিম্বা গান্ধীজীর আগে ভুল ক্রমে জিন্না আলীর নাম উচ্চারণ করলে, চাকরি নিয়ে টানাটানির সম্ভাবনাও দেখা দেয়। রাজনৈতিক অস্থিরতায় ভারতবর্ষের ভাবী শাসকদের মুখোশ খুলে যাওয়াতে সমর সেন বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৪৫-এ বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ভারতবর্ষে সারা দেশব্যাপী গণবিক্ষোভ প্রবল

আকার ধারণ করেছিল। আর কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েরই দুই সংগ্রামী শিবিরের তৎপরতায়, দেশ ক্রমেই যেন বিপ্লবের পথ ছেড়ে অন্য পথে সরে যাচ্ছিল। সর্দার প্যাটেলের সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ভারতবর্ষের ভাগ্যে ঝড়ের সংকেত এনে দিয়েছিল যে, তাই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন। অন্য দিকে আবার আজাদ হিন্দ্ ফৌজের তিনজন নায়কের বিচার ও দণ্ড সমগ্র দেশকে এত বেশী বিক্ষুব্ধ করেছিল যে, তার রেশ পুলিশ ও সৈন্য বাহিনীকেও আপ্লুত করেছিল—সে কথা 'জয়হিন্দ্' কবিতায় সমর সেন স্পষ্ট করেছেন। দেশের দুর্দিনকে মূলধন করে যে পেশাদার রাজনীতিবিদ্‌রা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখাচ্ছিলেন—তারাই আবার বোম্বাইয়ে নৌ-সেনাদের বিদ্রোহ সংবাদ পাওয়া মাত্রই মন্ত্রী মিশন পাঠাতে সচেষ্ট। সেই কিম্ভূত পরিস্থিতিতে আপ্ত বাক্যের মতো উচ্চারিত হয় কবি কণ্ঠে নতুনভাবে—'লাটের ভেল্‌কিতে পরম শত্রু আজ দোস্তে পরিণত, স্বজন শত্রুতে'। বর্তমানেও এর খুব একটা হের ফের হয় না।

১৯৪৬-র প্রথম দিকে কোলকাতায় কবির প্রিয় পরিচিত রাধারমণ মিত্র, নীরেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ কম্যুনিস্টদের হাতে আহত হলে সমর সেন বিস্মিত হন। এপ্রিল মাসে রাশিয়ান প্রাচ্যবিদ্, ওলেগ ওরস্তভের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। ওলেগ, রাশিয়ার বিখ্যাত পত্রিকা 'প্রাভদা'-র বিশেষ প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি মাতৃভাষায় বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে প্রবন্ধ এবং বই লিখতে আগ্রহী ছিলেন। সমর সেন তাঁকে এ ব্যাপারে তথ্য দিয়ে সাধ্য মতো সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। এ সময়েই সমর সেন I.P.T.A. -র এক অনুষ্ঠানে জওহরলাল নেহরুকে চাক্ষুষ করেন। ১৯৪৬-র জুলাই মাসে তিনি কোলকাতায় উপস্থিত ছিলেন। ২৯-শে জুলাই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এক বিরাট ধর্মঘট সংঘটিত হয়। অন্যান্য সকলের মতোই তাঁর মনে হয়েছিল কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের খেয়োখেয়ি বন্ধ হয়েছে। দেশ এক নতুন পথে যাত্রা শুরু করেছে। কিন্তু তাঁর এ ভাবনা বেশী দিন টেঁকেনি। ১৬ই অগস্ট কোলকাতায় নেমে আসে সেই কুখ্যাত ঘটনা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। যদিও এটা তাঁকে চোখে দেখতে হয় নি। তার আগেই অগস্টের ১২/১৩ তারিখ নাগাদ দিল্লী রওনা হয়ে যান তিনি। কোলকাতার এই দাঙ্গার পরে অনেকদিন ধরেই চলে কংগ্রেস-মুসলিম লীগ আলোচনা। প্রচণ্ড বাদ্-বিতণ্ডা। তৎকালীন কম্যুনিস্ট দল জাতীয় স্বায়ত্বশাসনের নামে পাকিস্তানের দাবি সমর্থন করেছিল। তাদের স্বপ্নে ছিল—পরাধীন ভারত ভেঙে জন্ম নেবে দুটি স্বাধীন-স্বতন্ত্র অথচ বন্ধুত্বের ডোরে বাঁধা দেশ। এ স্বপ্ন একদা সমর সেনের কবিতাতেও উদ্ভাসিত হয়েছে। কিন্তু রাম এবং রহিমেরা পরস্পর পরস্পরের গলা কাটলে তাঁর স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছিল। তখন তিনি বোঝেন একমাত্র মৃত্যু ছাড়া রাম এবং রহিমের মধ্যে মিতালি সম্ভব, নইলে নয়। বেদনা ঝ'ড়ে পড়ে তাঁর কণ্ঠে—

> 'ভবলীলা সাঙ্গ হলে সবাই সমান—
> বিহারের হিন্দু আর নোয়াখালির মুসলমান
> নোয়াখালির হিন্দু আর বিহারের মুসলমান।' [৮৭]

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সমর সেন তার ধারাবাহিক কাব্যজীবনের সমাপ্তি টানেন 'জন্মদিনে' কবিতা রচনার মধ্যে দিয়ে। কারণ তিনি ততদিনে জেনে গেছেন, পুরোনো দিন কোনো দিনই ফিরে আসবে না। গাছের যৌবন তবু প্রতিবছর ফিরে আসে, কিন্তু মানুষের সৃষ্টি ক্ষমতার একটা সীমাবদ্ধতা আছে। মাত্র তিরিশ বছর বয়সে, খ্যাতির গগনস্পর্শী সীমায় পৌঁছে কবিতাকে নির্বাসনে পাঠালেন তিনি—রোম্যাণ্টিক ব্যাধি আর রূপান্তরিত হয় না ব'লে। তিনি আরও জানালেন যে, যৌবনের প্রেম শেষ হয় প্রবীণের কামে। অর্থাৎ কবির সত্তর বছর বয়সে শারীবিক মৃত্যু ঘটবার অনেক আগেই তাঁর কবিতা রচনার মৃত্যু ঘটালেন। কিন্তু কেন?

—এ প্রশ্নের সদুত্তর আজও মেলেনি। সমর সেনও সঠিক কিছু জানান নি। তিনি একদা বলেছেন—'সংবাদের চাপে, দেশের দাঙ্গা হাঙ্গামায় আস্তে আস্তে কবিতা লেখা বন্ধ হয়ে এলো ছক মেলানো কঠিন হয়ে পড়ছিল।' অন্যত্র বলেছেন—'আমার কবিতার অর্থ বর্তমানে আমি কিছু বুঝি না, তাই-।' আবার অশোক রুদ্রকে এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে, তিনি তাঁর চার পাশের প্রবীণ এবং নবীন কবিরা যে সব কবিতা লিখছেন তা তিনি তেমন ভাবে পড়েন না। কাবণ পড়বার উপযুক্ত লেখা তিনি পান নি। অশোক রুদ্রের ধারণা এখানে উপস্থাপনা করা যেতে পারে। তাঁব মতে : 'কারও প্রত্যাশার মান যদি অতিশয় উচ্চ হয়, তো সাম্প্রতিক কালের বাংলা কাব্য চর্চা বিষয়ে তিনি যদি খুব উৎসাহবোধ না করলে তাঁকে বোধ হয় দোষ দেওয়া যায় না। এই প্রকার ব্যক্তি যদি চারদিকের আব সকলকে পিগ্‌মি বলে মনে করেন তো তাতেও তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। এই মনোভাবটা নিতান্তই সস্তা অহমিকায় পবিণত হয়ে যেতে পারে, যদি সেই ব্যক্তি নিজেকে এরণ্ড প্রান্তরে মহীরুহ বলে কল্পনা করেন। সমর সেন সেই ভুলটি কখনোই করেছেন বলে মনে হয় না। তা যদি করতেন তো নিজের কবিতা লেখা বন্ধ করতেন না।' [৮৮]

অন্যদিকে অশোক মিত্র এ ব্যাপারে দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে : 'এন্তার বাজে কবিতা লেখা হয়েছিল সমর বাবুকে অনুসরণ, অনুকরণ করে—আধা সাম্যবাদী কবিতা, আধা খিস্তির কবিতাও এবং কাঁচা খিস্তিরই—যাতে কোনো রকম কাব্যরস আদৌ ছিলনা। .... এই ব্যাপারটি কবিতার প্রতি সমর বাবুর বীতরাগের নিশ্চয়ই একটা বড় কারণ ছিল। তিনি তিতিবিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন—কী দরকার আর লিখে হয়তো তাঁর মনে হয়েছিল, অনুকারকদের যদি অনুকরণ করতে হয়। দ্বিতীয় যে মস্ত কারণ, সমর বাবুর ববাবরই অসম্ভব পরিমিতি বোধ ছিল, পুনরুক্তি ওঁব ঘোর অপছন্দ। ... . এখানেও হয়তো তিনি ভেবেছিলেন যে, যা বলবার তা তো বলেই দিয়েছেন, সব কবিতাই তো শেষ পর্যন্ত পুনর্লিখন, সুতরাং কী হবে নিজেকে বারবার একই কথা বলতে প্রবৃত্ত ক'রে?' [৮৯]

আর অরুণকুমার সরকার মনে করেছেন কবিতাকে সমর সেন খুব একটা সিরিয়াসলি নেন নি কোনো দিন। তিনি এও মনে করেন : 'রুদ্ধরতি আর রাজনীতির সামান্য ফাই

ফরমাস খেটেই তাঁর কবিতা আট বছরের মধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়ল।'[৯০]

উপরের এই সব মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয় না। এ ব্যাপারে সমর সেনের নিজস্ব কিছু মন্তব্য যদি দৃঢ়ভাবে থাকতো, তাহলে আমাদের সুবিধে হত। তা নেই। তাই আমাদেরকেও অনুমান করে ধারণা করতে হয় যে,সমব সেনের কবিতা পুনরাবৃত্তি হবার সম্ভাবনা একেবাবে বাতিল করে দেওয়া যায় না। বিশেষ করে, শেষের দিকে তাঁর কবিতায় নিহিত শূন্যতা বোধকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সমালোচকরা রায় দিয়েছিলেন : 'রাজনীতির ভাবলোকের' বিশুদ্ধ 'প্রেরণা' কাব্য চেষ্টারও প্রেরণা মাত্র—কিন্তু তার বেশী আর কিছু নয়। এই বিশুদ্ধ প্রেরণার ভিত্তিতে যদি দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বাস্তব ক্ষেত্রটি না থাকে বা ক্রমশ না গড়ে ওঠে ,তবে একদিন সেই ছিন্ন মূল প্রেরণা তার আকাশ বাসরের বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে গিয়েই অকালে প্রাণ হারাবে। এ প্রসঙ্গে সমর সেনের ব্যক্তিগত সাহিত্যিক ইতিহাসও বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। সমর বাবু একজন শক্তিমান আধুনিক কবি এবং তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ, ১৯৪০-এ প্রকাশিত 'গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা'র রচনাকাল থেকে 'রাজনীতি'র (মার্কসীয় রাজনীতির) ও 'ভাবলোকের' (মূল দার্শনিক মতবাদের এবং দ্বন্দ্ব মূলক বস্তুবাদের বহুমুখী ব্যাখ্যার) 'প্রেরণা'য় আস্থাও তাঁর অকৃত্রিম, অথচ ১৯৪৪-এ প্রকাশিত তাঁর আধুনিকতম কবিতার বই 'তিনপুরুষ' পড়তে গিয়ে এই কথাটিই বারবাব মনে হ'লো যে, 'রাজনীতি'র 'ভাবলোকেব' বিশুদ্ধ 'প্রেরণা' গত চার-পাঁচ বছরে কবির ব্যক্তিচেতনার সঙ্গে সমষ্টিচেতনার সমীকরণের কাজে তাঁকে একতিলও অগ্রসর হতে সাহায্য করেনি।।'[৯১]- এই সমালোচনাতেই সমর সেনের কবিতা লেখা স্তব্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে বলে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হয়েছে। এবং সমালোচক সমর সেনের বামপন্থায় 'অকৃত্রিম আস্থা'র কথা যে বলেছেন—তাও শেষ পর্যন্ত টাল খেয়ে যায় কবির ভাবনায় [জীবন কথায় একথা জানা যায়] । পক্ষান্তরে বলা চলে, ষাট, সত্তর ও আশির দশকের অ-কবি সমর সেন,রাজনীতির সঙ্গে অনেক বেশী সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিলেন—চল্লিশ দশকেব কবি সমর সেনের তুলনায়।

প্রসঙ্গত অধ্যাপক অশ্রুকুমার সিকদারের মন্তব্যও এখানে উপেক্ষনীয় নয়। তাঁর মন্তব্য : 'যেদিন ... . ইমেজের অনর্গল স্রোত স্তিমিত অবরুদ্ধ হয়ে এলো, কবিতায় এলো প্রত্যক্ষ ভাষণের চড়া গলা, সেদিন থেকে কবিতা পদ্যের স্তরে নেমে এলো এবং একদিন সেই নিঃসম্বল কবিত্বের দিকে তাকিয়ে সেই ধারাকে কবি [সমর সেন] নিজেই থামিয়ে দিলেন।'[৯২] আসলে সমর সেন বুঝতেন ইমেজগুলোই তাঁর কবি পরিচিতির বাহন। তাই কবি জানতেন তাঁর সীমাবদ্ধতার কথা। কেননা তাঁর কাছে স্বচ্ছভাবেই ধরা পড়েছিল সমস্ত পরিস্থিতি এবং জোর করা চেষ্টার অর্থহীনতা। সততার কাছে দায় বদ্ধতার বহুমূল্য এক ঋণ কবি চুকিয়ে দিলেন কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়ে। তাঁর প্রায়শ উচ্চারিত উক্ত মন্তব্যে তাই স্ববিরোধ কাজ করে না—'Poetry is not a turning loose of emotion কথাটি এখনো মনে পড়ে বাঙলা কবিতা পড়লে।' বুদ্ধদেব বসুর

'অনুদ্ধারণীয়' গল্পের নায়কের মতো সমর সেনও যেন বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিলেন এই ভেবে—'কবিতা যা মানুষকে বুদ্ধি স্পষ্ট করে, সম্মোহন আনে হৃদয়ে, উপহার দেয় অলীক এক আনন্দ, জগতের সঙ্গে এক ভ্রান্ত ঐক্যবোধ; যা কখনো কখনো এমন ভাণ করে যেন সব অন্যায়ের তা ক্ষতিপূরণ—সেই সর্বনাশী কবিতার আমি প্রথমেই ধ্বংস চাই।' তাই মনে হয়,পরবর্তী কালে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে 'কবিতা লিখে কি হবে? ওতে কিছু হয় না'—ব'লে যথেষ্ট শক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি কবিতা লেখা থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছিলেন। এটা তাঁর সচেতন সিদ্ধান্ত। নইলে পরে তিনি বাজী রেখে কবিতা লিখতে পারেন যে, তাও দেখা যায়। ইচ্ছা করলেই যে তিনি কবিতা লিখতে পারেন—তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

১৯৪৬-র নভেম্বরে সমর সেনের দ্বিতীয়া কন্যা, যূথীর জন্ম হয়। এ সময় তাঁকে কেউ কবিতা লেখার জন্য অনুরোধ জানালে তিনি সযত্নে এড়িয়ে চলেন। অন্তরঙ্গ কাউকে কাউকে হয়তো জানান—লেখা হয়ে উঠল না, আর কোনো দিন যে হবে সে ভরসাও নেই'।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে কোলকাতায় ফেরার জন্য সমর সেন পুনরায উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন। কিন্তু তাঁর কোলকাতা ফেরা হয় না। মে মাসে অফিসের কাজে সিমলায় যান। অগস্ট মাসের ১৫ই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। সমর সেনের কাছে স্বাধীনতা দিবসের কোনো উন্মাদনা অনুভূত হয় না। তাঁর কাছে ভারতবর্ষের এই স্বাধীনতা প্রাপ্তি ধরা পড়ে অন্য ব্যাখ্যায়—'ক্ষমতার হস্তান্তর যতটা ঘটে দাঙ্গা হাঙ্গামার ব্যাপক বাস্তুত্যাগের পটভূমিতে, ততটা গণ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ পরিপ্রেক্ষিতে নয়। 'নেপোয় দই মারা'র মতো নেতারা মসনদে বসলেন।'[৯৩] স্বাধীনতা লাভের ঠিক দু সপ্তাহ পরে, দিল্লীতে ১৯৪৭-র সেপ্টেম্বরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধে। ১৯৪৬-র কোলকাতায় যে দাঙ্গা চাক্ষুষ করেননি সমর সেন, তাই-ই প্রত্যক্ষ করলেন দিল্লীতে। দিল্লীর এই দাঙ্গার পাণ্ডা প্রধানত পাঞ্জাবের বাস্তুহারা, প্রায় হিংস্র হিন্দু ও শিখ। মুসলমানদের উপর ভীষণ চটা। মুসলমানদের খালি বাড়ির লোভে তারা শকুনের মতো শহরে ঘুরে বেড়ায়। জবর দখল করে নেয় তাদের বাড়ি। পুলিশ এসে তাদের তাড়িয়ে দিলে, পরে পুলিশ চলে গেলে পুনরায় ফিরে আসে। তবে বাড়িওয়ালা বর্তমান থাকলে পুলিশ সব সময় তাকে সাহায্য করে। এ হেন অবস্থায় মুসলমানদের দিল্লীতে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আর সমর সেনের বাড়িওয়ালা তরুণ মুসলমান যুবক, মারুফ আলি তাই কয়েকদিন গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে পালিয়ে অবশেষে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়। দিল্লীর এই দাঙ্গা থামে সপ্তাহ তিনেক থাকার পরে। অবিরাম বৃষ্টি শুরু হওয়ায় এবং দক্ষিণ ভারতীয় সৈন্যরা টহল দিতে নামায়। অন্যদিকে সমর সেনের কর্মস্থলের অবস্থা খুব একটা স্বস্তিদায়ক ছিল না। বিদেশী শাসক সরকারের পরিচালনায় থাকাকালীন অবস্থা অপেক্ষাও দেশীয় সরকারের পরিচালক বৃন্দের একপেশে নীতি তাঁকে পীড়াদায়ক করে তোলে। বিশেষ করে, সর্দার প্যাটেলের রক্ষণশীল হিন্দুয়ানি ও হিন্দী প্রেমের ফলে এ. এস. বোখারির মতো প্রতিভাবান ব্যক্তিকে

রেডিও অফিসের চাকরি ছাড়তে হয়। কম্যুনিস্ট সন্দেহে দু-একজন অফিস কর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়। কর্মস্থলের এ অবস্থায় সমর সেনের দিল্লীর প্রতি বিতৃষ্ণা ক্রমশ বেড়ে চলে। এরই ভিতর ১৯৪৭-র শেষাশেষি বিড়লা হাউসে সুব্রত রায়চৌধুরীর সহায়তায় তিনি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। নির্দিষ্ট পনেরো মিনিট সাক্ষাৎকার বেড়ে চলে প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে। মহাত্মাজীর ইংরেজী শুনে তিনি মহাত্মা গান্ধীর প্রতি Impressed হয়ে পড়েন। ১৯৪৮-র ৩০শে জানুয়ারী মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু হয়। ঐ দিন সমর সেনের অফিসে অপ্ ডে থাকায় বেরোননি বাইরে। পরের দিন বাইরে বেরিয়ে দেখেন যে, শহর এ ঘটনায় উত্তাল জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে। গান্ধীজীর নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না, তবু গান্ধীজীর মৃত্যুতে জনৈক পেশোয়ারীকে উল্লাস প্রকাশ করতে দেখে তাঁর অসহ্য লাগে। সমর সেন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বিপ্লবী চরিত্রের মানুষকে শ্রদ্ধা করতেন বলে এ ঘটনায় তিনি আহত হয়েছিলেন বিশেষ ভাবে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে কম্যুনিস্ট পার্টিকে পুনরায় অবৈধ বলে ঘোষিত হয়। তেলেঙ্গনায় আন্দোলন নির্মমভাবে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ও রাজাকারদেব মাধ্যমে দমন করা হল। এসব দেখে সমর সেনের ব্যথা বেড়েই চলল।

১৯৪৯-র সেপ্টেম্বর মাসে অমলেন্দু দাশগুপ্ত ও তিনি কোলকাতার Statesman পত্রিকায় একসঙ্গে আবেদন করেন। নভেম্বর মাসের শেষাশেষি দিল্লীর পাট চুকিয়ে কোলকাতার 'The Statesman' পত্রিকার সংবাদ সম্পাদনা বিভাগে সাব এডিটর হিসেবে নিজেকে যুক্ত করেন সমর সেন। তবে দিল্লী থেকে চলে এলেও মাঝে মাধ্যেই তিনি দিল্লী যেতেন। কয়েকজন আত্মীয়ও তো রয়ে গেছে সেখানে। 'The Statesman'-এ তিনি যখন যোগ দেন, তখন সংবাদ সম্পাদনা বিভাগে বর্মা ফেরৎ অ্যাংলো বার্মিজদের প্রাধান্য। তাদের কর্মদক্ষতা— ব্যবহার অবশ্যই স্মরণীয়। যাইহোক, এখানে যোগ দিয়ে সমর সেন বোঝেন যে, পত্রিকার কাজ রেডিও অপেক্ষা স্বতন্ত্র। সাধারণত রেডিওতে নানান সূত্রে খবর সংগ্রহ করে তারপর বাছাই করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বুলেটিন তৈরী করে মুখে মুখে স্টেনোগ্রাফারকে বলে টাইপ করিয়ে নিয়ে স্টুডিওতে পাঠাতে হত। সময় একদম পাওয়া যেতো না। অন্যদিকে, খবরের কাগজে সময় পাওয়া যায়। অন্যদের কপি এডিট করতে হয়। টাইপ, হেডিং সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে কারো পক্ষে এখানে কাজ করা সহজ। দিল্লীতে দীর্ঘদিন বসবাসের পরে কোলকাতায় এসে সমর সেন কিছুটা অস্বস্তির মধ্যে পড়লেও, অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই কাটিয়ে উঠেন। 'মজুমদার ক্লিনিকে' নিয়মিত আড্ডা বসান। যেখানে তাঁর মেজদাদা বসতেন। সাহিত্য জগতে তিনি কদাচিৎ চলা ফেরা করতেন। মজুমদার ক্লিনিকের আড্ডার পরিধি ক্রমে বিস্তৃতি লাভ করে। এখানে সাহিত্যিকদের পরিবর্তে আনাগোনা বেড়ে যায় সাংবাদিকদের। সমর সেনের সঙ্গে আলাপ হয় নিরঞ্জন মজুমদারের। আলাপ হয় ফটোগ্রাফার সুনীল জানা ও তাঁর স্ত্রী শোভা জানার সঙ্গে। সুনীল জানা এবং তাঁর স্ত্রী ডাক্তার শোভা জানার সমস্কারমুক্ত ও বাধাবন্ধহীন জীবনযাত্রা সমর সেনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

১৯৫১-র ৩০শে সেপ্টেম্বর 'The Statesman' পত্রিকায় সমর সেনের আধুনিক কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ, 'The Alien Corn' প্রকাশিত হয়। ১৯৫২-এ নির্বাচনের সময়, বন্ধু দেবু চৌধুরীর সহায়তায় বোম্বে যেতে গিয়ে হাওড়া স্টেসনে পৌঁছেও পকেটমার জনিত কারণে তিনি ফিরে আসতে বাধ্য হন। এ বছরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের 'Bicycle Thieves', 'Open City', 'Miracle of Milan' এবং Kurasawa-র দুটি ছবি তিনি দেখেন। এগুলির মধ্যে প্রথমটি তাঁর স্মরণে ছিল দীর্ঘদিন। ১৯৫৩-র জুলাই মাসে (শ্রাবণ ১৩৬০) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ লেখেন 'সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা' নামে। এসময়ে সমর সেনের কম্যুনিস্ট ভাবাদর্শের প্রতি আস্থা অটুট। যদিও ভারতের কম্যুনিস্ট ভাবাদর্শের প্রসঙ্গে কিছুটা চিড় ধরেছে। কারণ ভারতে তেভাগা আন্দোলন, তেলেঙ্গনা আন্দোলন ও অন্যান্য আন্দোলন বা জনযুদ্ধের চোরাগলিতে সমাপ্তি ঘটতে দেখে তিনি বিস্মিত। রাজনৈতিক-স্বাধীনতা ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল জোতদার ও পুঁজিবাদীদের হাতে। বিদেশী পুঁজি স্বনামে বা বেনামে অপরিবর্তিতই রয়ে গেল। তাঁর মনে হয়েছে, সমস্ত আত্মত্যাগ ও সংগঠন সত্ত্বেও কম্যুনিস্ট দল এদেশে দাঁড়াবার মাটি পায় নি। এহেন অবস্থায় হতাশা বা বিভ্রান্তি ঘটাই স্বাভাবিক। তাঁর ক্ষেত্রে কিছুটা যা লক্ষিত হয়।

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সিগনেট প্রেস থেকে 'সমর সেনের কবিতা' নামে এক সংকলন প্রকাশিত হয়। প্রকাশক দিলীপ কুমার গুপ্ত। একই সময়ে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলনে সমর সেনের ৯টি কবিতা—'রোমন্থন', 'স্মৃতি', 'মুক্তি', 'একটি মেয়ে', 'মহুয়ার দেশ', 'নাগরিক', 'কয়েকটি দিন', 'For thine is the king-dom', 'বকধার্মিক' প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৫৫-তে সত্যজিৎ রায়ের পরিচালিত 'পথের পাঁচালী' ছবিটি দেখেন তিনি। এই ছবি দেখে কয়েকজন বন্ধু মিলে সত্যজিৎ রায়কে অশোক মিত্রের বাড়িতে সম্বর্ধনা জানান। প্রসঙ্গত জানানো যেতে পারে যে, এই ছবি দেখার বেশ কয়েক বছর বাদে দেখা, ঋত্বিক ঘটকের 'নাগরিক' ছবিটি দেখে সমর সেন অভিভূত হয়ে ছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল ১৯৫২-তে তোলা 'নাগরিক' ছবিটি আগে মুক্তি পেলে সত্যজিৎ রায় নয় ঋত্বিক ঘটককেই পথিকৃৎ বলা হত। ১৯৫৪-র নভেম্বর মাসে তিনি বিষ্ণু দের পরিবারের সঙ্গে বিহারের রিখিয়া বেড়াতে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও, ছুটির অভাবে এবং আর্থিক অনটনের জন্য তাঁদের সঙ্গী হতে পারেন নি। ১৯৫৫-র সাধারণ নির্বাচনে অন্ধ্রপ্রদেশে কম্যুনিস্টদের অপ্রত্যাশিত শোচনীয় পরাজয়ে সমর সেন আশ্চর্য হন। অন্য অনেক বুদ্ধিজীবীর মতোই তিনিও ভাবেন—'অন্ধ্রের ব্যাপারটা সত্যি অদ্ভুত'। এই বিরাট বিভ্রান্তি ও বিপর্যয়ের কাবণ খোঁজেন; দোষী প্রকৃত পক্ষে কে বা কারা তাও চিন্তা করেন।

আবার বিশ্বের যে কম্যুনিস্ট দেশের আদর্শ সামনে রেখে একদা সমর সেনের মতন উজ্জ্বল যুবকরা বামপন্থায় শ্রদ্ধা জাগ্রত ও লালন করেছিলেন—সেই দেশ, রাশিয়া থেকেই চরম আঘাত আসে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। কবি সমর সেনকে এ ঘটনা

কিছু না করতে পারলেও, ব্যক্তি সমরকে বিচলিত করে তোলে। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য : 'অন্তত আমাদের জীবনে রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রখর ছিল তিরিশ ও চল্লিশের বছরগুলিতে, যখন দেশ-বিদেশের চেহারা বদলে যায়।...১৯৫৬-এ স্তালিনের কেচ্ছা শুরু হল। ব্যাপারটা অত্যন্ত কদর্য ঠেকেছিল, কৈশোর ও যৌবনের অনেক বদ্ধমূল ধারণা ও আদর্শে এমন আঘাত আগে লাগেনি।'[৯৪] এর পরেও রাশিয়ার ভাবাদর্শটি তিনি ধরে রাখার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তার সার্বিক রূপায়ণ বিষয়ে সম্ভবত হতাশ হয়েছিলেন। মনে হয় এ জন্যেই তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সততাকে আঁকড়ে ধরে অবশিষ্ট জীবন কাটাতে সচেষ্ট হন।

১৯৫৬-য় প্রকাশিত, আবু-সয়ীদ আইয়ুবের, সংকলন—'পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা' গ্রন্থে সমর সেনের পাঁচটি কবিতা : 'ইতিহাস', 'স্মৃতি', 'মুক্তি', 'শেষ বসন্ত' ও 'একটি মেয়ে' অন্তর্ভুক্ত হয়। জনৈক বন্ধুর সঙ্গে বাজি রেখে এ বছরেই সমর সেন লেখেন 'পিকনিক' 'উড়ো খৈ' ইত্যাদি কয়েকটি কবিতা। এগুলির মধ্যে 'পাঁচমিশেলি' বলে তাঁর তিনটি কবিতা ১৯৫৬-র 'দেশ' পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১৯৬১ সালের 'দেশ' পত্রিকার এক সংখ্যায় 'পিকনিক' কবিতাটি ছাপা হয়। 'উড়ো খৈ' নামের কয়েকটি কবিতা 'দৈনিক আনন্দবাজারে' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ প্রসঙ্গে সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষ জানাচ্ছেন : '১৯৫৬ সনে তিনি বোধ হয় শেষ কবিতা লেখেন। 'পাঁচ মিশেলি' বলে তাঁর তিনটি কবিতা সেই বছরেই দেশ পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। আর দুটো বেরিয়েছিল ১৯৬২ সনে, আনন্দবাজার পত্রিকার পূজা সংখ্যায়। সমর সেনের 'উড়ো খৈ' বলে কয়েকটা লেখাও আনন্দবাজার পত্রিকার দৈনিক সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছিল। আনন্দবাজার পত্রিকার পূজা সংখ্যায় তাঁর যে দুটি কবিতা ছাপা হয়েছিল, তার শেষ কবিতাটির নাম 'নতুন পাতা' । সেটা এখানে তুলে দিলাম। সমর বাবুকে ভালো বোঝা যাবে। 'মৃত্যুর পরে সব শেষ ঃ/ কিছু আহা উঃ, বেশি দুর্নাম/ চেলারা নতুন গুরুকে করে প্রণাম/বিধবার ঠোঁটে থাকে পানের রেশ।' এই হলেন সমর সেন। এবং এইটেই সম্ভবত তাঁর শেষ প্রকাশিত কবিতা।'[৯৫]

উপরের এই মন্তব্য আংশিক সত্য, পুরোপুরি সত্য নয়। প্রথম কথা ১৯৫৬-তেই তাঁর লেখা শেষ কবিতা নয়। দ্বিতীয় কথা, 'নতুন পাতা'ও তাঁর শেষ প্রকাশিত কবিতা নয়। উল্লেখ্য, ১৯৬১-তে বেথুন কলেজের পত্রিকার জন্য একটি কবিতা লেখেন সমর সেন, মৃণালিনী এমার্সনের অনুরোধে, প্রায় বাধ্য হয়ে। নিয়মিত কবিতা চর্চার প্রায় পনের বছর বাদে লেখা কবিতাটি নেহাৎ দায় সারা গোছের নয় যে, তা এটি লক্ষ্য রাখলেই জানা যাবে;

স্মৃতিতে

ওরা কাজ করে,
দুমুঠো তোলে ঘরে,
ভবে দুবেলা মুখে নয়।

রোজ ভাত ভালো নয়, ভালো নয়।
পাঁচ সালায় বৃথা অপচয়।
কেটেছে বিশ বছর;
রাত কত হল
এ প্রশ্নের মেলেনি উত্তর।
অনেকের দেহ মেদোচ্ছল,
অনেকেব মনে পড়েছে কড়া,
ভারা ভারা ধান কাটা হয়নি সারা।'[৯৬]

এছাড়া, ১৯৬৫-তে প্রকাশিত 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় (শ্রাবণ, ১৩৭২) সমর সেনের 'একটি অপ্রকাশিত কবিতা'ও উল্লেখ্য।

'একদা আমরা ছিলাম বিমর্ষ বাঁদর,
আজ আস্ফালনে মত্ত যেন বীর হনুমান।
সেতুবন্ধের অনেক বাকি,
ওপারে রাক্ষসের স্পর্ধা দিনে দিনে বাড়ে,
প্রতিদিন দেখি উর্ধ্বগ্রীব প্রতিনিধি তার
এদেশকে নির্বিকার করে বলাৎকার;
কিন্তু ভাই, নিশ্চিত জানি,
শেষ পর্যন্ত ইতিহাস নির্ঘাত আমাদের দিকে;
সেই ঐশী ইতিহাস শক্তির মাথায়
লেজের জটিল জাল দেখি রাবণের গলায়।'[৯৭]

আলোচ্য কবিতাটির রচনাকাল সঠিক জানা না গেলেও, এটি-ই সম্ভবত পত্রিকায় প্রকাশিত সমর সেনের সর্বশেষ মৌলিক কবিতা বলে দাবী করা যেতে পারে।

১৯৫৭-র ফেব্রুয়ারী মাসে সমর সেন 'The Statesman' পত্রিকার চাকরি ছেড়ে, মস্কোয় অনুবাদকের চাকরি নিয়ে চলে যান সপরিবারে। মস্কোর বিদেশী ভাষা ও সাহিত্য প্রকাশনালয়ে। যার নাম 'প্রগতি প্রকাশনালয়'। মস্কো যাবার প্রাক্কালে তাঁর মস্কো সম্বন্ধে বেশ কিছু সংশয় মনে উদয় হয়েছিল। ক্রমে সে সংশয়ের অবসান ঘটে। তিনি মস্কোর অফিস পরিবেশ ইত্যাদির বর্ণনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে, অফিসটা আয়তনে ছোট হলেও নানান দেশের লোক অনুবাদকের কাজ করতেন; বাড়িতে বসে কাজ করতে হত, কোনটি সম্পূর্ণ হলে রুশ কন্ট্রোল এডিটরদের সঙ্গে বসতে হত। ভাষার খাতিরে কোনো রদ্-বদল চলতো না, যখন চিরায়ত রুশ সাহিত্যের অনুবাদ হত। ফলে ভাষা জনিত কারণে অনুবাদ প্রায়শ হাস্যকর পর্যায়ে চলে যেত। অবশ্য পরে ভাষাজ্ঞান রপ্ত হওয়াতে মূল রুশ বই থেকে অনুবাদ করাতে এই ত্রুটি দূর হয়। মস্কোতে সমর সেন রুশ ভাষা পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন।

রাশিয়ার অগ্রগতি মূল কর্মকাণ্ড, মানুষের কর্মপ্রাণতা ও সততা, আন্তরিকতা, সুশৃঙ্খল

শাসন ব্যবস্থার প্রশংসা করেছেন সমর সেন বারে বারে। এখানের বাংলা বিভাগে একই বাড়িতে থাকতেন কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সস্ত্রীক। থাকতেন 'উদয়ের পথে' ছবির বিখ্যাত অভিনেতা, রাধামোহন ভট্টাচার্য। পরিচয় হয় বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ার বাসিন্দা ননী ভৌমিক, ফল্গু কর, শুভময় ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিদের সঙ্গে। সমর সেনের মস্কোতে থাকার সময়ে শিশুদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া হত। আটবছর বয়েস থেকে অবৈতনিক শিক্ষা, অল্প খরচায় বিশেষ আহার ইত্যাদি সুযোগ সুবিধে দেওয়া হত এদেরকে। বড়োদেরও শিক্ষা লাভ এবং চিকিৎসার দাম লাগতো না। ওষুধের দাম দিতে হত। এখানের ডাক্তার ও রোগ সম্পর্কে বলতে গিয়ে সমর সেন যে রসিকতা করেছেন, তা অবশ্য উল্লেখ্য। 'বাড়িতে ডাক্তার বা ডাক্তারনী বেশীর ভাগ মেয়ে ডাক্তার— ডাকতে হলে রুশীরা শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে টেলিফোনে বলবে ১০২ ডিগ্রি জ্বর হয়েছে। অসুখ একটু গুরুতর হলে পলিক্লিনিক, তারপর হাসপাতাল। জলবসন্ত হামে ওরাঁ মাথা ঘামাতেন না, কিন্তু আমাশা হয়েছে শুনলে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতাল; বাড়িতে জীবাণু নাশক ছড়ানো হতো, হাসপাতালে রাখা হতো একেবারে বিচ্ছিন্ন কাঁচের দরজা জানলা দেওয়া ক্যাবিনে। আমার একটা শখ ছিল বিনা পয়সায় হাসপাতালে কিছুদিন কাটানো, কিন্তু পলিক্লিনিক পেরোতে পারিনি। মাইনাস ৩৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে রাস্তার ঘুরেছি, জ্বর হয়নি।'[১৮] স্তালিন সম্পর্কে সমর সেন কৌতূহল প্রকাশ করলে রুশীরা ইতস্তত করে অল্পবিস্তর উত্তর দিতেন। জর্জিয়ায় স্তালিন সম্পর্কে তখন অনুরাগ লোপ পায় নি। কিন্তু স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা স্তালিন সম্পর্কে ছিল সবচেয়ে অসহিষ্ণু।

এখানে অবস্থিতির সময় সমর সেনের চোখে বর্ণবিদ্বেষ লক্ষিত হয়নি। দু এক বছর কাটানোর পর দেখেছেন বিদেশী মুদ্রার প্রতি অতিশয় আসক্তি। হোটেলে ইউরোপীয় ট্যুরিস্টদের সমাদর ও অগ্রাধিকার পায়। একদা হোটেলে জায়গা না পেয়ে লেনিনগ্রাদে অচেনা এক রুশী পরিবারে তাঁকে থাকতে হয়। এই লেনিনগ্রাদ সম্পর্কে তাঁর দুর্বলতা প্রবল। লেনিনগ্রাদ-র মিউজিয়াম দেখতেন বারবার। কোলকাতায় ফিরেও এই লেনিনগ্রাদের স্মৃতি ভুলতে পারেন নি। বন্ধু ও পরিচিত জনদের নোবলেস্ট সিটি, লেনিনগ্রাদ সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রায়ই বলতেন—'আপনি একবার অবশ্যই লেনিনগ্রাদ দেখবেন', 'ওখানেই তো সেই মহান যুদ্ধ হয়' ইত্যাদি। এখানের সংবাদপত্রে নেতাদের বক্তৃতার রিপোর্ট থাকতো বেশী, কিন্তু খবর কম। ভারতের সংবাদও খুব কম প্রকাশিত হত। জনগণ ক্রমশ ব্যক্তিগত সম্পত্তি—ফ্ল্যাট, টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর, মোটরগাড়ি ইত্যাদির জন্য লালায়িত ছিল। আমেরিকান জীবন যাত্রা সম্পর্কে মুগ্ধতা রাশিয়ানদের বেড়েই চলে।

সমর সেন তাঁর দুই কন্যাকে বয়েস অনুযায়ী মস্কোর স্কুলে ভর্তি করে দেন। ১৯৫৭ থেকে তিনি সেখান থেকেই বোম্বাইয়ের 'The Economic Weekly' -তে 'Moscow Letter' লিখতে থাকেন অনিয়মিত ভাবে। এ বছরেই তিনি পাঁচটি বই—'Health Protection in the Soviet Union', টলস্টয়ের 'Cossacks' (কসাকস্), কবলেঙ্কোর 'The Blind Musician' (অন্ধ সুরকার), পলভয়ের 'A Story of a Real Man' এবং

Ermilov-র 'চেকভ' অনুবাদ করেন। ১৯৫৮-তে তিনি কুড়ি দিনের জন্য পশ্চিম ইউরোপ বেড়াতে যান। এটাই তাঁর প্রথম পশ্চিম ইউরোপ ভ্রমণ। দক্ষিণ কৃষ্ণসাগরের উপকূলবর্তী কয়েকটি সুন্দর সুন্দর স্থান—সোচি, গাগরা, পিৎসুন্দা, নোভিআফ্‌ন ও সুখমি তাঁর কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। কুড়ি জনের দলে তাঁরা আটজন বাঙালী। বাকিরা সব রুশী। অনুমতি না পাওয়ায় সমর সেন সুখমি থেকে জর্জিয়ার রাজধানী তিব্‌লিসে্‌ যেতে পারেন নি। এই ভ্রমণের সময় রাশিয়া ও ক্রুশ্চেভ সম্পর্কে বিদেশীরা তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গীদের নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। সমর সেন ১৯৫৮-তে অনুবাদ করেন গোর্কির তিনটি নাটক—'পাতিবুর্জোয়া', 'মরশুমী লোক', 'শত্রুপক্ষ'। টলস্টয়ের 'ইভান ইলিচের মৃত্যু', চেকভের 'তিনবোন' এবং ইভানবুনিনের 'আপেল সৌরভ' অনুবাদ করেন এ বছরেই।

১৯৬০-এ ছুটিতে আসেন কোলকাতায়। একটানা তিন বছর থাকার পরে সমর সেনের মস্কো থেকে কোলকাতায় এটাই প্রথম আসা। কোলকাতা থেকে ফিরে যাওয়ার পথে সস্ত্রীক ট্রেনে ওয়ারশ, প্রাগ হয়ে ভিয়েনায় যান। প্রাগে সাক্ষাৎ হয় 'বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ান সংস্থা'র সতীশ দাশগুপ্তের সঙ্গে। দিন তিনেকের জন্য তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন সমর সেন। তারপর ভিয়েনায় ছিলেন ছ দিন। ভিয়েনার 'এ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সী'তে কর্মরত অমলেন্দু দাশগুপ্তের বাসায় ওঠেন তাঁরা। মস্কো ফিরে গিয়ে সমর সেনের সঙ্গে প্রগতি প্রকাশনালয়-র ডেপুটি, পাভ্‌লভের অনুবাদ নিয়ে কথান্তর ঘটে। স্বভাব স্বাধীন সমর সেনের সঙ্গে এ ঘটনা ঘটতেই পারে। মস্কো ফিরে তাঁর মন পুনরায় অস্বস্তিতে ভরে ওঠে। রুশ পত্র পত্রিকায় গল্প উপন্যাসে ক্রমাগত যে 'নতুন মানুষ' সৃষ্টির কথা শোনানো হত, সেই নতুন মানুষদের সাক্ষাৎ তিনি পান নি। তাছাড়া সেসময় চীনের সঙ্গে রুশ কম্যুনিস্ট পার্টির বিবাদের অনুচ্চ অস্পষ্ট গুঞ্জন শেষে বাস্তবে পরিণত হয় রাশিয়া কর্তৃক হঠাৎ চীন থেকে বিশেষজ্ঞ ও ব্লু প্রিন্ট ফিরিয়ে আনা হয়। অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিরোধ এত জটিল ও তীব্র হয় যে, সমর সেনের মতন সচেতন ব্যক্তির পক্ষে পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে অসুবিধে হয়না।* এই মানবিক অবস্থানে থেকে তিনি লিখে পাঠান 'Moscow Letter'। ১৯৬১-তে সারা দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাশিয়াতেও রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকী পালনের আয়োজন হয়। প্রগতি প্রকাশনালয় থেকে এই উপলক্ষে কয়েক খণ্ডে রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। কবিতার বাছাই ও ইংরেজীতে আক্ষরিক অনুবাদে সমর সেন সাহায্য করেন একজন নবীন রুশ সাহিত্যিককে। অন্তিম পর্যায়ের সংস্করণ করতেন 'ডক্টর জিভাগো' খ্যাত পাস্তেরনাক প্রমুখ।

১৯৬১-র অগস্ট মাসে মস্কোর পাততাড়ি গুটিয়ে দিল্লী ফিরে আসেন সমর সেন। দিল্লী হয়ে কোলকাতায় এসে যোগ দেন এক আমেরিকান বিজ্ঞাপন সংস্থায়। দেশে ফেরার আগেই মস্কো থেকে দিল্লী মারফৎ টেলিফোনে এই সংস্থার পরিচালকবৃন্দের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করে, তারপর এখানে যোগ দেন। এখানেও সমর সেন বেশী দিন স্থায়ী

হতে পারেন নি। তাঁর মতে : 'কাজের চাপ খুব একটা ছিল না, তবে নটা থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত অফিসে ভালো লাগতো না। বিজ্ঞাপন লেখার 'সৃষ্টিশীল' কাজে উৎসাহ পেতাম না।'[৯৯] মাত্র সাত মাস কাজ করার পর এখানে চাকরী ছেড়ে দেন তিনি। বিজ্ঞাপন সংস্থার চাকরী ছাড়ার আরও সাতমাস পরে, ১৯৬২-তে কোলকাতার 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকায় যুগ্ম সম্পাদকের পদে যোগ দেন। এর আগে, ১৯৬২-র ফেব্রুয়ারী মাসে 'The Economic Weekly' পত্রিকায় শেষ করেন 'Moscow Letter'-র শেষ কিস্তি। 'হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকা আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর ইংরেজী দৈনিক। এই পত্রিকার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমর সেনের মতের অমিল লক্ষ্য করা যায় প্রায় প্রথম দিক থেকেই। এখানে তাঁর কাজ ছিল প্রবন্ধ এডিট্ করা, সংবাদ পরিবেশনে নজর রাখা, দেশের বিভিন্নস্থানে সংবাদদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ইত্যাদি। তাঁদের মধ্যাহ্ন কালীন দৈনিক আড্ডার জায়গা ছিল চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিয়্যু-র কফি হাউসে। এখানে সমাবেশ ঘটতো সাংবাদিকদের, বিজ্ঞাপন সংস্থার কর্মীদের, উঠতি চলচ্চিত্র পরিচালকদের, কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের। টেবিল ঘেরা জমায়েতে, স্বল্পবাক্ সমর সেন কোনোদিনই মধ্যমণি ছিলেন না। কিন্তু মাঝে মধ্যেই প্রায় তির্যক কোনো মন্তব্য, বা হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ, এখানের সমবেত লোকদের সচকিত করে দিত ওঁর উপস্থিতি সম্বন্ধে। এবছরে তিনি দশ দিনের জন্য এক সেমিনারে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ রওনা হন।

১৯৬৩-তে রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণের সফর উপলক্ষে এক সাংবাদিক দলের সঙ্গে সমর সেন ব্রিটেন যান। এটিই তাঁর শেষ বিদেশ যাত্রা। মাস খানেক ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডে পুরোনো দু-তিনজন বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে কাটান। তারপর পনেরো দিন ছিলেন পশ্চিম জার্মানীতে। পশ্চিম জার্মানীতে বার্লিন প্রাচীর (১৯৮৯-র নভেম্বরে এটা ভাঙ্গা হয়েছে) নিয়ে বিক্ষোভ লক্ষ্য করেন। দেড়মাস পরে দেশে ফেরেন। এ বছরে প্রকাশিত, বিষ্ণু দে সম্পাদিত ও সংকলিত 'একালের কবিতা'য় অন্তর্ভুক্ত হয় সমর সেনের তিনটি কবিতা—'স্মৃতি', 'নাগরিক' ও 'জাতীয় সংকট'। এ বছরের 'পরিচয়' পত্রিকায় (৩৪ বর্ষ, ৮ সংখ্যা) সমর সেনের 'অদৃষ্টের পরিহাস' নামে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

১৯৬৪-তে 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতানৈক্য চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছোলে সমর সেন পত্রিকার চাকরী ছেড়ে দেন। ১৯৬৪-তে কোলকাতায় যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধে সেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উত্তেজনা মুখর সংবাদ, সমর সেনের অজান্তে ছাপানোর প্রতিবাদে তিনি 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকার চাকরী ছাড়েন। আরো একটু বিশদ করে বলতে হয় যে, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের সঙ্গে সম্পাদকদের একটা চুক্তি হয় এই বলে—পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত বাস্তুহারাদের নিয়ে নানা রটনা অন্তত কয়েকদিন যেন্ প্রাধান্য না পায়। যদিও সমর সেন নিজে এ নির্দেশকে মনে করতেন নিঃসন্দেহে পত্রিকার স্বাধীনতায় ঘোরতর হস্তক্ষেপ; তবু তিনি এও মনে করতেন যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় সংবাদপত্রের অবাধ স্বাধীনতা বাঞ্ছনীয় নয়। 'হিন্দুস্থান

স্ট্যান্ডার্ড' কর্তৃপক্ষ এই চুক্তি মানেন নি। এ সম্পর্কে সমর সেনের মন্তব্য : 'হঠাৎ এক অস্ট্রেলিয়ান সাংবাদিক ঢাকা ঘুরে এসে খবর দিলেন যে আদমজী পাটকলে নিহতের সংখ্যা অন্তত দশহাজার। মালিক ও অধিকাংশ সম্পাদকরা অতিশয় উত্তেজিত; আর একটি বৈঠকে প্রফুল্ল চন্দ্র সেনকে বলা হল যে এ খবর চাপা দেওয়া হবে না। বৈঠক থেকে ফিরে আমাদের সংবাদপত্র গোষ্ঠীর মালিককে বললাম ইংরেজি দৈনিকে খবরটা ফলাও করে ছাপাতে আমরা চাই না। তিনি রাজী হলেন।...দিন কয়েক পরে, ৩০শে জানুয়ারী (গান্ধীজীর মৃত্যু দিন) সকালে ইংরেজি পত্রিকায় দেখলাম আগেকার চেপে যাওয়া নানা অদ্ভুত রিপোর্টের সঙ্গে আরও অনেক কিছু ফলাও করে ছাপানো হয়েছে। অফিসে গিয়ে শুনলাম মালিকের নির্দেশ। সেদিনই পদত্যাগ পত্র পাঠাই।'[১০০]

স্বাধীনচেতা সমর সেনের পক্ষে একাজই সম্ভব। তিনি যেমন একদা কবিতা লেখা ছেড়েছিলেন হঠাৎই—তেমনি প্রতিবাদধর্মী সাংবাদিকতা শুরু করলেন যে হঠাৎই তাতে কোনো আকস্মিকতা থাকতে পারে না। শেষ হল সমর সেনের জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল এই ১৯৬৪ থেকেই তাঁর জীবনের অন্তিম অধ্যায়।

১৯৬২-র চীন-ভারত যুদ্ধ উপলক্ষে, ভারতবর্ষে জারি করা 'জরুরী অবস্থা'র ফলে বামপন্থী আন্দোলন যখন পুরোপুরি স্তব্ধ এবং এ যুদ্ধের ধাক্কায় ও কুৎসিত উগ্র জাতীয়তাবাদী অভিযানের পটভূমিকায় অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীই যখন শয়তানের কাছে বিবেক বিক্রি করে পরম নিশ্চিন্তে নিরাপত্তার আশ্রয়ে মুখ গুঁজে দিয়েছেন—ঠিক সেই সময়ে বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা অবরুদ্ধ আত্মপ্রকাশের আর্তি নিয়ে 'নন্দন' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। এই পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে বামপন্থী সংস্কৃতি প্রকাশ করতে সচেষ্ট ছিলেন তাঁরা। কিন্তু পত্রিকাটি সময়ের দাবীকে কোনোক্রমেই মেটাতে পারছিল না। এমনই এক ক্রান্তিকালে, অর্থাৎ ১৯৬৪-র ৯ই অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত হয় ৩০ পয়সা দামের এক ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা। জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুর পাঁচ মাস পরে প্রকাশিত, ডিমাই কোয়ার্টো সাইজের এ পত্রিকার প্রচ্ছদ ছিল রঙিন। মাত্র ২৪ পৃষ্ঠার। এই পত্রিকার নাম 'Now'। সম্পাদক হলেন সমর সেন।

অস্থির সময় এবং তার পটভূমিকায় সাংস্কৃতিক মানসিকতাকে প্রতিফলিত করার একটি সার্থক প্রচেষ্টা হিসেবে 'Now' অচিরেই বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের আন্তরিক—অনেক ক্ষেত্রেই আবেগ উচ্ছ্বসিত স্বীকৃতি লাভ করল। সর্বত্র সংশয়, দ্বিধা, দোদুল্যমানতা। সংশয় কাটাবার দায়ভার যাঁদের—এতাবৎ বাচাল সেই রাজনৈতিক, বৌদ্ধিক নেতৃত্ব হয় বেচাল—নয় তো মূক বধির। বন্ধ্যা নিষ্ক্রিয়তার অতৃপ্তিতে ভরা এসময়েই তিমির বিদার-উদার-অভ্যুদয়ের মতোই সমর সেন সম্পাদিত 'নাউ' পত্রিকার প্রকাশ। এ পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে জীবিকার কাজ ও মূল্যবোধের অনেকাংশেই সার্থক সমন্বয় প্রত্যক্ষ করে তুলেছিল সম্পাদক, সমর সেনের সামাজিক দায়বদ্ধতাব অবস্থানকে। বলা হয়েছিল, এ পত্রিকা কোনো পার্টি বা মতান্ধতার অনুসারী হবে না। পক্ষান্তরে, এ পত্রিকা দায়বদ্ধ থাকবে কয়েকটি নির্দিষ্ট নীতির প্রতি। কথা এবং কাজের ফারাককে কখনোই ক্ষমা করবে

না। 'Now'-র প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে ঘোষিত হয়েছিল : 'This weekly will not be committed to any party or dogma' এবং এ পত্রিকার মূল লক্ষ্য হল : '...not only on political, social and economic affairs, but also on literature, the arts and entertainment It will focus attention on major events and issues, analyse them without prejudice and judge them without fear'।

প্রথম সংখ্যার এই ঘোষণাটি কার্যত সমর সেনেরই ইচ্ছার ঘোষণা। পত্রিকা মালিকের পত্রিকা প্রকাশের মুখ্য উদ্দেশ্য তা ছিল না। 'Now' -প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল—will be committed to any party or dogma । সমর সেন কেবল একটি 'not' বসিয়ে দিয়ে যতদিন পেরেছিলেন, ততদিনই মুক্ত মনের স্বচ্ছ প্রবাহ বইয়েছিলেন। 'Now' -কে মালিক পক্ষ মূলত একটি দলের মুখপত্র করতেই চেয়েছিল। যে দলটি তখনও পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করেনি। যে দলের নেতার সঙ্গে সমর সেনের লক্ষ্যের—অন্তত 'নাউ'-র জন্মমুহূর্তে কোনো দ্বন্দ্ব দেখা দেয় নি বা ছিল না। আর মালিকপক্ষেরও 'নাউ' প্রকাশের পরিকল্পনাকে রূপ দিতে সমর সেনের মতো একজন সম্পাদকের প্রয়োজন ছিল; যিনি তুখোড় ইংরেজী ভাষা জ্ঞান সম্পন্ন এবং কংগ্রেস বিরোধী, আবার ঠিক বামপন্থীও নন। বলাবাহুল্য, সমর সেনের পাণ্ডিত্য, সততা, নীতিনিষ্ঠা, তুখোড় ইংরেজীজ্ঞান, আধা কম্যুনিস্ট আদর্শ তখন বুদ্ধিজীবী মহলে আলোচিত বিষয়। তিনি সহজেই তাই ন্যাশন ট্রাস্টের পরিচালক, হুমায়ুন কবীরের নজরে পড়ে যান [আবার সমর সেন হুমায়ুন কবীরের ছাত্রও] । এছাড়া 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকার চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে তিনি বেকার রয়েছেন। তাঁর কাছে ১০০০টাকা মাইনের এই চাকরি, মধ্যবিত্তের দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং সততা সত্ত্বেও ভালোই মনে হয়েছিল। কিন্তু এই শর্তে তিনি 'নাউ' সম্পাদনায় রাজী হলেন, যে যখনই এডিটোরিয়াল পলিসিতে মালিকের হস্তক্ষেপ ঘটবে তখনই তিনি চাকরি ছেড়ে দেবেন। পরবর্তীকালে দেখা যায় সমর সেন তাঁর শর্তপালনে কুণ্ঠিত হন নি।

'নাউ' পত্রিকার প্রথম সহকারী হিসেবে মাস দেড়েক ছিলেন পুসি সেন। ক্রমে আসেন ঋত্বিক ঘটকের ভাই, লোকেশ ঘটক, শ্যামলেন্দু ব্যানার্জী এবং নিত্যপ্রিয় ঘোষ। প্রথম প্রথম পত্রিকাটিতে দেশী-বিদেশী, খ্যাত-অখ্যাত লেখকদের উৎকৃষ্ট রচনায় ভর্তি থাকতো। বিশেষ একটা 'চরিত্র' দানা বেঁধে ওঠেনি। পরে আস্তে আস্তে একটি লেখক গোষ্ঠী তৈরী হয়ে যায় 'নাউ'-র। এখানের লেখকদের মধ্যে উল্লেখ্য—উৎপল দত্ত, নীরদ চন্দ্র চৌধুরী, লিণ্ডসে এমারসন,সত্যজিৎ রায়, অশোক মিত্র, অশোক রুদ্র, জন রবিনসন, পরেশ চট্টোপাধ্যায়, অমিয়কুমার বাগচী, বরুণ দে, শিপ্রা সরকার, সব্যসাচী ভট্টাচার্য প্রমুখ। তৎকালীন রাজনীতি ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে 'নাউ'র ভূমিকা মূলত ছিল সমালোচকের, কিন্তু পশ্চিম বাংলার শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সমাজের চিন্তা ভাবনা আচার-আচরণের কেন্দ্রস্থলেই সে নিজেকে অবস্থিত করতে চেয়েছিল। তবে সমালোচকের ভূমিকায় 'নাও'-র ভঙ্গিটা ছিল তীক্ষ্ণ, সরস, কিন্তু নেতিবাচক নয়। বরং নানা বিভ্রান্তিকর উক্তি

আর ফাঁকা বুলির ভেতরে থেকে আসল সমস্যাটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতো। ১৯৬৪-তে সি.পি.আই নেতা ও বামকর্মীদের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানায় 'নাউ'। ১৯৬৫-র জানুয়ারীতে দুর্গাপুরের কংগ্রেস অধিবেশনে রাজ্য কংগ্রেসের তৎকালীন কর্ণধার অতুল্য ঘোষ [১০১] সম্পর্কে 'নাউ' উচ্চকণ্ঠ হয়। ভারতবর্ষের অন্ধ চীন বিরোধিতাকে লক্ষ্য রেখে সমর সেন ১৯৬৫-র মার্চ মাসে প্রকাশ করেন জন রবিনসনের লেখা। মূলত এটি চীনের আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী নিয়ে লেখা। ১৯৬৫-র অক্টোবরে অনুষ্ঠিত ভারত-পাক যুদ্ধের সময় ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা নীতি সমর্থন করেছিল 'নাউ'। কিন্তু কোনো সময় পাকবিরোধী জিগির তোলেনি। পরিবর্তে তার বিরুদ্ধে, এবং সেই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পাকানোর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছিল সকলকে। এবছরেই 'লিটল-থিয়েটার গ্রুপ' কর্তৃক 'কল্লোল' নাটকের বিরুদ্ধে বড়ো বড়ো পত্রিকাগুলির জঘন্য আক্রমণের সময় 'নাউ' উৎপল দত্তদের এল-টি-জি-র পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। প্রতিসংখ্যায় 'কল্লোল' নাটকের বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করেছিল। পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে ১৯৬৬-র ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে। এ সম্পর্কে পরপর কয়েক সপ্তাহ ধরে 'নাউ' এর জ্বালাময়ী সম্পাদকীয় প্রকাশিত হতে থাকে। এর পাশাপাশি অশোক মিত্রের 'ক্যালকাটা ডায়েরি' ও অসংখ্য চিঠি ছাপা হয়। সেই সঙ্গে কংগ্রেস সরকারের অপদার্থতা এবং পুলিসি জুলুমের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভের সুর।

১৯৬৬-র জানুয়ারী মাসে একটি বৌভাতের নিমন্ত্রণে সমর সেনের সঙ্গে সরোজ দত্তের শেষ সাক্ষাৎ ঘটে। এপ্রিল মাসে নীরদ চৌধুরীর লেখা নিয়ে কবীর সাহেবের সঙ্গে সমর সেনের মতানৈক্য শুরু হয়। এ ব্যাপারে সমর সেন নীরদ চৌধুরীকে চিঠি লিখে অবগত করান। উত্তরে নীরদ চৌধুরী মন্তব্য করেন ১০-৫-৬৬ তারিখের এক চিঠিতে : 'আজ চিঠি লিখিবার বিশেষ কারণ অবশ্য আপনি কবীর সাহেব সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা। মনে হইতেছে, গোল বাধিবার খুবই সম্ভাবনা। তাঁহার আপত্তি আপনি নিজে যা লিখিতেছেন, এবং অন্যের লেখা যাহা বাহির করিতেছেন, তাহা হইলেও হইতে পারে, কারণ সে-সব লেখাও hard-writing কিন্তু আমার ধারণা, আমার লেখা (বিশেষ করিয়া Commentary) সম্বন্ধেই আপত্তি বেশী প্রবল। আপনাদের পলিসি অংশত ও বদলাইয়া কম কড়া করিলে কি ফল হইতে পারে, সে-বিষয়ে আমার যা বক্তব্য বলিতেছি। প্রথমত, কাগজের কথা বলিব। নরম সুর ধরিলে Now চলিবে না। কাগজটার যা কিছু প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা হইয়াছে, তাহা কড়া সুরের জন্যই। আজকাল সাধারণ পাঠক সম্প্রদায় গতানুগতিক, ভ্যাপসা বা ঘ্যানঘেনে কথা শুনিতে চায় না। ধরি মাছ, না ছুঁই পানি, এই নীতি ধরিলে চলিবে না। এটা আপনি নিশ্চিত জানিবেন। সুতরাং কবীর সাহেবকে স্পষ্ট জানাইবেন, কাগজের গুরুতর অনিষ্ট না করিয়া পলিসি বদলান যাইবে না—এমন কি সুরও নরম করা যাইবে না। তারপর আমার জিজ্ঞাস্য—কবীর সাহেবের ব্যথা কোথায়? আমেরিকা, কংগ্রেস, না গভর্নমেণ্ট, না ইন্দিরা গান্ধী? কংগ্রেস ও

কংগ্রেসের নেতাদের গালি না দিয়া, শুধু জনসংঘ বা কমিউনিস্টদের গাল দিলে কেহই আমাদের সাহস বা সততা আছে বলিবে না। আজ সর্বোপরি গাল দেওয়া দরকার বর্তমান গভর্নমেন্টকে। সমস্ত নষ্টের মূল উহারা। আর গাল যদি দিতেই হয়, তাহা হইলে মিন্‌মিন করিয়া কাজ হয় না—দুকূল যায়।'[১০২] ক্রমে সমর সেনের সঙ্গে হুমায়ুন কবীরের মতানৈক্য বেড়েই চলে। উদ্বিগ্ন সমর সেন পুনরায় মস্কোয় চাকরি নিয়ে চলে যাবেন কিনা তাও চিন্তা ভাবনা শুরু করেন। একথা নীরদ চৌধুরীকেও জানাতে ভোলেন না তিনি। ৩.৬.৬৬ তারিখে লেখা এক চিঠিতে নীরদ চৌধুরী উপদেশ পাঠিয়ে জানান : 'কবীর সাহেবের বুকে বল বেশী হইয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। আশা করি বাড়িয়া চলিবে। .... আজ চিঠি লিখিবার বিশেষ উদ্দেশ্য আপনাকে একটু উপদেশ দেওয়া। মস্কোর কাজের Offer সহজে ছাড়িবেন না। সবদিক বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিবেন। অবশ্য Now -কে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে বিশেষ একটা কৃতিত্বের ব্যাপার হইবে। আজ পর্যন্ত কোন ইংরেজী সাপ্তাহিক কেহ ভারতবর্ষে চালাইতে পাবে নাই। .... কিন্তু Now প্রতিষ্ঠিত হইবার পথে বাধাও আছে—একদিকে রাজনৈতিক বাধা, সেটা গুরুতর বাধা নয়; আর একটা—আর্থিক ও ব্যবস্থাগত বাধা। দ্বিতীয়ের সম্ভাবনা খুব বেশী। আপনি মুখে রক্ত তুলিয়া কাগজের সম্পাদকীয় দিকের উন্নতি করিলেন, আর ব্যবস্থার দোষে উহার কিছু হইল না, ইহার অপেক্ষা দুঃখের বিষয় কিছু হইতে পারে না। ব্যক্তিগত শান্তি চাহিলে আপনার মস্কো যাওয়াই উচিত। কিন্তু ব্যক্তিগত শান্তির কথা না ভাবিয়া যদি দেশের কথা ভাবেন, তবে থাকা উচিত।'[১০৩]

১৯৬৬-র সেপ্টেম্বর মাসে দু-দিনের পশ্চিমবঙ্গ বন্ধ পালিত হয়। পুলিশি বন্দোবস্ত আর সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টার অভাব ছিল না সরকারের। মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের বেতার ভাষণ নিয়ে 'নাউ' লিখেছিল। বামপন্থী সংগঠিত প্রতিবাদের দিকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে 'নাউ' জানিয়েছিল যে, পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপক গ্রামাঞ্চলে তলার দিকে সংগঠন তৈরী করতে বামপন্থীরা এখনো পর্যন্ত সক্ষম হয়নি। ১৯৬৭-র জানুয়ারীতে বাড়িতে পড়ে গিয়ে হাতে চোট পান সমর সেন। এ সময় পুনরায় হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে তাঁর 'নাউ' এ সম্পাদকীয় ছাপা নিয়ে মতানৈক্য হয়। কবীর সাহেব বাংলা কংগ্রেসের সমর্থনে দুটি সম্পাদকীয় ছাপতে আদেশ করেন; যে বিষয়ে আগেই সমর সেন অন্যের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন। অবশেষে কবীরের পরিচিত জনের সম্পাদকীয় ছাপা হয়নি। কিন্তু ভিতরে ভিতরে মত পার্থক্য বেড়েই চলে।' ৬৭-র নির্বাচনে 'নাউ' স্বভাবতই বামপন্থী ঐক্যের পক্ষে ছিল—যদিও সঙ্গে সঙ্গে ঐক্যের পথের বাধা বিপত্তি গুলো সম্পর্কেও 'নাউ' অবহিত ছিল।

১৯৬৭-তে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হলে তার প্রতি শুভেচ্ছা জানায় 'নাউ'। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব নিয়ে সতর্কও করে দেয় নতুন সরকারের নেতাদের। দু-তিন মাসের মধ্যেই অবস্থা খারাপের দিকে এগোয়। মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা যায় নি। জুন মাসে 'নাউ' লেখে যে, এ এক বিরক্তিকর দুর্বলতা। জনগণের এগিয়ে

যাওয়ার প্রচেষ্টায় রাশ টানা হচ্ছে। এ সময়েই শুরু হয় 'নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলন'। ১৪ই জুলাই ১৯৬৭, সম্পাদকীয়তে লেখা হয়—চীনারা সমর্থন জানিয়েছে বলেই নকশাল-বাড়ির আন্দোলনকে অস্বীকার করতে হবে, নতুন সরকারের সবাই নিশ্চয় এমন ভাবেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নকশাল আন্দোলনের ব্যাপারে সমর সেন তথা, 'নাউ' যেমন শুভাকাঙ্খীর ভূমিকা গ্রহণ করে—তেমনি কম্যুনিস্টদের ব্যাপারে মোহ ভঙ্গ হলেও অন্যায় ভাবে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করার ব্যাপারে 'নাউ' তীব্র ভাষায় সম্পাদকীয় লিখে ঘোরতর বিরোধিতা করে। এ সম্পর্কিত রচনা প্রকাশেও কবীর সাহেব ও সমর সেনের সংঘাত বেড়ে ওঠে। ১৯৬৭-র ৫ই এবং ১৯শে অক্টোবর, দুটি আলাদা আলাদা পত্রে রাষ্ট্রপতিকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক অস্থিরতায় হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ জানান কবীর সাহেব। এ বিষয়ে সমর বাবু প্রকাশ্যে কবীর সাহেবের বিরোধিতা করেন 'নাউ'-এ। ফল স্বরূপ কবীর সাহেব 'নাউ'-র সম্পাদকীয় সমালোচনা করে কয়েকটি পত্র লেখেন সম্পাদককে—যার একটিও 'নাউ'-এ প্রকাশিত হয় নি। এ প্রসঙ্গে মোহমুক্ত, স্পষ্টবাক বুদ্ধিজীবী সমর সেন দ্বিধাহীনতার সঙ্গে মন্তব্য করেন : 'প্রথম যুক্তফ্রণ্ট গঠনের পর 'নাউ' ছিল সি.পি.এম.-এর সমর্থক। বেশিদিন নয়, অন্তত ব্যক্তিগত ভাবে নয়। নকশাল-বাড়িতে নারী ও শিশু হত্যার পর সি.পি.এম.-এর ক্ষীণ কণ্ঠ প্রতিবাদ, বিক্ষুব্ধদের বিতাড়ন ও যেন তেন প্রকারেণ সরকারে টিকে থাকার 'রণকৌশল' আমাকে মোহমুক্ত করে। রাষ্ট্রপতির শাসন যে ভাবে চাপানো হয় তাতে সাময়িক ভাবে সি.পি.এম.-কে সমর্থন করা হয়। প্রথম যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পতনের পিছনে কবীরের হাত ছিল অনেকটা।'[১০৪] সমর সেন জনগণের রায়ে নির্বাচিত সরকারকে ভেঙে ফেলার জঘন্য চক্রান্ত, সদ্য গড়া হুমায়ুনের 'লোকদল'-এর অদ্ভুত তত্ত্ব এবং মার্কসবাদ ও বামপন্থী দল সম্পর্কে অযৌক্তিক মন্তব্যগুলিকে কোনো ভাবেই সমর্থন করা দূরে থাক—মানতেও পারেন নি। ততদিনে তিনি বামপন্থী দল সম্বন্ধে মোহমুক্ত হয়েছেন, দ্বিধার জায়গায় জড়ো হচ্ছে তাঁর সংশয় ও বিরুদ্ধাচারণ। নকশালপন্থীদের সমর্থক হয়ে যাচ্ছেন তিনি তখন। জের মেটেনি খাদ্য আন্দোলনের, ১৯৬৬তে যার শুরু। এমনি সময়ে হুমায়ুন কবীরের নির্দেশ আসে 'নাউ'-র পাতায় মার্কসবাদ চর্চা চলবে না। প্রথমে কবীর সাহেব, পত্রিকার অন্য আরেক স্বত্বাধিকারী, এম.আর. শর্বানীর মাধ্যমে চিঠি লেখেন। পরে ১৪-১২-৬৭ তারিখে তিনি এক পত্রে সমর সেনকে জানান : 'We regret to inform you that your services with this Trust as Editor of 'Now' are no longer required and are hereby terminated with immediate effect।'[১০৫] অতএব সমর সেনের চাকরি গেল। ১৯৬৮র ১২ই জানুয়ারী সংখ্যায় তিনি ঘোষণা করেন—'I wish to inform all readers that with this issue I cease to be editor of 'Now'। এর অব্যবহিত পরেই তিনি 'নাউ' থেকে সরে আসেন। সংসার নির্বাহ সংকটের চরমে পৌঁছাবে জেনেও স্বাধীন মত প্রকাশে বিশ্বাসী, তিনি এ সিদ্ধান্ত নেন।

'নাউ' পত্রিকা থেকে বিতাড়নের দু'সপ্তাহ পর থেকেই সমর সেন নতুন পত্রিকার

প্রস্তুতি শুরু করেন। মস্কো যাবার প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। ক্রমাগত চেষ্টার ফলে, ১৯৬৮-র ১৪ই এপ্রিল তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা, 'Frontier' প্রকাশিত হয়। এটিও ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা। এই নতুন পত্রিকার মালিকানা ছিল সমর সেন এবং তাঁর কয়েকজন আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধবদের হাতে। মালিকের রক্ত চক্ষু প্রদর্শনের আশঙ্কা এভাবে দূর হলেও পত্রিকার সমস্ত আর্থিক সমস্যা তাঁদের ঘাড়েই চেপে বসে। পত্রিকাটি বেরোবার মুখে ন'হাজার টাকা ওঠে। এ টাকা সমর সেন তাঁর নিজের ভাই বোন এবং বন্ধু বান্ধবদের কাছে তোলেন। তাঁদের পরিকল্পনা ছিল ৬০,০০০ টাকার। ভেবেছিলেন শুভানুধ্যায়ীদের সাহায্যে এটা তোলা সম্ভব হবে। কিন্তু এটা তোলার সময় দেখা গেল এটা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই প্রথম থেকেই পত্রিকাটি আর্থিক অনটনে পড়ে। এবং পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে সমর বাবুর মাইনে 'নাউ'-র তুলনায় প্রায় অর্ধেক হয়ে দাঁড়ায়। 'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা পড়ে নীরদ চন্দ্র চৌধুরী ১৬-৪-৬৮ তারিখের এক পত্রে, তাঁকে পত্রিকা এবং পত্রিকা প্রকাশ সম্পর্কে জানিয়েছেন—'সমর বাবু, আপনার নূতন কাগজের প্রথম সংখ্যা আজ সকালে পাইলাম। অবশ্য ইহা বাহির হইবে আগেই শুনিয়াছিলাম। কাগজটা কি রকম হইয়াছে তাহার কথা ছাড়িয়া দিয়া উহা বাহির করা সম্বন্ধে মূলগত একটা আপত্তি তুলিব। এই বয়সে আপনি নিজের লেখা লিখিয়া নিজের কাজ এবং তাহার সহিত নিজের জীবিকা অর্জন না করিয়া কেবল হুজুগের দিকে যাইতেছেন কেন? ইহাতে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতা ও চিত্ত বিক্ষোভ ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। আসল কথা কি, এটাও একটা নেশা। ইহা ছাড়া কি আপনার আর কিছু করা সম্ভবই নয়? কাগজটা Now এর মতোই হইয়াছে। উহাতে D Chakraborti নামে ভদ্রলোকের চিঠিটা ভালো লাগিল। কিন্তু সত্যকার নূতন ধরনের কাগজ বাহির করিবার জন্য যে অর্থবল ও লোকবল দরকার তা আপনি কখনো জোগাড় করিতে পারিবেন না, জানেন। বিদেশ যাওয়ার প্রস্তাবটা ব্যর্থ হইয়াছে শুনিলাম, কিন্তু বিদেশের অপেক্ষা না রাখিয়া দেশে থাকিয়াই কি কিছু করিতে পারেন না?'[১০৩] আসলে সমর বাবু নিজেই আপসহীনতার নমুনা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন; যেজন্যে তিনি কবি হয়েও কবিতা লেখা থামিয়ে দেন সত্য—কিন্তু প্রতিষ্ঠান-বিরোধী পত্রিকা-পরিচালনায় বিরত হন না। তাঁর মধ্যে যে একটা সংগ্রামী মনোভাব গড়ে উঠেছিল—যেটি প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে খুবই কম, তা নীরদচন্দ্র লক্ষ্য করতে পারেন নি।

'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকার শুরু প্রথমে 'দর্পণ'পত্রিকার দেড়খানা ঘর নিয়ে। লেখক হিসেবে পুরোনো লেখক গোষ্ঠী দল বেঁধে নতুন পত্রিকায় চলে আসেন। ব্যবস্থাপনার কাজে চলে আসেন জন বেবী ও গুলাম রশুল। সাহায্য করেন তরুণ চট্টোপাধ্যায়, রবি সোম, নৃপেন সান্যাল প্রমুখ। দেশীয় লেখকদের পাশাপাশি বিদেশী লেখকদের মধ্যে রথ গ্লাস (Roth Glass), তারিক আলি (Tariq Ali), নেভিল ম্যাক্সওয়েল (Neville Maxwell), জন মিরডাল (John Mirdahl), লরেন্স লিভশুলটজ্ (Lawrence Livesultz), উল্লেখ্য। এখানে রাজনৈতিক লেখার পাশাপাশি শিল্প সাহিত্যের বিচিত্র শাখার ছোট ছোট, অথচ

মূল্যবান আলোচনা ছাপানো হ'ত। ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীত থেকে শুরু করে গণ সঙ্গীত, চিত্রকলা, ফিল্ম-থিয়েটার এমন কি কবিতা পর্যন্ত। এখানের বিভিন্ন বিষয়ের লেখা-গুলির মধ্যে—সোভিয়েত-রাশিয়ার অর্থনীতি, মার্ক্স, লেনিন, প্যারী কমিউন নিয়ে পরেশ চট্টোপাধ্যায়ের আলোচনা, চীনের অর্থনীতি আর রাজনীতি নিয়ে জ্যাক্ গ্রে-র ধারাবাহিক আলোচনা বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। আরো অনেকে লিখেছেন—কখনো স্বনামে, কখনো বেনামে বা ছদ্মনামে। মল্লিকার্জ্জুন রাও, প্রভাত জানা, মণি গুহ, অরুণ মজুমদার, সুমন্ত ব্যানার্জী, ভবানী চৌধুরী, রফিকুল ইসলাম প্রমুখ। সামন্ততন্ত্রের উপর গুরুত্বপূর্ণ লেখাটি লিখেছিলেন অমিত ভাদুড়ী। নিপীড়ন ও সংস্কৃতি এবং নীলদর্পণের উপর লিখেছিলেন রণজিৎ গুহ। অমিয় বাগচী, নির্মলচন্দ্র, বিনয় ঘোষ, সত্যজিৎ রায়, সন্দীপ সরকার প্রমুখ নানান ধরনের লোক এই কাগজে নানান বিষয়ে লিখেছেন। 'ফ্রন্টিয়ার'-এ রাজনৈতিক বিতর্কের পরিসর যে কত ব্যাপ্ত ছিল, তা 'Naxalbari and After : Frontier Anthology' গ্রন্থের ২য় খণ্ড দেখলে বোঝা যায়।

'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকার জন্মের একবছর আগেই জন্ম হয়েছে নক্‌শালবাড়ি কৃষক আন্দোলনের। যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে এক নতুন গণজাগরণের। প্রথম দিকে প্রায় একবছর এ কাগজের বামপন্থী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বজায় ছিল সাধারণ অর্থে। পরে ক্রমশ র‍্যাডিক্যাল বামপন্থী চরিত্র প্রকাশ করতে থাকে এ কাগজটি। 'বাবু বৃত্তান্ত' গ্রন্থে সমর সেন একদা উল্লেখ করেছেন যে, যুদ্ধে যেমন সোভিয়েত জয়ের জন্য তাঁর আকুল আকুতি, সাগ্রহ প্রতীক্ষা ছিল তেমনি ষাট ও সত্তর দশকে তিনি বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন নক্‌শাল-বাড়ি আন্দোলন ও ভিয়েতনামের বিপ্লবীদের সাফল্যের সাক্ষী হবার জন্য। এই নকশালবাড়ি আন্দোলনের উপর সমর সেন কোনো বই লেখেন নি। কোথাও কোনো বিস্তৃত আলোচনা করেন নি তিনি। কিন্তু 'Naxalbari After : A Frontier Anthology' নামক সংকলনের ভূমিকায় এই আন্দোলনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ফলাফল গুলো তাঁর দৃষ্টিতে যেভাবে ধৃত, তা অবশ্য উল্লেখ্য। 'Naxalbari exploded many a myth and restored faith in the courage and character of the revolutionary left in India. It seemed the ever-yawining gap between percept and practice since Telengana would be bridged. Indeed, the up heaval was such that nothing remained the same after Naxalbari. People had to read just their position vis-a-vis every aspect of the system . political, administrative, military, cultural.'[১০৭]—এই মুহূর্তটিকে ধরে রাখার দায়িত্ব নিয়েছিল 'ফ্রন্টিয়ার'। আর এই কাগজের সম্পাদক নিয়েছিলেন এক আশ্চর্যজনক ভূমিকা। কাগজটি হয়ে উঠেছিল আস্তে আস্তে মার খাওয়া, উচ্ছেদ হওয়া ব্রাত্যদের কণ্ঠস্বর মাধ্যম। যাদের কোথাও দাঁড়াবার জায়গা নেই, যাদের কথা কেউ বলবে না—তাদের কথা বলার, আলোচনা করার জায়গা করে দিতে চেয়েছিলেন সমর বাবু তাঁর কাগজে। ১৯৬৮-তে 'এক্ষণ' পত্রিকার 'কার্লমার্কস্ সংখ্যায়' মার্কসের চারটি কবিতা অনুবাদ করে 'কার্লমার্কসের কবিতা' নামে প্রকাশ করেছিলেন সমর সেন।

১৯৬৯-র ১৪ই মার্চ যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে কলেজ স্ট্রীটে নকশাল বিরোধী আন্দোলন শুরু হলে 'ফ্রন্টিয়ারই' তার নিজস্ব ভাষায় ফ্রন্টসরকারের নিন্দা করে। ১৯৭০-এ বরানগরে নকশাল নিধন তুঙ্গে উঠলে, পরবর্তীকালে পত্রিকার সম্পাদকীয়তে 'SHADES IN INDONESIA' শিরোনামে প্রতিবাদ গর্জে ওঠে।' ৭০-র ১০ই এপ্রিল 'ফ্রন্টিয়ারে' Sanjay ছদ্মনামে সমর বাবু বিষ্ণু দের উপরে একটি প্রবন্ধ লেখেন 'Frankly Speak-ing' বিভাগে। যেখানে নিজের কবি জীবন সম্পর্কেও তিনি সামান্য আলোকপাত করেছেন—.....the trouble is I have been out of touch with poetry for the last 24 years. Alas! it no longer rings bell in me . When I am forced to look up some of my own stuff. weariness and boredom over take me.'[১০৮] প্রীতিশ নন্দীর অনুবাদ ও ভূমিকাসহ 'The Complete Poems. Samar Sen' নামে Writers' Workshop থেকে এবছরেই প্রকাশিত হয় সমর বাবুর কবিতার ইংরেজী অনুবাদ গ্রন্থ।

১৯৭১-এ 'ফ্রন্টিয়ারে'র আর্থিক দুর্দশা চরমে ওঠে। বিজ্ঞাপন অপ্রতুল চিরকালই ছিল, তখন নামে মাত্র পর্যবসিত। পরিস্থিতির সামাল দিতে সমরবাবু নিজের মাসোহারার হার কমিয়েছেন। পশ্চিম ভারতের একটি নামী দৈনিক থেকে তাঁকে এই সময়ে নিয়মিত লেখার জন্য বলে। টাকার অঙ্ক লোভনীয়। তিনি এ প্রস্তাব নাকচ করে দেন। ১৯৭২-এ বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের পরাজয়ের পর সংসদীয় রাজনীতিতে ভ্রষ্টাচারের কথা সাধারণের কাছে তুলে ধরেছিলেন তিনি 'ফ্রন্টিয়ারে'র মাধ্যমে। আবার নকশালদের দলীয় সাংগঠনিক নেতৃত্বের আওতায় রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে আঁটো সাঁটো কোনো নির্দেশিত পথের সম্ভাব্য আয়োজনে সায় দেবার মানসিকতা তাঁর কোনো কালেই ছিল না। তাই তাঁর বিখ্যাত সম্পাদকীয়তে সমস্ত সহানুভূতি নিয়েও সি. পি. আই. (এম.এল.)-র দলীয় মুখপত্রের লেখাগুলিকে কটাক্ষ করতে ছাড়েন না। তাদের আবেগ প্রবল সম্পাদকীয়তে যে আত্মত্যাগের কথা আর খতমের কথা বলা হচ্ছিল, তাকে তিনি 'আনন্দমঠে'র সন্তান বাহিনীর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। ফলে অচিরেই সমর বাবু তথা 'ফ্রন্টিয়ার' নকশালদের বিরাগভাজন হন। নকশালদের মুখপত্র 'দেশব্রতী' পত্রিকায় সরোজ দত্ত প্রত্যুত্তরে লেখেন যে শাসক শ্রেণীর তিন ফ্রন্ট—'ফ্রন্টিয়ার', 'ইষ্টার্ন রাইফেল্‌স্' ও 'ফ্রন্টিয়ার গান্ধী'।

১৯৭২-এ 'ফ্রন্টিয়ারে' প্রকাশিত প্রবন্ধের বাংলা সংকলন 'সীমানা' প্রথম সংখ্যার সম্পাদনা করেন সমর সেন। তাঁর অগস্টমাসে লেখা 'চন্দ্রবিন্দু বাদে' প্রবন্ধটি 'বুদ্ধিজীবী ও নানা প্রশ্ন' সংকলনে সংকলিত হয়। সেখানে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের কটাক্ষ করেছেন এই বলে—'মূল্যবোধে একটা আলোড়ন এসেছে, অনেকটা অর্বাচীনভাবে সে আলোড়ন আনা হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের জন্য যখন অনেকে প্রাণ দিয়েছে এবং দেবে—তখন পুরোনো ব্যবস্থা অনেকে অনেক বেশী করে আঁকড়ে ধরেছেন। তাই বর্ধমানের সাঁই ভ্রাতাদের জন্য এতো বিলাপ, অথচ মেলে ও রাস্তায় অসংখ্য লোকের হত্যার ব্যাপারে বেশীর ভাগ বুদ্ধিজীবী প্রভু বুদ্ধের মতো নির্বিকার।'[১০৯] ১৯৭২-র অক্টোবরে 'এক্ষণ' পত্রিকায় প্রকাশ করেন 'বন্দেমাতরম্' প্রবন্ধ। এটির রচনাকাল সেপ্টেম্বর মাস।

১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রেল ধর্মঘটের দমনের নৃশংসতাকে 'ফ্রন্টিয়ার'-র পাতায় সমর বাবুই সাধারণ্যে প্রকাশ করেছিলেন। যে কোনো বুদ্ধিজীবীর কাছেই যেটি দুঃসাহসের ব্যাপার। এ বছরে মারা যান তাঁর দাদা-অসীম পরহিতকারী যে দাদার বাড়িতে প্রতি রবিবার আড্ডা হত। আর ঠিক পঁচিশ দিন বাদে তাঁর পিতা, অরুণ চন্দ্রের দেহাবসান ঘটে। এ সময়ে কোলকাতায় উৎপল দত্ত প্রযোজিত 'দুঃস্বপ্নের নগরী' আক্রান্ত হয়। এই আক্রমণের প্রতিবাদে শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক কর্মী এবং বুদ্ধিজীবীদের এক সভা হয় রবীন্দ্র সদনে ২৬ শে অগস্ট। সমর বাবুও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। আক্রমণকারীকে সরাসরি চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হওয়ায় এই সভা সমর বাবুর কাছে মনে হয়েছিল নিরর্থক। এ সম্পর্কে তিমির বসু জানিয়েছেন—সভা সম্পর্কে সমরবাবুর মন্তব্য নতুন কোন মন্তব্যের অপেক্ষা রাখে না : 'উৎপল (ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু উৎপল দত্ত নিজেই) বলতে উঠে এমনভাবে বলতে শুরু করল যে পুরো আবহাওয়াটাই নষ্ট হয়ে পেল। উৎপল ভারিক্কীচালে বলে চলল—এই কংগ্রেস, সেই কংগ্রেস নয়, জাতীয় আন্দোলনের কংগ্রেস, ঐতিহ্যবাহী কংগ্রেস, অমুকের কংগ্রেস তমুকের কংগ্রেস এ জঘন্য কাজ করতে পারে আমি বিশ্বাস করিনা।....শুনে আমার পিত্তি জ্বলে গেল। রাগে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম, ভাবলাম মাইক ধরে বলি তাহলে এ তামাশা করবার দরকার কী ছিল। কিন্তু আমি বলতে পারিনা, তাই রাগে চেপে বসে পড়লাম।.....মৃণাল (মৃণাল সেন) ডায়াসে ছিল। সভার পর ওকে জিজ্ঞেস করলাম উৎপল ও রকম বলল কেন? মৃণাল কিছুটা চিন্তিতভাবে বলল—উৎপল বলেছিল নাকি? মোটকথা সমর বাবুর ভালোলাগেনি আক্রান্ত হয়েও আক্রমণকারীকে এভাবে তোয়াজ কবার চেষ্টা। এই ঘটনার পর সমর বাবু বুদ্ধিজীবীদের জলসায় যেতেন না বললেই চলে, এড়িয়ে যেতেন শারীরিক অসুস্থতার দোহাই দিয়ে।'[১১০] এ বছরে সাপ্তাহিক 'Sunday' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় সমর সেনের 'Politics of Alcohol' ও অন্যান্য প্রবন্ধ।

১৯৭৫-র জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে—গুজরাটে কংগ্রেসের চরম পরাজয় বটে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় প্রকাশিত হল। তারপরই আভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হল। এ ঘটনায় সমর সেন অবাক হয়েছিলেন। নতুন করে জরুরী অবস্থা জারি করার কী এমন দরকার ছিল? জরুরী অবস্থা তো চলছেই ১৯৭১ থেকে। এসব সত্ত্বেও সমর বাবু সুকৌশলে পাঠকের মনে আধা-ফ্যাসিস্ত পরিস্থিতির কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। এমারজেন্সির সময় পুরোনো লেখক গোষ্ঠীর সঙ্গে 'ফ্রন্টিয়ারে'র যোগাযোগ ছিন্ন হয়, তার প্রধান কারণ দেশের বিষয়ে খোলখুলি ভাবে লেখার উপায় ছিল না। জরুরী অবস্থার কারণে 'ফ্রন্টিয়ারে'র প্রেস ১৯৭৬-র এপ্রিল-মে মাসে বন্ধ হয়ে যায়। এসময়ে কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি। ঠিক তখনই সমরবাবু ঋত্বিক ঘটকের কয়েকটি ছবি দেখেন। এপ্রিল মাসে ১৩ তারিখে লেখেন 'ট্রাম থেকে থানায়' নামক স্মৃতি চারণ। আর 'প্রস্তুতিপর্ব' নামের অক্টোবরে লেখা প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় 'প্রস্তুতিপর্ব' পত্রিকায়। মার্কসবাদী 'তাত্ত্বিকনেতারা সাধারণ জনগণকে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের সংস্পর্শ ও প্রভাব থেকে দূরে

থাকবার পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ দেশের সংকট মুহূর্তে কিম্বা বিপ্লবের প্রস্তুতিপর্বে তাদের ভূমিকা সম্বন্ধে প্রায়শ ক্ষেত্রে সংশয়ের অবকাশ আছে। সত্তর দশকের অন্তর্বর্তী সময়ে ভারতবর্ষে জরুরী অবস্থায় বুদ্ধিজিবীদের ভূমিকা সম্বন্ধে মেহনতী মানুষেরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন নগরকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীরা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সর্বাত্মক অংশীদার হতে পারে না। সমর সেনের ক্ষোভ : 'বুদ্ধিজীবীদের গ্রামাঞ্চলে গিয়ে কাজ করা উচিত তবে সেটা এখন পর্যন্ত স্বপ্ন বিলাস।' একথা বলেছেন ১৯৭৭-র মে মাসে লেখা, 'জরুরী অবস্থায় বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা' প্রবন্ধে। এটি পরে অক্টোবর মাসে 'আগামীকাল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৯৭৭-র অক্টোবরে লেখা, 'শত্রুমিত্র' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় 'দর্পণ' পত্রিকায়। দেশের শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ জেলবন্দী হয়—এটা গর্বের না ভয়ের সে সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন সমর বাবু এখানে। বস্তুত, জেলে বা জেলের বাইরে যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড ঠাণ্ডা মাথায় হয়, তাতে ভীতির অবকাশ রয়েছে। শাসকশ্রেণীর মধ্যে, এমন কি পার্টিগুলোর মধ্যেও শত্রুমিত্র চেনবার ক্ষমতা কম। শরিকী সংঘর্ষে শ্রেণী শত্রু নির্বাচন দুঃখবহ। এ বছরের মার্চে লেখা, 'নির্বাচন মার্চ ১৯৭৭'-এ কাকে ভোট দেব?—এই কূট প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। প্রবন্ধটি 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আরেকটি প্রবন্ধ 'দেখা ছবি' (এটিও ১৯৭৭র রচনা)-তে অদেখা কথার সম্পর্ক নিবিড়তায় টেনে আনে। 'পথের পাঁচালী'কে উপলক্ষ করে উৎকেন্দ্রিক ঋত্বিক ঘটকের জীবনের উত্তরণ, সার্থকতা যে তাঁর চলচ্চিত্রের নির্মাণে—সেকথা ব্যক্ত করেছেন এখানে। 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় 'উড়ো খৈ' নামের সাতটি প্রবন্ধ এবছরের ৩রা ও ২৪শে অগস্ট, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯শে অক্টোবর, ৪ঠা ও ৩০শে নভেম্বর এবং ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতার পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তান, পরে বাংলা দেশের ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের নিয়ে সমর সেন সমস্যার গভীরে আলোকপাত করেছেন 'উড়ো খৈ : ১'-এ। ভারতবর্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া তিনি বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে দেখিয়েছেন। তিনি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত, স্বভাবতই কংগ্রেসের উপর তাঁর কোনো কালে আস্থা ছিল না। সি.পি. আই-র প্রতি তিনি ক্ষিপ্ত ছিলেন। আবার সি.পি.আই.এম.-র প্রতিও আগামী দিনের জন্য ভরসা বিশ্বাস রাখতে পারেন নি তিনি। কেননা পার্টির নেতারাই বলেছেন যে, এদেশে কেন্দ্রই সর্বেসর্বা; সব ব্যাপারে দিল্লী চলো নীতি গ্রহণ না করে উপায় নেই। এই বিশাল দেশে আমূল পরিবর্তন কবে এবং কিভাবে হবে তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে ('উড়ো খৈঃ ২')। দেশের আমূল পরিবর্তনে বিশ্বাসী এই মানুষটি জীবনের একটা বিশেষ পর্বে সাময়িকভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়লেও শেষ জীবনে হতাশা কাটিয়ে উঠেছিলেন কিছুটা (উড়ো খৈ : ৩')। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে বিরাট ফাঁক, তা বিপুল পুস্তকাদির মাধ্যমে পূর্ণ করা যাবে না। সব কিছুতেই গুবলেট। এমনকি সাহিত্য চর্চাতেও। সাহিত্যের আড্ডায় তিনি বিশশতকের তাঁর বন্ধু ও বন্ধুস্থানীয় তাবড় তাবড় কবি-সাহিত্যিক-সমালোচক-ঐতিহাসিকদের উল্লেখ করেছেন

'উড়ো খৈ : ৪'-এ। নগর সভ্যতার প্রভাব দ্রুত গ্রামগুলিকে আক্রান্ত করছে। গ্রামের সামাজিক রীতিনীতি আচার-আচরণের বদল হচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সমাধানে ব্যর্থ নেতারা একটার পর একটা হুজুগে দেশের জনসাধারণকে পরিচালিত করছেন। এই হুজুগেই কবিতা পড়ার ধূম, টি.ভি, ভিডিও, সিনেমার বাড়্‌বাড়ন্ত। সমাজের বিকাশের সঙ্গে তার উপরি কাঠামোর সামঞ্জস্য নেই, মানুষের চৈতন্যলোকে বাস্তব সামাজিক কোনো ইডিওলজি নেই। 'ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কী ফল পাবে?'—এ উক্তি উচ্চারিত হয়েছে 'উড়ো খৈ : ৫' প্রবন্ধে। জঙ্গী যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনী চিন্তাধারাকে দেশের নেতারা জনসাধারণের ওপর 'ধর্মযুদ্ধ' বলে চাপিয়ে দেয়। বিপ্লবের জন্য যুদ্ধ নয়, যুদ্ধ দিয়েই বিপ্লবকে ঠেকানো হয়। আমাদের 'জাতীয় যুদ্ধ গুলি'র চরিত্র অস্পষ্ট। ১৯৭১-এ ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের ব্যাপারে ফিলড্‌মার্শাল মানেকশ'র অনীহার কথা জানিয়েছেন সমর সেন। সেই সঙ্গে গণ আন্দোলনে আমাদের দেশের কবি-সাহিত্যিকদের ভূমিকা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁদের স্বধর্মচ্যুত করেছে সমর বাবুর মতে ('উড়ো খৈ : ৬')। আমাদের ঘরে-বাইরে লোডশেডিং। যেটুকু আলোয় আমরা নিজেদের 'আলোক প্রাপ্ত জীব' বলে দাবী করি, সেই আলোও 'আলোর কুহেলিকা' মাত্র। আমরা সময়ানুপাতিক ভোল-বদলানো পণ্ডিত, সাহিত্যিক, শিল্পী, রাজনীতিবিদ অর্থাৎ এই দেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী। আমরা পরস্পর পরস্পরের কাছে চিনেও অচেনা থাকার ভাণ করি, কিন্তু আমাদের আসল চেহারা সাধারণ জনগণ কালক্রমে কিম্বা কোনো কালেই ভুলে যাবে না ('উড়ো খৈ : ৭')।

১৯৭৭ সনে সমর সেনের মেজ দাদা সেরিব্রাল স্ট্রোকে গত হন। 'ফ্রন্টিয়ারে' সমর সেন সহকারী হিসেবে পান সদ্য জেল ফেরৎ ভবানী চৌধুরীকে এ বছরেই। ১৯৭৭-র নির্বাচন হেতু, তথাকথিত 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা' লাভে উল্লসিত বোধ করার কোনো কারণ খুঁজে পান না তিনি। কারণ পশ্চিমবঙ্গে গঠিত হয় সি পি এম নেতৃত্বাধীন 'বামফ্রন্ট সরকার' যেমন, তেমনি কেন্দ্রে স্থাপিত হয় 'জনতা সরকার'।

১৯৭৮ থেকে জনতা সরকারের আমলে, উত্তর প্রদেশে কানপুর, বাইলাডিলা ইত্যাদি স্থানে শ্রমিক-কৃষক হত্যার ঘটনা ঘটে। শুরু হয় শাহ কমিশনের প্রহসন। জনতা পার্টির অভ্যন্তরে দেখা দেয় নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি। এ সমস্ত বিষয়েও সমর সেন অবহিত ছিলেন। আবার ১৯৭৮-এ সমাজ গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সব ধরনের নকশালদের অবস্থান কার্যত আগের মতোই ছিল। তবু এসময়ে কংগ্রেসে সি.পি.এম দল গণলাইন অনুসরণকারী নকশালপন্থীদের যৌথ কার্যক্রমে আগ্রহ দেখিয়েছিল। ততদিনে জনতা পার্টির সঙ্গে বাম দলগুলির নাগরিক স্বাধীনতার প্রশ্নে ঐক্য অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে পশ্চিমবঙ্গে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সি পি এম দলের প্রয়াত নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত পার্বতী পুরম্ রাজবন্দীদের মুক্তি নিয়ে আলোচনায় বসেন। গঠিত হয় পার্বতীপুরম রাজবন্দি মুক্তি কমিটি। নিঃসন্দেহে বাম দলগুলিকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে কম্যুনিস্ট বিপ্লবীদের যৌথ কাজকর্মের সেটাই প্রথম পদক্ষেপ। বন্দীমুক্তিদের জন্য আবেদন পত্রে সমর বাবু

স্বতস্ফূর্তভাবে স্বাক্ষর করেন, একজন বুদ্ধিজীবী হিসেবে। কিন্তু সম্মেলনে কোনো কারণ না দেখিয়েই তিনি অনুপস্থিত থাকেন। তাঁর এই অনুপস্থিতির কারণ অনুমান করে অসীম চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন : 'এক, মিতভাষী সমরবাবুর অন্তর্লীন রোম্যান্টিকতা। কবিতায় সমরবাবু যতই রোম্যান্টিকতার বিরুদ্ধে জেহাদ করুন, রাজনীতিবিচারে তিনি উষ্ণ আবেগকে শীতল যুক্তির ওপরে স্থান দিয়েছেন। চতুর্দিকে যখন সুবিধাবাদ আর বিশ্বাসহীনতার ঘনঘটা, তখন নকশালপন্থীদের বিপথগামী সাহস, লক্ষ্য ভ্রষ্ট আত্মত্যাগ ও অন্ধ একনিষ্ঠতা দিয়ে সমর বাবু পরিব্যাপ্ত সিনিসিজমকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন। দুই, বুদ্ধিজীবীর সীমাবদ্ধতা। অনুশীলনের দায়ভার মুক্ত বুদ্ধিজীবী হিসেবে সমর বাবু নীতির সমস্যা সমাধানকেই প্রয়োজনীয় ও যথেষ্ট বিবেচনা করেছেন; পদ্ধতির সমস্যার গভীরে যেতে চাননি, বরং পদ্ধতির সমস্যাকে নিজের ক্ষেত্রে বিবেচনা করেন নি—যেন নদী পার হতে হবে কিনা সেটাই তাঁর বিবেচ্য, কি করে পার হওয়া যাবে, সে প্রশ্ন বিবেচ্য প্রয়োগবিদ্‌দের। বলা প্রয়োজন, এই সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সমরবাবু নিজেও সচেতন ছিলেন।'[১১১] আসলে সমর সেন 'বামপন্থীয়' আনুগত্য প্রদর্শন করলেও নিজেকে কোনো ছকে না ফেলে, বিশেষ গণ্ডীর সীমাবদ্ধতায় না থেকে, বুদ্ধির সীমানায় দাঁড়িয়ে একলা প্রশ্নের আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। 'ফ্রন্টিয়ার' ছিল তার বাহন। আর পাঁচ জন সাধারণ মানুষের মতন হলে তিনিও হয়তো মার্কসবাদের নাম করে জাঁকিয়ে বসতেন। তিনি তা করেন নি। কারণ তিনি মনে প্রাণে জানতেন যে, পার্টির ভাবাদর্শ অনেক সময় বাঁদর নাচ নাচিয়েছে। এজন্য গণ আন্দোলনকে দায়ী করা চলে না ঠিকই, কিন্তু 'লাইন' বেঠিক হলে আন্দোলনে যোগ দিয়েও ব্যর্থতা আসে। তিনি আরো মন্তব্য করেছেন— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শক্তিমান লেখক পার্টির প্রভাবে কোন মহারচনা করতে পেরেছিলেন? তাঁর বিচ্ছিন্ন ডায়েরিতে একটা অবিশ্বাস্যের ভাব তো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিরিশের দশকের ও পরে কবিদের মধ্যে সহজ ও বলিষ্ঠ ভাষায় লেখেন সুভাষ, সুকান্ত, পার্টির সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ছিল। কিন্তু মাও থেকে মেয়াওতে সুভাষের উত্তরণ যুগান্তকারী কিছু একটা হয়নি এবং সুকান্ত বেঁচে থাকলে মস্কোমুখী সিপি আই-এর জালে আটকে পড়ার যথেষ্ট ভয় ছিল।'[১১২] —একথা যদি সৃজনশীল শিল্প-কর্মীদের সম্পর্কে সত্য হয়, তাহলে সমর সেনের (পার্বতীপুরম্ রাজবন্দী মুক্তি কমিটির সম্মেলনে অনুপস্থিতি) সম্পর্কে অসীম চট্টোপাধ্যায়ের উপরিউক্ত মন্তব্য আংশিক সত্য। এছাড়া শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্যকালে সমর বাবু সেই সম্পাদক—'The Editor does not claim to be a Marxist'। অথচ শ্রীচট্টোপাধ্যায় মনে করতেন যে, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সমর বাবু মার্ক্সবাদী ছিলেন। সমরবাবু মেজাজে ছিলেন মার্ক্সবাদী ঠিকই। কিন্তু জীবনাচরণে যথার্থ মার্ক্সবাদী ছিলেন না। এছাড়া আমাদের ধারণা, সমর সেন সেদিন সম্মেলনে যান নি তার কারণ 'চিন্তায় ও কর্মে সমন্বয় আনতে না পারলে বড় জোর 'বিপ্লবী' সাপ্তাহিক চালানো যায় কিন্তু 'বিপ্লবী' হওয়া যায় না'[১১৩] এই তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন।

১৯৭৮-এ প্রকাশিত হয় সমর সেন, দেবব্রত পাণ্ডা ও আশীষ লাহিড়ীর সম্পাদনায়

'Naxalbari and After : A Frontier Anthology' নামের দু-খণ্ডের সংকলন। আর এবছরেই প্রকাশিত হয় 'আশা প্রকাশনী' থেকে সমর বাবুর আত্মজীবনী মূলক গদ্যরচনা 'বাবু বৃত্তান্ত'। এ বছরের বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত 'ফ্রন্টিয়ারে' তিনি সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের আমলেব সরকারের বামপন্থী নিধন ও গণহত্যা, অন্ধ্রের রামারাও আজাইয়াব ও ভেঙ্গলরাওদের কম্যুনিস্ট বিপ্লবী নিধন ইত্যাদি ঘটনার সঙ্গে এক করে দেখেন—মরিচ -ঝাঁপিতে বামফ্রন্ট সরকার কর্তৃক উদ্বাস্তুদের উপরে নির্যাতনকে। একদা যে কবি শিল্প ও দায়বদ্ধতাকে কবিতায় মেলাতে চেয়েছিলেন জীবনের একটা বিশেষ পর্বে, কিন্তু মনে ভেবেছিলেন সে কাজ তিনি পারছেন না—সেই কবিই যখন 'শ্রেণীত্যাগে তবু কিছু আশা আছে বাঁচার'—ভেবে পত্রিকা সম্পাদনা করতে এসেছেন, তখন তিনি ছিন্ন ভিন্ন করেছেন আত্মতৃপ্ত ত্রিশঙ্কু-অস্তিত্বের আত্মরতির প্রতারণাকে অনায়াসে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে। কিন্তু এই পত্রিকা সম্পাদনা কালে তিনি পারিপার্শ্বিক সামাজিক-রাজনৈতিক বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখতে পান না। 'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকার দশবছর পূর্ণ উপলক্ষে তাই সমরবাবুর খেদোক্তির মন্তব্য : 'দশবছর কেটে গেছে। এখন প্রায়ই মনে হয়, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়েছি—ভারতীয় মোষ তাড়ানো অবশ্য কোনো পত্রিকার সাধ্যের বাইরে।'[১১৪]

১৯৭৯-তে 'ফ্রন্টিয়ারে'র সম্পাদকীয় লেখেন তিনি—চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড এবং পরে আফগানিস্তানে রাশিয়ার অনুপ্রবেশকে আগ্রাসন বলে চিহ্নিত করে। ৫ই জানুয়ারীর এই সংখ্যায় তিনি এও বলে সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, রুশ কাবুলিওয়ালাদের মদতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পুনরায় আগমন এবং এ দেশের রুশভক্তদের আমন্ত্রণে রুশীরাও এদেশে প্রবেশ করবে নাকি। রুশ পার্টি শোধনবাদী হলেও তার আফগানিস্তান নীতি বৈপ্লবিক—সি.পি.এমের এই বিশ্লেষণও সমালোচনা করেন তিনি। ১৯৭৯ তে জনতা সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়; পার্লামেন্টে আবার নতুন করে ভোট হবে। কিন্তু তার দ্বারা দেশের মধ্যকার দুর্নীতি, মুদ্রাস্ফীতি, প্রশাসনিক অপদার্থতা এসব তো আর ঘুচবে না। তখন জনগণের করণীয় কী? সমর বাবু জানিয়েছেন, খুব কঠিন কাজ। জনগণকে বোঝাতে হবে যে, নোংরা আস্তাকুঁড় তারা পরিস্কার করতে পারেন অন্য উপায়ে; যদি আজও না হয়ে থাকে এটা, তাহলে অদূর-ভবিষ্যতে হবে। আবার এবছরের ২০শে অক্টোবর সংখ্যায় 'Comment on J.P.' আলোচনায়ও সমরবাবু জয়প্রকাশের সম্পূর্ণ বিপ্লবের তত্ত্বে অন্তঃসারশূন্যতা দেখেন। ডাক্তার নর্মান বেথুনের জীবন কাহিনী অবলম্বনে 'মহাচীনের পথিক' গ্রন্থের অনুবাদ করেন কল্যাণ চৌধুরী। ১৯৭৯-তে প্রকাশিত এই গ্রন্থের কবিতাংশের অনুবাদ করেন সমর সেন। এই বছরে প্রকাশিত চের বান্দারাজুর কবিতার বাংলা সংকলন, 'ঢেউয়ে ঢেউয়ে তলোয়ার' গ্রন্থের প্রথম কবিতার বলিষ্ঠ অনুবাদ—'জয় হবে আমাদের'-এটিও সমর সেনের।

ভবানী চৌধুরী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আকর্ষণে 'ফ্রন্টিয়ার' ছেড়ে গেলে এ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন তিমির বসু। প্রচণ্ড আর্থিক সংকট তখন 'ফ্রন্টিয়ারে'র। সমর বাবু মাসের মাইনে নেবার আগে, দুবার তিনবার চিন্তা করতেন নেবেন কিনা।

কারণ প্রেস, বাইন্ডার, পোস্ট অফিস ইত্যাদির খরচা বাকিতে চালানোর উপায় নেই। শুধুমাত্র কাগজওয়ালার টাকাটা দিন পনেরো মতন আটকানো যেতে পারে। মুসকিল আসানের জন্য 'ফ্রন্টিয়ারে'র পাতায় আবেদন করে 'ডোনেশন' তোলার প্রয়াস চলে। তবে সমরবাবু সংসার নির্বাহের জন্য সরব হয়ে কাবো কাছে হাত পাততে পারেন নি। প্রবল আত্মমর্যাদাবোধ তাঁকে এপথে চালিত করেনি। পত্রিকার স্বার্থে বিজ্ঞাপনের জন্য অনেককেই বলেছিলেন। অনেকে বিজ্ঞাপন দেন নি স্রেফ ভয়ে। 'ফ্রন্টিয়ারে' বিজ্ঞাপন দিলে পাছে পরিচালকরা অসন্তুষ্ট হন, তাই তারা এড়িয়ে গেছেন। ১৯৮০-র অক্টোবরে সমরবাবু লেখেন 'ইন্দিরা চরিত'। মূলত এটা Dom Morais এর 'Mrs Gandhi' গ্রন্থের সমালোচনা। যেটির প্রথম বাক্যই অতুলনীয় : 'ইন্দিরা গান্ধীর যে পতিত পাবন মূর্তি মোরেজ গড়ে তুলেছেন তার সঙ্গে আমাদের মতো সাধারণ প্রজার পরিচয় নেই।'[১১৫] ১৯৮২-র ডিসেম্বরে 'The Statesman' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর 'Poet's Reminiscenees of Bishnu Dey'।

ক্রমশ নানা কারণে সমর সেনের চারপাশে শূন্যতার ভীড় বাড়ছিল। কয়েক বছরের মধ্যে পর পর কয়েকটি মৃত্যু ঘটে তাঁর আপনজনদের ভিতর। 'ফ্রন্টিয়ারে'র চিন্তা, দিন যাপনের চিন্তায় তিনি শারীরিক অবসাদে ভুগতে থাকেন। দ্রুত ভাঙতে শুরু করে শরীর। যদিও ডাক্তার দেখাচ্ছিলেন। ১৯৮৪ থেকে 'ফ্রন্টিয়ার' অফিসে আসা কমতে থাকে তাঁর। সপ্তাহে তখন মাত্র তিন চারদিন অফিসে আসতেন। এসময় থেকেই দেখা যায়, এক নাগাড়ে তিনমাস সম্পূর্ণ সুস্থ থাকতে পারেন নি তিনি। অন্যান্য কাজ কর্মেও অসুবিধা সৃষ্টি করছিল তাঁর এই শারীরিক অসুস্থতা। ফলে মাঝে মাঝেই তিনি নিজের উপর বিরক্তি প্রকাশ করতেন। এর মধ্যে 'চতুর্দিক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর 'প্রসঙ্গ কলকাতা' নামের লেখাটি। শারীরিক অসুস্থতার জন্য সমর সেন ভর্তি হন পি. জি. হাসপাতালে। লিভার অ্যাবসেস্' ভেবে তাঁর এই ভর্তি। কিন্তু ইন্‌ভেস্টিগেশন সম্পূর্ণ হলে জানা যায় তাঁর 'লিভার অ্যাবসেস' হয়নি। এরপর প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী, ড: অশোক মিত্রের সহায়তায় 'ক্যালকাটা হসপিটালে'র কোঠারি সেন্টারের ডাক্তার কে. এন. জালানের চিকিৎসাধীনে ভর্তি করে দেওয়া হয় তাঁকে। ডা: জালানের চিকিৎসায় সেবার তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন। এই ঘটনার পর থেকে ডা: জালানও স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাঝে মাঝে বাড়িতে গিয়ে দেখে আসতেন সমর সেনকে। ১৯৮৫-তে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্রের সম্পাদনায় 'The Truth Unites' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় সমর সেনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে যখন তিনি বাড়িতে এসেছেন—তখন তাঁকে এই বইটি কেমন হয়েছে জিজ্ঞাসা করা হয়। স্বাভাবিক রসিকতায় উত্তর দিয়েছিলেন—'পাছে বইটির মরণোত্তর প্রকাশ (Posthumous publication) হয়ে যায়, তাই তাঁরা খুব তাড়াতাড়ি নরম কাঁচা-বাঁধানো একখানা বই দিয়ে এসেছিলেন হাসপাতালে, এখনো খুলে দেখিনি।'[১১৬] ১৯৮৫-র ১৭ই নভেম্বর থেকে অশোক মিত্র অনূদিত সমর সেনের বাবু বৃত্তান্ত গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ—'A

Babu's Tale' নামে ধারাবাহিকভাবে 'The Telegraph' পত্রিকায় রবিবারের ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত হতে থাকে।

১৯৮৬ থেকে তিনি পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফেব্রুয়ারী মাসে মহাশ্বেতা দেবীকে এক চিঠিতে লিখে জানান যে, জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি একদিন মহাশ্বেতা দেবীর বাড়ি যাবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য যেতে পারেন নি। আবার মার্চ মাসের ২৪ তারিখে আরেক চিঠিতে লেখেন : 'উত্তর দিতে দেরি হলো, তার কারণ ক্রমাগত ভুগছি, অনেকদিন অফিস যেতে পারিনি। যাঁবা সচল, তাঁদের কথা ভেবে আজকাল হিংসে হয়।'[১১৭] এমত অবস্থায় থেকেও কিন্তু সমর বাবু এপ্রিল, ১৯৮৬-তে আরোয়াল কৃষক হত্যার প্রতিবাদে একজন সচেতন বুদ্ধিজীবী হিসেবে প্রতিবাদ লিপিতে স্বাক্ষর করেন। কিন্তু শরীর ক্রমশই তাঁর চিকিৎসার বাইরে চলে যাচ্ছিল যে, এটা তিনি বেশ ভালো ভাবেই উপলব্ধি করছিলেন। ১৯৮৭-র জুলাই মাসে এক চিঠিতে তিমির বসুর কাছে হাসপাতালে যেতে হতে পারে, আশঙ্কা করেন। যে হাসপাতালের নামে তাঁর আতঙ্ক হত নানা কারণেই। টাকা-পয়সার ব্যাপার ছাড়াও বাড়ির কথা চিন্তা করে তিনি হাসপাতালে যেতে নারাজ। আবার প্রথমবারের চিকিৎসা বিভ্রাটের জন্য পি.জি. থেকে ক্যালকাটা হস্‌পিটালে স্থানান্তরের ঘটনাও বিস্মৃত হন নি। তবু এই জুলাই মাসের শেষ দিকে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁকে ক্যালকাটা হস্‌পিটালে ভর্তি হতে হয়। তাঁর তত্ত্বাবধানে ছিলেন ডাঃ কমল জালান। এবারে আর বাড়ি ফেরা হল না। 'সবাই যখন রাজবাড়িতে/বেচতে গেলেন দাঁতের মাজন/একা তিনি চৌরাস্তায়/দাঁড়িয়ে শোনেন শিবের গাজন/ঢ্যাম কুড় কুড় ঢ্যাম কুড় কুড়/দূর থেকে সেই বাদ্যি আসে/বাদ্যি ঘিরে নাচছে আগুন/আগুন যে তাঁর শ্রদ্ধাভাজন।'[১১৮] —আগুনের শ্রদ্ধা ভাজন এহেন সমর সেনের দেহান্তর হয় ক্যালকাটা হস্‌পিটালে। ১৯৮৭-র ২৩ শে অগস্ট বেলা ২-৩০ মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আমাদের অজানা নয় যে, সমর সেন তাঁর কাজে, তাঁর জীবনে, মননের সংঘাতের মধ্যে থেকেও সততার দায় তিনি অন্য অনেকের চেয়ে অনেক বেশী মিটিয়েছিলেন। একদা 'কবিতা' পত্রিকায় সাড়া তুলে দেওয়া তরুণ কবি, 'ফ্রন্টিয়ারে' সাজসজ্জাহীন পৃষ্ঠাগুলির মধ্যে যে সার্থকতা পেয়েছিলেন তাকে এক উত্তরণই বলা চলতে পারে। নিঃসন্দেহে তাঁর কাব্য শিল্প আমাদের আদরণীয়, কিন্তু সেই সঙ্গে জীবন শিল্পীকেও আমরা ভুলতে পারি না। একথা সত্য, যাঁরা নীতির জন্য কোনোরকম প্রতিষ্ঠা বা সুবিধার হাতছানি বিনা দ্বিধায় বর্জন করতে প্রস্তুত থাকেন, তাঁরা হয়তো কোনো 'দল' বিশেষের সঙ্গে সাংগঠনিকভাবে যুক্ত থাকতে পারেন না বা চান না। তাঁদের আত্মোৎসর্গ তাই অনেক সময়, অনেকের কাছেই তাৎপর্য পায় না। অথচ এঁরা আছেন, এবং থাকবেন। সমর সেন এঁদেরই একজন। যিনি নিজে 'মধ্যবিত্ত' ঘেরাটোপের ভিতর থেকে ও চারপাশের নির্মোক উন্মোচনে ব্রতী ছিলেন। আবার বলতে হয়, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অতীব জাগ্রত দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ বিচারশীল, যুক্তি বোধ সম্পন্ন প্রখর মননের

অধিকারী, সমর সেন এক অতৃপ্ত মানসিকতা নিয়ে উপলব্ধি করেন : আমাদের দেশে বুদ্ধিজীবীদের মানসিক দ্বন্দ্বের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো কাজের সঙ্গে বিরোধ। অর্থাৎ যে কাজ, যে চাকরি করি, তার সঙ্গে আমাদের মূল্যবোধ খাপ খায় না। ফলে বিবেক দংশন দেখা দেয়। অনেকে না জোড়াতালি দিয়ে শেষপর্যন্ত অবস্থাটা সইয়ে নেন। অল্প সংখ্যক ব্যক্তি সেটা পারেন না। তাঁরা না ঘরের, না বাইরের।'[১১৯] এবং বলাবাহুল্য সমর সেন নিজেও সেই শেষোক্ত 'না ঘরের না বাইরের' গোষ্ঠীভুক্ত হিসেবেই সারাজীবন থেকে গেছেন। তাই যখন কেউ বিশ্বাস থেকে, কেউ বাঁচবার জন্য, কেউ নিছক স্বার্থের জন্য রাজবাড়িতে দাঁতের মাজন বেচেছেন, ঠিক সে সময়ে আমাদের কবি সমর সেন একলা গাজনের বাজনা বাজিয়েছেন।

উল্লেখপঞ্জী

১. সমর সেন—'বাবুবৃত্তান্ত'। দে'জ দ্বিতীয় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সং। দে'জ পাবলিশিং। জানুয়ারী ১৯৮৮। পৃ. ৯১
২. সমর সেন—'গৃহস্থবিলাপ : এক', 'তিনপুরুষ'। অনুষ্টুপসং। অনুষ্টুপ প্রকাশনী। জানুয়ারী ১৯৮৯। পৃ. ১৮
৩. দীনেশচন্দ্র সেন—'ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য'। জিজ্ঞাসা। জুন ১৯৬৯। পৃ. ১৬৭
৪. তদেব। পৃ. ১৯৬
৫ সমর সেন—'গৃহস্থ বিলাপ : এক', তিনপুরুষ। প্রাগুক্ত। পৃ. ১৭-১৮
৬. সমর সেন—'বাবুবৃত্তান্ত'। প্রাগুক্ত। পৃ. ১৩
৭. সমর সেন—'উড়ো খৈ : ৪', 'বাবুবৃত্তান্ত'। প্রাগুক্ত। পৃ. ১২৯
'বছর দুই যেতে না যেতে লুকিয়ে চরিত্রহীন গৃহদাহ পড়া শেষ'
৮. সমর সেন—'বাবু বৃত্তান্ত'। পৃ. ১৪
৯. সমর সেন—'উড়ো খৈ : ২', 'বাবু বৃত্তান্ত'। পৃ. ১২২
১০. রাধারমণ মিত্র—'সমর'; স্মৃতিচারণ। 'অনুষ্টুপ'। 'সমর সেন বিশেষ সংখ্যা'। ২২শ বর্ষ; দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যা। ১৯৮৮। পৃ. ৩
১১. সমর সেন—'বাবু বৃত্তান্ত'। পৃ. ৯
১২. কমলা রায়—'আমাদের বাড়ি, আমাদের খোকাদা'; স্মৃতিচারণ। 'অনুষ্টুপ'। প্রাগুক্ত। পৃ. ৪০
১৩. সমর সেন—'বাবু বৃত্তান্ত'। পৃ. ১৩
১৪. কমলা রায়—'আমাদের বাড়ি, আমাদের খোকাদা'; স্মৃতিচারণ। 'অনুষ্টুপ'। প্রাগুক্ত। পৃ. ৪০
১৫. রাধারমণ মিত্র—'সমর'; স্মৃতিচারণ। 'অনুষ্টুপ'। প্রাগুক্ত। পৃ. ৩
১৬. সমর সেন—'বাবু বৃত্তান্ত'। পৃ. ১৪
১৭. তদেব। পৃ. ১৭
১৮. কমলারায়—'আমাদের বাড়ি, আমাদের খোকাদা'; স্মৃতিচারণ। অনুষ্টুপ'। প্রাগুক্ত। পৃ. ৪০
১৯. সমর সেন—'বাবুবৃত্তান্ত'। পৃ. ১৮
২০. তদেব।

২১ তদেব; পৃ. ১৮-১৯
২২. তদেব; পৃ. ১১
২৩. সমর সেন—'বন্দে মাতরম্'; 'বাবুবৃত্তান্ত'। পৃ. ৮৬
২৪. সমর সেন—'উড়ো খৈ : ৪', 'বাবুবৃত্তান্ত'। পৃ ১৩০
২৫. সমর সেন—'বাবু বৃত্তান্ত'। পৃ. ১৯
২৬. কমলা রায়—'আমাদের বাড়ি আমাদেব খোকাদা'। 'অনুষ্টুপ'। প্রাগুক্ত। পৃ ৪১
২৭. সমর সেন—'বাবু বৃত্তান্ত'। পৃ. ২০
২৮. দেবীভূষণ ভট্টাচার্য—'সহপাঠী বন্ধু সমর সেন প্রসঙ্গে'; স্মৃতিচারণ। 'অনুষ্টুপ'। প্রাগুক্ত। পৃ. ৫৯-৬০
২৯. প্রণতি দে—'আমার স্মৃতিতে সমরবাবু'; স্মৃতিচাবণ। 'অনুষ্টুপ'। প্রাগুক্ত। পৃ. ২০
৩০. নিত্যপ্রিয় ঘোষ—'সম্পাদক সমর সেন'; স্মৃতিচারণ। 'অনুষ্টুপ'। প্রাগুক্ত। পৃ. ৮৬
৩১ সঞ্জয় ভট্টাচার্য—'তৃতীয় ও চতুর্থ দশক' : 'আধুনিক কবিতাব ভূমিকা'। সবিতা প্রকাশ ভবন। ভাদ্র ১৩৬৬। পৃ. ১১৪
৩২. বুদ্ধদেব বসু—'পত্রগুচ্ছ'। 'রচনা সংগ্রহ'। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৬১০
৩৩. পুলক চন্দ—'কালের দর্পণে সমব সেন'। 'অনুষ্টুপ'। প্রাগুক্ত। পৃ ৩
৩৪ মণীন্দ্র রায়—'আমার কালেব কবিরা'। 'অমৃত'। ২০ শে জানুযাবী ১৯৭৮
৩৫. সমর সেন—'বাবুবৃত্তান্ত'। পৃ. ৩২-৩৩
৩৬ তদেব। পৃ ২১
৩৭. সমর সেন—'রোমন্থন : ১', 'নানাকথা'। অনুষ্টুপ সং। অনুষ্টুপ প্রকাশনী। জানুয়াবী ১৯৮৯। পৃ ৯-১০
৩৮ সমর সেন—'বাবুবৃত্তান্ত'। পৃ ৩২
৩৯ কমলা বায়—'আমাদেব বাড়ি, আমাদেব খোকাদা'। 'অনুষ্টুপ'। প্রাগুক্ত। পৃ. ৪২
৪০ সমর সেন—'বাবুবৃত্তান্ত'। পৃ ২৩
৪১ বুদ্ধদেব বসু—'আমার যৌবন'। শারদীয় 'দেশ'। ১৩৮০। 'রচনা সংগ্রহ' চতুর্থ খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত। গ্রন্থালয়। বৈশাখ ১৩৮৪। পৃ ৪৩৭-৪৩৮
৪২ ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বুদ্ধদেব বসুকে ৩ ১০ ৩৫ তারিখে লেখা চিঠি। 'কবিতা' প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৌষ ১৩৪২। বুদ্ধদেব বসুব 'রচনা সংগ্রহ' তৃতীয় খণ্ডে পুনমুদ্রিত। প্রাগুক্ত। পৃ ৫৩৮
৪৩ বুদ্ধদেব বসু—'চিঠিপত্র'; 'দেশ', সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮১। 'বচনা সংগ্রহ' তৃতীয় খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত। পৃ. ৬১১
৪৪. Samar Sen—'The Still Centre'; 'Water My Roots · Essys by & on Bishnu Dey'. [Ed. by Samir Dasgupta] গ্রন্থে মুদ্রিত। 'কলমের ফ্রন্ট' পত্রিকায 'বিশেষ সমব সেন সংখ্যায়' পুনমুদ্রিত। বর্ষ-৮, সংখ্যা-৯।
৪৫. দেবীভূষণ জানিযেছেন দুমাস নয়, আড়াই মাস। '.. বি.এ পবীক্ষার পর দীর্ঘ আড়াই মাস ব্রহ্মদেশে.. ।' —'সহপাঠী বন্ধু সমব সেন প্রসঙ্গে' : 'অনুষ্টুপ'। প্রাগুক্ত। পৃ ৬৪
৪৬ সমর সেন—'বাবুবৃত্তান্ত'। পৃ ৩০
৪৭ সমর সেন—'পোস্ট গ্রাজুয়েট' · 'কযেকটি কবিতা'। অনুষ্টুপসং। অনুষ্টুপ প্রকাশনী। জানুয়াবী ১৯৮৯। পৃ ৩৩

৪৮. সমর সেন—'বাবুবৃত্তান্ত'। পৃ. ২০
৪৯ সমর সেন—'১৯০০' 'কয়েকটি কবিতা'। প্রাগুক্ত। পৃ ৩১-৩২
৫০. প্রণতি দে—'আমার স্মৃতিতে সমব বাবু'; 'অনুষ্টুপ'। প্রাগুক্ত। পৃ. ২১
৫১. সমর সেন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুবকে লিখিত 'চিঠিপত্র'-২; 'অনুষ্টুপ'। প্রাগুপ্ত; পৃ ৪
৫২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব—সমব সেনকে লিখিত 'চিঠিপত্র—১'; 'অনুষ্টুপ'। প্রাগুক্ত। পৃ. ৩
৫৩ সমর সেন—'বাবু বৃত্তান্ত'। পৃ. ৩৫
৫৪. শঙ্খ ঘোষ—' রোমাঞ্চকর এক সংকলন' · 'উর্বশীব হাসি'। প্যাপিরাস। এপ্রিল ১৯৮১। পৃ. ২৪ 'সজনীকান্ত দাস 'বাংলাকাব্য পরিচয়' সংকলনেব দ্বিতীয় সংস্করণের ভার পান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি। সমব সেনেব ধারণা তাই অমূলক।'
৫৫ বুদ্ধদেব বসু—'বাংলা কাবা পরিচয়' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত সংকলন), সমালোচনা। 'কবিতা'। ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা। আশ্বিন ১৩৪৫
৫৬. সমব সেন—বিষ্ণু দেকে লিখিত 'চিঠিপত্র-২', 'অনুষ্টুপ'। প্রাগুক্ত। পৃ. ৪২
৫৭ ———বুদ্ধদেব বসুকে লিখিত 'চিঠিপত্র-৪'; 'অনুষ্টুপ'। প্রাগুক্ত। পৃ ৯
৫৮ ———তদেব। 'চিঠিপত্র-৬' পৃ ১১
৫৯ ———'বাবুবৃত্তান্ত'। পৃ ৩৬
৬০. ——— বুদ্ধদেব বসুকে লিখিত 'চিঠিপত্র-৮' 'অনুষ্টুপ'। প্রাগুক্ত। পৃ ১২
৬১ দেবীভূষণ ভট্টাচার্য—'সহপাঠী বন্ধু সমর সেন প্রসঙ্গে'; 'অনুষ্টুপ'। প্রাগুক্ত। পৃ ৫৭
৬২ সমব সেন—'নানাকথা · ৪', 'নানাকথা'। প্রাগুক্ত। পৃ ৩২
৬৩ তদেব। 'নানাকথা ৬'। পৃ ৩৩
৬৪ সুভাষ মুখোপাধ্যায। পরবর্তীকালে ইনিও সমব সেনকে রসিকতা করে, ২১.১৩৪৮ তারিখে লেখা এক পত্রে কবির পিতৃদেব সম্পর্কে জানান : '..ওদিকে তো সুভাষবাবু (সুভাষ বসু) নিরুদ্দেশ হলেন! আপনাব পিতৃদেব রটিয়ে বেড়াচ্ছেন (একদিন সকালে দেখা গেল সাবা কলকাতা লাল ইস্তাহাব 'সুভাষবাবু বার্লিনে' এবং ওদের organisation এমনই শক্ত যে এক বাত্তিবে ঐ সূত্রে ৬০ জন গ্রেপ্তাব হয়েছে) আপনাকে বুদ্ধদেব বাবুকে আর আমাকে 'ভাবী ডিক্টেটব' সুভাষ বাবু ফাঁসি দেবে। এখন থেকে গলাটা শক্ত করুন।'— 'বাবুবৃত্তান্ত'।
৬৫ সমর সেন—'বাবু বৃত্তান্ত'। পৃ ৭৪
৬৬ ———'অজ্ঞাত বাস' 'গ্রহণ'। অনুষ্টুপ। অনুষ্টুপ প্রকাশনী। জানুয়ারী ১৯৮৯। পৃ. ৩০
৬৭ ——— বুদ্ধদেব বসুকে লিখিত 'চিঠিপত্র-৯'; 'অনুষ্টুপ'। প্রাগুক্ত। পৃ. ১৩
৬৮ ———'বাবুবৃত্তান্ত'। পৃ ৩৯
৬৯. ———বুদ্ধদেব বসুকে লিখিত 'চিঠিপত্র-১০', 'অনুষ্টুপ'। প্রাগুক্ত। পৃ. ১৪
৭০ ——— দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত 'চিঠিপত্র-১'; 'অনুষ্টুপ'। প্রাগুক্ত। পৃ. ৯৬
৭১ ———বুদ্ধদেব বসুকে লিখিত 'চিঠিপত্র-১৩'; 'অনুষ্টুপ'। প্রাগুক্ত। পৃ. ১৮
৭২ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত 'চিঠিপত্র-৪'; 'অনুষ্টুপ'। প্রাগুক্ত। পৃ ৯৭
৭৩ বিষ্ণু দেকে লিখিত 'চিঠিপত্র-৮'; 'অনুষ্টুপ'। প্রাগুক্ত। পৃ ৪৭
৭৪ '২২শে জুন' · ' খোলাচিঠি'। 'অনুষ্টুপ সং'। অনুষ্টুপ প্রকাশনী। জানুয়াবী ১৯৮৯। পৃ ৯
৭৫ ——— 'নববর্ষের প্রস্তাব : ২', নানাকথা। প্রাগুক্ত। পৃ ৩৯

৭৬. তদেব। 'পঞ্চমবাহিনী : ২'। পৃ. ৩৭
৭৭. তদেব। 'নানাকথা : ৬'। পৃ. ৩৪
৭৮. সমর সেন—'একটি শহর' : 'খোলা চিঠি'। প্রাগুক্ত। পৃ. ১০
৭৯. সমর সেন—চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত 'চিঠিপত্র-২'; 'অনুষ্টুপ'। প্রাগুক্ত। পৃ. ৯১
৮০. —— বুদ্ধদেব বসুকে লিখিত 'চিঠিপত্র-৩১'; 'অনুষ্টুপ'। প্রাগুক্ত। পৃ. ৩৬
৮১. —— 'জাতীয় সংকট : ৩', 'খোলাচিঠি'। প্রাগুক্ত। পৃ. ১৪
৮২. তদেব। পৃ ১২
৮৩. সমর সেন—বিষ্ণু দেকে লিখিত 'চিঠিপত্র-৩১': 'অনুষ্টুপ'। প্রাগুক্ত। পৃ. ৬৯
৮৪. —— 'সাফাই : চার'; 'তিনপুরুষ'। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৪
৮৫. —— দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত 'চিঠিপত্র-৩৮'; 'অনুষ্টুপ'। প্রাগুক্ত। পৃ. ১৩২
৮৬. ——বিষ্ণু দে কে লিখিত চিঠিপত্র—৩৯; অনুষ্টুপ। প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৪
৮৭. ——'জন্মদিনে' : 'সমর সেনের কবিতা'। সিগনেট প্রেস। ৪র্থ পরিবর্ধিত সং। ১৩৮৪। পৃ. ১৪০
৮৮. অশোক রুদ্র——'কয়েক কোটি বাঙালীর মধ্যে একটি মানুষ'; আলোচনা : 'অনুষ্টুপ'। প্রাগুক্ত। পৃ. ৫২
৮৯. অশোক মিত্র——'সমর সেন প্রসঙ্গে', স্মৃতিচারণ : 'অনুষ্টুপ'। প্রাগুক্ত। পৃ. ১২৪-১২৫
৯০. অরুণকুমার সরকার—'দুই দশকের চোখে সমর সেন' : 'তিরিশের কবিতা এবং পরবর্তী'। প্যাপিরাস। নভেম্বর ১৯৮১। পৃ. ৭৮
৯১. মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়—'কাব্যদৃষ্টি ও সমর সেনের তিনপুরুষ'। 'পরিচয়'। পৌষ ১৩৫২। ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত 'মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক', ৩য় খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত। প্রাইমা পাবলিকেশনস্। এপ্রিল ১৯৭৮.
৯২. অশ্রুকুমার সিকদার—'সমর সেনের কবিতার ইমেজ' : 'আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়'। পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত ২য় সং। অরুণা প্রকাশনী। ১৩৮৬। পৃ. ২৪৬
৯৩. সমর সেন—'বাবুবৃত্তান্ত'। পৃ. ৪৮
৯৪. তদেব। পৃ. ৫০
৯৫. গৌরকিশোর ঘোষ—'সমর সেনের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন'; 'চতুরঙ্গ'। সেপ্টেম্বর ১৯৮৭। পৃ. ৪৭৬
৯৬. সমর সেন—'উড়ো খৈ : ৫' (কবিতা), 'বাবুবৃত্তান্ত'। পৃ. ১৪৮
৯৭. ——'একটি অপ্রকাশিত কবিতা'। 'চতুরঙ্গ'। শ্রাবণ ১৩৭২। 'অমৃতলোক' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত। 'সমর সেন স্মরণ সংখ্যা'। দ্বাদশ বর্ষ, জানুয়ারী ১৯৮৮
৯৮. ——বাবুবৃত্তান্ত। পৃ. ৫৪
৯৯. তদেব। পৃ. ৬২
১০০. তদেব। ৬৩-৬৪
১০১. হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায়—'নাও এবং সমর সেন'। 'অমৃতলোক'। প্রাগুক্ত।
নাও এর প্রতিষ্ঠাতা হুমায়ুন কবীর, অতুল্য ঘোষের চক্রান্তে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়লে স্বভাবতই তিনি ক্ষুব্ধ হন। এবং মনেপ্রাণে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। যদিও বলতেন কংগ্রেসকে শোধন করবো, ধ্বংস চাইনা। কিন্তু কার্যত তিনি

কংগ্রেসের ধ্বংসই চেয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ শুধু নয় ভারতবর্ষ থেকেও। তার চেয়েও মনেপ্রাণে অতুল্য ঘোষের রাজনৈতিক অবলুপ্তি চেয়েছিলেন। তিনি সফলও হয়েছিলেন। ১৯৬৪-৬৭ পর্যন্ত তাই পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক খেলায় কবীর সাহেবের ভূমিকা সমর সেন তো বটেই, এছাড়া জন মানসেও একটি প্রগতিশীলতার মূর্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।

১০২. নীরদচন্দ্র চৌধুরী—সমর সেনকে লিখিত 'চিঠিপত্র'-১৩'; 'অনুষ্টুপ'। চতুর্বিংশ বর্ষ : প্রথম সংখ্যা (শারদীয় সংখ্যা)। ১৯৮৯। পৃ. ৩২২-৩২৩

১০৩. তদেব। 'চিঠিপত্র-১৮'। পৃ. ৩২৮

১০৪. সমর সেন—'বাবুবৃত্তান্ত'। পৃ. ৬৬

১০৫. তদেব। পৃ. ৭৮

১০৬. নীরদচন্দ্র চৌধুরী—সমর সেন (১৯৬৮) লিখিত 'চিঠিপত্র-১'; 'অনুষ্টুপ'। চতুর্বিংশ বর্ষ : প্রথম সংখ্যা। ১৯৮৯। পৃ. ৩৭২

১০৭. Samar Sen, Debabrata Panda &Ashis Lahiri ed.—'Introduction' 'Naxalbari And After : A Frontier Anthology'; Foreword by Samar Sen. Kathashilpa June 1978. 2 Vols.

১০৮. প্রবন্ধটি পরে 'Water My Roots : Essays by & on Bishnu Dey' (Ed. by Samir Dasgupta) গ্রন্থে 'The Still Centre' শিরোনামে মুদ্রিত। 'কলমের ফ্রন্ট' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত। প্রাগুক্ত।

১০৯. সমর সেন—'চন্দ্রবিন্দু বাদে'; 'বাবুবৃত্তান্ত'। পৃ. ৮৫

১১০. তিমির বসু—'অতএব ফ্রন্টিয়ার'; 'অনীক'। ২৪ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা (সমর সেন সংখ্যা)। ডিসেম্বর ১৯৮৭। পৃ. ১২

১১১. অসীম চট্টোপাধ্যায়—'সমর সেন প্রসঙ্গে'; আলোচনা : 'অনুষ্টুপ'। 'সমর সেন বিশেষ সংখ্যা'। ২২শ বর্ষ, দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যা, ১৯৮৮। পৃ. ১১৫

১১২. সমর সেন—'উড়ো খৈ : ৬', 'বাবুবৃত্তান্ত'। পৃ. ১৪০

১১৩. সমর সেন—'বাবুবৃত্তান্ত'। পৃ. ৫২

১১৪. তদেব। পৃ. ৬৮

১১৫. তদেব। পৃ ১১১

১১৬. দেবব্রত পাণ্ডা—'সমর সেন প্রসঙ্গে'; আলোচনা : 'অনুষ্টুপ'। প্রাগুক্ত। পৃ. ১৩৪

১১৭. মহাশ্বেতা দেবী—'সমর সেন'; স্মৃতিচারণ : 'অনুষ্টুপ'। প্রাগুক্ত। পৃ. ৩৫

১১৮. বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—'সমর সেন' (কবিতা) : 'ভাতে পড়ল মাছি' (সংকলন)। ১৯৮১

১১৯. সমর সেন—'চন্দ্রবিন্দু বাদে'; 'বাবুবৃত্তান্ত'। পৃ. ৮৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

দেশ-কাল-কবিতা

"দূরে শুনি ঝড়ের ডাক; উদ্‌ভ্রান্ত ঘরে ফেরে কাক,
পাখার শঙ্কিত শব্দ; তারপর পৃথিবী নির্বাক।"

(লোকের হাটে : ৩ : সমর সেনের কবিতা)

একদা কবি জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন—'কবির পক্ষে সময়কে বোঝা দরকার, কবিতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাস চেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।'[১]—একথা কবির ক্ষেত্রে যেমন প্রয়োজন, ঠিক তেমনি প্রাসঙ্গিক সেই কবির কবিতা পাঠকালে কবিতা-পাঠকের ক্ষেত্রেও। আবার 'সময়জ্ঞান' বুঝতে হলে প্রয়োজন সময়াতীতের ধারণা ও সাময়িকের ধারণা, এবং যুগপৎ সময়াতীত ও সাময়িকের ধারণা। আধুনিক বাংলা কবিতার ধারায় সমর সেন সম্পর্কেও একথা সমানভাবে সত্য। কারণ তিনি যখন কবিতা লিখছেন, তার আগে পরে দেশব্যাপী, জীবন ব্যাপী ঝড়ের দিন। এই দিন বিবর্ণ, তার রাত আলকাতরার মতো কালো।

যাইহোক, আমাদের স্মরণে আছে যে সমর সেন কবিতা লিখতে শুরু করেন ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। যদিও ১৯৩৩—এই তাঁর প্রথম কবিতা, 'শ্রীহর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবিতা লেখা ধারাবাহিকভাবে শেষ করেন ১৯৪৬-এ। অবশ্য এর পরেও দুয়েকটি কবিতা বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে বাজি রেখে লেখেন। তবে মোটামুটি ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত—এই বারো/ তেরো বছর কাল তাঁর কবিতার ঘরে গতায়াত। আর এই বারো/তেরো বছরের কবিতা লেখার সমকালকে দেখতে গেলে—প্রথমেই আমাদের সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা স্মরণে আসে।

ক. সমকালীন সামাজিক রাজনৈতিক পরিবেশ

সমর সেন জন্মেছিলেন উনিশশো ষোলোয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা তখন বিশ্ববাসীর চোখেমুখে। পৃথিবীব্যাপী এই রণবাদ্য এবং অস্ত্র ঝনঝনার মধ্যে তাঁর জন্মের কোন প্রতীকীমূল্য নেই, কিন্তু জগৎ ও জীবনের যে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক মূল্যায়নে তিনি আজীবন বিশ্বস্ত থেকেছেন তার মূলমন্ত্রগুলি তখন থেকেই সামাজিক মাত্রা পেয়েছে। সদ্যোবিগত উনিশ শতকের পর মাত্র ষোলোটি বছরে বিংশ শতাব্দী যেন শতাব্দী কাল এগিয়ে এলো। আর সামাজিক সম্পর্ক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মাত্রা পেলো। কাব্য-কবিতা দেখবার শোনবার পক্ষে তখন এই সমাজ-আর্থ সম্পর্ক গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে। কবির নিজের মন্তব্য মূল্যবান : 'কাব্যের ইতিহাসে অন্তরায় আসে, তার কারণ কবিতা বিশুদ্ধ কল্পনা নয়, পারবর্তনশীল শ্রেণীগতির স্থান কাল পাত্রের মুখাপেক্ষী এবং মুখাপেক্ষী হলেও মাঝে-মাঝে সমাজের মুখ বদলানোর কাজে

সাহায্য করতে পারে। সামাজিক পরিস্থিতি এবং অন্তঃপ্রেরণার মধ্যকার আত্মীয়তা জটিল কিন্তু অনস্বীকার্য।[২]

সমর সেনের কবিতার পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে—কিম্বা আধুনিক বাংলা কবিতা নামক ত্রিশের দশকের বাংলা কবিতার গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট হিসেবে তদানীন্তন চিন্তাজগতের একটু রেখা চিত্র রচনা প্রয়োজন মনে করি। বিশেষ করে যে চারটি বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক চিন্তা ধারা বিশেষভাবে মানবজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, সেগুলি যথাক্রমে—**১. ডারুইনের বিবর্তনবাদ; ২. আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ; ৩. কার্ল মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও তার থেকে উদ্ভূত সমাজতন্ত্রবাদ এবং ৪. ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণবাদ।** বলা বাহুল্য, শেষোক্ত দুটি পরবর্তীকালে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হয়েছে।

ডারুইনের বিবর্তনবাদ এবং আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ চিন্তারাজ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এলো। এর ফলে মানুষের দৈব নির্ভরতা থাকলো না এবং সবকিছুর আপাত ও আপক্ষিক মূল্য সম্বন্ধে আমাদের সচেতন হতে হলো। আর জানতে হলো সময়ের ঘূর্ণমানতার স্রোতে নিজেদের অবস্থানের আয়তনটুকুর সীমাবদ্ধতা। চিরন্তনতার চালচিত্র মুছে গেলো অনায়াসে, যদিও উনিশ শতকের Legacy রয়ে গেলো অগোচরে। আর বিপুলা পৃথিবীর কালতরঙ্গে ভাসমান মানুষ অচিরে নিজের সামান্যতা অনুভব করে পার্থিব হলো অনায়াসে। এখান থেকে মাত্রা পেলো যুক্তিবাদ, আধুনিকতার তাই হলো ভিত্তিভূমি।

এর পরের আবিষ্কার কার্লমার্কস কৃত। ১৮৪৮-এ প্রকাশিত তাঁর 'Communist Manifesto' রচনার প্রকাশ মাধ্যমে এক নতুন দর্শনের শুরু। ১৮৬৭-তে প্রকাশিত 'Das Capital' (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থে তিনি শ্রেণীহীন, অর্থনৈতিক শোষণহীন এক মানব সমাজের প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন যে—তারই প্রাধান্য বিশশতকের মননে। অবশ্য এই তত্ত্ব বাস্তবায়িত হয় পরে। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার সমাজ তান্ত্রিক বিপ্লবের দ্বারা। সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্র বিন্দুতে 'ব্যক্তিমানুষ' আর প্রাধান্য পেলে না, পক্ষান্তরে সমাজের 'জনসমষ্টি' এসে উপস্থিত হলো। এরই নিরিখে নির্বাচিত হলো মানুষের সকল আদর্শ, সকল মূল্যবোধ। মার্কস-এর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত, 'Das Capital'-র অন্য দুই খণ্ডেও এরই বিস্তৃত আলোচনা বর্তমান।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার স্নায়ুবিজ্ঞানবিদ্ সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড তাঁর 'The Interpretation of Dreams'. ১৯০৪-এ 'The Poychopathology of Everyday Life' এবং ১৯০৫-এ 'Wit and its relations to the Unconscious' ও 'Three contribution to the Theory of Sex' প্রকাশ করেন। এসব প্রবন্ধ মাধ্যমে তিনি সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে মানুষের মানস-প্রক্রিয়াকে প্রণালীবদ্ধ করেন। তিনি Ego (অহং), Super ego (নিয়ন্ত্রক) এবং Id (অবচেতন)-মনের এই ত্রিস্তর দেখিয়েছেন। তাঁর এই বৈপ্লবিক আবিষ্কার নতুন মানুষের জন্মলগ্নকে এগিয়ে দিল, যেহেতু এই মানুষের মূলকথা এক সুতীব্র Subjectivity বা আত্মমুখী প্রবণতা। আধুনিক কবিতা ও সাহিত্য অত্যন্ত প্রগাঢ়ভাবে

Subjective বা আত্মগত; এখানে শিল্পী তাঁর আত্মমনের গভীরে অবতরণ করেন। দ্বিতীয়ত, তিনি দেখালেন সুন্দর ও অসুন্দরের মধ্যস্থ নিরপেক্ষ সম্পর্ক। কাম নয় কোনো ঘৃণ্য প্রবৃত্তি, তা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ মানবিক প্রবৃত্তি। মানুষের প্রাণশক্তির প্রধান উৎস। কামপ্রবৃত্তির সুস্থ, সুষ্ঠু পুনর্বাসন নরনারীর সম্পর্কের স্বাভাবিকতায়; কামের ঊর্ধ্বায়নে শিল্পসাহিত্য ধর্মীয় সূক্ষ্ম দর্শনের উদ্ভব।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে শুরু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। মানবিক ধ্রুবস্থিতিকে বিচলিত করে এক সন্ধিপত্র মাধ্যমে এই যুদ্ধ শেষ হয় ১৯১৮-তে। অবশ্য ১৯১৭ থেকে শুরু করে ১৯২২-র ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ শেষে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং এর ফলে পৃথিবীর সকল দেশের অত্যাচারিত, নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত মানুষের মুক্তির স্বপ্ন দেখা শুরু। আবার ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় টি. এস. এলিয়টের বিখ্যাত সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ, 'Tradition and the Individual Talent' ও ১৯২২-তে তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'The Waste Land' প্রকাশিত হয়। ঐ একই বছরে প্রকাশিত জেমস্ জয়েসের উপন্যাস 'Ulysses' আলোড়ন তোলে। ১৯২২-এর অক্টোবরে প্রকাশিত 'The Critarian' পত্রিকাটিও সাহিত্য মহলে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। অন্যদিকে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলন্ডের প্রচণ্ড আর্থিক সংকটে মুদ্রানীতির মার প্যাঁচে অনেক দেশেরই আর্থিক বিপর্যয় ঘটে। ১৯৩৩-এ জার্মানিতে ঘটে হিটলারের অভ্যুত্থান। সারা পৃথিবীতে শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের পরিচয় তখন ফ্যাসিস্ত বিরোধী হিসেবে। ১৯৩৪-এ রাশিয়ায় লেখক কংগ্রেসে গৃহীত 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'র আদর্শ জন্ম নেয়। জন্ম নেয় ইউরোপের 'New Writing' আন্দোলনের ভাবধারা। পাশাপাশি ফ্যাসিস্ত বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামে নিহত প্রখ্যাত তরুণ মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী ক্রিস্টোফার কর্ডওয়েলের সংবাদ প্রচার আলোড়ন তোলে। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যার সূচনা হয়েছিল, তারই প্রসার ঘটলো এই যুদ্ধে অধিকতর ভাবে। সঙ্গে এলো মিথ্যাচার, অসঙ্গত মুনাফা অর্জন, ব্ল্যাকমার্কেট, নারীকে পণ্যরূপে ব্যবহার প্রভৃতি। বলা বাহুল্য, এগুলি আগে সবই ছিল অস্পষ্ট বা সামান্য স্পষ্টভাবে। কিন্তু এই মহাযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে তা প্রবল হলো। ১৯৪১-এর ২২শে জুন হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করলে প্রতিবাদে ফেটে পড়ে চারিদিক। ১৯৪৫-এর ৬ই ও ৯ই অগস্ট জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহরে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপে মানবাত্মার প্রতি চরম অবমাননা করা হলো।

এ তো গেল পৃথিবীর কথা। এরপরে ভারতবর্ষ বিশেষ করে বাঙলা দেশের দিকে তাকালে দেখা যায়, এখানেও ঘটনার ঘনঘটা। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে শুরু স্বদেশী যুগের। যদিও এর সূচনা 'বুয়র যুদ্ধে' (১৮৯৯-১৯০২) এবং রুশ-জাপান সংগ্রামে (১৯০৪-১৯০৫)। স্বদেশী স্বরাজ ও জাতীয় শিক্ষার বৈগুণ্যে স্বদেশিয়ানার বান ডাকলো। আন্দোলনের প্রচণ্ডতায় বঙ্গভঙ্গ রোধ হলো। জাতি আবার আত্মস্থ হবার সুযোগ পেলো। শুধু তাই নয়, 'মার্লি-মিন্টো সংস্কার' (১৯০৯) ও এলো এরই মারফতে। এরই উপান্তে

এলো 'রাউলাট আইন', 'অমৃতসর হত্যা', 'মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার' (১৯১৯)। এই অমৃতসর হত্যার (জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড) বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিবাদ জানিয়ে, ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ডকে এক চিঠির উপসংহারে জানিয়েছিলেন : '...রাজাধিরাজ ভারতেশ্বর আমাকে নাইট উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, সেই উপাধি পূর্বতন যে রাজ প্রতিনিধির হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাঁহার উদার চিত্ততার প্রতি চিরদিন আমার শ্রদ্ধা আছে। ...বড় দুঃখেই আমি যথোচিত বিনয়ের সহিত শ্রীল শ্রীযুক্তের নিকট অদ্য এই উপরোধ উপস্থাপিত করিতে বাধ্য হইয়াছি যে, সেই 'নাইট' পদবী হইতে আমাকে নিষ্কৃতি দান করিবার ব্যবস্থা করা হয়।'[৩] এবং তিনি নাইট উপাধি ত্যাগ করলেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে এলো অসহযোগ, রাষ্ট্রের সঙ্গে। গান্ধীজী হলেন এর পুরোধা। রাষ্ট্রিক দিকটা সত্যাগ্রহ হরতাল ও স্বরাজের ত্রিবেনীতে মূর্ত হলো। জনসাধারণের ব্যাপক সহযোগিতায় অসহযোগ আন্দোলন, গণআন্দোলনে রূপ নিতে উদ্যত হলে, ১৯২২ এর চৌরিচেরায় নিহত কৃষক আন্দোলনকারীদের রোষে বাইশজন পুলিশ কনস্টেবল অগ্নিদগ্ধ হয়। এই দেখে গান্ধীজী মাঝপথেই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন। ইতিহাসে এর নাম 'বর্‌দল্‌ই হল্‌ট'।

অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফৎ আন্দোলন ব্যর্থ হলে মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত মানুষেরা অসহায় বোধ করে। কিন্তু কল কারখানার শ্রমিক অসন্তোষ চেপে রাখা গেল না। পাশাপাশি রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের অভূতপূর্ব সাফল্যে দেশের যুবশক্তি সমাজবাদী চিন্তাধারার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন। ১৯২৪-এ কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলার পর দেশে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন প্রবল হতে থাকে। দেশের মধ্যে নতুনভাবে জন জাগরণের জোয়ার এলো। গান্ধীজী আবার ফিরে এলেন। ১৯২৯-এ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় কম্যুনিস্ট পার্টির ওপর আবার আঘাত হানা হয়। বিশ্বজোড়া আর্থিক সংকটের ছায়া এ সময়ে সোজাসুজি ভারতের প্রত্যেকটি শ্রেণীর শিরদাঁড়ার ওপর পড়ে। দেশের মধ্যে এসময়ে নিরস্ত্র ও সশস্ত্র আকারে বহুগুণ বিক্ষোভ দেখা দিল। সেই বিদ্রোহের ইতিহাস রচনা করেছিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, গাড়োয়ালী সৈন্যদের বিদ্রোহ, শোলাপুর জনতার স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা, যুক্তপ্রদেশে কৃষকদের খাজনাবন্ধ প্রভৃতি অগ্নিগর্ভ ঘটনা। ১৯৩০-এ দেশজোড়া এই আন্দোলনের ভিত্তিতে পালিত হয় ২৬শে জানুযারী প্রথম স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান; এখন যার নাম সাধারণতন্ত্র দিবস। গান্ধীজী ২রা মার্চ (১৯৩০) বড়লাটকে আইন অমান্য আন্দোলন সম্বন্ধে অবহিত করেছিলেন এবং ৯ই এপ্রিল প্রকাশ্যে পরিকল্পনাটি ঘোষিত হয়। ১৩ই এপ্রিল তিনি বোম্বাইয়ের সমুদ্রতীরস্থ ডাণ্ডিতে লবণ আইন ভঙ্গ করেন। ফলে পরিকল্পনামত প্রতি গ্রামে লবণ তৈরী বর্জন করার সঙ্গে সঙ্গে মদ ও বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং, স্কুল কলেজ বয়কট, সরকারী চাকুরিতে ইস্তফা, অস্পৃশ্যতা পরিহার ও সাম্প্রদায়িকতা বর্জন প্রভৃতি কার্যক্রম গুলি যথাযথ পালিত হতে থাকে। বড়লাট এসময়ে দেশে শান্তিরক্ষার্থে কয়েক মাসের মধ্যে ৬টি অর্ডিন্যান্স পাশ করেন। ১৩০টি দেশীয় কাগজের জামিন জমা হিসাবে ২ লক্ষ ৪০

হাজার টাকা দিতে হয়। ১৯৩০-৩১-এর দশ মাসের মধ্যে ভারতের প্রায় নব্বুই হাজার নরনারী কারারুদ্ধ হন। কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষিত হয়। জনতার রোষ এ পর্যায়ে এমনই আকাশচুম্বী হয়েছিল যে, কংগ্রেসী নেতারাও জনতার ওপর থেকে কর্তৃত্বের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। বাঙলা দেশে নেমে আসে 'এন্ডারসনী জুলুম' ও বর্বরোচিত অত্যাচার। ১৯৩০-এর মে মাসে আইন অমান্য আন্দোলন বিনাশর্তে প্রত্যাহৃত হলে দেশবাসীর—বিশেষ করে সংগ্রামী মানুষের মনে ক্ষোভ এবং হতাশার সঞ্চার হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯২৯ নাগাদ ইংলণ্ডের প্রচণ্ড আর্থিক সংকটে মুদ্রানীতির মার প্যাঁচে এদেশেও সঙ্গীন অবস্থার সৃষ্টি হয়। টাকার মূল্যে অস্থিরতা, দেশীয় কলকারখানা-গুলি সব সঙ্কটাপন্ন শহরাঞ্চলে বেকার সমস্যা ক্রম বর্ধমান হয়ে ওঠে। কৃষকের ফসলের দাম তলিয়ে যায়, এর ওপর তাদের ঘাড়ে চেপে বসে মহাজন ও জমিদারদের থেকে নেওয়া ঋণের বোঝা। দেনার দায়ে জমি বিক্রির হার অতীতের সমস্ত রেকর্ড ছাপিয়ে যায়। জাতীয় আন্দোলনের ওপর তলায় তখন চলে চুলচেরা বিতর্ক—ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস্, না পূর্ণস্বাধীনতা। অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদী বলে পরিচিত স্বাধীনতা সংগ্রামী যুবকদের বাঙলা জুড়ে দুঃসাহসিক কার্যকলাপ। ফলে আতঙ্কিত ব্রিটিশ সিংহের মরিয়া আক্রমণ।

১৯৩৫-এর শাসন সংস্কার আইনানুযায়ী ১৯৩৭-এর নির্বাচিত জাতীয় কংগ্রেস প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন ভার গ্রহণ করে। সেই সঙ্গে তার মন্ত্রী সভা গুলিকে নির্দেশ দেয় আটক রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে নিখিল ভারত প্রগতি সংঘের প্রতিষ্ঠা ঘটে লক্ষ্ণৌতে। ১৯৩৯ এর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাংলার রাজনীতি-সমাজনীতি ও অর্থনীতির উপর প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। শোষণের ব্যবস্থা নানা বে-আব্রু পদ্ধতিতে চালু হয়। সাম্রাজ্যবাদী শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে আতাত গড়ে তুললো একশ্রেণীর পাতিবুর্জোয়া। ফলে শিল্পে এবং শ্রমিক মালিক সম্পর্কের মধ্যে তাদের নির্লজ্জের দালালি স্বরূপ ছাঁটাই—বেকার সমস্যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল। যুদ্ধের সময় কিছু কর্মসংস্থান বাড়ে ঠিকই, কিন্তু চাকুরির স্থায়িত্বের প্রতিশ্রুতি ছিল না। ফলে যুদ্ধের রসদ যোগানের প্রয়োজনে নির্মিত কলকারখানা ও অফিস গুলোতে শ্রমিক শ্রেণীর একটা বড় অংশ সব সময়ে অনিশ্চিত অবস্থায় তীব্রতম শোষণের মুখোমুখি হয়ে বেঁচে রইলো। শহরে ও গ্রামে জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় খাদ্য-সামগ্রীরও অভাব দেখা গেল। চাকুরির প্রলোভনে গ্রাম ছেড়ে হাজার হাজার দরিদ্র কৃষকও শহরাভিমুখী হলো। ফলে চরম মূল্য দিতে হয় গ্রামের গরীব কৃষকদের।

গান্ধীজীর '৪২-এ 'ভারত ছাড়ো' মন্ত্রে প্রকাশ পেল রাষ্ট্রিক দিক থেকে সরকারকে বিপদগ্রস্ত করে তোলা, অন্যদিকে এর সহযোগী হলো নেতাজীর আজাদ্ হিন্দ ফৌজের 'জয়হিন্দ' অভিযান। আর্থিক সমস্যা প্রতিভাত হলো সমাজতান্ত্রিক সাধনায়, যার জ্বালাময় রূপ দেখা দেয় ১৯৪৩-র দুর্ভিক্ষের করাল ছায়ায় এবং মন্বন্তরে। এরপরে ১৯৪৫-এ জাগরণ। আন্দোলনে উত্তাল কলকাতা, বোম্বাইয়ের নৌবিদ্রোহ, আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের অন্তর্গত বন্দীদের মুক্তি নিয়ে ঝড়, রশিদ আলি দিবস বিমান বাহিনীতে বিক্ষোভ;

অন্যদিকে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, ১৯৪৬-তে কবিজীবনের সমাপ্তি ঘটান সমর সেন, তাই এ বছরেই সংঘটিত বাঙলার তেভাগা আন্দোলন, অন্ধ্রের তেলেঙ্গনা আন্দোলন ইত্যাদির উল্লেখ অপ্রয়োজনীয়।

উপরের সংক্ষেপে আলোচিত রাষ্ট্রিক সংঘটনের পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয় যে, পাশ্চাত্যের শিক্ষিতের নগরাভিমুখিনতার মতোই বাঙলা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়েরও নগরাভিগমন শুরু হয়। ক্রমে ক্রমে কোলকাতা বুদ্ধির রাজধানী হয়ে ওঠে। কোলকাতা কেন্দ্রিক হয়ে পড়ে শিক্ষিত বাঙালী। একান্নবর্তী বাঙালী পরিবার ও যৌথ মনোবৃত্তির মূলে ভাঙন ধরে। যদিও প্রশস্ত হয় ব্যক্তিমুখিনতার পথ। কিন্তু রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজ, বিশেষ করে যুব সমাজ, বিশশতকের গোড়া থেকেই অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের উত্তর যুগ থেকেই ক্রমশ এক হতাশা-অনিশ্চয়তা-অস্থিরতা এবং সব মিলিয়ে প্রচলিত মূল্যবোধ সম্পর্কে বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণায় বিহ্বল হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক জীবেন্দ্র সিংহরায়ের বর্ণনা স্মরণীয়—'প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পরে যে অবসাদ জাতীয় জীবনে দেখা দেয়, তার পেছনে অর্থনৈতিক কারণ ছিলো। দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরণ, যুদ্ধ ভাণ্ডারে দেড়শো কোটি টাকা দান, দেশবাসীর ওপর চাপানো করভার (যুদ্ধের খরচের জন্য), যুদ্ধকালে শিল্প বাণিজ্যে বিশৃঙ্খলা, নতুন কর্মোদ্যোগের অভাব—সব মিলিয়ে একটা অর্থনৈতিক অরাজকতা তখন চলছে। তার ওপর অসহযোগের কালে যখন কর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে গেলো তখন আর্থিক সংকট আরো ঘনিয়ে এলো। সবচেয়ে বড়ো কথা, তিরিশের দশকের দুনিয়াব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা ভারতীয় অর্থনীতিতেও ভয়ঙ্কর ছায়া ফেলতে শুরু করলো। চাকুরী সংগ্রহ করা শিক্ষিত মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠলো। এর অনিবার্য পরিণামে দেশে, বিশেষ করে যুবকদের মধ্যে দেখা দিলো অবসাদ, শূন্যতাবোধ ও বিষাদাত্মকতা। এর অবশ্য আরও কিছু কারণ ছিলো। শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে শুরু করে তৃতীয় দশক পর্যন্ত সময়ের মধ্যে স্কুল-কলেজের সংখ্যা বেড়ে যায়। কলেজীয় ও পোস্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষার সুযোগ বাড়তির ফলে শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অথচ চাকুরীর ক্ষেত্র খুবই সীমিত ছিলো। স্বাধীন উপজীবিকা হিসেবে ওকালতি এ যাবৎ যে ভূমিকা নিয়েছিলো, অধিক ভিড়ের ফলে তার সুযোগ অনেক সংকুচিত হয়ে পড়ে। শিক্ষকতার আকর্ষণ তেমন ছিল না, কারণ তা থেকে ভদ্রভাবে জীবন যাপন করার মতো আয় হতো না। বাঙালির সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এবং বাংলার প্রাদেশিক সীমানা পুনর্বিন্যাস বহির্বাংলায় তরুণদের বসবাস ও জীবিকা নির্বাহের উপায় কতকটা নষ্ট করে ফেলে—শাসকরাও বাঙালি তরুণদের সর্বনাশা প্রভাব থেকে সে-সব অঞ্চল মুক্ত রাখতে প্রয়াসী ছিলেন। স্বাধীন অন্য কোনো জীবিকা সন্ধান ও শিল্পোদ্যোগ তখনও তাদের লক্ষ্য হয়নি। ফলে শহরে নগরে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা স্ফীত হয়ে ওঠে। তারা শহরে ভিড় জমাতে থাকে—মুখ্যত প্রাদেশিক রাজধানী কোলকাতায়, গৌণত অন্যান্য মফস্বল শহরে। আগে থেকে শহরের সঙ্গে শিক্ষা ও কর্মের সূত্রে শিক্ষিত বাঙালির যে যোগ ছিলো তা আরও অব্যবহিত হয়ে ওঠে। ম্যালেরিয়ার অত্যাচার,

জমির উৎপাদন থেকে জীবিকা নির্বাহের কষ্টকরতা, সাংস্কৃতিক আলো বাতাসহীন ও দলাদলি ভরা গ্রামীণ জীবনের দুঃসহতা এবং আধুনিক সুযোগ সুবিধা যুক্ত শহর-বাসের মোহ—এই সব ছিলো তার কারণ। এছাড়া শহরগুলির উপকণ্ঠে স্থাপিত কলকারখানায় চাকুরী সূত্রেও সেখানে থাকার প্রয়োজন বাড়তে থাকে। এদিক থেকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ ছিলো কোলকাতার—উনিশ শতকের আদি পর্বে প্রথম কোলকাতা আমাদের জাতীয় জীবন ও কৃষ্টির কেন্দ্রে পরিণত হয়, তারপর থেকে তার প্রাধান্য বাড়তে বাড়তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে একচ্ছত্র আধিপত্যের আকার নেয়। এর বাইরে কিছু প্রতিপত্তি ছিলো পূর্ববঙ্গের বৃহত্তম শহর ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর তার গুরুত্ব ও জনসমাগম বৃদ্ধি পায়। সে যাই হোক, কোলকাতা ও অন্যান্য বড়ো শহর গুলির জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমস্যাও বাড়ে এবং সেই সব ক্রমবর্ধমান সমস্যার ফল হিসেবে সমাজে ও জীবনে দুঃখ ও অবসাদের ভাগ চক্রবৃদ্ধিহারে জমতে থাকে। সমাজ জীবনের এই প্যার্টান মেয়েদের জীবনকেও অপরিবর্তিত থাকতে দেয় নি। তাদের বিয়ের বয়স যতই বাড়তে থাকে ততই স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজন ও আয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আর তার ফলে দেখা দেয় পারিবারিক বিন্যাসের পরিবর্তন, নারীপুরুষের সম্পর্ক ও সমাজে মেয়েদের স্থান নিয়ে নতুন করে ভাববার প্রয়োজনীয়তা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ের বাংলার সামাজিক অবস্থার আর্থিক ব্যবস্থার এই হচ্ছে মোটামুটি ইতিহাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের আর্থিক অবস্থা বাহ্যত কতকটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে, কারণ যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজকর্ম ও চাকুরী কতকটা সুলভ হয়ে ওঠে। কিন্তু এই যুদ্ধ চলা কালেই সরাকারি অর্থনীতির সমান্তরাল ভাবে আরেকটা অর্থনীতি—কালোবাজার ও কালো টাকার অর্থনীতি চালু হয়। .... এছাড়া ইংরেজ প্রভুদের 'ডিনাইয়েল পলিসি'র ফলে বাংলায় যে পঞ্চাশের মন্বন্তর হয়, তাতে প্রাণ রক্ষার দায় মেটাতে গিয়ে নারী ও পুরুষ এবং তাদের মনুষ্যত্ব প্রায় কেনাবেচার পণ্য হয়ে ওঠে। কোলকাতার মতো শহরের জন বিন্যাসও এই সময় বারবার বিপর্যস্ত হয়—১৯৪০-১৯৪১ সালে বর্মা থেকে দলে দলে ইভাক্যুয়ি আসে,—১৯৪২এর ডিসেম্বর মাসে কোলকাতায় বোমা পড়ার পর দলে দলে লোকের শহর ত্যাগের হিড়িক পড়ে যায়, ১৯৪৩-এ দুর্ভিক্ষের সময় হাজার হাজার মানুষ দু'মুঠো অন্নের জন্য কোলকাতার ফুটপাতে এসে ভিড় করে। আসলে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালটা হচ্ছে বাঙালির প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ গুলি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাওয়ার কাল।'[৪]

—মানসভূমির আবির্ভাব হেতু জন্ম দিল আধুনিক বাংলা কবিতার। বাংলা কবিতার এ সময়ের ইতিহাস—ইউরোপীয় নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব, মার্কসের মতবাদ প্রভৃতির দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপিকা দীপ্তি ত্রিপাঠীর মন্তব্য স্মরণীয় : 'কাব্য যদি জীবনের মুকুর হয় তবে এই জটিল যুগের প্রতিবিম্ব তাকে জটিল করে তুলবে এতে আশ্চর্য কি? ১৯১৪ থেকে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ সময় পৃথিবীর পক্ষে একটা প্রচণ্ড ভাঙাগড়ার যুগ। রাষ্ট্র, সমাজ এবং তার অর্থনৈতিক

ভিত্তি অতিদ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছিল। পদার্থ বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, তুলনামূলক নৃতত্ত্ববাদের ক্ষেত্রেও নানা বৈপ্লবিক চিন্তাধারার আবির্ভাব ঘটেছিল। তার ফলে মানুষের জীবন দর্শন ও মূল্যবোধ সম্বন্ধে প্রাক্তন ধারণা ও বিশ্বাস ভেঙে পড়তে শুরু করেছিল। যদিও এই পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছিল ইউরোপে, তার আকৃতি ও প্রকৃতি প্রথমে খুব স্পষ্ট ছিল না এবং বাংলা সাহিত্যে তার ঢেউ এসে পৌঁছেছিল আট দশ বছর পরে, তবুও আধুনিক বাঙালী কবির চিন্তাধারার গঙ্গোত্রী সেইখানে। আধুনিক বাংলা কাব্যের পটভূমিকা দুই মহাদেশে বিস্তৃত হয়ে আছে.......... আধুনিক কবিরা তাঁদের অব্যবহৃত অগ্রজদের সুকোমল, শিথিল, অতির্মত্য কাব্য কলা বর্জন করলেন।'[৫]

অন্যদিকে প্রবাদ প্রতিম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এ সময়ে তাঁর প্রতিভার চরম উৎকর্ষে প্রতিষ্ঠিত। বিশেষ করে তাঁর ১৯২২-এ প্রকাশিত হয় 'লিপিকা'। গদ্যে রচিত হলেও বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'আধুনিক বাংলা কবিতা'-র সংকলন শুরু করেন 'লিপিকা'-র লেখা দিয়েই। যেখানে বুদ্ধদেব নির্দ্বিধায় মতপ্রকাশ করেছেন—'রবীন্দ্রনাথ নতুন করে জন্ম নিয়েছিলেন'। রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৩২-এ। কবি-ধর্মে তাঁকে রোমাণ্টিক বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। যদিও ইংরেজ রোমাণ্টিক কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেব সাদৃশ্য যেমন চোখে পড়ে, তেমনি স্বাতন্ত্র্যও লক্ষ্য করার মতো। তবু এরই মধ্যে আধুনিক বাংলা কবিতা সচেতন ভাবে ভিন্ন পথে অগ্রসর হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার যে পরিণত রূপ দান করেছিলেন, আলোচ্য পর্বে বাঙালী কবিরা সেই বাংলা ভাষাকেই গ্রহণ করত অগ্রসর হতে চাইলেন।

একদা ইংলণ্ডের 'পোয়েট্রি' পত্রিকাকে (১৯১২) কেন্দ্র করে এজরা পাউণ্ডের নেতৃত্বে যে কাব্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল, ১৯৩৫-এ বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সেরকম একটা কাব্য আন্দোলন বাংলাদেশে গড়ে উঠলো। সেই সঙ্গে বাঙালী আধুনিক কবিরা তদানীন্তন পাশ্চাত্য কাব্যের প্রতি অনিবার্য ভাবে আকৃষ্ট হলেন। বিশেষ করে এলিয়টের মধ্যে আধুনিক কবিরা পেলেন আত্মসচেতনতা, নৈর্ব্যক্তিকতার আদর্শ, ঐতিহ্যের দৃঢ়মূল এবং তৎসঙ্গে বিশ শতাব্দীর এলোমেলো সমাজের অনাস্বাদিত কাব্য রূপায়ন। এই আত্মসচেতনতা বাঙালী কবিদের একেবারে ছিল না যে, তা নয়। ছিল, কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে। এ প্রসঙ্গে জীবনানন্দ জানিয়েছেন, আধুনিক বাঙালী কবিরা কিছুটা হৃদয়ের সাহচর্য ও কিছুটা অভিনবত্ব-গরিমার জন্য এলিয়ট, পাউণ্ড প্রমুখের পন্থা অনুসরণ করলেন। '.......... অন্তত যারা আধুনিক বিশিষ্ট বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথকে তারা বিস্পষ্ট সম্ভ্রমে প্রণাম জানিয়ে মালার্মে ও পলভারলেন, রঁসার ও ইয়েটস ও এলিয়ট এর সদর্থক বা নঞর্থক মনন বিচিত্রতার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।'[৬]

অর্থাৎ পথে-প্রান্তরে, স্কুলে-কলেজে, হোস্টেলে-বাসাবাড়িতে, চায়ের-দোকানে-আড্ডায়, বারে, সরাইখানায়, গ্রামে ও গ্রাম্যহাটে এবং পথচারীদের আলাপ-আলোচনায়, যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতিতে যে জীবন—না সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক, না সম্পূর্ণ ধনতান্ত্রিক, বরং উভয়েরই মিলিত গলিত নাম গোত্রহীন এক সমাজের—সেই জীবনের শরিক হয়েই

সমর সেনের কবি জীবনের শুরু। একদা প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম কাব্যগ্রন্থ, 'প্রথমা' সম্বন্ধে আলোচনা কালে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সহযোগে সমর বাবু যে মন্তব্য করেছিলেন, তা তাঁর কাব্য চিন্তার ও সূচি হিসেবে এখানে গ্রহণ করা যেতে পারে : 'প্রথমা' প্রকাশিত হয় ১৯৩২-এ। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তারিখ এটা। গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলন তখন প্রায় চূড়ান্তে পৌছেছে এবং তার গণ-আন্দোলনে পরিণত হ'বার উপক্রম হয়েছে। ঠিক সেই সময়ে গান্ধীজীর সহসা নির্দেশে সমস্ত আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেল, অন্তত তার পিছন থেকে জনশক্তি সরিয়ে নেওয়া হলো। কিন্তু দেশের যুবকবৃন্দ সম্পূর্ণ সরে আসতে সম্মত হল না এবং যে সন্ত্রাসবাদের বীজ ছিল দেশে, হঠাৎ তা যেন আবার চারদিকে ফেটে পড়লো। সন্ত্রাসবাদের রাজনৈতিক মূল্য নিয়ে যতই মতবিরোধ থাক না, এটা যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের অভিব্যক্তি সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকা উচিত নয়। মোটের উপর জনগণের দৃষ্টিকে সরিয়ে রাজনীতিতে এল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দৃষ্টি। .... এ ক'বছরের মধ্যে (অর্থাৎ ১৯৪০-র মধ্যে) বাঙালী সমাজ মনের অনেকটা পরিবর্তন হয়ে গেছে। সন্ত্রাসবাদ শেষ হয়ে গেল; তার রাজনৈতিব মূল্যে বাঙালী বিশ্বাস হারালো। যে সহজ মানব ধর্মী বিশ্বাস প্রেমেন্দ্র মিত্রের সহায় ছিল তা আজ যথেষ্ট ব'লে বিবেচিত নয়। মানবধর্মে বিশ্বাস আজ বিশিষ্টরূপ নিয়েছে। সামাজিক বৈষম্য, অনাচার, অত্যাচার ও নানাবিধ বিড়ম্বনায় মধ্যবিত্ত কবিদের মনে বিদ্রূপ এবং বিদ্রোহ জমেছে, কাব্যে ও জীবনে মুক্তি ও প্রগতির পন্থা তাঁদের কাছে অন্যরকম।'[৭]

খ. কাব্য পরিমণ্ডল

বিশ শতকে প্রথম মহযুদ্ধের অব্যবহিত পরে বাংলা সাহিত্যের একটা পালা বদল হলো। এ সময় জাতীয় জীবনে কিছু অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক পবিবর্তন দেখা দেয়। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, এসময়ে শিক্ষিত বাঙালী কোলকাতা কেন্দ্রিক হ'য়ে পড়ে। বাঙালীর উনিশ শতকীয় জীবনযাত্রা, বিশ্বাসের স্থায়ী মূল অবলম্বন করে যে বর্ধিত হয়েছিল, সেখানে মাঝে মাঝে আবেগের উত্তালতা দেখা দিলেও ধীর স্থির ভাবটুকু তখনো সে বর্জন করেনি। জীবনের অখণ্ডতা কাব্য সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছিল; মোটকথা এ সময়ের বাংলা কবিতার জীবনবোধের অখণ্ডতাই অধিক পরিমাণে প্রকাশিত। কিন্তু মহাযুদ্ধের প্রবল অস্থিরতা এবং সেই অস্থিরতার ডানা ঝাপটানিতে আগেকার সমস্ত স্থিতিশীল রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-ধর্মনৈতিক চিন্তা সূত্রের ভিতরে ভিতরে বিচলিত হওয়ার লক্ষণ প্রকট হয়। বিশ্বাসের স্থিরভূমি সরে গিয়ে বাঙালীর কাছে খণ্ড খণ্ড অসংলগ্ন চূর্ণ-বিচূর্ণিত বিশ্বাসের হতাশাযুক্ত মনে রাখতেই হবে যে, উৎকৃষ্ট পরিগ্রহণের পথে ক্রমশ মৌলিকত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন অনেক বাঙালী কবিই।

এখন এই 'কবিতা' পত্রিকা গোষ্ঠীর আলোচনায় যাওয়ার আগে—কিছু আগের সাহিত্যিক বাতাবরণের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা করে নেওয়া ভালো।

১৯২৩-এ 'কল্লোল' পত্রিকার প্রকাশ। কল্লোল প্রকাশের আগে আধুনিকতার একটা রূপ ধরা পড়েছিলো 'সবুজ পত্রে' (১৯১৪)। আর পুরোন কাগজ হিসেবে ছিলো 'মানসী'-'মর্মবাণী'-'ভারতী' ইত্যাদি। এ সব কাগজে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের ঊনবিংশ শতকের একটা স্থায়ী মূল্যবোধ ভিত্তিক লেখা পত্র প্রকাশিত হতো। যাইহোক, কল্লোলের সম্পাদক-মণ্ডলীতে প্রধান ভাবে যুক্ত ছিলেন দীনেশ রঞ্জন দাশ। যুক্ত ছিলেন 'পথিক' উপন্যাস খ্যাত গোকুলচন্দ্র নাগ। বাংলা সাহিত্যের তৃতীয় দশকে যিনি, 'শিল্পের জন্য শিল্প' (Art for arts sake)-তত্ত্বের একজন প্রধান সমর্থক। 'কল্লোল' পত্রিকায় কিছু প্রধান আধুনিক কবি কবিতা লেখেন। আধুনিক গদ্য সাহিত্যেরও ধাত্রী গৃহরূপে 'কল্লোল' কে বর্ণনা করা হয়। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মতে—'কল্লোল' বললেই বুঝতে পারি সেটা কি। উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধা-বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্বারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন।'[৮] আর 'কল্লোল' সম্পর্কে বলতে গিয়ে সমকালীন সমাজ ও ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন নন্দ গোপাল সেনগুপ্ত, তাঁর 'সাহিত্য ও স্বাধীনতা' প্রবন্ধে (সাহিত্যের খবর, বৈশাখ ১৩৬৬) : 'বিশশতকেব তৃতীয় দশক থেকে নতুন সাহিত্যের জোয়ার এল দেশে, তা পরোক্ষ ভাবে জাতীয়তার মাটি ছুঁয়ে থাকলেও প্রত্যক্ষভাবে চলে গেল অর্ন্তলোক বিশ্লেষণের এলাকায়, অথবা বাজনীতিক সমাজ চেতনা সৃষ্টির পথে। ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ এবং মার্কসীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এ শতাব্দীর জীবনে ও মনন রাজ্যে যে বিপ্লব এনেছে, বাংলা সাহিত্যের প্রাণপ্রবাহও তা থেকে দূরে সরে থাকতে পারে নি। সাহিত্যিকদের সৃজনী মন চলে গেছে নোংরা মজুর বস্তিতে, অবজ্ঞাত পতিতা, চোর, ডাকাত, ভিক্ষুক, গেঁজেল ও জুয়াড়ীর আড্ডায়। মানুষের অর্ন্তলোক যাচাইয়ের এই প্রয়াস তার সাহিত্যের দ্বিমুখী (জাতীয়তা বনাম আর্ন্তজাতিকতা চিহ্নিত) পথকে শত মুখে প্রসারিত করে দিল। কিন্তু যত বড় সৃষ্টি হলে এই অভিনব মাল-মশলা সার্থক ঐতিহ্য গড়তে পারত, তা হয় নি। প্রথমত লেখকের জীবন বোধ ছিল সীমাবদ্ধ, কেননা বয়স ছিল অল্প এবং অভিজ্ঞতার চেয়ে পুঁথির সঞ্চয়ের ওপরই ভরসা রেখেছিলেন তাঁরা সবচেয়ে বেশী। দ্বিতীয়ত নিজের আদর্শ তাঁদের নিজেই তৈরী করে নিতে হয়েছিল, সামনে কোনো পূর্বাচার্য ছিলেন না। তবু এঁরা স্মরণীয় নতুন যুগের লেখক।' এখানে সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় 'কল্লোলে'র ব্যর্থতাও অভিহিত হয়েছে।

'কল্লোল' কাগজ প্রবর্তিত বাংলা সাহিত্যে যে আধুনিকতার লক্ষণ দেখা যায়, সেগুলির মধ্যে উল্লেখ্য—নতুন যুগের সংশয়, সন্দেহ, জীবনের প্রতিপদে জিজ্ঞাসা, যুক্তির দাবি, বিদ্রোহ, বিক্ষোভ, বিধাতা সম্পর্কে সংশয়াকুল, প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে বন্দী মানবাত্মার জন্য ব্যথা, জীবনের কুৎসিত, নিষ্ঠুর, দুঃখ-দৈন্যময় রূপ সম্বন্ধে সচেতনতা ইত্যাদি। কিন্তু 'কল্লোলে'র লেখকদের অধিকাংশেরই আবেগ ধর্মী উচ্ছ্বাসে মননধর্মী সংহতি লক্ষিত হয় না।

এ হেন 'কল্লোলে' নানা দিক থেকে আসেন নজরুল ইসলাম, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ

মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধ সান্যাল, হেমেন্দ্র কুমার রায়, মনীন্দ্রলাল বসু, মনীশ ঘটক (যুবনাশ্ব), ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ, নলিনী সরকার, জসীমউদ্দিন, হেমচন্দ্র বাগচী, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ভূপতি চৌধুরী, সরোজ কুমার রায়চৌধুরী, শিবরাম চক্রবর্তী, অজিত দত্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায, জগদীশ গুপ্ত, জীবনানন্দ দাশ, যতীন্দ্রনাথ বাগচী, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ লেখক হিসেবে। কিন্তু জমজমাট এই আসর বেশী দিন স্থায়ী হয় নি। ঐকান্তিকতার অভাবে 'কল্লোলে' ভাঙাহাটের মেলা বসে অনতিবিলম্বে। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু জানিয়েছেন—'................. কিছুদিন পরে দেখা গেলো 'কল্লোল' দলের ঐকান্তিকতা আর থাকছে না; শৈলজানন্দ আর প্রেমেন্দ্র শ্রীযুক্ত মুরলীধর বসুর সঙ্গে আলাদা কাগজ বের করলেন 'কালিকলম' (১৯২৬), এ দিকে অজিত দত্তের আর আমার যৌথ সম্পাদনায় 'প্রগতি' (১৯২৭) দেখা দিলো ঢাকা থেকে। 'প্রগতি'র নিয়মিত লেখকদের মধ্যে ছিলেন অচিন্ত্যকুমার, জীবনানন্দ ও তখন সদ্য সমাগত বিষ্ণু দে, ওদিকে 'কালিকলমে' জুটলেন মোহিতলাল, প্রবোধ সান্যাল ও জগদীশ গুপ্ত। নজরুল ইসলাম—তখন তাঁর সৃজনী দিনের মধ্যাহ্ন— তিনটি পত্রিকারই ঝুলি সমানে ভর্তি করে চললেন। 'কল্লোল' তিনভাগ হলো, কিন্তু 'কল্লোলে'র মূল লেখকদের তার প্রতি আসক্তি কমলো না। তাঁদের অনেকেরই অনেক ভালো লেখা অন্য পত্রিকা দুটির প্রলোভন সত্ত্বেও 'কল্লোলে'ই বেরিয়েছে। 'কালিকলম' আর 'প্রগতি' দুটিই স্বল্পজীবী হয়েছিলো, কিন্তু 'কল্লোলে'র স্রোত যে তার পূর্ণতার সময়েই সহসা থেমে যাবে তা আমরা কেউ কল্পনা করিনি।'[৯]

'কল্লোল' পত্রিকা থেকে 'কবিতা' পত্রিকায় যাত্রা কালে মধ্যে আরেকটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা, 'পরিচয়' এর কথা তুলতেই হয়। এটি ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। এর সম্পাদক হন প্রথমে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। বলা বাহুল্য, আজও পত্রিকাটি জীবিত। এটি 'কবিতা' পত্রিকার আগে প্রকাশিত হওয়ায়—এর মাধ্যমে যেমন আধুনিক কবিতা প্রকাশ লাভ করে, তেমনি আধুনিকতার তত্ত্ব বিস্তার লাভে অনেক উল্লেখযোগ্য এবং সৃজনশীল লেখা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

'কল্লোল' পত্রিকার পরে 'প্রগতি' পত্রিকা প্রকাশ করে বুদ্ধদেব বসু বেশী দিন বাঁচিয়ে রাখতে পারেন নি। কিন্তু তাই বলে তিনি নিশ্চুপ হয়েও থাকতে পারেন নি। কোলকাতায় চলে এসে তিনি ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন 'কবিতা' পত্রিকা। কিন্তু কেন করেন?— উত্তরে 'কবিতা'র প্রথম বছরের যুগ্ম-সম্পাদক প্রেমেন্দ্র মিত্র জানিয়েছেন : 'আমার ও বুদ্ধদেবের এক সময় মনে হচ্ছিল, বড় বড় কাগজে কবিতা বের হয় বটে কিন্তু সেটা অনেকটাই পাদপূরণ গোছের। কবিতার নিজস্ব সম্মানের জায়গা যেন সেখানে মোটেই নেই। আমরা তাই গতানুগতিকতার মধ্যে না গিয়ে নতুন কিছু করবার কথা ভাবলাম। ভাবলাম, কবিতা কবিতারই জোরে, নিজেরই অধিকারে তার স্থান করে নেবে। অতএব চাই শুধুই কবিতার ও কবিতা-বিষয়ক একটি কাগজ। ত্রৈমাসিক 'কবিতা'র পরিকল্পনা

হ'ল।[১০] 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদক হন বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। সহকারী সম্পাদক সমর সেন। এই পত্রিকাকে ঘিরে তখন অদম্য উদ্দীপনা লক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব 'আমাদের কবিতা ভবন' স্মৃতি চারণায় জানিয়েছেন— '.............. আমার সে সময়কার ঘনিষ্ঠতম সাহিত্যিক বন্ধু প্রেমেন্দ্র আমার সঙ্গী, প্রধান উৎসাহ দাতা বিষ্ণু দে ও সমর সেন।' আর 'বাবু বৃত্তান্তে' সমর সেন জানিয়েছেন—'পাঁচজন পাঁচ টাকা করে চাঁদা দিয়ে কবিতা-র সূত্রপাত। যতদূর মনে পড়ে পাঁচ জন ছিলেন বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র বাবু, বিষ্ণু বাবু, অজিত দত্ত ও আমি। প্রেমেন্দ্র বাবু অলস প্রকৃতির লোক, দ্বিতীয় বছরে আমি যুগ্ম সম্পাদক হই, কিন্তু সম্পাদনা, প্রকাশনা, টাকা কড়ির হিসাব নিকেশ সমস্ত কিছু করতেন বুদ্ধদেব বাবু।'[১১] সব বক্তব্যই ঠিক। কিন্তু সমর সেন দ্বিতীয় বছরের পরিবর্তে, তৃতীয় বছর থেকে 'কবিতা' পত্রিকায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্থলাভিষিক্ত হ'ন। অর্থাৎ যুগ্ম সম্পাদক। বলা অনাবশ্যক, এখান থেকেই কবি সমর সেনের জন্ম।

কবিতার প্রথম সংখ্যাতেই সমর সেনের Amor Stand Upon You, মুক্তি, স্মৃতি, প্রেম—যথা, 'হিংস্র পশুর মতো অন্ধকার এলো', 'আমার রক্তে খালি তোমার সুর বাজে' আর 'বিষাক্ত সাপের মতো আমার রক্তে তোমাকে পাবার বাসনা' প্রভৃতি পংক্তি সমন্বিত তিনটি কবিতা প্রকাশিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি সংবর্ধিতও হয়। অবশ্য সংবর্ধনাকারীর সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। সেটাই স্বাভাবিক। নতুন প্রতিভাকে হৃদয়ঙ্গম করে স্বাগত জানাবার মতো প্রাণ-মন-শিক্ষাবোধ সর্বকালে সর্বদেশেই খুব কম মানুষের থাকে। তার উপর গদ্যকবিতার লেখক! রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' এবং 'পরিশেষ' নামক গদ্য কবিতার বই দুটি বলা যায় প্রায় সদ্য সদ্যই বেরিয়েছে। এদের বয়েস তখন বছর দুয়েকও হয় নি, এগুলিকেই পাঠককুল হজম করে উঠতে পারে নি—ঠিক এ সময়ে নতুন লেখক, সমর সেনকে গ্রহণযোগ্য ভাবা নিতান্তই কঠিন বলে মনে হয়। তবে এরই ভেতর রবীন্দ্রনাথ সমর বাবুর কবিতা পড়ে, 'কবিতা' পত্রিকায় দ্বিতীয় সংখ্যায় (৩রা অক্টোবর ১৯৩৫) সমালোচনা করে বুদ্ধদেব বসুকে লেখেন : '.......... সমর সেনের কবিতা কয়টিতে গদ্যের রূঢ়তার ভিতর দিয়ে কাব্যের লাবণ্য প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্যে এঁর লেখা ট্যাকসই হবে বলেই বোধ হচ্ছে। ....'[১২]

আলোচ্য পর্বের কয়েকটি বাংলা কাব্য গ্রন্থের উল্লেখ করতেই হয়, যে গুলি প্রধান প্রধান বাঙালী আধুনিক কবিদের রচনা। কারণ এ পর্বে এই কাব্যগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সেই সঙ্গে কোনো কোনো গদ্য রচনাও এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। বলা বাহুল্য, এগুলি সমর সেনের কাব্য জীবনের কিছু আগে-পরেই প্রকাশিত।

জীবনানন্দ দাশের 'ঝরাপালক' (১৯২৭), 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'বনলতা সেন' (১৯৪২), 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮); বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা'(১৯৩০), 'কঙ্কাবতী ও অন্যান্য কবিতা' (১৯৩৭), 'দময়ন্তী' (১৯৪৩), 'দ্রৌপদীর শাড়ি' (১৯৪৮), 'কালের পুতুল' (১৯৪৬); অজিত দত্তের 'কুসুমের মাস' (১৯৩০); প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা' (১৯৩২), 'সম্রাট' (১৯৪০), 'ফেরারী ফৌজ' (১৯৪৮); 'পাঁক', 'বেনামীবন্দর' (১৯৩০);

অমিয় চক্রবর্তীর 'উপহার' (১৯৩৭), 'খসড়া' (১৯৩৮), 'একমুঠো' (১৯৩৯); সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'অর্কেস্ট্রা' (১৯৩৫), 'ক্রন্দসী' (১৯৩৭), 'উত্তর ফাল্গুনী' (১৯৪০), 'স্বগত' (১৯৩৮); বিষ্ণু দের 'উর্বশী ও আর্টেমিস' (১৯৩৩), 'চোরাবালি' (১৯৩৮), 'পূর্বলেখ' (১৯৪১), 'সন্দীপের চর' (১৯৪৭) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া গোকুলচন্দ্র নাগের উপন্যাস 'পথিক' (১৯২৫); মনীন্দ্রলাল বসুর 'রমলা' (১৩৩০); বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯), 'মৌরীফুল' (১৩৩৯); শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কয়লাকুঠি গল্পধারা; অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কল্লোলযুগ'; অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'সত্যাসত্য' (১৯৩২-৫৩) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গণদেবতা' (১৯৪২), 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭), 'জলসাঘর' (১৯৩০), 'বেদেনী' (১৯৪০) ইত্যাদি উপন্যাস ও গল্প সমূহ; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' (১৯৩৭), 'দিবারাত্রির কাব্য' (১৯৩৫) 'পুতুল নাচের ইতিকথা' ও 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) ইত্যাদি গল্প-উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার শিল্পতত্ত্ব প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। অবশ্য এ সমস্ত গ্রন্থাদিতে আধুনিকতার লক্ষণাদি কখনো কখনো বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্রন্থকাররা যে সকলেই আধুনিক চিন্তা ধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত, তাতে সন্দেহ থাকতে পারেনা। বিশেষত কাব্য সাহিত্যে, আধুনিকতার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ—শিল্পের বিভিন্ন মাধ্যম—চিত্রকলা, ভাস্কর্য; সঙ্গীত ইত্যাদির সঙ্গে ভাববিনিময়—তা তাঁরা প্রভূত পরিমাণে করেছেন।

১. রবীন্দ্র কাব্য

'কল্লোল' থেকে 'প্রগতি' পত্রিকা পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৯২৩ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত বাংলা কবিতায় যে একটা ভিন্নতর বাতাবরণের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছিল, রবীন্দ্রনাথ সেটা বুঝতে পেরেছিলেন। পাশাপাশি এ সময়ে লেখা কবির 'লীলাসঙ্গিনী' (পূরবী, ১৯২৫) কবিতায় কবিমনের নিঃসঙ্গতাও পরিস্ফুট হয়েছে। কিন্তু কর্মজীবনে—এ সময়টা কবির অবসরের সময় নয় মোটেই। বিশ্বভারতীর নানা কাজ শুরু হয়েছে, আহ্বান এসেছে বক্তৃতা দেবার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, আমন্ত্রণ এসেছে চীনদেশ ভ্রমণের জন্য, কিছুদিন পরেই আরজেনটিনা যাবেন বলে স্থির, শুরু হয়েছে চিত্রাঙ্কন প্রযাস। অথচ তাঁর কবিতা, সঙ্গী খুঁজে পাচ্ছে না ঠিক মতন। যদিও এই কবিই লিখেছেন 'লিপিকা' (১৯২২)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ ফলে উদ্ভূত যে বাঙালী কবি-লেখক গোষ্ঠীর জন্ম হয়েছিল, 'কল্লোলে'র কোলাহলে যাঁরা নিজেদেরকে যুক্ত করেছিলেন—তাঁদের উন্মাদনার সেই মুহূর্তেই রবীন্দ্রনাথ এই 'লিপিকা' নামক গদ্যকবিকা রচনা করেন। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়—'যে বইতে 'মানসী' থেকে 'বলাকা' পর্যন্ত একজন্ম শেষ করে রবীন্দ্রনাথ নতুন করে জন্মেছিলেন।'[১৩] আর রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে : 'আজ পালা সাঙ্গ করবার বেলায় দেখি কখন অসাক্ষাতে গদ্যে পদ্যে রফানিষ্পত্তি চলেছে। যাবার আগে তাদের রাজিনামায় আমিও একটা সই দিয়েছি। এককালের খাতিরে অন্য কালকে অস্বীকার করা যায় না।'[১৪]

নদীর গতি পরিবর্তনের মতোই 'লিপিকা'ও বিষয়বস্তু এবং প্রকাশ-ধর্মিতার দিক দিয়ে নতুনত্ব সূচিত করলো। বিশেষত এ গ্রন্থের 'প্রশ্ন', 'একটি দিন', 'পায়ে চলার পথ'— প্রভৃতি রচনাকে গদ্য কবিতা বলে স্বীকার করতে কোনো সন্দেহ থাকে না। কবি নিজেও স্বীকার করেছেন 'পুনশ্চ' কাব্যের সূচনায় এই বলে যে, তিনি সচেতন ভাবেই 'লিপিকা' গ্রন্থের কোনো কোনো জায়গা গদ্য কবিতাতে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। এবং গদ্য ও পদ্যের ব্যবধান দূর করতে তিনি পদ্যের বিশেষ ভাষা ও রীতি পরিত্যাগ করেছেন, যেমন—'তবে' 'সনে' 'মোর' প্রভৃতি কাব্যিক শব্দের বর্জনে। প্রসঙ্গত 'পলাতকা' কাব্যটি স্মরণীয়—যেখানে রবীন্দ্রনাথ চলতি প্রবাদ ও ইংরেজি শব্দের নিরঙ্কুশ ব্যবহার করেছেন। এজন্য কোনো কোনো সমালোচক কবির গদ্যছন্দ বা ভাবছন্দের উদ্ভব সম্পর্কে এই বলে মত প্রকাশ করেছেন : 'পলাতকা' (১৯১৮)-র চলতি বাংলার মুক্তকছন্দ থেকেই গদ্যছন্দের উদ্ভব বলে মোটামুটি ধরে নেওয়া যায়। বিষয়বস্তুও এখানে উর্ধলোকের ভাব কল্পনা নয়—নিতান্ত সাদাসিধে আটপৌরে চলন তার চাল চলনে।'[১৫] কিন্তু ভালো ভাবে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, ছন্দের বন্ধন এখানেও বর্তমান। যাইহোক, 'লিপিকা' রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতার আদিরূপ না হলেও—এখানেই কবি আচার্যের ভূমিকায় থেকে অভ্যর্থনা জানালেন নতুন কালের বর্ষকে। কবির নিজেকে গড়ে পিঠে নতুন চেহারা দিয়ে কালের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলবার একটা চেষ্টা বরাবরই ছিলো। সে চেষ্টায় তিনি কখনো নবযৌবনের বাঁধন ভাঙা কাব্য 'বলাকা' (১৯১৬) লিখেছেন, কখনো বা ছন্দহারা গদ্যকাব্য—'পুনশ্চ', 'শেষ সপ্তক' লিখেছেন। কিন্তু সেই কাব্যগুলির কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি। যদিও প্রায়শ কবিকণ্ঠে গদ্য ছন্দের স্বপক্ষে মন্তব্য উচ্চারিত, তবু কবি মনেপ্রাণে কতটা গদ্য ছন্দের পক্ষপাতী ছিলেন সে বিষয়ে এখানে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দকে মূল্যদান সম্পর্কে বিভিন্ন কৈফিয়তকে স্মরণ রেখেও একথা বলা অনুচিত হবে না যে. কবির দীর্ঘজীবনের কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে ছন্দ ও শিল্পকলা সম্বন্ধে তাঁর যে সচেতনতা—তাই-ই গদ্যছন্দ প্রচেষ্টার অন্যতম কারণ। কবির শিল্পমানসে পথমাবধি যে জিনিসটি কাজ করেছে—তা হল কাব্যের আসল সত্যকে আবিষ্কারের চেষ্টা। এরই পাশাপাশি তাঁর মানসপটে সচেতনে এবং অবচেতনে সমানে কাজ করে গেছে নিম্নলিখিত কারণগুলি :

১. জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক প্রবণতা—বেদ, উপনিষদ, লৌকিক ছড়ার ছন্দের মধ্যে যার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ।

২. বাংলা-সাহিত্যের রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী লেখক এবং কবিদের সক্রিয় চেষ্টা।

৩. বর্তমান যুগজীবনে অতিবাস্তব ঘটনাকে ও জীবন সচেতনাকে মূল্যদান।

৪. পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব।

বিশদ করে বললে দাঁড়ায়—

১. পৃথিবীর সমস্ত দেশের জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় —মানুষের মনের আদিম চেষ্টা লিপিবদ্ধ রয়েছে ভাবছন্দের মধ্যে। সেখানে মানুষের

মনের উপলব্ধ ভাবগুলি স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণাবেগে আত্মপ্রকাশ করেছিল সুরের মাধুর্যে মণ্ডিত হয়ে। সুর ধর্মিতা বা ভাবের বিচারে এগুলি কাব্য আখ্যা পেলেও ছন্দের দিক থেকে বিশেষ কোনো মিলের বন্ধনকে এরা স্বীকার করেনি। ভাবের স্বাভাবিক পরিপূর্তির দিকে লক্ষ্য রেখেই এসব গ্রন্থের পঙক্তি বিন্যাস করা হয়েছে। অতএব পরবর্তীকালের গদ্যছন্দ বা ভাবছন্দের আদিরূপের সন্ধান এর মধ্যে করা চলে। আবার বাংলা ছড়ার ছন্দ বা লৌকিক ছন্দের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনায় ধরা পড়ে একটি অনায়াস লব্ধ ধ্বনি-বিন্যাস—যার মধ্য দিয়ে সহজে ভাবকে লোকের মনে পৌঁছে দেওয়া যায়। ভাবের এই স্বতঃস্ফূর্ততা মানুষের অবচেতন মনে যে ধ্বনি স্পন্দন জাগায় তার থেকেই লৌকিক ছন্দের জন্ম। অর্থাৎ জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক প্রবণতার জন্মদানে এগুলি সক্রিয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্প মানসে এই স্বাভাবিক প্রবণাতাকে স্বীকার করেছেন এবং পূর্ণ মূল্য দিয়ে তাঁর 'বাংলা ভাষা পরিচয়' গ্রন্থে জানিয়েছেন : 'চলতি ভাষার স্বভাব রক্ষা করে বাংলা ছন্দে কবিতা যা লেখা হয়েছে সে আমাদের লোকগাথায়, বাউলের গানে, ছেলে-ভোলাবার ও ঘুম পাড়াবার ছড়ায় ব্রতকথায়। ....চলতি ভাষার কবিতা বাংলা শব্দের স্বাভাবিক হসন্তরূপ মেনে নিয়েছে। হসন্ত শব্দ স্বরবর্ণের বাধা না পাওয়াতে পরস্পর জুড়ে যায়, তাতে যুক্তবর্ণের ধ্বনি কানে লাগে। চলতি ভাষার ছন্দ সেই যুক্তবর্ণের ছন্দ।'

২. ছন্দোমুক্তির সাধনায় বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী লেখক ও কবিসম্প্রদায়ের সক্রিয় চেষ্টাও কবিকে অনেকটা সাহায্য করেছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগে বিদ্যাসাগরের শিল্প প্রতিভার স্পর্শে যে প্রথম গদ্য-রচনায় ছন্দোনুখী প্রবণতা দেখা দিয়েছিলো—এ সম্পর্কে কবির 'ছন্দ' প্রবন্ধে নিজস্ব উক্তি গ্রহণযোগ্য—'গদ্যের পদগুলির মধ্যে ধ্বনি সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া .... বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।' সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বিদ্যাসাগরের এই 'অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত' আরও বেশী সার্থক হয়ে ওঠে। বঙ্কিমের 'কবিতা পুস্তকে' (১৮৭৮) 'মেঘ', 'বৃষ্টি' ও 'খদ্যোত' প্রভৃতি রচনার মধ্যে গদ্য কবিতার সুস্পষ্ট পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়। এখানে বঙ্কিম প্রচলিত বিধি নিষেধকে লঙ্ঘন করে গদ্যের চলনের মধ্যে কাব্যরসকে যে অনুপ্রবেশ করানো চলতে পারে, সেকথাও সগৌরবে ঘোষণা করেছেন। সঞ্জীবচন্দ্রের গদ্যরচনার মধ্যেই গদ্যের এই শিল্প সুষমা আরও বেশী পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। তবে বঙ্কিমচন্দ্র গদ্যকবিতা রচনার প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেও এই রচনাকে কবিতার মতো খণ্ডিত অংশে পঙক্তি বিভাগ করে সাজাননি। পক্ষান্তরে, রাজকৃষ্ণ রায় 'বর্ষার মেঘ' ('আর্যদর্শন' পত্রিকা, জুলাই ১৮৪৮) নামক একটি কবিতায় প্রথম এই বাক্‌ছন্দের বিভাগ অনুসারে ভেঙে ভেঙে বিন্যস্ত করে গদ্যকবিতা হিসেবে সাজান। সেই সঙ্গে তিনি এর নাম দিয়েছিলেন 'পদ্য পঙক্তিক গদ্য'। এই হলো বাংলা-সাহিত্যে গদ্যের পদ্যাভিমুখিতার ইতিহাস। এছাড়া পদ্যের ও গদ্যাভিমুখিতার ভিতর দিয়ে গদ্য কবিতার জন্ম হয়। কবিতার ক্ষেত্রে বাংলা

সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতেই প্রথম সুরের আশ্রয় ত্যাগ করে রচনায় গদ্য-অভিমুখিতার সূত্রপাত। এই পথ বেয়েই উপস্থিত হয় 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দ মধুসূদনের হাত ধরে। এই প্রথম সুস্পষ্ট পদক্ষেপ পদ্যবন্ধের গদ্যবন্ধের অভিমুখে। 'ছেদ' ও 'যতি'র সুনিয়ন্ত্রিত সুসংবদ্ধ বন্ধনকে কাটিয়ে এখানে ভাব অনেকখানি মুক্তি পেলো। চোদ্দ অক্ষরের বেড়ি তার পায়ে তখনো পরানো অবশ্য। ছন্দের বন্ধন মুক্তির দ্বিতীয় পদক্ষেপ হলো গিরীশচন্দ্রের হাতে। তাঁর নাটকের সংলাপ রচনায় গদ্যসুলভ বাক্‌ভঙ্গির অনুসরণে ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষরের জন্ম। এই সময় রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যা সংগীত' ও 'প্রভাত সংগীতে'র অসম পঙক্তিক পদ্যবন্ধ রচনার মধ্যে এ প্রবণতার মৃদু স্পর্শ আভাষিত। মোটকথা পদ্যের এই গদ্য চলন ভঙ্গি কাব্যের ক্ষেত্রে একেবারে নতুন কিছু নয়—নতুন হল একে 'গদ্য কবিতা' বলে সোজাসুজি মূল্যবান করা। মানুষের অতিরিক্ত বাস্তব সচেতনতাই একে নতুন মূল্যে গ্রহণ করলো বলা চলে।

৩. আধুনিক যুগের যুগযন্ত্রণাকে এবং অতিরিক্ত বাস্তব সচেতনতাকে মূল্যদান — রবীন্দ্রনাথ একেবারে উপেক্ষা করতে পারেননি বলেই কাব্যের চলনের দিক থেকে গদ্যছন্দকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে সমগ্র পৃথিবীর ভাঙ্গাগড়া ইতিহাসকে রবীন্দ্রনাথও প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর নিজস্ব রোম্যান্টিক ধর্মের মধ্যেও কোনো ত্রুটি দেখতে পাননি। ফলে তিনি এ সময়ের কাব্যে বিষয়বস্তু ও প্রকাশ-ধর্মিতার দিক দিয়ে কিছু কিছু নতুনত্ব আনলেও, যে সহজ দৃষ্টিতে জীবনকে দেখেছিলেন তার মূল্যবোধ কিছুমাত্র কমে গেল না। দীর্ঘজীবনের সাধনায় তিনি জীবনে যে সমন্বয়ের সন্ধান পেয়েছিলেন—সেই মানসিক স্থৈর্যকে কোনো কারণেই নষ্ট হতে দেননি। তাই গদ্যছন্দকে 'পুনশ্চ' কাব্যে গ্রহণ করে পরবর্তী কাব্যত্রয়—'শেষ সপ্তক', 'পত্রপুট' ও 'শ্যামলী'র মধ্য দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিক যাই হোক না কেন, তাকে প্রকৃত রসোত্তীর্ণ করে তোলাই শিল্পীর যথার্থ সাধনা। কিন্তু এই গদ্য ছন্দ বা ভাবছন্দ যে কেবল অতিবাস্তব বিষয়বস্তুকে এবং চিন্তাধারাকে প্রকাশ করতে সক্ষম তা নয়। কবি এই ছন্দের মধ্য দিয়ে চৈতন্যলোক থেকে অচৈতন্য লোকের সমস্ত ভাব এবং ভাবনা, উপলব্ধি এবং জীবন চেতনাকে কাব্যোত্তীর্ণ করে অভাবনীয় শিল্প সাধনায় নিমগ্ন হয়েছেন।

৪. বিশ শতকের উগ্র বাস্তববাদ এবং জীবনের নতুন মূল্যায়ণ, ইউরোপীয় শিক্ষা এবং জীবনবোধ থেকেই আমাদের সাহিত্যে এসেছে বললে অত্যুক্তি হবে না। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবকে এব্যাপারে একেবারেই অস্বীকার করা যায় না। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভিত্তিভূমি যে ইউরোপীয় সাহিত্য এবং জীবন দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত—একথা রবীন্দ্রনাথও নিজে স্বীকার করেছেন। সেই সঙ্গে বিদেশের এবং বিদেশী সাহিত্যের যা কিছু ভালো তাকে বরণ করে নিতে দ্বিধা করেননি তিনি। তাই বলে চিরন্তনকে আঘাত হানার প্রতি আধুনিক সাহিত্যিক বা কবিদের যে উদ্ধত মনোভাব তাকেও সুস্থ মানসিকতা বলে মানতে পারেননি। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, ইংরেজী

সাহিত্যের 'Free Verse' বা 'ভাবছন্দের' প্রভাব তাঁর মনে একেবারে পড়েনি—একথা মানতে কষ্ট হয়। তেমনি কোনো সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে একে বর্জন করেননি বলেই আমাদের বিশ্বাস। তাঁর মনের অফুরন্ত গ্রহণ ক্ষমতা বলে তিনি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আপন চিন্তা এবং চেতনাকেও মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন। কাজেই 'বলাকা'র যুগ থেকে কবির মধ্যে কয়েকটি নতুন প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। আর আধুনিক সাহিত্যের দাবী—ছন্দকে বর্জন করে কাব্যের মধ্যে গদ্যের সহজ সুষমাকে আনার চেষ্টাকে তিনি ধীরে ধীরে ফলবতী কবে তুলতে চেয়েছিলেন।[১৬]

উপরেব এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই 'পুনশ্চ' পর্বে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পদ্যের form ভেঙেছে, তা আসছে গদ্যের দিকে। একে তিনি নিজে বলেছেন বিষয়ের প্রয়োজন। বিষয়ানুসারিতার কথা তিনি আধুনিক কাব্যের লক্ষণ বলে উল্লেখ করেছেন তাঁর 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে। Form যেমন বদলালো, তেমনি বদলালো তাঁর বিষয় তাঁর ভাষা। কাব্যের অতি মাধুর্য থেকে সরে এসে আধুনিক জীবনগতির উচ্চাবচতাকে প্রকাশ করার জন্য নিলেন গদ্যছন্দ। গদ্যছন্দ—কিন্তু সেও পর্বসৌষম্যের দ্বারা রচিত। পর্ব সমতা তাঁর গদ্য কাব্যের অবিসংবাদিত লক্ষণ—উচ্চাবচতার পক্ষে তা সম্পূর্ণ প্রকাশোপযোগী নয়। শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন যে, গদ্যছন্দে যাবার পথে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রকৃত কবিতার অনুবাদ করতে গিয়ে একবার প্রকৃত free verse লিখেছিলেন—

> 'বৃষ্টি ধারা শ্রাবণে ঝরে গগনে
> শীতল পবন বহে সঘনে
> কনক বিজুরি নাচেরে, অশনিগর্জন করে
> নিষ্ঠুর অন্তর মম প্রিয়তম নাই ঘরে।'

রবীন্দ্রনাথ এরকম কবিতা লেখেননি। এই প্রসঙ্গ মনে রেখে বলা যেতে পারে পুনশ্চের গদ্য কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এতদিনকার অকথিত জীবনের যে সংবাদ দিতে এসেছেন, তা তাঁরই মনোধর্মের গুণে শেষ পর্যন্ত হয়ে পড়েছে সুষম, যে শতাচ্ছন্ন জীবনের সংবাদ দিতে তিনি আগ্রহী 'বাঁশী' কিম্বা 'ছেলেটা' কিম্বা এরকম কোনো কবিতায় তাও শেষ পর্যন্ত তাঁর পূর্ববর্তী সৌন্দর্য চেতনার দিগদর্শনকে প্রকাশ করে। আর এজন্যই রবীন্দ্রনাথ কেন প্রকৃত অর্থে free verse লিখলেন না বোঝা যায়—কেন তাঁর মনোধর্মের পক্ষে free verse একেবারে অসঙ্গত হতো—তা স্পষ্ট হয়।

রবীন্দ্রনাথ জীবনের আঁকাড়া বাস্তবকে প্রকাশ করতে আগ্রহী, কিন্তু যতক্ষণ না তাকে তাঁর মনক্ষেপে সুষম করতে পারছেন ততক্ষণ তাঁর স্বস্তি নেই। আর সেজন্যেই 'বাঁশি' কবিতার নায়ক হঠাৎ সন্ধ্যায় সিন্দুবারোয়াঁর তান শুনে সৌন্দর্যের এমন এক জগতে উধাও হয়, যেখানে আকবর বাদশাহের সঙ্গে তাঁর কোন ভেদ থাকে না। এই হলো রবীন্দ্রনাথের স্বক্ষেত্র। এখানে পৌঁছে তিনি স্বস্থ। যেহেতু জীবনের উচ্চাবচতাকে স্বচ্ছন্দ করায় তাঁর আগ্রহ—সেজন্য আঙ্গিকও দেখি free verse রবীন্দ্রনাথ লিখছেন না,

লিখছেন গদ্য কবিতা। প্রসঙ্গত শিশির কুমার দাশের কথা স্মরণ করি। তিনি লিখেছেন 'রবীন্দ্রনাথ পদ্যের ছন্দের বন্ধন ভেঙ্গে তাকে গদ্যমুখী করার কথা ভাবেননি ভেবেছিলেন ঠিক তার উল্টো, গদ্যকে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা পদ্যের দিকে।'[১৭] এই মন্তব্যের আলোকে রবীন্দ্রনাথের দুয়েকটি গদ্য রচনার কথা তুলতেই হয়। বিশেষ করে, 'শেষের কবিতা' (১৯২৯) উপন্যাসে অমিতের আধুনিকতার স্বপক্ষে যুক্তি বিস্তারে। আরও পরবর্তীকালে, 'মালঞ্চ' (১৯৩৪) উপন্যাসের চরিত্রের পরিবর্তন বর্ণনায় এবং অন্যত্র। অর্থাৎ গদ্য যে কতখানি পদ্য হয়ে উঠতে পারে তার নিদর্শন এখানে প্রভূতভাবে রেখেছেন কবি। যেমন—'নীরজার আজকালকার মনখানা বাদুড়ের চঞ্চুক্ষত ফলের মতো।' অথবা, 'কাঁটা-আগাছার মতো। অমঙ্গল নাম নিয়ে আতঙ্কের জঙ্গল উঠেছে। চারিদিকে সারিসারি জীর্ণ ভিতে ভেঙে পড়া অতীতের বিরূপ বিকৃতি। কাপুরুষে করিছে বিদ্রূপ।' ইত্যাদি বর্ণনায়।

শিশির বাবুর কথা সুত্রেই একটা বিপরীত সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হয়। যেমন ছন্দের বন্ধন ভাঙতে ভাঙতে রবীন্দ্রনাথ গদ্যে নেমে আসেননি—গদ্যকেই এনেছিলেন কাব্যের ক্ষেত্রে, তেমনি সাধারণ জীবনের দিকে রবীন্দ্রনাথ কাব্যের জীবনমুখিনতার প্রবাহে নেমে আসেননি। তিনি সাধারণ জীবনের বাস্তবকে কালের প্রবর্তনায় গ্রহণ করেছেন তাঁর কাব্যে, কিন্তু একান্ত নিজস্বরীতিতে পুরোন style এ। যেখানে ছেলেটা উধাও হয় পরিচিত জগৎ থেকে অপরিচয়ের সৌন্দর্যলোকে—এরকম সকলেই। তিনি যে বঙ্কিম প্রবর্তিত পথেরই পথিক সে কথাও প্রমাণ হয় তাঁর এই মানসিকতায় এবং স্বীকারোক্তিতে ঃ 'বঙ্কিম যে যুগ প্রবর্তন করেছেন আমার বাস সেই যুগেই। সেই যুগকে তার সৃষ্টির উপকরণ যোগানো এ পর্যন্ত আমার কাজ ছিল।'[১৮]

অর্থাৎ 'পুনশ্চ' থেকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বুদ্ধিগত জীবন চেতনার প্রসার ঘটলেও তাঁর শাশ্বত মূল্যবোধ থেকে কোনো দিনই তিনি বিচ্যুত হননি। এপর্বের কাব্যে রূপ ও বিরূপকে সমানভাবে তিনি মর্যাদা দিয়েছিলেন। ভাষার শুচিবায়ু অনেকটাই ত্যাগ করেছিলেন সত্য, তবু তাঁর আধুনিকতা একমাত্র তাঁরই নিজস্ব কীর্তি। আধুনিক কবিদের সঙ্গে মেলে না। কারণ প্রেমের চিরন্তন রূপে আস্থা, মানুষ সম্বন্ধে আশা, ধর্মের প্রতি সুগভীর বিশ্বাস, পৃথিবী সম্বন্ধে বিস্ময় বোধ—এগুলি কোনোটিই শেষ পর্যন্ত পরিত্যাগ করতে পারেননি। এখানেই আধুনিকদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য।

রবীন্দ্রনাথের শেষ প্রেমের কাব্য, 'সানাই' (১৯৪০)-এ এসেও লক্ষ্য করা যায় অনির্বচনীয় দেহ হীন বিশুদ্ধ প্রেমের সংরাগ। যার জন্য আধুনিক কবিরা তাঁকে অতিক্রম করে যেতে চাইলেন। কারণ তাঁদের জীবনদর্শন এর বিপরীত। তাঁরা জীবনের রঙ্গ ভূমিতে প্রধান ভূমিকায় বিরূপকেই অবতীর্ণ হতে দেখেছেন, দেহহীন বিশুদ্ধ প্রেম তাঁদের কাছে তাই মাত্রা পায় না। দ্বিতীয়ত, আধুনিকদের সৌন্দর্য সম্বন্ধে ধারণাও রবীন্দ্রনাথের ধারণা থেকে স্বতন্ত্র ছিল। আধুনিকরা আবির্ভাব লগ্নেই যেভাবে সমাজ ও ব্যক্তির

সংশয়দীর্ন ও সংকটাপন্ন রূপটিকে দর্শন করলেন, সেখানে রবীন্দ্রনাথের ধ্রুববীজটি : 'সৌন্দর্য আমার কাছে প্রত্যক্ষ দেবতা'[১৯]—মানতে পারলেন না। তৃতীয়ত রবীন্দ্রনাথের একটা বাস্তব সম্বন্ধে সীমাবদ্ধ ধারণা ছিল। তাই তাঁকে ১৯৩৯-এ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তাণ্ডবও ক্ষণকালের জন্য দ্বিধান্বিত করতে পারেনি। মানব সভ্যতার শোচনীয় পরিণাম জেনেও মানুষকেই বিশ্বাস করেছেন তিনি। 'আরোগ্যে'র '১ সংখ্যক' কবিতায় তিনি তাই বলেছেন—'এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি/অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি'। একথা আধুনিকরা মানতে পারেননি। তাঁদের কাছে উপনিষদের বাণী মূল্যহীন হয়েছে। চতুর্থত, সাম্যবাদী দর্শন সম্বন্ধে সচেতনতা রবীন্দ্রনাথের কাছে তেমন ভাবে মাত্রা পায়নি। এদিকটা কমবেশী প্রায় সব আধুনিক কবিই লক্ষ্য করেছেন।

উপরের এই চারটি কারণের জন্যেই মূলত আধুনিক কবিরা বুঝেছিলেন, নতুন কালের নতুন কবি হিসেবে স্বয়ংকৃত হতে গেলে তাঁদের পক্ষে রবীন্দ্র-পরিহার একান্তভাবেই প্রয়োজনীয়। শুধু তাই নয়, উপরিউক্ত দৃষ্টিভঙ্গির সুষম প্রয়োগে বা উপস্থাপনায় রবীন্দ্রনাথকে পেরিয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। যদিও রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে বসতে চাওয়া কিম্বা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চাওয়া—কাজটা খুব একটা সহজ ছিলো না। যেহেতু নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর থেকে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাঙালীর অবিসংবাদিত আন্তর্জাতিক পরিচয় ও বাংলাভাষার অভিভাবক কল্প কবি ব্যক্তিত্ব। সুতরাং যে—কোনো কবিকর্মীরই মনে রবীন্দ্রনাথের একটু স্নেহ ও সমর্থন পাওয়ার প্রত্যাশা থাকা স্বাভাবিক ছিলো। অবশ্য প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর তরুণ কবিদের রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সংশয় ছিলো। একদিকে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রকাব্যের সর্বব্যাপী প্রভাব থেকে এড়িয়ে থাকার প্রয়াস—অন্যদিকে তাঁর আশীর্বাদ লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। তাই খুব সম্ভব তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে মেনে নিয়ে তাঁকে অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন। তবে তাঁরা সেকথা পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করতে পারেননি। কিন্তু ইতিহাসের দিক থেকে তাঁরা এও বুঝেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের দিন শেষ হয়ে এসেছে। এ প্রসঙ্গে জীবনানন্দ দাশের মন্তব্য মনে পড়ে, 'তাঁর প্রকৃত কাব্যলোকে সমাজ ও ইতিহাস চেতনা একটা নির্ধারিত সীমায় এসে তারপর মন্থর হয়ে গেছে। আধুনিকের কবিতা সেই কিনারার থেকে সূত্র তুলে নিয়ে যে ধরনের সমাজ ও ঐতিহ্যবোধের আশ্রয় গ্রহণ করেছে তার পরিচয় রবীন্দ্রকাব্যে পাওয়া যায় না বললে উক্তি অসঙ্গত হবে, কারণ রবীন্দ্রকাব্য বিরাট সমুদ্রের মতো—কিন্তু তাঁর শেষ জীবনের কবিতাও—পুনশ্চ, রোগশয্যায়, আরোগ্য প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থেও—এই জিনিস রবীন্দ্রকাব্যে প্রধান স্মরণীয় বিষয় নয় বলে কবি এর দিকে সম্পূর্ণ মনঃক্ষেপ করতে উদাসীন এবং এর প্রকাশ তাঁর কাব্যে রবীন্দ্র-প্রতিভার স্বাক্ষর থেকে বঞ্চিত। এইখানেই কোনো কোনো আধুনিকদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অমিল। দৃষ্টিভঙ্গির এই ব্যতিরেকী গতির জন্যে আধুনিক বাংলা কবিতার চিন্তা ও ভাষা রবীন্দ্রকাব্যের থেকে পৃথক পথে চলতে শুরু করেছে।'[২০]

২. আধুনিক কবিগোষ্ঠী

'কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী, এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত অন্তত মুক্তি প্রয়াসী, কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছি।'[২১] আবু সয়ীদ আইয়ুবের একথা স্বীকার করে নিলে, আধুনিকতার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি সম্পর্কে আমাদের ভাবিত হতেই হয়। বিশেষত তিনি যখন রবীন্দ্র প্রভাব মুক্তি বা তার প্রয়াসের কথা বলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিপুল বিচিত্র কাব্য-সাধনায় বাঙালী কবিকুলকে অস্বস্তিতে ফেলবেন যে তাতে সন্দেহ থাকে না, তাই তাঁর কাব্যের বিষয় ও রূপের বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করে নতুন ভাবে বাংলা কবিতায় দীক্ষা নেওয়া প্রায় অসম্ভবপর ব্যাপারই বটে। সকলের কাছেই তো সম্মুখেতে 'পথরুধি রবীন্দ্র ঠাকুর'।[২২] অথচ জীবন ও জগৎ দ্রুত বদলে যাচ্ছে। মানুষের উপর যান্ত্রিক জীবনের প্রভাব বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। বিজ্ঞানের নানান আবিষ্কারে পুরানো ধারণা ভেঙে যাচ্ছে। আমূল পরিবর্তন ঘটছে ব্যক্তিগত ও সমাজ কেন্দ্রিক জীবন বোধের। স্থায়ী সত্যবোধ, কল্যাণবোধ ও মনুষ্যত্ববোধ থেকে ক্রমেই মানুষ ভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে যেন। সমাজের সংকীর্ণতা, কুশ্রীতা ও অচলায়তনের মধ্যে সেই অজর-অক্ষয় রবীন্দ্রনাথের 'শুভংকর কল্যাণ'-জগতের সৌন্দর্যতত্ত্বে আধুনিক কবিরা তাই আস্থা রাখতে পারেননি। এ অবস্থায় তাঁরা স্বভাবতই দ্বিধাচল হ'য়ে পড়েন। প্রতিষ্ঠিত কাব্যাদর্শ এবং জীবনসত্যের সম্বন্ধে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া তাঁদের মনে দেখা দিল। জীবন সম্পর্কে একটা কঠিন নাস্তিকতা, তীব্র অসন্তোষ এবং তীক্ষ্ণ বিদ্রূপাত্মক মনোভাব তাঁদের কাছে একমাত্র সত্য বলে ধরা পড়লো।

আধুনিক কবিরা তাঁদের কাব্যে-কবিতায় অতিরিক্ত জীবন সচেতনতা বোঝাতে প্রচলিত রোম্যান্টিকতা, ভাবালুতা, আদর্শবাদ ও আস্তিক্যবাদের প্রতি প্রতিবাদ জানালেন। সামাজিক মানুষ হিসেবে চারপাশের অবক্ষয়ী চেতনাকে রূপ দিতে গিয়ে তাঁরা দেখেছেন— 'যুগধর্মে দীক্ষাগ্রহণ তার (আধুনিক বাঙালি কবির) অবশ্য কর্তব্য। একথা না মেনে আর উপায় নেই যে প্রত্যেক সৎ কবির রচনাই তার দেশ কালের মুকুর, এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যে যে দেশ ও কালের প্রতিবিম্ব পড়ে, তাদের সঙ্গে আজকালকার পরিচয় এত অল্প যে উভয়ের যোগফলকে যদি পরীর রাজ্য বলা যায় তাহলে বিস্ময় প্রকাশ অনুচিত।'[২৩] এই কবিরা কেউ কেউ প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনিমগ্ন হলেও পরে প্রত্যেকেই স্বীয় মুক্তির পথ খুঁজতে প্রয়াসী হন। সমসাময়িক জীবন ও জগতের ভাঙচুরকে নিজেদের প্রতিভা বলে কাব্য শরীর দান করেন। প্রেমের পাশাপাশি প্রেমহীনতা, আদর্শ প্রেমের সঙ্গে দেহজ প্রেমের স্তর বিভাজন ইত্যাদি সম্পর্ক তাঁরা অস্বীকার করেন। সুধীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যেতে পারে—'সে যদি বাঁচতে চায়, তার ধ্বংসাবশিষ্ট পৈত্রিক প্রাসাদের অন্তঃপুরে বসে রূপকথার রাজপুত্রের স্বপ্ন দেখা কাব্যের আর চলবে না, তাকে বেরিয়ে আসতে হবে, পোকায় খাওয়া শিরোপা, মরচে পড়া সাঁজোয়া, রজ্জুসার জয়মাল্য ফেলে তাকে বেরিয়ে আসতে হবে হাটের মাঝে, সেখানে পাপ-পুণ্য, ভালোমন্দ, দেব-দানব সমস্বরে জটলা পাকাতে ব্যস্ত।'[২৪]

এই সূত্রেই আমরা দেখি, রবীন্দ্রকাব্য ভাবনার সমান্তরাল আরেক কাব্য-জগৎ। আর এই

কাব্য জগতের অধিবাসীরা আবার অধিকাংশই পাশ্চাত্য কাব্য-আন্দোলন, প্রতীকী আন্দোলন, ইমেজিস্ট আন্দোলন, সুররিয়ালিস্ট আন্দোলন ইত্যাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত। তাঁরা একথাও মনে করতেন যে, নিজের দেশের কবিতার দীর্ঘকালের ঐতিহ্যের ভিতরে স্থিত হয়েও আজকের মুখ্য কবি পৃথিবীর, বিশেষত পশ্চিমের শ্রেষ্ঠ কাব্য উপলব্ধি করতে পেরে বাংলা কবিতাকে এমন এক জায়গায় এনে দাঁড় করাতে পেরেছেন, যে তার ভবিষ্যৎ পরিণতির প্রশ্ন বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, পূর্ববঙ্গের গীতিকা বা মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথের সত্যের ভিতরেই শুধু আটকে নেই—কিন্তু যেখানেই মানুষ তার স্বতন্ত্র আধুনিক চেতনাকে মহান কবিতায় প্রকাশ করতে পেরেছে, সেসবের সঙ্গেও যুক্ত। আগাগোড়া বাংলা কাব্যের সঙ্গে আত্মীয়তা বোধ সর্বদাই দরকারি; কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরকার ওদেশের—বিশেষত ইংরেজি এবং ফরাসি কবিতার মর্ম হাড়ের ভিতরে বোধ করবার শক্তি।[২৫]

বলা বাহুল্য, এই শক্তিতেই বলশালী হয়ে এঁরা রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বের প্রভাবকে কাটিয়ে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। এবং এঁরা বস্তুমুখী জীবন জিজ্ঞাসাকে যে বাহনে প্রকাশ করলেন তা হলো 'গদ্যবাচন ভঙ্গী' কাব্য। এই আধুনিক কবিরা ভাবের দিক থেকে প্রচলিত সমস্ত সংস্কারকে কাটিয়ে উঠতে চেয়েছিলেন যেমন, তেমনি আঙ্গিকের দিক থেকেও ছন্দের কোনো প্রচলিত বন্ধনকে—স্বীকার করতে চাইলেন না তাঁরা। ভাষা, অলংকার, চিত্রকল্প সব ক্ষেত্রেই একটা বিদ্রোহী মনোভাব দেখা দিল। এই মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা কাব্যে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হলো গদ্যছন্দ। যাইহোক কালের দিক থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে বাংলা কবিতার আধুনিক সুর শোনা গেলেও ১৯৩০ সালে সুধীন্দ্রনাথের 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, আর ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হলো—এই দুই ঘটনার মধ্যের সময়কে আধুনিক কবিতার মধ্যগগন বলে পরিগণিত করা চলে।[২৬]

আধুনিক কবিতার মধ্যগগনের কবিদের কাব্যকৃতি আলোচনা করতে যাওয়ার আগে, রবীন্দ্রনাথের ঠিক অব্যবহিত পরেই উদ্ভূত কবিদের সম্পর্কে কিছু বলতেই হয়। এঁরা রবীন্দ্রনাথ এবং আধুনিক কবিদের মধ্যে সেতু রচনা করেছিলেন বলে, তাঁদেরকে 'সন্ধিক্ষণের কবি' হিসেবেও অভিহিত করা যেতে পাবে। মূলত এঁরা 'রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজ' নামে পরিচিত। এঁরা রবীন্দ্রানুসারী কবি হলেও শুধুমাত্র 'রবীন্দ্রবৃত্তে'ই চিরকাল আবর্তিত, এমন ধারণা পোষণ করা যথার্থ নয়। এরা বিষয় এবং রূপের প্রকাশে রবীন্দ্র নির্ভরতার মধ্যেও স্বকীয়। এপ্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ্য দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। সর্বব্যাপী রবীন্দ্র প্রভাবের দিনে তিনি নিজের পথ খুঁজেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কলাকৈবল্যবাদ, অনুপ্রেরণাবাদ, শুদ্ধসৌন্দর্যবাদ ও অধ্যাত্ম বিবেক সমর্থন করতে পারেননি তিনি। রাবীন্দ্রিক আদর্শের অনিবার্য পরিণাম যে ব্যঞ্জনা প্রাধান্য ও অস্পষ্টতা তাও তাঁর মনোহরণ করেনি। কতকটা অনতিভব্য বস্তুবোধ, সামাজিক নৈতিকতা, জ্ঞানাত্মক বুদ্ধিবৃত্তি ও ভাবুকতার বাঙালিয়ানা দ্বিজেন্দ্রলালের কবিস্বভাবে এসে ভিড় করেছিলো। রবীন্দ্রনাথের কল্পনাপ্রবণতা ও স্বপ্নচারিতার পরিবর্তে তিনি বুদ্ধিমানের তার্কিকতা ও বাস্তববাদীর মনোভঙ্গি আমদানি করতে চেয়েছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের পাশাপাশি প্রমথ চৌধুরীর কথা মনে পড়ে। যিনি রবীন্দ্রনাথের

সমসাময়িক ও অতি নিকট আত্মীয় হয়েও বাঙলা কাব্যে এক ভাববিমুখ-আবেগহীন কল্পনা মোহবর্জিত মনের, প্রজ্ঞা বিজড়িত মননাশ্রিত জীবনের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। আর এখানেই রবীন্দ্রকবিতার সঙ্গে তাঁর কবিতার পার্থক্য।

এর পরে উল্লেখ্য, কবি মোহিতলাল মজুমদার। মোহিতলালের অকুতোভয় কবি-প্রাণ 'স্বপন পসারীর' মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সোনার খাঁচা স্বীকার করেও তাকে ত্যাগ করতে চেয়েছে। তিনি 'মোহমুগ্দরে' খোলাখুলি রবীন্দ্রনাথকে তিরস্কার করেছেন এই বলে— 'কতদিন ভুলাইবে মর্ত্যজনে বিলাইয়া মোহন আসব। —হে কবি বাসব?' মোহিত লালের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চার্য আরেকটি নাম— যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। যিনি দুঃখের অশ্রু-জলে জীবনের রাজ্যাভিষেকে বিশ্বাসী ছিলেন; সত্যের দারুণমূল্য হিসেবেই দুঃখের তপস্যায় তাঁর আস্থা ছিলো। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের যে অমৃতবাণীতে আত্যন্তিক বিশ্বাসী ছিলেন, তাকে তিরস্কার করেই যেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বলতে চেয়েছিলেন—সর্বব্যাপী দুঃখ থেকেই এই সমস্ত প্রাণী জন্মাচ্ছে; সেই সর্বব্যাপী দুঃখের দ্বারাই এই সমস্ত প্রাণী জীবিত আছে; সেই সর্বব্যাপী দুঃখের মধ্যেই এরা গমন করে, প্রবেশ করে।

এই সময়ের বাঙলা কাব্যে নজরুলের দানও অপরিসীম। নজরুল ইসলাম সর্বজয়ী মানুষের অভ্রভেদী মহিমা এবং সেই মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানালেন। এবং সেই সঙ্গে সমাজের অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানিয়েছিলেন প্রাণশক্তির অসংবৃত আবেগ ও উচ্ছ্বাস মাধ্যমে। এর ফলে রবীন্দ্রনাথের আত্মসমাহিতি অপেক্ষা নজরুলের বেহিসাবী উচ্ছৃঙ্খলতা অনেকাংশেই ঘরোয়া মনে হয়েছিলো সে সময়ে। যদিও নজরুলের ছিলো না কোনো পরিণতি বা পরিমিতিবোধ।

সবশেষে, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নাম উল্লেখ করতেই হয়। বিশেষ করে তাঁর আঙ্গিক ও ছন্দোবৈচিত্র্যের ব্যবহার—ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার, বিভিন্ন ছন্দের অনুকরণ, গ্রাম্য ও লৌকিক শব্দ সম্পর্কে ঔদার্য নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিলো। সেই সঙ্গে তাঁর বিষয়ের নতুনত্বও—নিত্য সত্যকে গ্রহণ না করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন, শ্রমিক ধর্মঘট প্রভৃতির কাব্যবিষয় প্রশংসার দাবী রাখে।

একথা যথার্থ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কবিরা হয়তো কেউ-ই প্রথম শ্রেণীর কবি ছিলেন না—তথাপি এঁদের উচ্চারণের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য স্পষ্টত লক্ষিত। এঁদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'রবীনদ্রনাথ ও উত্তর সাধক' (সাহিত্যচর্চা) প্রবন্ধে 'ঐতিহাসিক স্বভাবকবি' বলে অভিহিত করেছেন। আর অধ্যাপক অশ্রুকুমার সিকদার এঁদেরকে ইংরেজী সাহিত্যের 'প্রি-র্যাফেলাইট' কবিদের সঙ্গে তুলনা করে মন্তব্য করেছেন : 'রোম্যান্টিক আন্দোলন যখন ভিক্টোরীয় যুগে ম্রিয়মান, তখন একদল কবি চিত্রল প্রি-র্যাফেলাইটে, হরিদ্রাভ নব্বইয়ে, জর্জিয়ান গোপগাথার নকল ভাটিয়ালে, ইমেজিজমের ছদ্ম-ধ্রুপদে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, তাঁদের একমাত্র মূল্য আজ ঐতিহাসিক। তাঁরা উত্তরকালের নান্দী রচনা করেছিলেন এইমাত্র তাঁদের গৌরব।'[২৭] মূলত তিনি এ মন্তব্য

করেছেন সুধীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণ রেখে। তিনি নজরুলের অশিক্ষিত পটুত্বের উচ্চকণ্ঠ এবং যতীন্দ্রনাথের বার্ধক্যময় 'বিষণ্ণ বিদ্রূপে'র জন্য কিছু স্বতন্ত্র স্বাদ লক্ষ্য করেছেন।

তথাপি আজ আর একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এঁদের মধ্যে সকলেই সমভাবে আধুনিক কবিতার পথ প্রদর্শক না হলেও আধুনিক কাল লক্ষণ এঁদের কবিতায় বর্তমান। কেননা ঐতিহ্যগত কারণেই 'পরবর্তী আধুনিক কবিতা মোহিতলালের কাছ থেকে নিয়েছে নির্ভীক দেহবাদ, যতীন্দ্রনাথের কাছ থেকে সংশয় সংকুল নেতিবাদ, আর নজরুলের কাছ থেকে উদ্ধত যৌবনের উন্মাদনার মন্ত্র। সমগ্রভাবে এই তিনজন কবির কাছ থেকে পরবর্তী যুগ নিম্নলিখিত প্রবণতাগুলিকে গ্রহণ করেছে—ক. ঈশ্বরে অবিশ্বাস খ. ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী মানুষের প্রাধান্য গ. নিপীড়িত মানবাত্মার প্রতি সমবেদনা ঘ. শোষণের প্রতিবাদ ঙ. নেতিবাদ চ. দেহনির্ভর প্রেম ছ. কৌৎসিত্যবোধ জ. অমঙ্গলবোধ ঝ. বাস্তবতাবোধ (ভাববাদী সত্যের তুলনায় বাস্তব সত্যের প্রাধান্য।) এবং ঞ. সবমিলিয়ে একটি বিদ্রোহের মনোভঙ্গি। আধুনিক কবিরা প্রায় সকলেই মোহিতলাল—যতীন্দ্রনাথ-নজরুলের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, কিন্তু সে প্রভাব দেশীদিন স্থায়ী হয়নি। যদিও এঁদের ঋণ অস্বীকার করার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। আধুনিক কবিরা রবীন্দ্রনাথ থেকে পৃথক হবার একটি সহজ ও সরল উপায় এঁদের কাছে শিখেছিলেন। কিন্তু ক্রমশ তাঁরা বুঝতে শিখলেন যে,—

ক. কেবলমাত্র রবীন্দ্র বিরোধিতার দ্বারা নতুন কবিতার জন্ম দেওয়া সম্ভব নয়,

খ. স্বতন্ত্র ভঙ্গি গ্রহণ করলেও রবীন্দ্রনাথের ভাষায় রবীন্দ্রোত্তর কবিতা সৃষ্টি করা যাবে না, এবং

গ. স্বতন্ত্র ভাষা সৃষ্টি করলেও তার দ্বারা মহৎকাব্য রচিত হয়না, যদি না সেই ভাষার মধ্যে প্রগাঢ় অভিজ্ঞতার গভীর উপলব্ধি সঞ্চারিত হয়।

আধুনিক কবিরা স্ব স্ব ক্ষমতা ও প্রবণতা অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ ও মোহিতলালের যুগটিকে আত্মসাৎ করলেন, তার সঙ্গে মেশালেন নিজেদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, নতুন যুগের চিন্তাধারা ও ভাষা চেতনা।[২৮] মোটকথা, আধুনিক জগতের ভাষা যে আলাদা, কাব্যে যে 'বিষয়ের আত্মতা'র প্রতিষ্ঠা করা যায়, নতুন করে আবার তার নজির সৃষ্টি হলো। সৃষ্টি করলেন বাংলা আধুনিক কবিতার মধ্যগগনের নক্ষত্রবৃন্দ। নীচে সংক্ষেপে সেই নক্ষত্রবৃন্দের মধ্যে থেকে প্রতিনিধি স্থানীয় কয়েকজনের কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করলে আধুনিক কবির অন্বেষাটি লক্ষ্য করতে পারব।

রবীন্দ্রোত্তর কাব্য-আন্দোলনে জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) কথা প্রথমেই বলতে হয়। মূলত 'কল্লোল' পত্রিকার মাধ্যমেই তিনি বাঙালি পাঠকের সঙ্গে পরিচিত হন। জীবনানন্দ 'ঝরা পালকের' যুগে রবীন্দ্রনাথের ক্ষীণ প্রভাবের দ্বারা আক্রান্ত হলেও (অসম পয়ার ও মুক্তক ছন্দের ব্যবহারে) সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ইতিহাস চেতনা, নজরুল ইসলামের তারুণ্য, মোহিতলাল মজুমদারের দেহ চেতনা এবং কল্লোলীয় সাহিত্যিক-দ্রোহবুদ্ধি সবচেয়ে সক্রিয় সেখানে। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর দলবৃত্ত ছন্দ নিয়ে তাঁকে আকর্ষণ করেছেন। আর জীবনানন্দও সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন, গভীর ভাবে।

ক্রমে তিনি নিজের মধ্যে আত্মস্থ হয়েছেন। তৈরী করেছেন স্বতন্ত্র চিত্রকল্প-উপমা। তাঁর চিত্রকল্প রবীন্দ্র-ভিন্ন এক উপমালোকের ভাবসৃষ্টি করে। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রকাব্য জগতে বা সন্ধিক্ষণের কবিদের কাব্যে এ ধরনের উপমার সন্ধান মেলেনা। শব্দ চেতনার ক্ষেত্রেও তাঁর এক বিশেষ ঝোঁক ছিল। অনুচ্চার্য, ইতর, কবিতা-বর্জিত দেশী-বিদেশী শব্দে—অগ্রজ কবিদের যেগুলি গ্রহণে অনীহা—জীবনানন্দ সেগুলিই অনায়াসে কাব্যাঙ্গে গ্রহণ করেছেন। অবশ্য তাঁর নবশব্দ গঠন অপেক্ষা প্রচলিত ও দেশী শব্দ ব্যবহারে উৎসাহ অধিক ছিল। তাঁর প্রকাশভঙ্গি নবীন কালকে রূপ দিতে গিয়ে কথ্য বাগ্‌ভঙ্গির দিকে ঝুঁকেছে। তাই মৌখিক শব্দগুলি কাব্যের মহলে অনায়াসে প্রবেশ করেছে। গভীর জটিলযুগের মনোবেদনাকে ইতর দেশী শব্দগুলো শাণিত ভাবে বাক্যরূপ দিয়েছে। অথচ জীবনানন্দের কবিভাষা যুগের টেনশনকে আপাত-শিথিল বিন্যাসে, ভাবের উল্লম্ফনে উল্লেখের সমারোহে যেভাবে প্রকাশ করেছে, তাকে সহজ বলা সম্ভব নয়।

আসলে সময়গ্রন্থির উন্মোচনে দক্ষতা, ঐতিহ্যকে একালের সঙ্গে যুক্ত করা, বস্তু সঙ্গতির এক প্রতীকী প্রকাশ, আবেগের সংহত-নিরুচ্চার রূপ, বিষণ্ণতা-যান্ত্রিকতা-প্রেমহীনতার বেদনা ও শব্দের নিপুণ ব্যবহারে জীবনানন্দের কবিতা রবীন্দ্রযুগকে অতিক্রম করে বাংলা কবিতাকে আধুনিক করে তুলেছে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করি কবি সমালোচক সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মন্তব্য : 'জ্ঞানের গভীরতার সঙ্গে প্রাকৃতিক জীবনের নিবিড়তা মিশিয়েই জীবনানন্দের কবিতা—তা আমাদের জীবন থেকে এক তিল দূরে হলেও পৃথিবীর মানবেরই জীবন।'[২৯]

আলো আঁধারের কবি, জীবনানন্দ দাশের পর উল্লেখ্য হলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০)। তিনি প্রখর মনন ও বৈদগ্ধে, অতৃপ্ত হৃদয় বৃত্তির অলজ্জিত ঘোষণায়, ধ্রূপদী শব্দের অর্থবহ প্রয়োগে এবং পরিশীলিত প্রকাশভঙ্গির শাণিত দীপ্তি বিকিরণে অনন্য পথযাত্রী হলেও তাঁর প্রথম কাব্য 'তন্বী'তে রবীন্দ্রচ্ছায়া অনুসৃত হয়েছে। আধুনিক পৃথিবীর সমস্যা ও জীবনসত্য-সন্ধান, দর্শন ও বিজ্ঞানের নানামুখী অগ্রগতি, মনোবৈজ্ঞানিকের মানসিকতার প্রবণতার বিশ্লেষণ, প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের যথোচিত প্রয়োজনীয়তা এবং পশ্চিমী চিন্তাপদ্ধতির প্রবণতাকে সুধীন্দ্রনাথ আত্মস্থ করতে চেয়েছিলেন। টি. এস. এলিয়টের দিক্ নির্দেশ এই দিক দিয়ে তিনি শিরোধার্য করেছিলেন। এলিয়টের মতোই তিনিও চেয়েছিলেন 'স্বকীয় উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অতীত ও বর্তমানের সমুদ্র মন্থন করে উপযুক্ত উপায়ে সুসঙ্গত অবৈকল্য নির্মাণ।'[৩০] এই আত্ম সচেতনতার দীক্ষাতেই তিনি রবীন্দ্রবিরোধী হয়ে গেছেন। 'দৈবী প্রেরণা'র বদলে, 'অভিজ্ঞতা'কে কবিতার মূল বলে জেনেছেন, যদিও আমাদের ধারণা, প্রেরণা ব্যাপারটায় শুধুমাত্র 'সূচনা'ই বোঝায় না, 'পরিণতি'ও অন্তর্ভুক্ত। তাঁর নঞর্থক এবং পরে ক্ষণবাদী জীবনদর্শন বাংলা কাব্যে অভিনব এক সংযোজন। প্রেমের স্থায়িত্বে সুধীন্দ্রনাথ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ যেখানে পূর্ণতার প্রসাদ লাভ করে ছিলেন—সেখানে সুধীন্দ্রনাথ নেতি ছাড়া কিছুই পাননি। প্রত্যক্ষ দেহের দাবি আরো অনিবার্যভাবে সত্য ছিলো তাঁর কাছে।

ভগবানেও সুধীন্দ্রনাথ আস্থা পাননি। তাঁর মনে হয়েছিল স্বৈরসৃষ্টি আজন্ম অনাথ, চরাচর অরাজক, মানুষের সৃষ্টি অতিদৈব বিবর্তনে। তবে ঈশ্বরকে অস্বীকার করলেও 'কাল' (Time)-কে তিনি স্বীকার করেছেন।

শিল্প প্রকরণে সুধীন্দ্রনাথের প্রধান বৈশিষ্ট্য আবেগ ও যুক্তির অঙ্গাঙ্গি মিলন। বিশেষণ প্রয়োগে তৎসম শব্দের ব্যবহার এবং ক্রিয়ার চলিতরূপের ব্যবহার যেমন দেখা যায়, তেমনি অব্যয় ব্যবহারেও মুন্সিয়ানা লক্ষিত। অনুপ্রাস অলঙ্কার ব্যবহারেও তিনি নতুনত্ব এনেছেন। যা ফরাসী কবি পল ভালেরির সঙ্গেই তুলনীয় হতে পারে।

নাস্তিবাদী সুধীন্দ্রনাথের পাশাপাশি আমরা অমিয় চক্রবর্তীর (১৯০১-১৯৮৬) কবিতায় পেয়েছি সেই গভীরতর উচ্চারণ বা ভগবানের প্রতি আস্থা ও মানুষের প্রতি বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত, যদিও সমাজ ও সভ্যতার বিশশতকী ভাঙন সম্পর্কে তিনি অবহিত সম্পূর্ণ। আর সকলের মতন তিনিও প্রয়োজন মাফিক ও সাধ্যমাফিক রবীন্দ্রনাথ থেকে যা নিতে পেরেছেন, নিয়েছেন। আবার যা নিয়েছেন তা ব্যবহার করে আসলের যে রূপান্তর ঘটিয়েছেন, তাতে তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও চিত্ত সমৃদ্ধির পরিচয় ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের মন্ময় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে তিনি তন্ময় দেখাটাকেই সত্য দৃষ্টি বলে মেনে নিয়েছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে আত্মস্থ করে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস দেখিয়েছেন। এই সাহস জুগিয়েছে তাঁকে পাশ্চাত্য সাহিত্য জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়—বোধহয় তাঁর বিদেশবাসের অভিজ্ঞতাও এব্যাপারে সহায়তা করেছে। এরই ফাঁকে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সচিবের কাজ তাঁকে সম্মোহিত করেনি, পক্ষান্তরে নতুন বিষয় ও ছন্দে রবীন্দ্র প্রভাব মুক্তি চিহ্নিত করেছে। ক্রমে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতনই তিনি মনে করেছেন, ঈশ্বর মানুষের মনের কল্পনা—তার সীমাবদ্ধ কামনার প্রতীকে। তবে অমিয় চক্রবর্তীর আধুনিকতার প্রথম লক্ষণ বিজ্ঞান চেতনা। আধ্যাত্মিক চেতনা ও বিজ্ঞানচেতনা যে পরস্পর বিরোধী নয়, বরং উভয়ের মিলনেই মিষ্টিকতার সৃষ্টি—এ বোধ তাঁর ছিল। তাঁর এই মিষ্টিক অনুভূতির শুরু সংশয়ের দোটানায়। বারবার বিশ্বাসের শিথিলতা অমিয় চক্রবর্তীর অন্তরের গভীরতর উপলব্ধিকে দোলায়িত করেছে। যুগের অভিশাপে অন্যান্য আধুনিক কবির মতোই তাঁর প্রেমের কবিতা বিরহান্তক এবং সে রূঢ় বাস্তবকে প্রশান্ত চিত্তে গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছেন তিনি।

শিল্প প্রকরণের দিক থেকে দেখা যায়, আধুনিক প্রকরণের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির প্রায় সমস্তই অমিয় চক্রবর্তীর কাব্যে উপস্থিত। যথা—মিতব্যয়িতা, উল্লম্ফন শব্দার্থতত্ত্বের বিপর্যয়, পরিভাষার বহুল ব্যবহার ইত্যাদি। প্রাত্যহিকতার স্পন্দ অব্যাহত রেখেও তাতে সুর যোজনা কী ভাবে সম্ভব তার শিক্ষা তিনি নিয়েছিলেন হপ্‌কিনস্‌ অথবা ইয়েট্‌স্‌ কিম্বা অডেনের কাছ থেকে। অন্ত্যমিলের পরিবর্তে মধ্যমিল, সম্পূর্ণ-মিলের পরিবর্তে অর্ধ-মিল—এসবের প্রয়োগে সুরের একটা নতুন মাত্রা সংযোজিত হলো তাঁর হাতে বাংলা কবিতায়।

অমিয় চক্রবর্তীর থেকে বয়েসে ছোট হলেও প্রেমেন্দ্র মিত্রের (১৯০৪-১৯৮৮) কাব্যে কখনও অস্বাস্থ্যকর জটিলতা প্রশ্রয় পায়নি। কবিতায় নতুন সুর শোনাতে তিনিও

চেয়েছিলেন বটে, কিন্তু আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য, বিষয় নির্বাচনে, চিত্রকল্প রচনায় কিছু মনোযোগী হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের আশাবাদ, রোমান্টিক সৌন্দর্যচেতনা ও মর্ত্যপ্রেম থেকে খুব একটা সরে আসতে পারেন নি। ফলে বিশ শতকের তৃতীয় দশকে 'কল্লোলযুগে'র কবিরা রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে নতুন বিষয়, নতুন আঙ্গিক নিয়ে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কবিতা রচনায় সচেষ্ট হলেও প্রেমেন্দ্র মিত্রের মধ্যে এই সচেষ্টতা লক্ষিত হয় না। এজন্য তাঁকে সমালোচক অধ্যাপক, অশ্রুকুমার সিকদার এবং দীপ্তি ত্রিপাঠী 'আধুনিক কবি' হিসেবে মানতে রাজী নন। প্রসঙ্গত এখানে অধ্যাপিকা দীপ্তি ত্রিপাঠীর দীর্ঘ বিশ্লেষণাত্মক মন্তব্য স্মরণ করতে পারি : 'তাঁকে আধুনিক কবি বলা অপেক্ষা রবীন্দ্রযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণের কবি বলাই অধিকতর সংগত। যদিও ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের ভাষায়—নূতন যুগের সংশয়-সন্দেহ, জীবনের প্রতিপদে জিজ্ঞাসা,—যুক্তির দাবি—বিদ্রোহ—বিক্ষোভ—ইহা প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতাতেও স্পষ্ট এবং অকপট এবং যদিও তিনি বিধাতা সম্বন্ধে সংশয়াকুল, বুদ্ধদেব বসুর মতো প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে বন্দী মানব-আত্মার জন্য ব্যথিত, জীবনের কুৎসিত, নিষ্ঠুর,দুঃখ-দৈন্যময় রূপ সম্বন্ধে সচেতন, তবু তাঁর বিক্ষোভের সঙ্গে নজরুলের বিদ্রোহই তুলনীয়। তিনি চিরকাল ভগ্নহৃদয়ে উৎপীড়িত লাঞ্ছিতদের জন্য স্বপ্ন স্বর্গের অনুসন্ধান করেছেন, কিন্তু কি করে মর্ত্যে তার প্রতিষ্ঠা সম্ভব, বা আদৌ সম্ভব কিনা বা কাব্যরচনায় সে প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক কিনা সে-বিষয়ে আধুনিক কবিদের মতো নিরলস চিন্তা করেননি। তাঁর কাব্যে হুইটম্যানের আবেগ-ধর্মী উচ্ছ্বাস শোনা যায়, এলিয়টের মননধর্মী সংহতি অনুপস্থিত। আত্মবিরোধ এবং অনিকেত মনোভাব (rootlessness) যেটি আধুনিক কাব্যের .... অন্যতম প্রধান লক্ষণ, সেই মানসিক দ্বিধা দ্বন্দ্ব প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনায় ততটা নেই। এইজন্যেই শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় একদা বলেছিলেন : Premendra is a broken hearted dreamer, still hoping for the best from a revolution. পথ, সমুদ্র, বন্দর, জীবনের ঘাটে বাঁধা তরণীর চিত্রকল্পগুলি তাঁর কাব্যে বারংবার এসেছে। মনে হয় কবি শিষ্ট সভ্য অথচ নিষ্ঠুর এবং যান্ত্রিক নগর-সভ্যতার বাইরে একটি ব্যাপ্তির জন্য আকুল হ'য়ে উঠেছেন। কিন্তু মধ্যবিত্ত জীবনের নোঙর এত শক্ত যে তাঁর দিগন্ত-পিপাসা মিটছে না। সম্ভাবনার কূল কোথায় সে-সম্বন্ধে তাঁর কোনো প্রশ্ন নেই। উদ্দেশ্যহীনভাবে তিনি শুধুই পলাতক হতে চাইছেন এই সংকীর্ণজীবন থেকে—'কেরমানের নোনা মরুর উপর দিয়ে, খোরাশান থেকে বাদক্শান, পামিরের তুষার-পৃষ্ঠ ডিঙিয়ে, ইয়ারকন্দ থেকে খোটান।' তাই সাগর থেকে তাঁকে ফিরতেই হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, প্রকরণের দিক থেকেও তাঁর সঙ্গে অগ্রজ কবিদের মিল অধিক। 'প্রথমা'র ছন্দের উপর 'বলাকা'র প্রভাব সুস্পষ্ট।' অবশ্য তিনি গদ্যকবিতাও রচনা করেছেন, কিন্তু আধুনিক কাব্যের যেটি প্রধান লক্ষণ, বাকরীতি ও কাব্যরীতির মিলন, তা তাঁর কাব্যে বিশেষ দেখা যায় না। প্রধানত তৎসম শব্দই তিনি ব্যবহার করেছেন। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থেকে সচেতন গ্রহণ, বাহুল্য বর্জনের জন্য বাক্যগঠনে মিতব্যয়িতা প্রভৃতি আধুনিক প্রকরণও তাঁর কাব্যে বিরল। এক কথায়

আধুনিক কাব্যের জটিল গ্রন্থিলতা থেকে তাঁর কাব্য মুক্ত।'[৩১]

আধুনিক বাংলা কাব্যকারদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) অন্যতম প্রাণপুরুষ। 'কবিতা' পত্রিকার প্রকাশে (১৯৩৫-১৯৬০) পঁচিশ বছর ধরে তিনি কবিস্বভাবে অসংখ্য কবির কাছে অনুপ্রেরণাকারী রূপে অভিহিত। আধুনিক যে কোনো কবির মতোই রবীন্দ্রপ্রভাব স্বীকৃতি ও রবীন্দ্র প্রভাব মুক্তির সমস্যা—বুদ্ধদেবেরও সমস্যা। কিশোর বয়সে রবীন্দ্র-পদ-লালিত্য ভাবনায় মোহাবিষ্ট হয়ে তাঁর প্রথম কাব্য, 'মর্মবাণী' (১৯২৪) প্রকাশিত হলেও যৌবনে ডি. এইচ. লরেন্স, হাক্সলিব দেহ সংরাগ তাঁর কাব্যের বিষয়মুক্তি ঘটায়। এই নতুন সুর প্রকাশে তাঁকে প্রেরণা দেয় রবার্ট ব্রাউনিং, সুইনবার্ন, রসেটি, মরিস প্রমুখ। বুদ্ধদেব একান্ত ভাবেই ব্যক্তিজীবনের কবি। সেখানেই সমসাময়িক প্রেমেন্দ্র মিত্রের থেকে তিনি স্বতন্ত্র। প্রেমেন্দ্র এবং তিনি—উভয়েই মুক্তির উপায় হিসেবে স্বীকার করেছিলেন 'আদিম জীবন'কে সত্য, কিন্তু তাঁদের কবিতায় 'আদিম জীবনে'র প্রকাশ এক নয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র যেখানে আদিমতার বলিষ্ঠ রক্ত-সঞ্চারে রুগ্ন সভ্যতার বৈপ্লবিক স্ফূর্তি দেখতে আগ্রহশীল, বুদ্ধদেব সেখানে যৌন চেতনার গভীরতায় প্রবেশ করত তার অবারিত প্রকাশে আদিমতাকে সঞ্চারিত করতে যথেষ্ট যত্নশীল। এছাড়া মানসিক গঠনে বুদ্ধদেব ছিলেন একটু বেশী মাত্রায় ইন্ট্রোভার্ট। সমসাময়িক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অস্থিরতা তাই তাঁর সৌন্দর্যের ভাবলোকে বারেবারে হানা দিয়েছে ব'লে তিনি ব্যতিব্যস্ত। 'সুন্দরের ধ্যান মোর এরা সব ক্ষণে ক্ষণে ভেঙে দিয়ে যায়...........।'[৩২]

বুদ্ধদেব বসু প্রেমের কবি। তাঁর মনের ধর্ম প্রেম। কিন্তু এ প্রেমকে তিনি রোম্যান্টিক কবিদের মতো অতীন্দ্রিয়, অমূর্তভাবে না দেখিয়ে মূর্ত শরীরীরূপে দেখিয়েছেন। ইন্দ্রিয় তাঁর কাছে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ অনুভব করবার উপায় মাত্র, দেহসৌধের বাতায়ন। কিন্তু তিনি প্রেমের ক্ষণিক রূপ স্বীকার করতে গিয়ে জীবনানন্দের গুমরানো ব্যথা বা সুধীন্দ্রনাথের অতৃপ্তির অগ্ন্যুদ্গারকে কাব্যে প্রকট করে তোলেননি। তিনি কবিসত্তার সঙ্গে সামাজিক সত্তার বিরোধের কথাও প্রেম বর্ণনায় প্রাধান্য দেন। এজন্য ডেকাডেন্স-এর সৌন্দর্যবাদী কবিদের সঙ্গে তাঁর সাগোত্র স্পষ্ট হয়।

সুধীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দেব মতো কালচেতনা বুদ্ধদেবের কাব্যে খুব প্রবল নয়। যেমন প্রবল নয় সমাজ চেতনা; যদিও সমাজ চেতনা অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রবেশ করেছে তাঁর কাব্যে। উদ্দেশ্য প্রণোদিত শিল্প সাধনায় বিশ্বাসী না হলেও ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই তাঁর সমাজ চেতনার বিকাশ। শিল্প প্রকরণের দিক দিয়ে তিনি প্রথমেই কথ্যরীতি ও কাব্যরীতির মিশ্রণ ঘটাতে উদ্যোগী ছিলেন কাব্যে। আর ছন্দের দিক দিয়েও তাঁর প্রধান সাধনা-বাক্ছন্দের সঙ্গে কাব্যছন্দের মিলন লক্ষিত। গদ্যকবিতায় আধুনিক কবিদের মধ্যমিলের সৃষ্টি যে নতুনত্ব সূচিত করে, তা বুদ্ধদেবেও সমধিক। অবশ্য তাঁর কাবিতায় এমন অনেক পংক্তি ও চিত্রকল্প খুঁজে পাওয়া যায়, যা তাঁর নিজের নয়। অপরের। যাইহোক, ভাষা ব্যবহারে যেখানে তিনি সার্থক সেখানে তাঁকে অবশ্যই স্বীকার করতে হয় নতুন স্রষ্টা হিসেবে। তবে একথা বলতেই হয় যে, কবির সামাজিক দায়িত্বকে

স্বীকার করেও বুদ্ধদেবের আত্মস্থ শিল্পচর্যা আধুনিক বাংলা কবিতার এক বিশেষ দিক। নইলে 'কবিতা' পত্রিকার প্রাণপুরুষের আহ্বানে যে নতুন কবিরা নিজেদের মুক্তি পথ খুঁজে পেয়েছিলেন, তাঁর প্রভাবকে সামান্য করে দেখতে হয়।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত জনতার জঘন্য মিতালী এড়াবার জন্য নেতিবাদে আশ্রয় নিয়েছিলেন, বুদ্ধদেব কলাকৈবল্যকেই ধ্রুবতারা করেছিলেন, অমিয় চক্রবর্তী অংশত কাল চেতনায় দীপ্ত হলেও বিজ্ঞানের সঙ্গে অতীন্দ্রিয়তা মেলালেন। আর প্রেমেন্দ্র মিত্র হুইটম্যান সুলভ মানব বন্দনা গাইলেও অন্তহীন, নিষ্কম্প্র, নির্মল শব্দের ধ্যানও করেছেন। পক্ষান্তরে, বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮৪) অনেক উৎসাহের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে মেনে নিয়েছেন। কেননা, আস্তিক্যবাদের জন্য দর্শনে বিশ্বাসী হলেও রবীন্দ্রনাথই এযুগের ক্ষয়াটে সমাজের কাছে সদর্থক চেতনার প্রতীক। বিষ্ণু দে প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রনাথের ছিন্ন চরণাংশকে বিদ্রূপবাণে তির্যকভাবে ব্যবহার করেও তাই তাঁর কালোপযোগিতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন—'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ' বলে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক সৌন্দর্যতত্ত্বকে ত্যাগ করে তিনি এক মানবীয় সৌন্দর্য বোধকে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন তাঁর কাব্য জীবনের প্রথম থেকেই। বিষ্ণু দের প্রেম চেতনায় ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের সরব উপস্থিতি খুঁজে পাওয়া যেমন শক্ত, তেমনি যে জীবন খণ্ডিত, ক্লান্ত তাকে সুস্থ জীবনে উত্তীর্ণ করবার প্রয়াস তাঁর কাব্যে সমধিক। এবং দেহ চেতনায়—কোথাও কোথাও তা উদ্বেল হলেও সাধারণ জীবনের শুভ্রতায় তাকে পাবার কথাই কবির মনে হয়েছে।

তিরিশের শেষ দিক থেকে বিষ্ণু দের কাব্যে প্রথম যুগের নিরাশা, দ্বন্দ্ব ও ক্লান্তির অবসান ঘটে। এবং এলিয়টীয় যে ভাবধারা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল—তা, আর প্রমথ চৌধুরীর আত্মসচেতনতা ও ঐতিহ্যবোধ ধরে মার্কসবাদের সংস্পর্শে নিজেকে জনসমুদ্রের একাংশ মনে করে স্থির হন। একদা ব্যক্তিকসঙ্গহীনতা, নৈর্ব্যক্তিক একাকিত্ব প্রথম পর্বে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের সাহায্যে যেমন শুদ্ধ সৌন্দর্য থেকে কবিকে মুক্তি দিয়েছিল, তেমনি কিন্তু ঐতিহ্যের সূত্র ধরে মার্কসীয় প্রকরণ ও জনগণ-মনস্কতায় সমাজ চৈতন্যদীক্ষা দিয়েছে তাঁকে শেষ পর্ব। তাঁর কাব্য প্রকরণে মোটামুটি মন্ত্রধর্ম-কথ্যরীতি ও সংগীত ধর্ম—এই তিনটি বৈশিষ্ট্য প্রাধান্য পেয়েছে। আমরা কিন্তু এও বলতে পারি, যে কবি বিষ্ণু দে অবচেতনার অসংলগ্নতা নিয়ে গভীর ভাবে কাজ করেছেন, ফলে বিশ শতকের মানুষের বিচূর্ণীকরণ জনিত কারণে বিকার ও দুর্বোধ্যতা, আত্মব্যক্তিত্বে অবতরণ—সবই এক সঙ্গে লক্ষিত হয়। শব্দ প্রয়োগের আকস্মিকতা বা দূরত্ব তাঁকে পাঠকের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। একই কবিতার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শব্দেই শুধু নয়, একই শব্দে একাধিক মাত্রা বিপর্যস্ত করে দিতে পারে পাঠককে—তাও মেলে। তাই তিনি সমাজতান্ত্রিক হয়েও শেষ পর্যন্ত জনসাধারণকে এড়িয়ে নিজের ব্যষ্টি চেতনার কাছে আত্ম সমর্পণ করেন, কবিতায় এমনসব অকল্পনীয় চিত্রকল্প উপহার দেন, যার তাৎপর্যগত দুর্বোধ্যতার জন্য অদ্ভুত অদ্ভুত তত্ত্ব দ্বারা বা আইডিয়া দ্বারা তাদের সমর্থন আবশ্যিক হয়। তবে সংগীত অনুরাগী, সচেতন সামাজিক কবিমন তাঁর অভিজ্ঞতার কাছে মিথ্যাচারী হতে পারে না।

আধুনিক কবিতায় দেশকালের ভৌগোলিক ভেদাভেদ, জ্ঞানের প্রাচীর ভেঙে যায় বলেই বিষ্ণু দের কবিভাষা ছড়ার গণ্ডি ছাড়া একেবারে নিরলংকার হতে পারেনি।

উপরের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষে আমরা বলতে পারি—আধুনিক কবিরা আবির্ভাব লগ্নেই বুঝেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ থেকে হয় সরে বসতে হবে নয় তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে। তাঁরা জানতেন, বিষয় ও উচ্চারণে অত্যন্ত বেশী পরিমাণ রবীন্দ্র নিমজ্জন যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস রায়ের মতো কবিকে স্বপ্রতিষ্ঠ হতে দেয়নি, শুধুই রবিচক্রের অন্তর্গত থাকতে তাঁদের বাধ্য করেছে। তাই তাঁরা নতুন কালের নতুন কবি হিসেবে স্বয়ংবৃত হতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের—

১. দেহহীন বিশুদ্ধ প্রেম
২. সৌন্দর্য সম্বন্ধে ধারণা
৩. বাস্তব সম্বন্ধে একটা সীমাবদ্ধ ধারণা
৪. সাম্যবাদী দর্শন সম্বন্ধে অ-সচেতনতা

—প্রভৃতি বিষয়ে তাঁকে ছাড়িয়ে গেলেন। অর্থাৎ রবীন্দ্র বিজিত রাজ্য গুলি অতিক্রম করে তাঁদের ভিন্নতর বিষয়ে মনোযোগী হতে হলো। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, এখানের আলোচ্য কবিরা সকলেই ইংরেজী সাহিত্য ও ভাষার অধ্যাপক ও ছাত্র ছিলেন। ফলে ইংরেজী সাহিত্য স্বীকরণে তাঁদের কোনোই অসুবিধে হয়নি। সেই সঙ্গে দেশীয় ঐতিহ্য গ্রহণেও। ডঃ দীপ্তি ত্রিপাঠীর মতে : 'রবীন্দ্রোত্তর যুগে নতুন স্বাদ, নতুন কৌশল অনেকেই হয়তো এনেছেন কিন্তু জীবনব্যাপী সযত্ন গবেষণায় ও সচেতন পরিশ্রমে বাংলা সাহিত্যকে নতুন পথের সন্ধান এই পাঁচজন কবিই দিয়েছেন। বিষ্ণু দের ভাষায় বলা যায়—'সজীব রচনাতে তাই শিল্পী ও শিল্প বস্তু, বিষয় ও টেকনিকে টান পড়ে জ্যাবদ্ধ ধনুকের টঙ্কারে ধনু ও ছিলার টানের মতো। লক্ষ্য ভেদের লক্ষ্য হয়তো অনেক সময়ে সরাসরি চেনা যায় না, ধনুর্ভঙ্গও হতে পারে। তবু প্রগতিশীল সাহিত্যের চিরকালীন লক্ষণ হল এই চৈতন্য-জ্যাবদ্ধ টান।' এই চৈতন্য-জ্যাবদ্ধ টান ঊনবিংশ শতকে প্রথমবার দিয়েছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং শেষবার স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। বিংশ শতকে সে-ভার নিলেন এই আধুনিক কবিরা। এই কারণেই বিংশশতাব্দীর তৃতীয় দশক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মূল্যবান হয়ে রইল। রবীন্দ্রনাথ থেকে তাঁরা সজ্ঞানে যে পৃথক হয়েছিলেন তার মধ্যে ছিল—'ভারসাম্যের আকাঙ্ক্ষা আর আত্মপ্রকাশের পথের সন্ধান'। '..............এঁরা রবীন্দ্রনাথের মোহনরূপে ভুলে থাকলেন না, তাকে কাজে লাগাতে শিখলেন, সার্থক করলেন তাঁর প্রভাব বাংলা কবিতার পরবর্তী ধারায়'।[৩৩] এবং বলা বাহুল্য, সমর সেনের আবির্ভাব লগ্নে (১৯৩৫) 'রবীন্দ্রনাথ' নামক এক প্রবল ব্যক্তিত্বপূর্ণ কবিকে অতিক্রম করে বাংলা আধুনিক কবিতার এক বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল।

৩. আধুনিক কবিতা ও প্রগতি লেখক সংঘ

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয় 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'। ভারতবর্ষে এই সংঘ প্রতিষ্ঠার পিছনে মূলত মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী ও কমিউনিষ্ট পার্টির সক্রিয় উদ্যোগ ছিল। প্রগতি লেখক সংঘ গঠনের পটভূমিকা সম্পর্কে আমাদের ধারণা পরিষ্কার রাখা দরকার, নইলে শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে মার্ক্সীয় ধ্যানধারণা কিভাবে ক্রিয়াশীল—তা বুঝতে অসুবিধে হবে।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানিতে ফ্যাসিস্ত হিটলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই ক্রমশ সমগ্র ইউরোপকে ফ্যাসিজমের দানবিক ঔদ্ধত্য ও যুদ্ধ প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তোলে। তার এই সীমাহীন ঔদ্ধত্য ও যুদ্ধপ্রস্তুতিকে ব্যর্থ করতে সারা বিশ্বের তাবৎ বিবেকবান প্রগতিশীল, শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা প্রতিরোধ আন্দোলনে সামিল হতে আহ্বান জানালেন। এঁদের মধ্যে রোমারোঁলা, গোর্কি ও অ্যাঁরি বারব্যুস প্রমুখ প্রধান। ২১ শে জুন ১৯৩৫-এ প্যারিস শহরে শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের ফ্যাসিবাদ বিরোধী প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। আঁদ্রে জিদ্‌, ঈ. এম. ফস্টার, আঁদ্রে মালরো, অলডাস হাক্সলি, জুলিয়া বাঁদ, ওয়াল্ডো ফ্রাঙ্ক, মাইকেল গোল্ড, জন স্ট্র্যাচি প্রমুখ বরেণ্য সাহিত্যিক ও মনীষীরা যোগ দিলেন এই সম্মেলনে এবং সেই সঙ্গে ফ্যাসিবাদ বর্বরতার বিরুদ্ধে সমস্ত মানব প্রেমিক শিল্পী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে অগ্রসর হতে আহ্বান জানালেন। ভারতীয় লেখকদের পক্ষ থেকে এই সম্মেলনে ইউরোপ প্রবাসী মুলক্‌রাজ আনন্দ প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

আন্তর্জাতিক এই পটভূমিকায় ভারতেও রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে নতুন আলোড়ন শুরু হয়। বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয় এখানে। ১৯২৯-র মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় ভারতে, বিশেষত বাঙলা দেশের পরিচিত কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার বরণ করে জেলে যান। সেখানে থাকাকালীন পড়াশুনা, তর্ক বিতর্ক, আত্মানুসন্ধানের মধ্য দিয়ে সন্ত্রাসবাদ, কংগ্রেস রাজনীতি ও সোস্যালিজমের পাঁচমেশালি সমাহার কাটিয়ে উঠতে থাকেন। অন্যদিকে এই গ্রেপ্তার হেতু যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৩১-৩২-র মধ্যে, ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে সেই শূন্যতা পূর্ণ করার জন্য আবদুল হালিম, রণেন সেন, সোমনাথ লাহিড়ী প্রমুখ তৎপর হন। পাশাপাশি ১৯৩৩-র অগস্ট মাসে, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার কয়েকজন বন্দী মুক্ত হয়ে এসে কমিউনিস্ট পার্টির একটি অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করেন।[৩৪] আর ১৯৩৫-র শাসন-সংস্কার আইন অনুসারে জাতীয় কংগ্রেস প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন ভার গ্রহণ করেই আটক রাজবন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থা করলেন। এভাবে বিভিন্ন গ্রুপে বিচ্ছিন্ন ঐক্যহীন কমিউনিস্ট পার্টিতে পুনর্বার সংহতি ফিরে এল। জাতীয় কংগ্রেস এসময়ে জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদ বিরোধী এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় নামে। অবশেষে সংঘবদ্ধভাবে প্রগতি সাহিত্য সৃষ্টিতে উৎসাহিত হয়ে গঠিত হয় ১৯৩৬-র ১০ই এপ্রিল লক্ষ্ণৌ-এ 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'।

এই সংগঠনে তৎকালীন সমস্ত লেখক-সাহিত্যিকই কিন্তু নিজেদেরকে যুক্ত করতে পারেননি। এই সংগঠনের একদা সচেতক, সাংস্কৃতিক কর্মী সুধী প্রধান প্রগতি লেখক সংঘ গঠন সম্পর্কে এবং তৎকালীন লেখকদের মনোভাব-সম্পর্কে দ্বিধাহীন ভাবে বর্ণনা করেছেন এভাবে : '....after the failure of Gandhi-led movement in 1930-'31, failure of militant nationalist movement in Bengal, U.P. and Punjab, successive communist conspiracy cases in India, instituted by the British Indian Government were responsible for keeping large numbers of political prisoners in jails and detention camps in India. Here a section of them reviewed the national and international situations and were influenced by what was happening in Europe. Like their predecessors of the 19th century they were also influenced by the most inspiring ideology of Europe – that is Marxism. After they came out of jails – they began to bring out journals and periodicals to preach the newly found ideas .... . The bulk of the traditional writers, afraied of many legislations introduced in the Indian Panal Code, were not very enthusiastic at the beginning. As a result most of the traditional writers and artists did not like to associate themselves directly with any organisation where men with extremist political views were in control. Earlier manifestos and declarations had used stronger words against fascism – compared to those used against British misdeeds in India ......'[৩৫]

'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘে'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হন মুন্সী প্রেমচাঁদ। এবং সম্পাদক হন সদ্য ইউরোপ প্রত্যাগত সজ্জাদ জহীর। এছাড়া সদস্য হিসেবে ছিলেন মুলক্ রাজ আনন্দ, হীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, ভবানী ভট্টাচার্য, ইকবাল সিং, রাজা রাও, মুহম্মদ আশরাফ প্রমুখ। মুন্সী প্রেমচাঁদ তাঁর প্রথম সভাপতির ভাষণেই 'প্রগতি সাহিত্য' বোঝাতে মন্তব্য করেছেন—'We shall consider only that literature as progressive which is thoughtful, which awakens in us the spirit of freedom and of beauty; which is creative, which is luminous with the realities of life; which moves us, which leads us to action and which does not act on us a narcotic; which does not produce in us a state of intellectual somnolence – for, if we continue to remain in that state it can only mean that we are not longer alive.'[৩৬]

লক্ষ্ণৌ-সম্মেলনে গঠিত যে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'—তারই ঘোষণাপত্রকে ভিত্তি করে বাঙলা দেশের প্রগতিশীল লেখক ও বুদ্ধিজীবী এবং সাংস্কৃতিক কর্মীরা অনুরূপ একটি সাংগঠনিক কমিটির মাধ্যমে কাজ শুরু করেন। এবং ১৮ই জুন ১৯৩৬-এ গোর্কির মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত হলে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘে'র সম্পাদক সজ্জাদ জহীর গোর্কি দিবস পালনের আহ্বান জানাবার আগেই বাংলার 'প্রগতি লেখক সংঘে'র সাংগঠনিক কমিটি গোর্কির মৃত্যু উপলক্ষে ১১ই জুলাই ১৯৩৬-এ কলকাতার এলবার্ট হলের (অধুনা কলেজ স্ট্রীটস্থ কফি হাউস) কমিটিরুমে একটি শোকসভার আয়োজন করে। মূলত এই শোকসভা থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তকে সভাপতি ও অধ্যাপক

সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে সম্পাদক করে 'বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ' গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়। আর এই শোকসভার আহ্বায়ক ছিলেন আনন্দ বাজার পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন এবং খগেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখ সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী।[৩৭] এই সময়ে তাঁদের সাহিত্য সম্পর্কে মনোভাব কেমন ছিল? —সে সম্পর্কে জানিয়েছেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : 'আমাদের সাহিত্যে 'realism'-এর অত্যন্ত অভাব রহিয়াছে। আমরা 'space and time'-কে ঠিক ভাবে ধরিয়া চলিতেছি না। তাই একদল নূতন শ্রেণীর লেখকের প্রয়োজন, যাঁহারা বিভিন্ন স্তরের যথার্থ অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন ও পরিবেশন করিবেন, যাঁহারা সমাজ ও সাহিত্যকে সনাতন গণ্ডী হইতে বাহির করিবেন এবং কাল ব্যতিক্রমের অসামঞ্জস্যের কবল হইতে রক্ষা করিবেন।'[৩৮] এই মানসিকতা থেকেই তাঁরা সাহিত্যে প্রগতি আনতে সচেষ্ট হলেন। এবং মুন্সী প্রেমচাঁদের 'Progressive Literature' সম্পর্কে মন্তব্যটিকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গ্রহণ করে বাঙলাদেশের তদানীন্তন সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা 'প্রগতি সাহিত্য' বোধে অনুপ্রাণিত হন। এই বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘের শৈশব অবস্থায় দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার ভাবাপন্ন। তাঁরা জানতেন—'দল বাঁধিয়া সাহিত্য রচনা হয় না। প্রগতি কবির এই প্রতিজ্ঞা করিয়াও সব সময়ে সু-সাহিত্য রচনা করা চলে না। দল বাঁধিয়া প্রগতিসাহিত্য রচনা করিব এ উদ্দেশ্য এ সঙ্ঘের নাই। সঙ্ঘের সভ্যগণের উপর প্রগতির দাবী ধরিয়া বাঁধিয়া প্রচার করিতে সঙ্ঘ চাহেন না। কিন্তু যাঁরা প্রগতিকামী সাহিত্যিক তাঁহাদিগকে সমসূত্রে গ্রথিত করিয়া, প্রগতি সাহিত্যের সম্যক প্রচার, আলোচনা ও গবেষণা করিয়া, পরস্পর আনুকূল্যের দ্বারা প্রগতি লেখক সংঘ সাহিত্যে নিয়ত প্রগতির অনুকূল অবস্থা ও আবহাওয়ার সৃষ্টি করিবার ভরসা রাখেন।'[৩৯]

এই উদার মানসিকতার জন্য সেদিন দেশের অগ্রগণ্য সব বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিকেরই সাহায্য পেয়েছিলেন তাঁরা। মার্কস্‌বাদী—অ-মার্কস্‌বাদী, যে কোনো গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ খ্যাতিমান লেখককেই প্রগতি লেখক সংঘের প্রতি আকর্ষণ বোধ করতে দেখা গিয়েছিল। এঁদের মধ্যে কবি অরুণ মিত্র, সাহিত্যিক স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, বিনয় ঘোষ, মন্মথ সান্যাল, সুবোধ ঘোষ, বিজন ভট্টাচার্য, পুলকেশ দে সরকার, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, নীরেন্দ্রনাথ রায়, হিরণকুমার সান্যাল প্রমুখের সক্রিয় সহযোগিতায় প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন বাঙলার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিরাট গতিদান করেছিল। ঠিক এ সময়েই নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন স্বাধীনতা, শান্তি ও প্রগতির বাণী মুখে নিয়ে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের পাশে নিজেদেরও স্থান করে নেয়।

প্রগতি লেখক সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত হয় 'Towards Progressive Literature' এবং সংঘের পক্ষে সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বাংলা সংকলন 'প্রগতি' (১৯৩৭)। 'প্রগতি'-তে নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্তের ভূমিকা, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রগতি', ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'সাহিত্যে প্রগতি', বিজয় লাল চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রগতি সাহিত্যের রূপ', সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর 'সাহিত্যে বাস্তব ও কল্পনা' প্রভৃতি প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি

উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধগুলির শিরোনাম দিয়েই বোঝা যায় এই সব প্রবন্ধে 'প্রগতি সাহিত্য' সম্পর্কে আলাপ আলোচনা বিশ্লেষণাত্মক ভঙ্গিতে বিধৃত হয়েছে। এছাড়াও প্রকাশিত হয় অরুণ মিত্র কৃত আঁদ্রে জিদ্-র রচনার অনুবাদ; আবু সয়ীদ আইয়ুব কৃত ঈ. এম. ফস্টারের ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কৃত কার্ল-মার্কস্-এর প্রবন্ধের অনুবাদগুলির মাধ্যমে ফ্যাসিবিরোধী ইউরোপীয় শিল্প-সাহিত্য সমাজ ও রাজনৈতিক জগতের চমৎকার বিচার বিশ্লেষণ এবং ভারতে ইংরেজ শাসন সম্পর্কে মার্কসের যুগান্তকারী চিন্তাভাবনা। এই সংকলনের মৌলিব ও অনূদিত কবিতাগুলির মধ্যে আবার বিষ্ণু দে অনূদিত টি. এস. এলিয়টের 'ফাঁপা মানুষ'; সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুদিত আলেকজান্ডার ব্লকের বিপ্লবী কবিতা 'বারো'; নীরেন্দ্রনাথ রায় অনূদিত উজবেকিস্তানের কবি গোলাম গফুরের 'পথ'। এবং বিভা বসু, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সজনীকান্ত দাস. অরুণ মিত্র প্রমুখের স্বরচিত কবিতা উল্লেখ্য। এছাড়া বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধ কুমার স্যান্যাল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য ও প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখের গল্প এই সংকলনে সংকলিত হয়। পাশাপাশি আমাদের আলোচ্য কবি সমর সেনের কবিতাও এখানে সংকলিত।

'প্রগতি' সংকলনই বাঙলাদেশে প্রথম সংঘবদ্ধ প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের দান। ক্রমে প্রগতি লেখক সংঘের আন্দোলন ঢাকার তরুণ মনেও সাড়া জাগিয়েছিল। সাংস্কৃতিক কর্মী রণেশ দাসগুপ্ত, নৃপেন্দ্র গোস্বামী, সত্যেন সেন, অচ্যুত গোস্বামী, কিরণ শঙ্কর সেনগুপ্ত এবং সোমেন চন্দের প্রচেষ্টায় ঢাকায় একটা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। কোলকাতার পরেই ঢাকার এই কেন্দ্রটি সক্রিয় ছিল বেশী। অন্যদিকে এই ধরনের প্রগতি সাহিত্যের বিরুদ্ধেও কিছু ব্যক্তি ছিলেন। কবি অধ্যাপক মোহিতলাল এই প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনকে বলেছিলেন সাহিত্যের 'রসের বিরুদ্ধে বেরসিকের আক্রোশ।'[৪০]

১৯৩৮ নাগাদ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র, অথবা সদ্য শিক্ষা সমাপ্ত একদল তরুণ কবি সাহিত্যিক এবং কিছু সাংস্কৃতিক কর্মী প্রগতি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। এঁদের মধ্যে সরোজ দত্ত, অনিল কাঞ্জিলাল, সুবোধ চৌধুরী. বিনয় ঘোষ. সমর সেন, গোপাল হালদার, সুধী প্রধান, চিন্মোহন সেহানবীশ প্রমুখ উল্লেখ্য। ১৯৩৮ এর ডিসেম্বরে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলন হলো কোলকাতায়। এই সম্মেলনের মূল সংগঠক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। মার্কসবাদী-অমার্কসবাদী অনেক খ্যাতিমান সাহিত্যিকই ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখানে যোগ দিয়েছিলেন। সম্মেলন পরিচালনার জন্য সভাপতি মণ্ডলীতে ছিলেন মুলকরাজ আনন্দ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু ও পণ্ডিত সুদর্শন প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথের প্রেরিত বাণী পাঠ করে সম্মেলন আরম্ভ হয়। সমবেত প্রতিনিধি ও দর্শকদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে ভাষণ দেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। বিভিন্ন আলোচনা এবং রচনা পাঠে অংশগ্রহণ করেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার হিরণকুমার সান্যাল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল, সজ্জাদ জহীর, বলরাজ সাহানী, ড. আব্দুল হালিম আহম্মদ্ আলি, মাজাজ. আলি সর্দার জাফরী প্রমুখ বিভিন্ন সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী। এই সম্মেলনে শিল্প, সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা খুব বেশী ছিল না। তবে

এই সম্মেলনের আলোচিত ও পঠিত বিষয়গুলি ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শগত হওয়ার জন্য বিতর্ক জমে ওঠে। সমর সেন কলকাতা সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে পাঠ করেন তাঁর 'In Defence of the Decadents' প্রবন্ধটি। এটি 'Indian Progressive Writers' Association'-এর 'New Indian Literature'-র দ্বিতীয় সংকলনে মুদ্রিত হয়। এবং ঐ সংখ্যার শেষে 'Commentary' অংশে সম্পাদক মণ্ডলীর তরফ থেকে বলা হয় : 'We are glad to publish Samar Sen's Defence of Decadents'. He represents a valuable point of view and it will or at least should stimulate discussion; We can not but welcome such discussion......'[৪১]

কলকাতা সম্মেলনের অব্যবহিত পরেই বাঙলাদেশে (পশ্চিমবঙ্গে) কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে পরিচালিত প্রথম সাংস্কৃতিক মাসিক পত্রিকা 'অগ্রণী', ১৯৩৯ এর জানুয়ারীতে আত্মপ্রকাশ করে। এই 'অগ্রণী' পত্রিকা পর্বে স্পেনের ফ্যাসিস্ত বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামে নিহত, প্রখ্যাত তরুণ মার্কস্‌বাদী বুদ্ধিজীবী—ক্রিস্টোফার কড্‌ওয়েলের সুবিখ্যাত 'Illusion and Reality' গ্রন্থ এবং 'Studies in Dying Culture' গ্রন্থ বাঙলা দেশের মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। কারণ উপরোক্ত প্রথম গ্রন্থে জানিয়েছেন তিনি : 'Today all bourgeois culture struggles in the throes of its final crisis. The contradictions whose tension first drove on the development of society's productive forces are now wrecking them and a new system of social relations is already emerging from the womb of the old that of communism. Communism is not an ideal, it is the inevitable solution of the ripening contradictions in capitalism.'[৪২]—ফলস্বরূপ উদ্দীপিত হয়ে এই পর্বের বাঙালী লেখকরা সমালোচনায় ক্ষুরধার হয়ে ওঠেন।

'অগ্রণী' পত্রিকার ২য় বর্ষের ৪র্থ সংখ্যায় (১৯৪০, এপ্রিল) সরোজ কুমার দত্ত 'অতি আধুনিক বাংলা কবিতা' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। মূলত এটি সমর সেনের 'In Defence of the Decadents' প্রবন্ধটির বক্তব্যের বিরোধিতা করে লেখা। এই পত্রিকার ৫ম সংখ্যায় সরোজবাবুর ঐ প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে সমর সেন এবং সরোজ দত্তের আরও এক কিস্তি উত্তর-প্রত্যুত্তর মুদ্রিত হয়। মার্কস্‌বাদী সাহিত্যের স্বরূপ কি হবে-না হবে তা নিয়েই এই বিতর্ক। মার্কস্‌বাদী সাহিত্যের স্বরূপ নিয়ে এই বিতর্ককে অনেকে প্রথম সচেতন, যুক্তিপূর্ণ এবং বলিষ্ঠ মার্কস্‌বাদী সাহিত্য বিতর্ক হিসেবে অভিহিত করতে চান।

এঁদের তর্ক বিতর্ক মতান্তর, ভুল বোঝাবুঝি সত্ত্বেও এঁরা সমবেত ভাবে প্রগতিশীল সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। এ প্রসঙ্গে একটা কথা না বললে বোধ হয় সত্যের অপলাপ করা হবে। চল্লিশের দশকের প্রারম্ভে মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরা ব্যক্তিগত ভালো লাগা-মন্দ লাগার ঊর্ধ্বে সাধারণভাবে সকলেই মার্কসবাদের অনুশীলন ও তার প্রয়োগে সামগ্রিক অর্থে দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রসর হয়েছিলেন। ব্যক্তিপ্রতিভা ও ব্যক্তি মানসিকতার তারতম্য ও ঝোঁক অবশ্যই ছিল। যেমন, চিন্তাভাবনার দিক দিয়ে স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, সুধী প্রধান, বিনয় ঘোষ, সরোজ দত্ত, অনিল কাঞ্জিলাল

এবং কিছুটা পরিমাণে চিন্মোহন সেহানবীশ অনেক বেশী পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং নিজেদের ভেতর মতামতও বিনিময় করতেন। আবার সাধারণভাবে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, বিষ্ণু দে, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সমর সেন প্রমুখ চিন্তা ভাবনার দিক দিয়ে ছিলেন পরস্পরের অনেক বেশী কাছাকাছি। প্রথমপক্ষ মনে করতেন, বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যের প্রতি বিমুখতা, কৃত্রিম ভাষা ও একান্ত ব্যক্তিগত চিত্রকল্প ব্যবহার, উৎকট ইউরোপ মনস্কতা, উদ্ভট আঙ্গিক বিলাস এবং জনমনে পশ্চিমী অবক্ষয়বাদী সাহিত্যধারার প্রতি সহানুভূতি পোষণের মাধ্যমে দ্বিতীয় পক্ষ এক ভ্রান্ত, অমার্কসীয় পথ অনুসরণ করছেন। পক্ষান্তরে, দ্বিতীয়পক্ষ ভাবতেন, বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য বরণের নামে নতুন আঙ্গিক গ্রহণে অনিচ্ছা এবং সজনীকান্ত গোষ্ঠীর প্রতি প্রচ্ছন্ন পক্ষপাতের মধ্য দিয়ে প্রথম পক্ষ প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করছেন।

চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে এই জাতীয় তর্ক বিতর্ক থেকে মার্কসবাদী শিবিরে একটা জিনিস ফুটে উঠেছিল পরিষ্কার ভাবে—যার একপ্রান্তে 'সাচ্চা প্রগতিবাদী' আর অন্যপ্রান্তে 'মেকী প্রগতিবাদী'দের অবস্থিতি। ফলত দুটি দলের পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিষোদ্‌গার। ফলত 'প্রগতি লেখক সংঘে'র আন্দোলনে ১৯৩৯-৪০ পর্বে ভাঁটার টান। আবার ২২শে জুন, ১৯৪১-এ বিশ্বে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ত হিটলারের নাৎসী বাহিনী যুদ্ধ ঘোষণা করলে, সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির রণনীতি মোড় ঘুরে, জন-যুদ্ধের সূচনা করে। ফলে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের বিভিন্ন গণফ্রন্টে নতুন প্রাণচাঞ্চল্য দেখা যায়। ঠিক এমনি সময়ে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। ফ্যাসিস্ত বিরোধী মিছিল পরিচালনার সময় ঢাকার তরুণ সাম্যবাদী লেখক সোমেন চন্দ ঘাতকদের হাতে প্রাণ দেন, ১৯৪২-এর ৮ই মার্চ। এই সূত্রে ১৯৪২ এর ২৮ মার্চ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় ফ্যাসিস্ত বিরোধী লেখক সম্মেলন। এই সম্মেলনের মঞ্চেই গঠিত হয় ফ্যাসিস্ত বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ। যার দায়িত্ব ছিল প্রগতি লেখক সংঘের শাখারূপে কাজ করার। অবশ্য প্রগতি লেখক সংঘের কাজে যে ভাঁটার টান চলছিল তা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। নইলে ১৯৪৩ এ বোম্বাইয়ে কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসের পাশাপাশি নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের যে অধিবেশন বসে, তাকে 'জনযুদ্ধে'র সংবাদ প্রতিবেদক 'অভিনব সংস্কৃতি উৎসব' আখ্যা দিলেন কেন?[৪৩] যদিও এই অধিবেশনে এস. এ. ডাঙ্গে বর্তমান সময়কে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন : 'I only emphasis the need of the hour, the need of the people, the demands of the people on their artists. Defence of the country against fascism, against the hoarder and profiteer, against famine. Unity of the people with complete freedom for every nationality to work that unity its own independent way and thus forward to our national liberation. The people demand of their artists to present these in art forms. to clothe these sacred emotions and feeling in inspiring, binding, mobilising pictures of pen and pencil.'[৪৪] যাইহোক এর পরে আর প্রগতি লেখক সংঘের কথা আমাদের কবির কাছে গ্রহণীয় হয়নি বলে. আমরাও আর সে প্রসঙ্গে বিশদ হচ্ছি না।

কিন্তু প্রগতি লেখক সংঘের পরিবেশগত এই অবস্থাতেই সমর সেনের শ্বাস-প্রশ্বাস বইতো না। আমাদের অজানা নয় যে, তাঁর সাহিত্য রুচিতে এলিয়ট, ইয়েটস্, এজরা পাউন্ড যেমন ঘোরাফেরা করতেন—তেমনি পরিচয় হয়েছিল ইংলণ্ডের সমসাময়িক কালের মার্কসবাদী তরুণ কবিগোষ্ঠীর সঙ্গে। অর্থাৎ একদিকে যেমন রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী এলিয়ট, এবং স্বৈরতন্ত্রে উৎসাহী পাউন্ড, তেমনি অন্যদিকে 'New Signatures' কাব্য সংকলনের ফ্যাসিজম বিরোধী অডেন, জুলিয়ান বেল, সিসিল ডে ল্যুই, স্টীফেন স্পেন্ডার, জন লেম্যান, লুই ম্যাকনিস প্রমুখ তরুণ কবিদের নূতন স্বাক্ষরের নতুনত্বের প্রতি আকর্ষণও হয়তো তাঁর মনে ধাঁধার সৃষ্টি করেছিল। এর ওপর আবার ফ্রয়েডের আধুনিক 'Ego, ID এবং Super Ego'-র নিয়ন্ত্রণ ও সর্বোপরি মধ্যবিত্ত মানসের অদৃষ্টবাদী নিয়ন্ত্রণ—কবির কোন স্তরে সত্যিকার স্থিতি ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করে তোলে। কেননা 'In Defence of the Decadents' প্রবন্ধে, তিনি এই বলে মত প্রকাশ করেছিলেন যে, অশিক্ষিত জন সাধারণের অস্ফুট বোধশক্তিকে সব দলের রাজনৈতিক দালালরাই স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারে এবং করেও। স্বাধীন চিন্তা শক্তির স্ফূরণ না হলে, কায়েমী স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থায় কেবল বিপ্লবী কবিতায় বা বিপ্লবী বক্তৃতার বিস্ফোরণে ফাটল ধরানো অসম্ভব। ফল হেতু, বিপ্লবী সাম্যবাদী হিসেবে নিষ্ক্রিয় সচেতনতার অভিযোগ এনেছিলেন প্রগতিকেরা তাঁর বিরুদ্ধে। তাঁদের মতে 'Revolutionary Training' ছাড়াই সমর সেন বিপ্লবী সাজার চেষ্টা করছেন। আসলে তাঁরা ভুলেছিলেন যে, সমর সেন শিল্পী। তিনি শিল্পীর মন নিয়ে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের তথা মানব সম্প্রদায়ের পিপাসার তৃপ্তি বিধানের দায়বদ্ধতা স্বীকার করেছিলেন। পরবর্তীকালেও তাঁর এ মনোভাব অটুট ছিল। তাই কবি প্রগতিবাদী সেই সব প্রগতিকদের প্রতি কটাক্ষ করতে পিছপা হননি—

> 'জীবন যাত্রার গতি বদলাতে তাই
> বিশেষ আগ্রহ নেই, প্রয়োজনও দেখি না।
> আর্টের কৈবল্য শুধু, অখণ্ড চৈতন্য শুধু,
> আত্মচর্চার ধারালো সিঁড়ি ধাপে-ধাপে উঠে
> প্রাণের গম্বুজে আমার এ-যাত্রা,
> আমার এ উর্দ্ধগতি সবাই দেখুক,
> প্রগতিকেরা বিশেষ করে; ....'[৪৫]

উল্লেখপঞ্জী

১ জীবনানন্দ দাস — 'উত্তর রৈবিক বাংলা কাব্য' : 'কবিতার কথা'। ৪র্থ সং। সিগনেট প্রেস। ১৩৮৭। পৃ ৩

২. সমর সেন — 'বাংলা কবিতা' : 'কবিতা' পত্রিকা : বৈশাখ ১৩৪৫। পুনর্মুদ্রিত, 'কলমের ফ্রন্ট'। ৮ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা: ১৯৮৮। পৃ. ১৫-১৬।

৩. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় — 'রবীন্দ্র জীবনী ও প্রবেশক'। ৩য় সং। বিশ্বভারতী। ৩য় খণ্ড, ১৩৬৮। পৃ. ২০

৪. জীবেন্দ্র সিংহরায় — 'আধুনিক কবিতার মানচিত্র'। দে'জ পাবলিশিং। ১৯৮৬। পৃ ১৭-১৯
৫. দীপ্তি ত্রিপাঠী — 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়'। ৪র্থ সং। দে'জ পাবলিশিং। মার্চ ১৯৮৮। পৃ. ৯,৮
৬. জীবনানন্দ দাশ — 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা' : 'কবিতার কথা'। পৃ. ২৪
৭. সমর সেন ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা' (সমালোচনা)। 'কবিতা' কার্তিক, ১৩৪৭।
৮. অচিন্ত্যকুমাব সেনগুপ্ত — 'কল্লোল যুগ'। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা। ১৩৬৬। পৃ. ১৮
৯. বুদ্ধদেব বসু — 'কল্লোল ও দীনেশরঞ্জন দাশ' (সম্পাদকীয়) : 'কবিতা'। ৭ম বর্ষ, ১৯৪১। পুনর্মুদ্রিত, মীনাক্ষী দত্ত সংকলিত 'কবিতা'। প্যাপিরাস। ১৯৮৮। প্রথম খণ্ড।
১০. প্রেমেন্দ্র মিত্র — 'সমর প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা'; স্মৃতিকথা : 'অনুষ্টুপ'। ২২শ বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা। ১৯৮৮। পৃ. ৫
১১. সমর সেন — 'বাবুবৃত্তান্ত'। দে'জ ২য় পবিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সং। দে'জ পাবলিশিং। ১৯৮৮। পৃ. ২৩
১২. মীনাক্ষী দত্ত — 'কবিতা' পত্রিকা-সংকলন। প্রথম খণ্ড
১৩ বুদ্ধদেব বসু — 'আধুনিক বাংলা কবিতা'—সংকলন, ভূমিকা। ৫ম পরিবর্ধিত সং। এম. সি সরকার। আগস্ট ১৯৭৩। পৃ ৯
১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব — 'গদ্যছন্দ' 'বচনাবলী'। জন্মশতবার্ষিকী সঃ। প. ব. সরকার। ১৪শ খণ্ড, ১৩৬৮। পৃ ২৭৮-২৭৯
১৫ বাসন্তী চক্রবর্তী — 'রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্য'। ওরিয়েন্ট বুক কোং। মাঘ ১৩৮৭। পৃ. ৪০
১৬. বাসন্তী চক্রবর্তী — তদেব। পৃ. ১৯-৩১
১৭. শিশিরকুমার দাশ — 'গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব'। দে'জ পাবলিশিং। ১৩৯২। পৃ ৬৯
১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — 'সাহিত্যের পথে' : 'রচনাবলী'। জন্মশতবার্ষিকী সং।১৪শ খণ্ড, ১৩৬৮। পৃ. ৪২০
১৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — তদেব। 'ছিন্নপত্রাবলী' · 'রচনাবলী'। জন্মশতবার্ষিকী সং। ১১শ খণ্ড। পৃ. ২১৫
২০. জীবনানন্দ দাশ — 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা' : কবিতার কথা। পৃ. ২১
২১ আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পা)—'আধুনিক বাংলা কবিতা'—সংকলন, ভূমিকা। ১৯৪০। পৃ. ১১
২২. অচিন্ত্যকুমাব সেনগুপ্ত — 'আবিষ্কার' : 'সমসাময়িক কবিতা'। 'রচনাবলী'। গ্রন্থালয়। ১ম খণ্ড ১৯৭৪। পৃ. ৬৯
২৩. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত — 'কুলায় ও কালপুরুষ' : 'প্রবন্ধ সংগ্রহ'। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ফাউন্ডেশন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। ১৩৯০। পৃ ২৬৫
২৪. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত — তদেব। 'স্বগত' : 'প্রবন্ধ সংগ্রহ'। পৃ. ১৭
২৫ জীবনানন্দ দাশ — 'বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ' : 'কবিতার কথা'। পৃ. ১৩৩-১৩৪
২৬. অশ্রুকুমার সিকদার—'আধুনিক বাংলা কবিতার দিগ্‌বলয়'। পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত ২য় সং। অরুণা প্রকাশনী। ১৩৮৬। পৃ ৯৬
২৭. অশ্রুকুমার সিকদার—তদেব। পৃ. ১০২

২৮. বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায় — 'আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা'। প্রকাশ ভবন। এপ্রিল ১৯৬৯। পৃ. ১০৯-১১০
২৯. সঞ্জয় ভট্টাচার্য — 'কবি জীবনানন্দ'। ভারবি। ১৯৭০। পৃ. ১৩৮
৩০. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত — 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা; ১৩৭৯। পৃ. ১৩৮
৩১. দীপ্তি ত্রিপাঠী — 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়'। পৃ. ৪-৫
৩২. বুদ্ধদেব বসু — 'বন্দীর বন্দনা' : 'কবিতা সংগ্রহ'। দে'জ পাবলিশিং। ১৯৮০। প্রথম খণ্ড। পৃ. ৩৫
৩৩. দীপ্তি ত্রিপাঠী — 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়'। পৃ. ৬৩
৩৪. ধনঞ্জয় দাশ — 'মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক। প্রাইমা পাবলিকেশনস। কলকাতা। ১৯৭৫। প্রথম খণ্ড। পৃ. ৮-৯
৩৫. Sudhi Pradhan – 'Marxist Cultural Movement in India'. Foreword, National Book Agency Pvt.Ltd. 1979. Vot. I. p. ix-x
৩৬. Munshi Prem Chand – 'The Nature and Purpose of Literature' (Presidental Address, delivered to the 1st All India Progressive Writer's Congress) Collected in 'Marxist Cultural Movement in India', by S. Pradhan. vol-I. p. 58-59
৩৭. ধনঞ্জয় দাশ — 'মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক'। ১ম খণ্ড। পৃ. ১০
৩৮. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত — 'সাহিত্যে প্রগতি-২'। সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রগতি' সংকলনে এটি শুধু 'সাহিত্যে প্রগতি' নামে সংকলিত। 'প্রগতি'তে সংকলিত হওয়ার আগেই এটি পরিবর্তিত আকার লাভ করে। ধনঞ্জয় দাশ তাঁর 'মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক'— ৩য় খণ্ডে প্রথমে একে 'সাহিত্যে প্রগতি' নামে অন্তর্ভুক্ত করেন। পরে পরিবর্ধিত আকারের অংশটিকে 'সাহিত্যে প্রগতি-২' নামে পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করেন। পৃ. ৫৫
৩৯. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত —'প্রগতি' সংকলনের ভূমিকা। পুনর্মুদ্রিত, 'মার্কস্‌বাদী সাহিত্য বিতর্ক'— ৩য় খণ্ডে। পৃ. ৪০
৪০. মোহিতলাল মজুমদার —'সাহিত্য বিতান'। পরিবর্ধিত ২য় বিদ্যোদয় সং। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী। এপ্রিল ১৯৭৪। পৃ. ২২৬
৪১. 'New Indian Literature', 1939 – Reprinted in 'Marxist Cultural Movement in India'. Compiled & ed. by Sudhi Pradhan. 1979. vol-I
৪২. Christopher Cordwell – 'The Future of Poetry' : 'Illusion and Reality' People's Pub. House. New Delhi. Reprint 1981. p. 286-287
৪৩. রাধেশ্যাম সাহা — 'প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন ও আধুনিক বাংলা কবিতা (১৯৩৫-১৯৫০)'। উ. ব. বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি. (আর্টস) থিসিস। ১৯৮৭। পৃ. ১৫৯
৪৪. S. A. Dange – 'Literature and the People'. Peoples Pub. House. Bombay. 1943; p. 19
৪৫. সমর সেন — 'সাফাই : চার', 'তিনপুরুষ'। ১৯৮৯। পৃ. ২৪

তৃতীয় অধ্যায়

আধুনিকতা ও সমর সেনের কবিতা

"এসো করো স্নান নবধারা জলে।"

(বিরতি : গ্রহণ)

সমর সেন কবিতা লিখতে শুরু করেছেন তিরিশের দশকে। তার কিছু আগে থেকেই বাংলা আধুনিক কবিতার পর্ব শুরু হয়েছে। আর কবি সমর সেন সেই আধুনিক কবিতা আন্দোলনের সঙ্গে অচিরে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁর কবিতা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আধুনিক কবিতা আন্দোলনের আলোচনা অতিশয় সংগত। আমরা পূর্বসূরীদের পন্থানুসরণ করে এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সেকালের আধুনিকতা আন্দোলনের অনেকেই সাহিত্যে আধুনিকতা বিষয়ে কিছু না কিছু বলতে চেয়েছেন। তাঁদের বক্তব্যও কিছু অস্পষ্ট নয়। তবু আধুনিকতার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে এঁদের অস্বস্তি কম নয়। রবীন্দ্রনাথ কালের উপরে আধুনিকতার দায়ভার অর্পণ করেননি। বরং মেজাজ মর্জির উপরে নির্ভর করেছেন। তাঁর মন্তব্য ঃ 'এটা কালের কথা ততটা নয়, যতটা ভাবের কথা। নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলেনা। যখন সে বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকাটাকেই বলতে হবে মডার্ন। বাংলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।'[১] কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কবিতার চরিত্র ধরতে পারলেও এই কবিতার চরিত্রকে সুন্দর বলে মনে করতে পারেন নি এবং এ ব্যাপারে তাঁর ব্যক্তিগত রুচি অনেকখানি ক্রিয়াশীল ছিল। রবীন্দ্রনাথ অন্তর থেকে আধুনিকতাকে স্বীকার করে নিতে পারেননি। কেননা চিন্তার বিশৃঙ্খলা ছিল তাঁর পক্ষে অসহ্য। তিনি বলেছেন —'আধুনিকতার যদি কোনো তত্ত্ব থাকে, যদি সেই তত্ত্বকে নৈর্ব্যক্তিক আখ্যা দেওয়া হয়, তবে বলতেই হবে, বিশ্বের প্রতি এই উদ্ধত, অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টি এও আকস্মিক বিপ্লব জনিত একটা ব্যক্তিগত চিত্তবিকার। এও একটা মোহ, এর মধ্যে শান্ত নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে গ্রহণ করবার কোনো গভীরতা নেই। অনেকে মনে করেন এই উগ্রতা, এই কালাপাহাড়ি তাল ঠোকাই আধুনিকতা'।[২] এই সঙ্গে তিনি 'সাহিত্যের মূলনীতি চিরন্তন'[৩] বলেও মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর বিশ্বাসে চিন্তার বিশৃঙ্খলা কল্পনার অতীত ছিল। অথচ আধুনিকতাকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিচার করলে দেখা যায়—'When we use the word 'modern' in a general sense we use it to describe a whole complex of culture which developed in Europe and spread beyond it from the fifteenth century to the present day.........This complex rest on economic foundation. The complex itself is changeful.'[৪] বলাবাহুল্য, আধুনিকতাকে উপলব্ধি করলেই আধুনিক কবিতার চরিত্রধর্ম নির্ণয় করতে

পারা যায়। উপনিষদ-প্রীতির কারণে বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতাকে মনেপ্রাণে বরণ করে নিতে পারেননি। তাই শেষ দিকে তাঁর কাব্যের যে পরিবর্তন দেখা যায় মূলত তা আঙ্গিকের রদ বদল।

আবার রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে কবি-ব্যক্তিত্ব জীবনানন্দ দাশ আধুনিক কবিতা সম্পর্কে বলেছেন : 'নতুন সময়ের জন্যে নতুন, ও নতুন ভাবে নির্নীত পুরোনো মূল্য, নতুন চেতনা ও নতুন ভাবে আবিষ্কৃত পুরোনো চেতনার যে একান্ত দরকার শিল্পে ও জীবনে একালের কোনো-কোনো বাঙালী কবি সেটা বুঝতে পেরেছেন বলেই আজকের বাংলা কবিতা স্বভাবতই বিষয় ও রীতি নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষার একটা অব্যাহত প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে।'[৫] এখানে নতুন সময়ের জন্যে যে মূল্য বোধ ও চেতনার কথা একান্ত প্রয়োজনীয় হিসেবে ভাবছেন জীবনানন্দ, তাতে পুরোনো ভাবনা নির্বিচারে অগ্রাহ্য হচ্ছে না। চিরাগত ঐতিহ্যকে পরিপ্রশ্ন ও অনুশীলনের মধ্য দিয়েই নব্য বাস্তবতার উপযোগী হয়ে উঠতে হবে বলেই তাঁর বিশ্বাস। গ্রহণ ও বর্জনের মধ্য দিয়ে মানুষের নিরন্তর জায়মান মানবিক সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ স্বনির্ভর ও সুসমঞ্জস করে তোলাকেই তিনি আধুনিক অস্তিত্বের সার বলে ভেবেছেন। একথা বলার আগে অবশ্য তিনি পাঠককে জানাতে কার্পণ্য করেন নি—'বাংলা কাব্যে বা কোনো দেশেরই বিশিষ্ট কাব্যে আধুনিকতা শুধু আজকের কবিতায় আছে—অন্যত্র নয়—একথা ঠিক নয়।'[৬] এই বিশ্বাসের ফলে সমালোচক জীবনানন্দ হয়ে আধুনিক বাংলা কবিতার সংজ্ঞা নির্ণয় অসম্ভব হয়ে পড়ে। কারণ এখানে স্পষ্টভাবে আধুনিক কবিতার কাল সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার হয় না।

আধুনিক বাংলা কবিতা সম্পর্কিত সমালোচনা গ্রন্থে অনেক ক্ষেত্রেই আধুনিক বাংলা কবিতার সংজ্ঞা নিয়েও বক্তব্য প্রসঙ্গ ক্রমে এসেছে। আবার অনেকে সযতনে এড়িয়েও গিয়েছেন। কবি সমালোচক সঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁর 'আধুনিক কবিতার ভূমিকা' গ্রন্থে আধুনিক বাংলা কবিতার সংজ্ঞা বিচারে প্রবৃত্ত হননি। গ্রন্থের অন্যান্য প্রবন্ধ মাধ্যমে আধুনিক বাংলা কবিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন ঠিকই। কিন্তু সংজ্ঞা নির্ণয় নিয়ে কোনো বক্তব্য সাজান নি। অনুরূপভাবে, সংজ্ঞা নির্ণয়ের সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েছিলেন বলেই 'আধুনিক বাংলা কবিতা' (১৩৪৬-র শ্রাবণ)-র অন্যতম সংকলক, সয়ীদ আইয়ুব স্পষ্টতর কাল নির্দেশক সংজ্ঞা প্রদান করেছিলেন। তাঁর মতে কালের দিক থেকে বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত কাব্যকেই আধুনিক বাংলা কাব্য বলা যেতে পারে। এখানে দুটি বৈশিষ্ট্যই প্রাধান্য পেয়েছে—প্রথমত, কালবাচক—মহাযুদ্ধ পরবর্তী, দ্বিতীয়ত, ভাববাচক—রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত। কিন্তু মাত্র এই দুটি বৈশিষ্ট্যে আধুনিক কবিতার চরিত্র সনাক্ত করা যায় না। এই সংকলনের সম্পাদক-দ্বয়—আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দুটি পৃথক ভূমিকায় আধুনিক কবিতার চরিত্র বোঝানো অপেক্ষা তার লক্ষণ বোঝাতে তৎপরতা দেখিয়েছেন। সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'কবিতার কালান্তর' (১৯৭৬) গ্রন্থে আধুনিক শব্দ ব্যবহারে, ঐতিহাসিক সময়সীমা চিহ্নিত করেছেন এবং আধুনিক শব্দ ব্যবহারের ক্রমিক

ধাপে আধুনিক শব্দটি যে কবিতার পূর্বে স্মরণীয় ভাবে রয়ে গেল, তার উল্লেখ করলেও আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা নির্ণীত না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

বুদ্ধদেব বসু আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা নির্ণয় করতে চেয়েছেন এই বলে : 'এই আধুনিক কবিতা এমন কোনো পদার্থ নয়, যাকে কোনো একটা চিহ্ন দ্বারা অবিকল ভাবে সনাক্ত করা যায়। একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের, আবার এর মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি। আশা আর নৈরাশ্য, অন্তর্মুখিনতা ও বহির্মুখিতা, সামাজিক জীবনের সংগ্রাম আর আধ্যাত্মিক জীবনের তৃষ্ণা এই সবগুলি ধারাই পাওয়া যাবে শুধু ভিন্ন ভিন্ন কবিতে নয়, কখনো হয়তো বিভিন্ন সময়ে একই কবির রচনায়।'[৭] এখানেও বুদ্ধদেব আসলে কেন্দ্রীয় প্রাণ বস্তুর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ না করে কয়েকটি লক্ষণ বা উপসর্গকে আধুনিক কবিতার বৈশিষ্ট্য বলে অভিহিত করতে চেয়েছেন। বলা বাহুল্য, যে গুলি প্রায় সমস্তই এক রবীন্দ্রনাথে বর্তমান। ফলে বুদ্ধদেবের এই মন্তব্য আধুনিক কবিতার আত্মিক বৈশিষ্ট্য বা আধুনিকতার বিশিষ্ট পরিচয় তুলে ধরতে পারেনা।

আধুনিক বাংলা কবিতাব সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে ডঃ দীপ্তি ত্রিপাঠী মনে করেন নেতিবাদের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন গত্যন্তর নেই। কিন্তু যদি এক কথায় এর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতেই হয় তবে বলতে হয়, আধুনিক বাংলা কাব্য মিশ্র সংস্কৃতির উপাসক। এর বর্ণ ধূপছায়া, এর মর্ম জঙ্গমতা, এর ধর্ম বহু দেববাদ। এপ্রসঙ্গে কয়েকটি সাধারণ লক্ষণও সূত্রাকারে আমাদের জানিয়েছেন—

১। নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাত।
২। বর্তমান জীবনে ক্লান্তি ও নৈরাশ্যবোধ।
৩। আত্মবিরোধ ও অনিকেত (rootless) মনোভাব।
৪। বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য হতে সচেতন গ্রহণ।
৫। ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের প্রভাব। অবচেতন মনের ক্রিয়াকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে চিন্তাধারার অসম্বদ্ধতা।
৬। ফ্রেজার প্রমুখ নৃতাত্ত্বিক, ও প্ল্যাঙ্ক, বোর, আইনস্টাইন প্রভৃতি আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানীর প্রভাব।
৭। মার্ক্সীয় দর্শনের, বিশেষত সাম্যবাদী চিন্তাধারার প্রভাবে নতুন সমাজ সৃষ্টির আশা।
৮। মনন ধর্মিতা—অনেক সময় জ্ঞানের বিপুল ভাবে দুরূহতার সৃষ্টি।
৯। বিবিধ প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধে (যেমন প্রেম, সুন্দর, কল্যাণ, ধর্ম) সংশয় এবং তৎসঞ্জাত অনিশ্চয়তার উদ্বেগ।
১০। দেহজ কামনা, বাসনা ও তৎপ্রসূত অনুভূতিকে স্বীকার করা এবং প্রেমের শরীরী রূপকে প্রত্যক্ষ করা।
১১। ভগবান এবং প্রথাগত নীতি ধর্মে অবিশ্বাস।
১২। রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহ এবং নতুন সৃষ্টির পথ সন্ধান।

ভাব ধর্মের সঙ্গে শৈলী ও প্রকরণ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বলে আধুনিক কাব্যের প্রকরণেও বহু পরিবর্তন দেখা দিল। এজন্য আধুনিক কাব্যের লক্ষণ আলোচনায় আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্যও সমমর্যাদা দাবি করে। বৈশিষ্ট্যের লক্ষণগুলি এই :

১। বাক্‌রীতি ও কাব্যরীতির মিশ্রণ। গদ্যের ভাষা, প্রবাদ, চলতি শব্দ, গ্রাম্য শব্দ ও বিদেশী শব্দের ব্যবহারে গদ্য, পদ্য ও কথ্য ভাষার ব্যবধান বিলোপের চেষ্টা। পরবর্তী পর্যায়ে অতি-ব্যবহৃত পদ্যগন্ধী শব্দকেও গ্রহণ অর্থাৎ ভাষা সম্বন্ধে সর্বপ্রকার শুচিবায়ু পরিহার।

২। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পুরাণ এবং বিখ্যাত কবিদের কাব্য অথবা ভাবনা থেকে উদ্ধৃতির যত্রতত্র প্রয়োগে সিদ্ধরসকে চূর্ণ করা বা অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুন অনুভূতির সমন্বয় সাধন।

৩। প্রচলিত কবিপ্রসিদ্ধ উপমা ও বর্ণনার বিরলতম ব্যবহার। প্রচলিত কাব্যিক শব্দ, যথা—ছিনু, গেনু, মনে, হিয়া প্রভৃতি বর্জন।

৪। প্রাচীন উপমা বা শব্দের অভিনব অর্থে প্রয়োগ এবং তৎসহযোগে নতুন চিত্রকল্প সৃষ্টি।

৫। শব্দ প্রয়োগে বা গঠনে মিতব্যয়িতা ও অর্থ ঘনত্ব সৃষ্টির চেষ্টা।

৬। এই মিতব্যয়িতার উদ্দেশ্যে বাহুল্য বর্জনের ফলে মধ্যবর্তী চরণের অনুল্লেখ। তার জন্য চিন্তাধারার মধ্যে একটা উল্লম্ফনের সৃষ্টি, আপাত দৃষ্টিতে যাকে মনে হয় অসম্বদ্ধ। ছড়ার উল্লম্ফনের সঙ্গে তার পার্থক্য মৌলিক।

৭। নামবাচক বিশেষ্য, বহুপদ ময় বিশেষণ, অব্যয় এবং ক্রিয়ার পূর্ণরূপের ব্যবহার। চলতি ক্রিয়াপদের সঙ্গে সংস্কৃত বহুল বিশেষ্য বা বিশেষণের সংযোগ।

৮। প্রচলিত পয়ার, সনেট ও মাত্রাপ্রধান ছন্দের রূপান্তর এবং মধ্যমিলের (internal rhyme) সৃষ্টি।

৯। গদ্যছন্দের ব্যবহার।

১০। ব্যঙ্গ, বিতর্ক, অদ্ভুত, বীভৎস রসের বহুল ব্যবহার।

১১। শব্দালংকার অপেক্ষা বিরোধাভাস, বক্রোক্তি, স্মরণ প্রভৃতি অর্থালংকারের ব্যবহার।

১২। বিষয় বৈচিত্র্য।'[৮]

আসলে আধুনিকতা ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিচার্য। আধুনিকতা একটি নিয়মের ফলমাত্র। অবশ্যই বাংলা কবিতার আধুনিকতা ধারাবাহিকতা বিচ্যুত কিছু নয়। পরিবর্তমান জগৎজীবন যে সচেতন দায়বদ্ধতার দ্বারা চলতি কালকে একমাত্র সত্য মনে করেনা, কালের গভীরতম অন্ধকার থেকে প্রোজ্জ্বল চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টায় রত থাকে তাকে, আধুনিকতা বলা যেতে পারে। সর্বাঙ্গীন জীবনের জন্যে অন্বেষণই যে আধুনিকতা-সেই অভীপ্সিত এবং কাঙ্ক্ষিত জীবন দর্শনের মাত্র কয়েকটি স্ফুলিঙ্গ আধুনিক কবিতায় সংলক্ষ্য। যে কবিতা সেই আত্মপ্রকাশের সংলক্ষ্যে সংক্রামিত তাকেই বলা

যাবে আধুনিক। সুধীন্দ্রনাথের ভাষায় যে, 'অবৈকল্য আর অকপটতা'। সমাজ সভ্যতা ইতিহাসের ক্রমবিকশিত অধ্যায়ের যে বর্ণিল বিভূতি এবং তার সঙ্গে মানবচৈতন্যের যে অন্তর যোগ—তারই প্রকাশকে আধুনিক কবিতা হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। আধুনিক কবিতাকে বিবর্তিত ইতিহাসের পটভূমিকায় দেখেছেন তাই ড. অশ্রুকুমার সিকদার। 'প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ক্রমান্বয় ভাঙনের পথে তার (আধুনিক কবিতার) আবির্ভাব। যুদ্ধে যুদ্ধে রাষ্ট্রবিপ্লবে ইয়োরোপ তখন ক্ষত বিক্ষত-এবং যেহেতু তখন ইয়োরোপ ছিল প্রায় সমস্ত বিশ্বের শাসক, সেই কারণে দূরতম দিগন্ত পর্যন্ত ইয়োরোপীয় ঘটনা ভাবনার অনুকম্পন পৌঁছে যেত। রুশ বিপ্লব, উনত্রিশ সালের অর্থনৈতিক বিপর্যয়, শক্তিবাদ ও ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থান,........এছাড়া চিন্তা ও মনীষার জগতে এল বিপুল পরিবর্তন। রুশবিপ্লব জয়ী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিজীবী মহলে মার্কসবাদ সশ্রদ্ধ কৌতূহল জাগালো, সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত ধারণা তাই ভাঙতে শুরু করলো। পুঁথিগত ও বিশ্ববার্তাগত জ্ঞান মানুষের চৈতন্য চিন্তার মধ্যে এক ঘোর আলোড়ন বাধিয়ে দিল। ফ্রয়েডের গবেষণা বিশ্লেষণ করলো স্বপ্নের কুহেলিময় জগৎকে, সেই গবেষণার ফলে পারিবারিক সম্পর্ক, মনোজগৎ ও নরনারীর প্রেম ইত্যাদি বিষয়ে পুরোনো ধারণা গুলো চুরমার হয়ে গেল। নৃতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানের গবেষণা দেখালো কোনো নীতি বা অনুশাসনই নিত্য বা সর্বদেশে সমান সত্য নয়, নষ্ট হয়ে গেল চিরন্তন মূল্যবোধ এই নৈতিক আপেক্ষিকতায়। এসবের সঙ্গে এসে যোগ দিল ক্রমান্বয় শিল্প বিস্তার। মুছে গেল এতদিনের পরিচিত প্রকৃতি, চিমনির ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল ঈশ্বরেব আকাশ। ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা বোধ, অতিকায় রাষ্ট্র ও যন্ত্রশক্তির সামনে মানুষের ঐকান্তিক অসহায়তা, প্রকৃতি, বিচ্ছিন্ন নৈর্ব্যক্তিক নাগরিক জীবন যাপন, যান্ত্রিক উৎপাদনের ফল হিসাবে অনিবার্য যূথবদ্ধতা—এ সমস্তই মানুষের ব্যক্তিত্বকে যেন বিনাশের পথে নিযে চলেছিল। এই প্রতিকূল পরিবেশেই বীরের মতো, যেন সিসিফান্দের মতো আধুনিক কবির যাত্রা। তার মনে হল রিয়ালিটির চেহারার যেন এক মৌলিক পরিবর্তন ঘটে গেছে এবং এই পরিবর্তিত রিয়ালিটিকে রূপ দিতে গেলে প্রকাশের নতুন পন্থা খুঁজে নেওয়া প্রয়োজন। যে অবস্থায় ভেঙে পড়েছে ঈশ্বর ও নীতি ধর্মে বিশ্বাস, যুক্তি ও মানবতার প্রতিপত্তি, সৌজন্য ও সামাজিক দায়িত্ব বোধ—অর্থাৎ রেনেসাঁসের যাবতীয় উত্তরাধিকার, যেখানে ভেঙে পড়তে চায় ভাষার অর্থ এবং ব্যাকরণের অনুশাসন। সুতরাং খুঁজতে হয় শিল্পীকে প্রকাশের নতুন মাধ্যম, আত্মপ্রকাশের ক্ষুরধার অন্য এক ভঙ্গিমা। প্রকাশের ও রূপায়ণের এই নতুন ভঙ্গিমার মধ্যেই কবিতার আধুনিকতা।'[৯]

পশ্চিম পৃথিবীর বিরাট পরিবর্তন জনিত বিপ্লবের ঢেউ বাঙলাদেশের নিভৃততন্ত্রীতেও ভাঙনের সুর তুলেছিল। সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের অন্দরে অসহযোগ আন্দোলন, শিল্পবিস্তার, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, বেকার সমস্যা, সমস্ত ঘটনাই অনুভূতি প্রবণ যুবক কবিদের চোখের সামনে ঘটেছিল। যার জন্য আধুনিক বাংলা কবিতাকে ইয়োরোপীয় আধুনিক কবিতার প্রতিধ্বনি মাত্র যেমন বলা যাবে না, তেমনি প্রতীচ্যের ব্যঙ্গ সমস্তও বলা চলে না।

যদিও প্রায় অধিকাংশ কবিই আধুনিকতার অন্বেষণে পশ্চিমের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন— অথচ তাঁদের ঝুলিতে পশ্চিমের মহাযুদ্ধ কেন্দ্রিক প্রত্যক্ষ জীবনাভিজ্ঞতা ছিল না। অর্থাৎ আধুনিকতা তাঁদের কবিতায় অনেকটাই আরোপিত। কিন্তু আধুনিকতা তো আরোপিত হতে পারে না, আধুনিকতা জীবন মন্থন' সহজাত হবে। তাই বাংলা কবিতার আধুনিকতাকে শুধু সংশয়, ক্লান্তি, যন্ত্রণা-বেদনার মধ্যে অনুসন্ধান করলে ঠকতে হবে। আধুনিকতা যেমন চিত্ত দীর্ণতা তেমনি একটি সদর্থক প্রবৃত্তি, মানবচেতনার সমাজচৈতন্যে অভিমুখিতাও বটে। আধুনিক বাংলা কবিতা তাই বিষয় বৈচিত্র্যে বিশ্বপরিক্রমায়, পথাবদ্ধ উপমা-উৎপেক্ষার পথ পরিহারে, ভাষার জটিলতা-জনিত দুর্বোধ্যতায়, পরিবেশের প্রতি আকর্ষণে, অভিনব চিত্রকল্পে, বাগভঙ্গির ব্যবহারে, সর্বোপরি জগৎ-জীবনের প্রতি একটি পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুন চিন্তা চেতনার ফসল।

আধুনিক বাংলা কাব্যান্দোলনের ব্যাপক পটভূমিতে নতুনত্ব সঞ্চারে যে কয়েকটি অনুপ্রেরণা কাজ করেছিল তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য-রবীন্দ্রকাব্যের অপ্রতিহত প্রভাব অতিক্রমনের ইচ্ছা। বাংলা কাব্যের স্বাভাবিক ধারায় এই আন্দোলন যতটা অবশ্যম্ভাবী ছিল, তার থেকে বেশী অনুভূত হয়েছিল বিদেশী ভাষা ও সাহিত্যের—ইংরেজী সাহিত্যের নিবিড় সান্নিধ্যের অনুপ্রেরণায়। একদা মাইকেল মধুসূদন যে বৈপ্লবিক কাব্য প্রচেষ্টার সূত্রপাত করেন এবং তাঁর সাহিত্যে নব জাগরণের যে মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল, তার মধ্যে ব্যক্তিমনের চিন্তাভাবনার পরিবর্তে শ্রেণী ধর্ম ও সম্প্রদায়গত ভাবের চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তিনি আঘাত করেছিলেন ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ভারতীয় মূল্যবোধকে। অনুরূপভাবে, রবীন্দ্রনাথ সামগ্রিক ভাবে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতিকে এক নবতর তাৎপর্যে মণ্ডিত করেন। তাঁর রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বয়ধর্মী সংস্কৃতিতে আস্থা, শাশ্বত সত্যে অবিচলিত বিশ্বাস, বিশুদ্ধ সৌন্দর্য চেতনা এবং অতীন্দ্রিয় প্রেমানুভূতি ঊনবিংশ শতকের ভিক্টোরীয় শান্তি ও প্রাচুর্যের যুগে গড়ে উঠেছিল কিন্তু যুগ ধর্মের প্রভাবে রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিগোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথের এই সর্বজনীন শ্রেয় বোধে বিশ্বাসী হতে পারেন নি। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিগোষ্ঠী উপলব্ধি করেছিলেন যে, রবীন্দ্র আশ্রিত কাব্য পরিমণ্ডল থেকে—রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিকতা থেকে মুক্ত হওয়াতেই জীবনের সামগ্রিক চিত্রাঙ্কন সম্ভব। অবশ্য আধুনিক এই কবিদের কিছু আগেই যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত উচ্চারণ করেছেন।

'কল্পনা, তুমি শ্রান্ত হয়েছ, ঘন বহে দেখি শ্বাস,
বারো মাস খেটে লক্ষ কবির এক ঘেয়ে ফরমাস।'[১০]

কল্পনাবাদী রোম্যান্টিকরা ছিলেন প্রেরণা বাদী। অথচ আধুনিক কবিরা ঐশী প্রেরণাতেও বিশ্বাসী নন। দৈববর্জনই তাঁদের সংকল্প—বাংলা আধুনিক কবিতায় সুধীন্দ্রনাথে তার প্রকাশ দেখা যায়। রোম্যান্টিকতার হাত ধরে আসে যে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা তাকেও আধুনিকরা গ্রহণ করতে নারাজ। বাংলা আধুনিক কাব্যে সুধীন্দ্রনাথ এই ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে তাই কীটসের 'negative capability'-কে 'নৈরাত্ম সিদ্ধি' বলে অনুবাদ করেছেন। আবার রোম্যান্টিকদের কাছে যে প্রকৃতি ও ভূদৃশ্য প্রায় সমার্থক হয়ে

প্রাধান্য পেয়েছে, সেই প্রকৃতির বিরুদ্ধেও আধুনিক কবিতায় প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল। এজন্যই কেউ কেউ মনে করেছিলেন, কল্পনাকে প্রত্যাখ্যান, প্রকৃতির বিরুদ্ধতা, অনুপ্রেরণায় অনাস্থা, নৈর্ব্যক্তিকতার আরাধনা ইত্যাদি সব দিক থেকে উনিশ শতকী রোম্যান্টিকতাকে অস্বীকার করতেই যেন আধুনিক কবিতার আবির্ভাব।[১১] কিন্তু তা ঠিক নয়, কিছু ক্ল্যাসিকাল উপাদানের উপস্থিতি সত্ত্বেও রোম্যান্টিক চেতনার আত্মময়তা আধুনিক শিশু সাহিত্যেও বর্তমান। আধুনিকরাও মানবচৈতন্যের উপর, দৃশ্যদ্রষ্টা সম্পর্ক এবং অভিজ্ঞতার তীব্রতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন রোম্যান্টিকদের মতোই। আধুনিক কবিতায় আত্মসচেতনতার প্রাবল্যে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির বিচ্ছেদ যে দেখা যায়, তাও রোম্যান্টিক যুগেই সংঘটিত। বিচ্ছেদ যন্ত্রণার মর্মজ্বালা সুধীন্দ্রনাথ প্রমুখে প্রত্যক্ষ হেতু তাঁদের কবিতা ক্ল্যাসিকাল কবিতা হতে পারেনি। আত্ম সচেতন ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাবোধহেতু আধুনিকদের উচ্চারণ 'বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী—'[১২] রোম্যান্টিকতার উত্তরাধিকার সূত্রেই এসেছে।

আধুনিক বাংলা কবিতায় রোম্যান্টিকদের মতোই আত্মভাবের পরিচয়ও মেলে। জীবনানন্দ দাশের রূপসী বাংলার বস্তুদৃশ্য ব্যক্তিগত স্মৃতি মমতা ও সংবেদনায় মথিত এই বৈশিষ্ট্যকেই বড়ো করে তোলে। সুধীন্দ্রনাথও সংবর্ত কাব্যে যখন বিশ্ববীক্ষা বিধৃত করেন, তখনো এই আত্মভাবের প্রাধান্য পায়। আবার যে অন্তঃপ্রেরণাকে বহিষ্কারের সংকল্পে আধুনিক কবিরা রোম্যান্টিকদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন, সেই কবিরাই মনে করেন কল্পনা হল এমন মৌলিক শক্তি যার সাহায্যে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সামঞ্জস্য বিধানের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠতে পারে সংগতিময় অন্তর্জগৎ। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক অশ্রুকুমার সিকদারের মন্তব্য : 'কবিকল্পনার মিরাকল্-উৎপাদক মহিমায় আধুনিকদের আস্থা রোম্যান্টিকদের মতোই অটুট। আদি-আধুনিক বোদলেয়ার লেখেন, 'The whole visible universe is but an array of images and signs to which imagination gives a place and relative value; it is a sort of fodder which the imagination must digest and transform. All the faculties of man's soul must be subordinated to the imagination.' নেরুদার আত্মজীবনীতে বিবরণ পাই, আদিষ্ট হয়ে শ্রুতিলিখন লেখার মতো অনুপ্রাণিত অবস্থায় কীভাবে তিনি 'Elhondero entuasiasta' বইয়ের প্রথম কবিতাটি রচনা করেছিলেন। ইংরেজি কবিতার আধুনিককালের ইতিহাসেও দেখি ইয়েটস এবং গ্রেভস্-এর মতো কবিরাও শেলি-প্রভৃতির মতো সমান প্রেরণাবাদী। সুধীন্দ্রনাথের কাছে যা 'প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অধ্যবসায়', বুদ্ধদেব বসুর কাছে তাই 'দৈব্যের দান'। সেই 'দৈবপ্রেরণারই 'চকিত স্পর্শে কেঁপে ওঠে কল্পনার শ্রোণী/কবিতার জন্ম হয়।' যে কোনো রোম্যান্টিকের মতো বুদ্ধদেব বসু অনুভব করেন সেই সমর্থ প্রতারক শক্তির আনুকূল্য বিনা কবিব গতি নেই।'[১৩] তবে রোম্যান্টিক উত্তরাধিকার হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক বাংলা কবিতার নিজত্ব অনেক আছে।

বাংলা কবিতার আধুনিকতার সন্ধান করতে যাওয়ার কিছু আগে আবির্ভূত, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কাজী নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও মোহিতলাল মজুমদারের কথা উল্লেখ করতেই হয়। এঁরা নতুন সুরের জন্য আধুনিকদের প্রথম প্রথম আকর্ষণ

করেছিলেন। বিশেষ করে সত্যেন্দ্রনাথ আঙ্গিক ও ছন্দোবৈচিত্র্যের জন্য তরুণ কবিদের প্রিয়। বিষয়ের দিক থেকেও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন, বাংলার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য শ্রমিক ধর্মঘট প্রভৃতি বিষয়কে তিনি কাব্যে উপজীব্য করেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের ঐতিহ্যকেই তিনি যেন নতুন ভাবে উপস্থাপনা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে আধুনিকরা পরিত্যাগ করেছিলেন মননধর্মের মধ্যে নতুনত্বের অভাবের জন্য। যদিও তাঁর আঙ্গিক মনোহারী ছিল। নজরুল ইসলাম ছিলেন স্বভাব কবি গোত্রের। কাব্য রচনার জন্য যে সচেতন কঠোর সাধনার প্রয়োজন, তা তাঁর ধাতে ছিল না। জীবনদর্শনের গভীরতা তাঁর কাব্যকে রূপলোক থেকে ভাবলোকে পৌঁছে দেয়নি। তাই সত্যেন্দ্রনাথে যেমন মননশক্তির অগভীরতা, তেমনি নজরুলে অ-পরিমিতি লক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে মোহিতলাল মজুমদার এবং যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আনলেন চারিত্রগুণ, মননশীলতা। একটি বিশেষ জীবন দর্শনের মাধ্যমে মোহিতলাল আধুনিক কবিদের মনকে আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি সচেতন ভাবে নির্ভীক দেহবাদকে কাব্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁর এই দেহবাদের পিছনে স্বভাব কবি গোবিন্দ দাসের প্রভাব একেবারে ছিল না, বলা চলে না—'আমি তারে ভালোবাসি অস্থি মাংস সহ।' মোহিতলালের প্রধান বৈশিষ্ট্য বিষয়বস্তুর ঐশ্বর্য এবং বিরাটত্ব কাব্যে বর্তমান। আধুনিকদের মধ্যে আরেকটি নতুন স্বাদ যোগালেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত দুঃখবাদের মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ যেখানে অমর্ত্য অতীন্দ্রিয়তায় নিমগ্ন ছিলেন, সেখানে মোহিতলাল এবং যতীন্দ্রনাথ জীবনের রুদ্র রূপকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে রবীন্দ্রনাথ যে চেতনার অস্তিত্বের কথা বলেছিলেন, সে সম্বন্ধে মোহিতলাল উদাসীন ছিলেন এবং যতীন্দ্রনাথ ছিলেন অবিশ্বাসী। তবে যতীন্দ্রনাথই দেখালেন প্রথম দৈনন্দিন জীবনের গদ্যগন্ধী তুচ্ছতাও কাব্যের বিষয় হতে পারে। তাঁর বিদ্রোহ রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যত, তার চেয়েও বেশি তাঁর অক্ষম এবং অন্ধ অনুকারীদের বিরুদ্ধে। সংশয়, ব্যঙ্গ, নেতিবাদ প্রভৃতি আধুনিক কাব্যের লক্ষণগুলি, যতীন্দ্রনাথে প্রথম দেখা যায় বললে ভুল হবে না। যতীন্দ্রনাথের চিত্রকল্পও আধুনিকরা বেশ গ্রহণ করেছেন অনায়াসে। তাঁর আকাশকে 'বারান্দা'র চিত্রকল্পে বর্ণনা জীবনানন্দ দাস, বুদ্ধদেব বসু উভয়েই করেছেন। হাতুড়ি-ছেনি-হাপর-সমন্বিত কর্মমুখর চিত্র অমিয় চক্রবর্তীর 'চেতন স্যাকরা' প্রভৃতি কবিতায় উজ্জীবিত হয়েছে। তবে মোহিতলাল ও যতীন্দ্রনাথে আধুনিকদের মন বেশী দিন আকৃষ্ট হয়নি। এর কারণ ড. দীপ্তি ত্রিপাঠী মনে করেন : 'মোহিতলাল ও যতীন্দ্রনাথ আধুনিক কবিদের বেশি দিন আকৃষ্ট করে রাখতে পারলেন না। 'প্রবাসী' পত্রিকায় সত্যসুন্দর দাস বেনামে মোহিতলাল যখন ক্রমশ সাহিত্য আলোচনার মধ্য দিয়ে উনিশ শতকীয় সত্য-শিব-সুন্দরের আদর্শের পরিপোষক হলেন ও উৎকট রক্ষণশীলতা ও প্রাদেশিকতার সমর্থক হলেন এবং যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ তাঁর সর্ববিদচিন্তা ও সৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলল তখন আধুনিক কবিরা নিরাশ হলেন। মোহিতলালের কবিকৃতি ও সমালোচনার আদর্শের মধ্যে বৈপরীত্য (Contradiction) দেখে আধুনিকেরা তাঁর প্রতি আস্থা হারালেন। অন্যদিকে যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদকে মেনে নিতে তাঁদের তরুণ ও বিদ্রোহী মন সায় দিল না।'[১৪]

বাংলা আধুনিক কবিদের আদিপর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব উপস্থিত ছিল। সেই সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল, মোহিতলাল ও যতীন্দ্রনাথের প্রভাবও পড়তে শুরু করে। আধুনিকরা পূর্ববর্তীদের কাব্যসম্পদকে চেতন অচেতনে মিলিয়ে কিছুটা গ্রহণ করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের আঙ্গিক, ছন্দোবৈচিত্র্য, ধ্বনাত্মক শব্দ, গ্রাম ও লৌকিক শব্দ ব্যবহার, নজরুলের বিদ্রোহ—সর্বজয়ী মানুষের অভ্রভেদী মহিমা এবং সেই মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, এবং সমাজের অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, মোহিতলালের তন্ত্রধর্মী নির্ভীক দেহবাদ ও সংস্কৃত শব্দ বহুল দীর্ঘচরণের বড়ো বড়ো তাল, এবং পাপ-পূণ্য, জীবন-মৃত্যু প্রভৃতি ধ্রুপদী বিষয়, যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ, আবেগহীনপ্রকাশ, যন্ত্রযুগের চিত্রকল্প ইত্যাদি আধুনিকদের উপর বিশেষ ছাপ ফেলেছিল। কিন্তু অচিরেই আধুনিকরা ভেবেছিলেন, ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য সাহিত্যের অফুরন্ত আকর থেকে উপকরণ-আঙ্গিক না আহরণ করলে তাঁদের বিদ্রোহ বিপ্লবে পর্যবসিত হবে না। তাঁরা তাই ইংরেজী কাব্যমুক্তি আন্দোলনের হোতা টি এস. এলিয়ট ও পাউণ্ডের প্রতি আকৃষ্ট হলেন পুরোমাত্রায়। বিশেষ করে এলিয়টের মধ্যে আধুনিক কবিরা আত্মসচেতনতা, নৈর্ব্যক্তিকতার আদর্শ, ঐতিহ্যের দৃঢ়মূল এবং সেই সঙ্গে বিশশতকের এলোমেলো সমাজের কাব্য রূপায়ণ খুঁজে পেলেন। বাংলা আধুনিক কবিদের মধ্যে আত্মসচেতনতা ছিল না একেবারে, একথা সত্য নয়। কিন্তু তা ছিল বিচ্ছিন্ন ভাবে। এ প্রসঙ্গে বিষ্ণু দের মন্তব্য : 'এলিয়টের কাছে বাংলা লেখকের ঋণগ্রহণ মুখ্যত এই আত্মসচেতনতার ক্ষেত্রে। আত্মসচেতনতা হয়ে উঠল কবিমার্গে প্রত্যক্ষ সত্তাসম্পন্ন।'[১৫] এলিয়টের অনুপ্রেরণায় তিনি আরো অনুভব করলেন—'নৈতির সংযমে শিক্ষা শুরু হল, ঐতিহ্য ও ব্যক্তির সম্বন্ধ হ'ল কর্মিষ্ঠ, সচল ব্যাখ্যা থেকে পরিবর্তনের, ভেঙে পূর্ণগ্রহণের নির্মাণের।'[১৬] এলিয়টের প্রভাবে বাংলা আধুনিক কাব্যের মেজাজের পরিবর্তন ঘটলো মূলত। আধুনিকরা আত্মসচেতনতা, মননের বৈচিত্র্য, নৈর্ব্যক্তিকতার আদর্শ, ঐতিহ্যের দিকে মনোযোগ ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে প্রেম, ধর্ম, মৃত্যু, বিধাতা কাল প্রভৃতি সম্বন্ধে নতুন করে ভাবনা শুরু করলেন। বলা বাহুল্য এ ভাবনা রোম্যান্টিক বিরোধী। আধুনিকদের মনে মূল্যবোধের পরিবর্তন হেতু আঙ্গিকেও নতুনত্বের দাবী গৃহীত হল। নিত্য, সত্য ও আনন্দের কবি রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা অনুসরণ করতে পারলেন না আর। তাঁদের কাছে প্রাধান্য পেলেন টি.এস. এলিয়ট।

কিন্তু আধুনিক বাঙালী কবিদের দিশারী, এলিয়টেও তাঁরা স্থির থাকতে পারেননি। কারণ এলিয়ট নিজেই বদলাতে শুরু করেন। এলিয়টের ১৯৩০-এ লিখিত 'Ash Wednesday থেকে ১৯৩৬-এ লিখিত 'Four Quarters'-র মধ্যে ধ্যানধারণার বহুল পরিবর্তন দেখা গেল। শেষ রচনায় দেখা গেল তাঁর নৈরাশ্য দুর্বলতা অপসৃয়মান। পরিবর্তে এখানে তিনি উপলব্ধির মুহূর্তের মধ্যেই সমস্ত কালের গতি স্তম্ভিত দেখছেন। তিনি হয়ে উঠছেন দার্শনিক। কিন্তু বিজ্ঞান বিদ্বেষী। তাঁর বিজ্ঞান বিদ্বেষ ও মানুষের সমাজ নিয়ন্ত্রণ-শক্তিতে অবিশ্বাস বাঙালী আধুনিক কবিরা গ্রহণ করতে নারাজ। অন্যদিকে এলিয়টের রাজতন্ত্রে শ্রদ্ধা ও সামাজিক শ্রেণী বৈষম্যে আস্থাকেও তাঁরা সংশয়ের দৃষ্টিতে

দেখলেন। পাশাপাশি ১৯৩৯-র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহ রূপ ঘটে ১৯৪২-এ। ১৯৪১-এ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে আধুনিক কবিদের জ্যা-রোপণের উদ্দেশ্য দূরাগত হ'ল। এছাড়া অগস্ট বিপ্লব, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ ও স্বাধীনতা আন্দোলন, গান্ধীজীর ১৯৪৮-তে মৃত্যু ইত্যাদি ঘটনা, আধুনিক বাংলা কাব্যকে ঘনঘন দোলা লাগালো। ফলে ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসী টি.এস. এলিয়টকে বাঙালী আধুনিক কবিরা গুরুপদে আর আসীন রাখলেন না। আবার এজরা পাউণ্ডের স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে গলাগলিও তাঁদের অপছন্দ হ'ল। এমতাবস্থায় মার্কসবাদী কবি সিসিল ডে লুইস, স্টীফেন স্পেণ্ডার, লুই ম্যাকনিস এবং ফ্রয়েডীয় প্রভাবের অডেন প্রমুখরা আধুনিক বাঙালী কবিদের কাছে আদরণীয় হলেন। যদিও এঁদের কবিতার প্রভাব বাঙালী আধুনিক কবিদের গভীর কিছু পরিবর্তন আনতে পারেনি। পাশ্চাত্যের এই সব কবিদের সমাজ-সমালোচনা কাব্য বিষয় হিসেবে প্রাধান্য পেল। বাংলা কবিতার আধুনিক কবিরা-বিশেষত বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মার্কসকে অবলম্বন করেছিলেন। অডেন-ডে লুইস প্রমুখের মধ্যবিত্ত ক্ষয়িষ্ণু সমাজ সম্বন্ধে বক্রোক্তি আমাদের দেশের আধুনিকদের বিশেষ ভাবে নাড়া দিয়েছিল। এঁদের প্রভাব সম্পর্কে দীপ্তি ত্রিপাঠী বলেছেন—'এলিয়টের উপর থেকে আস্থা সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু তাই আধুনিক কবিদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। বিষ্ণু দে অডেন-স্পেণ্ডারের খেয়ালী সাম্যবাদে (কিংবা দক্ষিণপন্থী রোমান্টিক র‍্যাডিক্যালিজমে?) বিশ্বাস হারিয়ে আশ্রয় খুঁজলেন এলুয়ার ও আরাগঁর কাব্যে। বুদ্ধদেব বসু কিছুকালের মতো রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়ে ফিরে গেলেন। জীবনানন্দ আত্ম পরিক্রমা ছেড়ে ক্রমশ সমাজ সচেতন হ'য়ে উঠলেন, তাঁর ছোটো নীড় থেকে এসে দাঁড়ালেন মহাপৃথিবীর বিস্তৃত বুকে, সাতটি তারার তিমিরে সন্ধান করলেন আগামী ভোরের আলো। কবি অমিয় চক্রবর্তীর মধ্যে এল একটা উদ্‌ভ্রান্তি, নৈর্ব্যক্তিক নিস্পৃহতার বদলে বেদনা স্পৃহতা। রিলকের প্রভাবে তাঁর যে 'সৃষ্টির দর্শন' গড়ে উঠেছিল তাতে পরিবর্তন এল। আর সুধীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ নীরব হ'য়ে গেলেন—প্রায় বারো বছর.........মালার্মের আঙ্গিক ও নিখিল নাস্তির দর্শনের অনুসরণে তিনি যে বিশিষ্ট কাব্য ধারার প্রবর্তন করেছিলেন তাতে ভালেরির ক্ষণবাদের ছাপ পড়ল এই সময়। হয়তো অস্তিত্ববাদের প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করেছিলেন।'[১৭]

তবে একথাও সত্য, রবীন্দ্রনাথও আধুনিকদের নাড়া দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' কাব্য পড়ে সুধীন্দ্রনাথ লেখেন 'ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' নামের এক বিস্তৃত প্রবন্ধ। বুদ্ধদেব লেখেন 'নতুন পাতা'। আর বিষ্ণু দে লেখেন 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' কাব্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা তাঁরই সৃষ্টি। আধুনিকদের সঙ্গে সেখানে মিল নেই। রবীন্দ্রনাথের শাশ্বত মূল্যবোধ থেকে দৃষ্টিভঙ্গি বিচ্যুত হয়নি কখনো। প্রেম সম্পর্কেও কবির রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়নি। আধুনিক কবিদের জীবনদর্শন এর বিপরীত। তাঁরা জীবনের রঙ্গভূমিতে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখেছেন রূপের বদলে বিরূপকে। তাই তাঁরা সজ্ঞানে রবীন্দ্রনাথ থেকে স্বতন্ত্র হতে চেয়েছিলেন।

আত্মপ্রকাশের পথ সন্ধানে নেমে তাঁরা ভারসাম্যের আকাঙ্ক্ষায় উচ্চারণ করেছিলেন :

'রবীন্দ্র ব্যবসা নয়, উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে
চিরস্থায়ী জটাজালে জাহ্নবীকে বাঁধিনা, বরং
আমরা প্রাণের গঙ্গা খোলা রাখি, গানে গানে নেমে
সমুদ্রের দিকে চলি, খুলে দিই রেখা আর রং
সদাই নূতন চিত্রে গল্পে কাব্যে হাজার ছন্দের
রুদ্ধ উৎসে খুঁজে পাই খরস্রোত নবআনন্দের।'[১৮]

আধুনিকতা আন্দোলনের ফল স্বরূপ বাংলা কবিতায় যে বৈশিষ্ট্যগুলি আত্মপ্রকাশ করেছিল, তা কোনো একজন কবির মধ্যেই নিহিত ছিল না। এই বৈশিষ্ট্যগুলির কিছু কিছু একজন কবির মধ্যে ছিল, কখনো বা বিভিন্ন কবির মধ্যে একই বৈশিষ্ট্য প্রাধান্য পেয়েছিল।

আধুনিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, নাগরিকতা আধুনিকদের কবিতায় ঘুরে ফিরে বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। যন্ত্র নির্ভর ধনতান্ত্রিক সভ্যতার উদ্ভব নগরে, আর আধুনিকতার জন্ম নগরে, তার পটভূমিও নগরকেন্দ্রিক। ব্যক্তি মুখশ্রীহীন নাগরিক মানুষের গড্ডল প্রবাহের নরক, পশ্চিমী কবিদের মতোই বাঙালী কবিদের কল্পনাকেও উত্তেজিত করেছিল। নগরের ইতরতা, অবক্ষয়ের বর্ণনায় নাগরিক মানুষের নির্বেদ, ক্লান্তি, ব্যর্থতাবোধ, আত্ম-অবিশ্বাস এত বেশী মূর্ত হয়ে উঠেছিল, তা পূর্বের ধ্যান ধারণা থেকেও স্বতন্ত্র হয়েছিল। নগর দৃশ্যের উপস্থাপনায় কলকাতা শহরের পটভূমি বাঙালী কবিদের প্রায় প্রত্যেকের কাছে গ্রহণীয়। জীবনানন্দ দাশের মতো কবির কণ্ঠেও তাই উচ্চারিত :

'নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।
তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব-অতিবৈতনিক
বস্তুত কাপড় পড়ে লজ্জাবশত।'[১৯]

নগর যেমন যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার ফল হিসেবে মহাকায় রূপে গড়ে উঠেছে, তেমনি এই নগরের ব্যবসা সংগঠন গুলিও বিশাল হয়ে উঠেছে। যেখানে মানুষের কর্মস্থল, আবাসস্থল, প্রমোদ স্থল অবস্থিত। এতদ্‌সত্ত্বেও মানুষের নিরর্থকতা ও তুচ্ছতার বোধ মানুষকে কুরে খায়। সংবেদনশীল মানুষ অনুভব করে সে বড় একা।

'অতল শূন্যের শেষে পড়ে আছি আমি নিরাশ্রয়,
দেখিতেছি ভ্রমিভ্রান্ত চোখে
গতাসু আলোর প্রেত বিচরিছে স্তবকে স্তবকে
নিরালম্ব নৈরাশ্যের নিঃসঙ্গ আধারে।।'[২০]

এই নিঃসঙ্গতা বোধ হেতু হতাশার জন্ম, নির্বেদের জন্ম। হতাশা এবং নির্বেদ হাত ধরাধরি করে এগিয়েছে আত্মিক আতঙ্কের দিকে, যেখানে শূন্যতাবোধের মর্মান্তিকতা প্রকট। নিরুপায় আত্মগ্লানির ব্যাপ্তি সর্বত্র।

'সব কাজ তুচ্ছ হয়— পণ্ড মনে হয়,

সব চিন্তা—প্রার্থনার সকল সময়
শূন্য মনে হয়,
শূন্য মনে হয়।'[২১]

শূন্যতা পীড়িত মানুষ তার চারপাশের সঙ্গে মানবিক সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনা। ভিড়ের মধ্যেও একাকীত্বকে যন্ত্রণায় ধরে রাখে—

'নিঃসঙ্গতা জানি আমি দেখেছি তো ভিড়
আপিসে বাজারে ভিড় সোফায় চেয়ারে ভিড়
চশমে শেয়ারে ভিড় নিঃসঙ্গতা মুখোমুখি নেমে
দিনান্তের ফ্রেমে এনে দেয় ভয়াল নিবিড় শূন্যতার ছবি।'[২২]

এই মানবিক অনুভূতি বর্জিত, যন্ত্রণা পীড়িত আধুনিক মানুষের মর্মান্তিক শূন্যতা বোধ থেকে আত্মহত্যা বাসনার উদ্ভব। জীবনানন্দ দেখিয়েছেন তাঁর 'বোধ' কবিতায় আত্মহত্যার কারণ, আর 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় তার পরিণাম। নেতির গহ্বরে দাঁড়িয়ে আধুনিক শিল্পীরা তাঁদের শিল্পে আত্মহননের প্রসঙ্গ নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্যে'র কথা এ প্রসঙ্গে তুলতেই হয়। শুধু ব্যক্তিগত নিরর্থকতা বোধ থেকে নয়, সভ্যতার উন্মার্গগামিতা দেখেও আত্মহনন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে কখনো কখনো। আর যে কবি স্বেচ্ছায় আত্মহত্যার অন্ধকারে ডুবে যান নি, তিনিও পারিপার্শ্বিক সমাজকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। নিজ বাসভূমে তিনি তখন পরবাসী, নিরাশ্রয়। কেউ স্বেচ্ছায় প্রবাসী, কেউ নির্বাসিত, কেউ স্বসমাজ থেকেও আভ্যন্তরীণ প্রবাসী হয়ে যান। কবিদের কাব্যেও এই প্রবাসী মনোভাবের কথা প্রকাশ পায়। তখন বিরূপ বিমুখ বিশ্বের আধুনিক সভ্যতার শিকার এইসব প্রবাসী মানুষদের আনাগোনা ঘটে আধুনিক কবিতায়। আধুনিক মানুষের এই যে নিজেকে পরিবেশের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত ও প্রবাসী বলে অনুভব, তার জন্যে আধুনিক সাহিত্যে উদ্ভূত হয় সমালোচনা বুদ্ধি। আধুনিক শিল্প সাহিত্যের মজ্জায় মজ্জায় নিহিত সমালোচনা, তর্ক—মানুষের নিয়তি সম্পর্কে, যুগ ও সমাজ সম্পর্কে তার আপত্তি ও প্রত্যাখ্যান। এদিক থেকে বাংলা আধুনিক কবিতাও ব্যতিক্রম নয়। এই সমালোচনা অতীতেও ছিল, ছিল তর্ক, ছিল বিশ্লেষণও। কিন্তু সেকালে সমালোচনার লক্ষ্য ছিল সত্য, আর এখন সমালোচনাই সত্য। আবার বর্তমানের সাহিত্যে দেখা যায় পরিবেশের বিরুদ্ধে সমালোচনা ব্যঙ্গাত্মক আত্ম-সমালোচনার জন্ম দিচ্ছে। আত্ম-সমালোচনার উত্তরণ ঘটে অনুরূপভাবে আত্ম-ঘৃণায়।

'হে ধর্ম, হে ধর্মাধিপতি, তুমি যদি একবার এসে
বলে দিয়ে যাও শুধু কত ধানে কত চাল হয়
তাহলে হয়তো আরো কিছুদিন টিকে যেতে পারি
ভারিক্কি গম্ভীর চালে হতে পারি বয়স্ক বাঁদর।'[২৩]

কবিদের কাছে সমাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে তীব্র সমালোচনা ও আক্রমণের বিষয়।

আধুনিক কবি তার নিজের যন্ত্রণাময় পরিবেশ সম্বন্ধে গভীর ভাবে সচেতন, কিন্তু সে তার সমাজ পরিবেশের মূল্যবোধকে মানতে পারেনি। সভ্যতার পরিচ্ছন্ন মিথ্যাচারের পরিবর্তে তার কাছে অভিপ্রেত নারকীয় সত্য। ধনতান্ত্রিক যন্ত্রোৎপাদনের তীব্র গতিশীলতা থেকে যে আধুনিকতার উদ্ভব, অচিরে ধনতান্ত্রিক বুর্জোয়া সভ্যতার সঙ্গে আধুনিকতার সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে তাই শত্রুতায়। কবিরা বুর্জোয়া মানসিকতাকে প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু বুর্জোয়া সমাজকে অস্বীকার করতে গিয়ে এক এক সময় মনে হওয়া স্বাভাবিক, আধুনিকতা যেন গোটা সমাজকেই অস্বীকার করেছে।

আধুনিকতার আরেক ধর্ম হল অ মানবিকতাবোধ। রেনেসাঁসের সাহিত্য বৈশিষ্ট্য ছিল মানবিকতা বোধ। কিন্তু ক্রমাগত যুদ্ধে যুদ্ধে (বাইরে এবং অন্তরে), রাষ্ট্র বিপ্লবে মনুষ্য ধর্মের বারবার পরাজয় দেখে সুধীন্দ্রনাথের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে 'মনুষ্য ধর্মের স্তবে নিরুত্তর'। আধুনিক কবির এই যে মনুষ্যধর্মে স্থিতিবোধের অভাব, তা সমগ্র আধুনিক সভ্যতার সম্পর্কে আস্থার অভাব থেকেই জাত বললে ভুল হবেনা। অমিয় চক্রবর্তীর মতন কবি, যিনি রবীন্দ্রনাথের অনেক মূল্যবোধেই আস্থাজ্ঞাপন করেছেন তাঁর কাব্যেও অনুপস্থিত স্থিতিবোধ।

'বাঁচানো অর্থে বস্তি বাঁচানো নয়, বস্তির বস্তিত্ব
ঘুচিয়ে মানুষকে দেওয়া অস্তিত্ব;'[২৪]

অবশ্য রবীন্দ্রনাথও শেষ পর্যায়ে বিচলিত হয়েছিলেন স্থিতিবোধ সম্পর্কে। আধুনিক কবিতায় ক্রমে প্রাধান্য পেয়েছে উৎকণ্ঠা, অনাস্থা, অবিশ্বাস। এই জন্যই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন সব কিছু সম্বন্ধে 'বিদ্রূপপরায়ণ বিশ্বাসহীনতার কঠিন জমিতে' জন্ম আধুনিকতা সব কিছু চূড়ান্ত সংকট ও মহাবিপর্যয়ের সামনে দাঁড়িয়েছে, ভেঙ্গে পড়ছে মূল্যবোধ— এগুলিই উপজীব্য আজ আধুনিক কবিতার। কেন্দ্রবিন্দু থেকে ঝরে পড়ে সমস্ত কিছু শৃঙ্খলাবোধের পরিবর্তে বিশৃঙ্খলাবোধই প্রাধান্য পায়।

'ভেঙে পড়ে সব বাঁধ; অভিমান মর্যাদা সাহস
যত্নে রচা ঔদাস্যের নাস্তিগর্ভ কঠিন সন্তোষ।.....
যুগান্তের সম্ভ্রম সংস্কার,
তিতিক্ষার অভিনয়, সভ্যতার দৃপ্ত অহংকার
পলকে খসিয়া পড়ে;'[২৫]

পরবর্তী অন্য কবির মনে হয়,—

ধ্বংসে পড়ে দিনরাত, আলো ফোটে, ছায়া দীর্ঘ হয়।
শান দেওয়া অন্ধকারে ক্ষয়ে যায় নক্ষত্র বলয়।
তৃষ্ণার সমুদ্র থেকে সূর্য তোলে দানবের চোখ;
ভয়ার্ত ত্রিলোক
মানে না মনসার বনে শূন্যে তোলা অভয় মুদ্রাকে।
অদৃশ্য বায়সে খায় সময়ের যে-যে ফল পাকে।

অঙ্গার পথের ধুলো, আকাশ মূর্ছায়
ঢলে পড়ে ডাইনির গুহায়।
এবং ত্রিশূল হাতে দিক দেখায় কপট প্রেতেরা।[২৬]

আধুনিক কবিদের সর্বগ্রাসী সংশয় বোধ, সমালোচনা বুদ্ধি, সন্দিহান স্বভাব স্পর্শ করেছে কবিতার ব্যাকরণকেও। কবিতার আঙ্গিক, ভাষা, শব্দ, ছন্দ-বাক্য গঠন, মধ্যবর্তীস্তরের লুপ্তি, পুরোনো কবিতার ভাঙা বা বিকৃত অংশের ব্যবহার, তির্যকতা, শুদ্ধতা, বিশেষীকরণের প্রবণতা ইত্যাদি বিপর্যয়কর সভ্যতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাঙালী আধুনিক কবি ও কবিতা রচনার উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। —'বিশ্বসংসারের বাস্তবিকতায়, স্থিতিশীলতায় আস্থা নেই, সব কিছু যেন এক প্রলয়ংকর ভাঙনের পথে চলেছে—তাই আধুনিকের রচনায় আমরা পাই 'a rage against order'। শুরু হয়েছিল বুর্জোয়া শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দিয়ে, শেষ পর্যন্ত আধুনিক সমস্ত শৃঙ্খলার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহী। তাই আধুনিক কবিতার ভাষাবন্ধেও ঘটে গেছে বিপর্যয়। জর্জ স্টিনার চমৎকার ভাবে বলেছেন 'An explicit grammar is an acceptance of order'. জগৎশৃঙ্খলাই নৈরাজ্যে পর্যবসিত, তাই আধুনিক কবিতায় ঘটেছে বৈয়াকরণিক বিপর্যয়। আধুনিক সাহিত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে 'problematics of language'। বাক্যগঠনের মধ্যে সময়ের যে রৈখিক অগ্রগতি রূপ নিয়ে থাকে, সময়ের সেই রৈখিক অগ্রগতি অস্বীকৃত বলে বাক্‌বন্ধও এলোমেলো;—সব অনুভূতিই তাৎক্ষণিক যুগপৎ। ভাষাতেও তাই সময়ের পারম্পর্য ভেঙে পড়তে চায়। তার মধ্যে আর প্রত্যাশিত পরম্পরা নেই, অনেকস্তর উহ্য, ক্রমবিলুপ্ত; তার অগ্রগতি সাবলীল নয়। প্রতিপদে ঝাঁকুনির ধাক্কা চমকে দেয় আমাদের। আধুনিক কবিতার বিষয়ের মধ্যে যেমন মরিয়া ভাব লক্ষ করি একটা, তার ভাষা ও আঙ্গিকের মধ্যেও তেমন একটা মরিয়া ভাব—যেন আমরা সহ্যশক্তির সীমায় পৌঁছে গেছি। আধুনিক কবিতার গঠন অনেক সময়েই 'a-logical'। সময়ের পরম্পরা যেমন মানে না, তেমনি মানে না ন্যায়ের পারম্পর্য। শুধু অস্তিত্বের বিপর্যয়ের জন্যেই যে ভাষাগত বা গঠনগত বিপর্যয় ঘটেছে তা নয়। বৈজ্ঞানিক কারিগবি প্রগতির ফলে আধুনিককালে ঐতিহাসিক সময়ের ঘটেছে অভূতপূর্ব চলিষ্ণু দ্রুততা। সেই কালগত দ্রুততাও যেন প্রতিফলিত হয়েছে পদক্ষেপ বাদ দিয়ে যাওয়া টেলিগ্রাফিক বাকবন্ধে, 'cinematographic cutting' ধরনের গঠন পদ্ধতিতে,[২৭] আধুনিক বাংলা কবিতায় ভাষাগত মত্ততা পাওয়া যাবে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে যেমন, তেমনি অমিয় চক্রবর্তীর মধ্যে পাওয়া যাবে টেলিগ্রাফিক বাকবন্ধ। এই ভঙ্গিমা সমধর্মী অভিজ্ঞতার, যে সমধর্মী অভিজ্ঞতাকে প্রকাশেব পদ্ধতি অনেক সময একদেশের কবি অন্যদেশের কবির কাছে শেখেন।

উপরের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরে, সমর সেনের কবিতা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আধুনিক কাব্যের লক্ষণ সেখানেও প্রকট। সমর সেন কালের দিক দিয়ে পরবর্তী পর্যায়ের কবি। আধুনিক বাংলা কাব্যের অনেকগুলি লক্ষণ প্রতিষ্ঠিত হবার পরে তাঁর আবির্ভাব, তবু তাঁর বৈশিষ্ট্য নতুন দিকদর্শনে। সমর সেন নগরের মানুষ। নগরের চাল চলনে তিনি

অভ্যস্ত। দৈনন্দিন জীবন চর্চায়, কথোপকথনে, তাঁর এই নাগরিকতা পরিষ্কার। কবিতা লিখতে গিয়ে যে নগরকে দেখেছেন তিনি, তাকেই দেখাচ্ছেন কবিতায়। সে নাগরিকতা ক্ষয়িষ্ণু। সৃষ্টিশীল নয়। কবি বোদলেয়র, যিনি প্রথম আধুনিক—তাঁর কাব্যে নগর এরকম ক্ষয়িত নয়। Art is a movement contrary to nature–একথাও আধুনিকতা আন্দোলনের কবি রিল্‌কের। হ্যারি লেভিম এসব লক্ষ্য করে লেখেন—Is is not surprising that modernism, that product of cities, should be so impelled to create the image of cities. কিন্তু সমর সেনের কবিতায় নগরের ক্ষয়িত রূপই ফুটে উঠেছে। এই নগরের জন্য তাঁর কাব্যে কোনো সৃষ্টি-সমবেদনা নেই। তিনি কবিতার স্থান হিসেবে যে নগরকে নির্বাচন করেছেন, সেখানে ক্লান্তি, বিকার, বিক্ষোভই প্রধান।

উনিশ শতকের টানাপোড়েন শিক্ষিত বাঙালী মধ্যশ্রেণিকে যে মুক্তির ইসারা জানিয়েছিল, ব্যক্তিক স্বপ্ন বিলাস ও স্বাধীন ভাবনার অর্থ ও আপাত অনুকূল পরিবেশ তৈরী করেছিল, বিশ শতকের প্রথম পদেই তার ভ্রান্তি ও অসম্পূর্ণতা ধরা পড়তে লাগল। ফলে বিক্ষোভ তৈরী হচ্ছিল ভিতরে ভিতরে। আর সেই সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছিল রোম্যান্টিক ধারণাগুলো। ফলে যে রোম্যান্টিকতায় ভর করে জন্ম নিয়েছিল বাংলা কবিতার আধুনিকতা, ক্রূর সময় যেন আস্তে আস্তে সরিয়ে নিল তার পায়ের নিচের মাটি। একদিন আধুনিকতার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে ছিল রোম্যান্টিকতা, আর তিরিশের দশকে এসে সমর সেন যেন মনে করাতে চাইলেন, সে সবই অতীত মাত্র, এখন চার পাশে তাকিয়ে দেখতে হয় 'রিকশার উপর ক্লান্ত চীনে গণিকা', 'ফিরিঙ্গি মেয়ের উদ্ধত নরম বুক'। মেঘ এখানে শীতের অজগরের মতো, সমুদ্র ধূসর, চারদিকে ধোঁয়ার গন্ধ। আর রবীন্দ্রনাথ চিরকাল জেনে এসেছেন 'মধুময় পৃথিবীর ধুলি'; সমর সেন জানলেন এই শহরের ধুলোর কণা যেন ক্ষয়রোগের জীবাণু সর্বত্র সঞ্চারমান ক্ষয়রোগের স্বাস্থ্যহীন পাণ্ডুরতা, বিকার গ্রস্তের দুঃস্বপ্ন।

> 'আকাশে ধোঁয়ার ক্লেশ, চারিদিকে ধোঁয়ার গন্ধ,
> আর হাওয়ায় অসংখ্য ধুলোর কণা
> জীবন্ত বীজাণুর মতো!'[২৮]

—তাহলে ভিতরে ভিতরে কোথাও এই বীজাণু বাসা বেঁধেছিল। নাগরিক জীবনের এই রূপ যে শুধু সমর সেনই দেখালেন, তা নয়,—বিষ্ণু দের নানা কবিতা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে। কিন্তু সমর সেনের তির্যকভঙ্গি মনে পড়ায় আরেক জন পূর্বসূরীর কথা। 'বৌবাজারের মোড়ে/যেখানে ফুলের দোকানের পাশে কসাই-এ মাংস থোড়ে',[২৯]—নগর জীবনের এই বৈপরীত্য, সৌন্দর্যের পাশেই রূঢ় কর্কশতা চোখে পড়েছিল যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর। একথা অবশ্যই বলা যাবে না যে যতীন্দ্রনাথ সমর সেনের উত্তমর্ণ, তাঁদের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু সমর সেনের মনোভঙ্গি, তীক্ষ্ণতা আর উপলব্ধি যতীন্দ্রনাথের ধারণা থেকে আলাদা। তবু যতীন্দ্রনাথকে মনে পড়ে, তাঁব কবিতায় নগরজীবনের রুক্ষতা আর সে জীবনের মায়াবী কল্পনাকে ভাঙার চেষ্টা ছিল বলে, কেননা এগুলি সমর সেনের কবিতায় গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ।

সমর সেনের শহর কালিদাসের বিদিশা বা উজ্জয়িনী নয়, এমনকি রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কাব্যের ব্যথাতুর শেষ উনিশ শতকের কোলকাতাও নয়। কবি সমর সেন এযুগের কবি। তাঁর কাব্যে কালচেতনা তাই স্পষ্ট। এখানে 'বৃষ্টির আগে ঝড়, বৃষ্টির পরে বন্যা'; আর বর্ষাকালে বর্ষণের মদিরতার পরিবর্তে, 'অনেক দেশে যখন অজস্র জলে ঘরবাড়ি ভাঙবে/ভাসবে মূক পশু আর মুখর মানুষ/শহরের রাস্তায় যখন/সদলবদলে গাইবে দুর্ভিক্ষের স্বেচ্ছাসেবক/তোমার মনে তখন মিলনের বিলাস/ ফিরে তুমি যাবে বিবাহিত প্রেমিকের কাছে'।[৩০] এখানে প্রেমের কোনো অনির্বচনীয়ত্ব অনুভূত হয় না, বর্ষণসিক্ত মনে বিরহের কাতরতার বদলে, বন্যার আর দুর্ভিক্ষের বিপরীত পরিবেশে, মিলনের আনন্দও নয়, বিলাস জেগে ওঠে, যেন তা পরিবেশকে ভুলে যাবার প্রয়াস। ক্লান্তি আর মলিনতা মাখানো প্রেম শুধু 'জৈবিক তাড়নাই, তাতে নেই কোনো আনন্দের স্বাদ। এই হলো সমর সেনের নগর। তিনি আরও দেখেন, ট্রাম লাইন শেষ হলে নিঃসঙ্গ পশুর মতো রাত্রি আসে এখানে। এই নগরের নাগরিকও কবির দৃষ্টিতে স্বতন্ত্র ভাবে ধরা পড়ে। ক্ষয়িত নগরের মানুষের মধ্যে অ-সেতু সম্পর্কই প্রকট। ট্রামলাইন, কালিঘাট ব্রিজ, চিৎপুরের গণিকা, লম্পটের পদধ্বনি, আর ক্লান্তি মোড়া ধূসর শহরে তিনি দেখেন মানুষ বড়োই একা। শহরের গড্ডলপ্রবাহে নিঃসঙ্গতা ঘোচানোর চেষ্টায় যে যৌন মিলন, তা নৈঃসঙ্গ না ঘুচিয়ে আরো বেশী প্রখর ভাবে একা করে দেয়। নাগরিক জীবনের কল-কোলাহলের মধ্যে বাস করেও মানুষকে বলতে হয় : 'আমার অন্ধকারে আমি/নির্জন দ্বীপের মতো সুদূর, নিঃসঙ্গ।'[৩১] নিরালোক আমিত্বের প্রধান শর্ত যে নিঃসঙ্গতা ও নৈঃশব্দ্য, তার কথা কবি বার বার উচ্চারণ করেছেন। আসমান-জমিন জুড়ে এক বিশাল একাকিত্বের উৎপ্রেক্ষা সেখানে আকাশের সুকঠিন নিঃসঙ্গতায় এবং নির্জন প্রান্তরের সুকঠিন নিঃসঙ্গতায় মিলে মিশে একাকার।

সমর সেনের নিঃসঙ্গতাবোধ এসেছে তাঁর সুগভীর সমাজ চেতনা থেকে। বৈশ্যশাসিত শহর নানা ব্যভিচারের লীলা নিকেতন। একদিকে ধনীর ধনলিপ্সা, অন্য দিকে রাস্তার ফুটপাতে কুঁড়ড়ে পড়ে থাকা হা-ভাতের দলের কোন রকমে টিকে থাকার আপ্রাণ প্রচেষ্টা—এই হ'ল কোলকাতার দৈনন্দিন চিত্র। 'বৈচিত্র্যহীন মানুষের এই চিত্র দেখতে দেখতে কবি সমাধান খুঁজেছেন এর। ব্যর্থ হয়েছে তাঁর অন্বেষণ। এই ব্যর্থতার গ্লানিতে তাঁর বিষাদ মগ্নতা এবং নিঃসঙ্গতার কোটরে অপসরণ। দুঃস্বপ্ন অধিকার করেছে কবির মনকে, আর তিনি সর্বত্র প্রত্যক্ষ করেছেন অশান্ত বিষণ্ণতা। তার চোখে দেখেছেন বাসনার বিষণ্ণ দুঃস্বপ্ন আর সেই দুঃস্বপ্নের অমানিশা হানা দিয়েছে কবির রক্তেও। তিনি আরও অনুভব করেছেন, একাকীত্ব বা শূন্যতা বোধের কারণ মানুষের বিচ্ছিন্নতা বোধ। মানুষ এখানে সমাজ স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা নিয়ে দাঁড়াতে চায়, তাই সে নিঃসঙ্গ। আবার সে যেমন সমাজ বিচ্ছিন্ন, তেমনি ধনতান্ত্রিক নগর কেন্দ্রের বিশাল যন্ত্র সংগঠনের কাছে তুচ্ছও। এ জন্যেই সে একা। একদা, 'যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার ফল হিসেবে গড়ে উঠেছে যেমন মহাকায় নগর, তেমনি বিশাল হয়ে উঠেছে সংগঠনগুলি—বিশাল বিশাল

প্রতিষ্ঠানে—কারখানায় মানুষ কাজ করে, মহাকায় বহুতল বাড়ির কন্দরে কন্দরে মানুষ বাস করে, লক্ষ লোক স্টেডিয়ামে একত্রে প্রমোদের সময় কাটায়—মানুষের সমিতিগুলিও প্রকাণ্ড। এই সব বিশালতা মানুষের মনে জাগায় নিরর্থকতা, তুচ্ছতার বোধ। বোদলেয়ারই প্রথম বুঝেছিলেন 'multitude' আর 'solitude', ভিড় আর নিঃসঙ্গতা সমার্থক। 'কেউ কেউ একা থাকে, বেশ একা, ভয়ংকর একা'। কেউ কেউ নয়, সব মানুষই একা, সব সংবেদনশীল মানুষই আজ একা,'[৩২] —একথা সমর সেনের কবিতা পাঠকালেও আমাদের সতত মনে আসে। একজন যথার্থ আধুনিক কবি হিসেবে সমর সেন সেই মানুষের একাকীত্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কবিতায়।

এই শূন্যতা হতাশা নিঃসঙ্গতা সে কাটিয়ে উঠতে চায় ইন্দ্রিয় বিলাসে। এজন্য একালের মানুষের কামনা কেবলই শূন্যতার সৃষ্টি করে। এই কামনা সৃষ্টি সংরোধী। সৃষ্টিশীলে নয়। সে নারীকে নীলাঞ্জন প্রেমের দৃষ্টিতে দেখতে পারে না। নারী মাত্রকেই তাঁর মনে হয় কামনার সামগ্রী, a child bearing machine। কিন্তু কেবলমাত্র যৌনতা কোনো অর্থবান সৃষ্টিতে পূর্ণ হয় না। অথচ নাগরিক মানুষগুলো প্রেম চায় না-চায় সম্ভোগ। সমর সেন সেই অনিকেত মানুষকেও প্রকাশ করেছেন-যারা নিজেদের আত্মপ্রকাশে কুণ্ঠিত হয়; তারা নিজের অন্তর উদ্‌ঘাটনে উৎসাহী নয়। বিশেষত এরা সমাজের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ। যে বাঙালী মধ্যবিত্তের অবক্ষয়ের একটা জরুরি দিক তার সামন্ততান্ত্রিক পিছুটানে; যেহেতু ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে তাঁর সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষমতার সীমা একেবারে ছ'কে দেওয়া, তার সামনে এগোবার কোনো রাস্তা নেই, ঠিক সেই কারণেই জমির সঙ্গে, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে ক্রমক্ষীয়মান অর্থনৈতিক বাঁধন দুরারোগ্য nostalogia-র সৃষ্টি করে। সেই বাঙালী মধ্যবিত্তের সামন্ততান্ত্রিক অতীতের অহমিকা ও নগরজীবনের শ্বাসরোধী শূন্যতাকে সমর সেন সুচারুভাবে উপস্থাপনা করেছেন। মধ্যবিত্তের অস্তিত্বের গ্লানি, তার বিবর্ণ দৈনন্দিনতা, তার সঙ্কীর্ণতা, আত্মপরায়ণতা, অসহায়তা এবং নীতিহীনতাকে সমর সেন নির্মমতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। যারা স্বাস্থ্য বিধি পালনের পাশে দুপুরের ঘুম আর দাম্ভিকতা মিলিয়ে স্ববিরোধিতাপূর্ণ জীবনে নারীর সতীত্ব ও নিষ্ঠা দেখতে চায়, তারা সংস্কারাচ্ছন্ন গর্ভধারণে নতুনত্ব খুঁজে পায় না। তারা একমাত্র জানে নারীধর্ষণের ইতিহাসই। শহুরে মধ্যবিত্তের সুবিধাবাদী অন্তঃসারশূন্য চরিত্রকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমর সেন চিত্রিত করেছেন।

আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে মধ্যশ্রেণীই বারে বারে নেতৃত্ব দিয়েছে রাজনীতিতে আর সংস্কৃতিতে, তবুও সেই শ্রেণী সম্পর্কে সমর সেন, রাজনীতির নতুন ধারণা জনিত কারণে উৎসাহ বোধ করেন নি। এই মধ্যশ্রেণীর একজন হয়েই তিনি বুঝেছিলেন—উনিশ শতকী লিবারেলিজম থেকে শুরু করে বিশ শতকের চরমপন্থী রাজনীতি পর্যন্ত মধ্যশ্রেণী নির্ভর ক্রিয়াকর্মে তাৎক্ষণিক আবেগ এবং উত্তেজনা যতটা, দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন এবং পরিণতিতে পৌছনোর উপাদান ততটা ছিল না। সামাজিক অর্থনীতিক চাপ ক্রমশ

কঠিন হচ্ছিল। আর দেখা যাচ্ছিল সাম্রাজ্যবাদী ও অন্যান্য শোষণ থেকে মুক্তির পথ গণ আন্দোলন। আর সেই গণ আন্দোলন, তা গান্ধীবাদীই হোক, আর শ্রমিক-কৃষকেরই হোক, তাতে মধ্যশ্রেণীর ভূমিকা নামমাত্র। এই তিক্ত অভিজ্ঞতা মধ্যশ্রেণীকে একটা প্রশ্নের সামনে দাঁড় করায়-সে শ্রেণীচ্যুত হবে কিনা! শ্রেণীচ্যুতি পোষাক বদলানো নয়, দীর্ঘস্থায়ী এক পদ্ধতি তা, আর তা চেতনার যে আমূল পরিবর্তন দাবি করে, তাও খুব সহজ সাধ্য নয়। সরল সান্ত্বনা পাওয়া যায়, আবেগের কাছে আত্মসমর্পণে। একদা চরম-পন্থী বিপ্লববাদ যেমন মধ্যশ্রেণীর তরুণদের আকর্ষণ করেছিল নিষিদ্ধ পথে পা বাড়ানোর রোমাঞ্চকর উত্তেজনায়, নতুন পাওয়া মার্কসবাদ ও তেমনি অনেককে টানছিল অচেনা পৃথিবীর রহস্যময়তার টানে। মধ্যশ্রেণীর কাছে মার্কসবাদ ছিল অনেকটাই পুঁথিতে পড়া, সংগ্রামের অভিজ্ঞতাজাত ততটা নয়। সেই সঙ্গে ছিল সোভিয়েত-ভূমি সম্পর্কে এক ধরণের কল্পনা মদির আবেশ। কিন্তু সমর সেন তো আবেগকেই সরাতে চাইছিলেন, ফলে বুদ্ধি দিয়ে যেখানে পৌঁছেছিলেন, তা তত্ত্বগতভাবে সত্য হলেও চারপাশে তাকিয়ে শুধুই ভবিষ্যতের আশায় উদ্বেল হতে পারছিলেন না। একটা বিশ্বাসহীনতার ভাব ক্রমশই ফুটে উঠছিল। 'আশেপাশে ব্যর্থতায় চিরকাল মৃত্যু আসে আর যায়।'[৩৩] আর নিজের শ্রেণীগত পরিচয়ের সূত্রে মনে হয়—আমাদের মুক্তি নেই, আমাদের জয়াশা নেই; আগামী দিন উজ্জ্বল, কিন্তু বর্তমানকে এড়ানোর উপায়ও নেই।

সমর সেনের সমস্যাও এখান থেকে অনুধাবন করা যায়। এ সমস্যা শুধু সমর সেনের নয়, মধ্যশ্রেণীভুক্ত মননবাদী ব্যক্তিরই, মার্কসবাদকে কীভাবে গ্রহণ করা হবে—আবেগে না যুক্তিতে, রোম্যান্টিকতায় না কঠিন বাস্তবে। এ সমস্যার সমাধান আসে তত্ত্ব আর অনুশীলনের সংযোগে। অনুশীলন-রহিত তত্ত্ববিশ্বাস টেনে নিতে চায় তাৎক্ষণিক উত্তেজনায়। অথবা, তা পর্যবসিত জীবন সংযোগহীন শুষ্কজ্ঞানে। শুধু রোম্যান্টিক আবেগের আয়ু বেশী নয়, রাজনৈতিক কর্মে যুক্ত থাকলেও :য়। কিন্তু শুধু তত্ত্ববিশ্বাস কতদূর নিয়ে যাবে,—তাই নিজেকে মনে হয় বিচ্ছিন্ন শিকড়হীন। সমস্ত ঢেউ পেরিয়ে যে যাত্রা করতে চায়, সে নির্দিষ্ট ঘরের ঠিকানা পায়না, বিভ্রান্তির যন্ত্রণা তাকে পীড়া দেয়, গম্ভীর পাহাড় থেকে দুরন্ত ঝড় এলেও 'প্রবাসী নাবিক নরকে এখনো ঘোরে।'[৩৪] কোনো রোম্যান্টিকতাতেই আর সান্ত্বনা পাওয়া যায় না। পরিবর্তে বিদ্রূপ পরায়ণতা জন্ম নিচ্ছে। নাগরিক চাপে পর্যুদস্ত জীবনে গ্রাম-সম্পর্কে যে পলায়নবাদী মোহ কাজ করে, আর যার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে এক ধরনের আর্থিক সচ্ছলতা আর নিরাপত্তার ধারণা, তাকে ভেঙে দিয়ে সমর সেন মনে করিয়ে দেন ম্যালেরিয়া সম্ভাবনা, আর কুশ্রীতা ও বিধ্বস্তরূপকে।

'নদীর উপরে যেখানে নীল আকাশ নামে
গভীর স্নেহে,
শেয়াল, সংকুল কোনো নির্জন গ্রামে
কুঁড়ে-ঘর বাঁধি;
গরুর দুধ, পোষা মুরগির ডিম, ক্ষেতের ধান;

রাত্রে কান পেতে শোনা বাঁশবনে মশার গান;
সেখানে দুপুরে শ্যাওলায় সবুজ পুকুরে
গরুর মতো করুণ চোখ
বাংলার বধূ নামে;[৩৫]

—এই নির্বোধ জীবন আর দুঃস্থ পরিবেশ কোনো সান্ত্বনা হতে পারে না। বর্তমান বড়োই নিষ্ঠুর। মধ্যশ্রেণীর নিরাপদ আশ্রয় ভেঙে পড়তে থাকলেও, সে সত্যকে মেনে নেওয়া কষ্টকর। কিন্তু সমর সেন সত্য থেকে মুখ ফেরান না। বরং সহজ আত্ম সমালোচনার ভঙ্গিতে তিনি মুখ ফেরানোর ভুলটাকেই জানিয়েছেন—আমি মাত্র/মেছুনীর সামনে সরম কেরাণী, আর ভারি ট্যাঁক ছাড়া কিছুই টেঁকে না। আসলে এটাই মধ্যশ্রেণীর মানসিকতা, যদিও এটাকে আড়াল করতেই চেষ্টা করে তারা। এই সূত্রে মনে আসে, আধুনিক শিল্প সাহিত্যের মজ্জায় মজ্জায় নিহিত যে সমালোচনা, তর্ক —তাকেই সমর সেন প্রাধান্য দিয়েছেন। পরিবেশের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রূপ সমালোচনা কখনো কখনো ব্যঙ্গাত্মক আত্ম-সমালোচনাতেও পর্যবসিত হয়।

'রুক্ষমাঠে গ্রীষ্মের কিষাণের গান।
এখানে অসহায় দিন
দূর শ্মশানের গন্ধে, শেষহীন শব্দের পাশে
আসন্ন রাত্রির পদক্ষেপে স্তব্ধ।[৩৬]

এই অসহায়ত্ব আর শ্মশান-বাস্তবতাকে সমর সেন অস্বীকার করতে পারেন না। ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে এই আত্ম-সমালোচনা পাঠককে মনে করিয়ে দেয়, তাঁর কবিতা শুধুই ব্যক্তি বিশেষের আত্মোপলব্ধি নয়, তা নিছক এক ব্যক্তির ভাববিলাসও নয়, তা স্পষ্টতই তার শ্রেণীর উপলব্ধির দ্বন্দ্বময় প্রকাশ। সমর সেনেব এই ভঙ্গিমা একেবারেই স্বতন্ত্র। এমনকি কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের থেকেও। এ প্রসঙ্গে ইরাবান বসুরায় মন্তব্য করেছেন : 'তাঁর (সমর সেন) এই নির্মোহ কল্লোলীয় লেখকদের বিপরীত; কল্লোলের কেউ কেউ অবশ্য, এই মোহ কাটাতে চেয়েছিলেন, কিছুটা স্ব-বিরোধিতাতেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় মধ্যশ্রেণীর কল্পনাভিসারের যে আরোপিত সত্যতা, তার ছোটগল্পে তার বদলে পাওয়া যায় মধ্যশ্রেণীর জীবনের দুর্বহ গ্লানি আর ক্লিন্নতা আর মানসিক পঙ্গুত্বের স্পষ্ট পরিচয়। সমর সেন কোনো রোম্যান্টিকতার আভাস দেন না, তা নয়—কিন্তু শ্রেণীগত শ্রেষ্ঠত্বের অলীক সান্ত্বনা যেমন তাঁর নেই, তেমনি নেই অতীত চারণার মোহ—আছে ভবিষ্যতের কিছুটা আশা, কিন্তু তাকে তিনি ভাসতে দিতে চাননা আবেগের টানে।'[৩৭] এই মন্তব্যই প্রাধান্য পায়, সমর সেন যখন রূঢ় সত্যে উচ্চারণ করেন : 'আমাদের সামনে অনেক বসন্ত,/শেষ কি আমাদের দিন'।[৩৮]

এখানে 'আমরা' সেই শ্রেণী যারা ধারণা করে, জেনেছি জনগণ বর্বর, আত্ম চিন্তাই পরম চর্চা। সমর সেন অনুভব করেন, এই শ্রেণীর দিন অপসৃত, আগামী বসন্ত তাদের নয়, অন্যদের। কিন্তু মধ্য শ্রেণীর এই উপলব্ধি হয়না বলেই কবির বক্তব্যে তির্যকতা

পরিস্ফুট হয়। তিনি এই শ্রেণীর বিপর্যস্ত অস্তিত্বকে স্মরণ করান—বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ, তবু নিজেকে কতদিনের জীর্ণ বৃদ্ধ লাগে, জিভে স্বাদ নেই। বোঝা যায় না, কি পাপে সুস্থ শরীরে ঘুণের আশ্রয় ঘটেছে।—এই না বোঝাটাই মধ্যশ্রেণীর অক্ষমতা, ইতিহাসের ধারাকে উপলব্ধি করতে না পারার ফল। আর এখানেই সমর সেনের সঙ্গে মধ্যশ্রেণীর প্রভেদ সৃষ্টি হয়। আত্মসন্তুষ্টিকে ব্যঙ্গ করেন তিনি। 'বর্গি আজো দূরে।/প্রেম আমার পরিখা, দম্ভ প্রাকার,/দুর্গম নিজদুর্গে অন্তরীণ,/মনে শ্রাবণের ঘনমেঘ।'[৩৯] এই দুর্গ থেকে, অন্তরীণ-দশা থেকে বেরিয়ে আসা প্রয়োজন, কেননা সময় কঠিন। এই প্রয়োজনের তাড়ায় সমর সেন প্রত্যক্ষ বাস্তবকে পেরিয়ে যান, পৌঁছন আশাতেই, শ্রমিকের-কৃষকের সাময়িক দুরবস্থা দেখেন : 'স্থান নেই, স্থান নেই রব/ছোট এ ফ্যাক্টরী/ধানক্ষেত জীর্ণপ্রায়'। কিন্তু 'তারি আশেপাশে ট্রামবাস বিমর্ষ মানুষের ভিড়ে/কারা যেন পথেপথে নিঃশব্দে ঘোরে'; 'কারা যেন' বলাতে কিছুটা অপরিচয়ের আভাস থাকে। 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট এ তরী' আর ভারা ভারা সোনার ধানের বদলে কারখানায় স্থান না থাকার ফলে বেকারত্ব, আর ধান ক্ষেতের জীর্ণত্বের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো নাবিক আসে না সোনার তরী বেয়ে, যাকে দেখে বলা যায়—'মনে হয় চিনি তাহারে'। তার বদলে যারা আসে তারা নতুন মানুষ, মধ্যশ্রেণীর কল্পনা বিলাসের আভিজাতক পরিমণ্ডলের সৌন্দর্য তাদের শরীরে নেই। কবি এদের চেনেন, কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে নয়। আসলে কবির শ্রেণীগত দ্বিধা কাজ করে। বস্তুত চেনাটা অনেকটাই তত্ত্বগত। আর তত্ত্বে যা সত্য বলে মনে হয়, তাকে অনুশীলন মাধ্যমে না পেলে, না মেলালে সেই চেনাও বদলে যাবার সম্ভাবনা থাকে। সমর সেনের ক্ষেত্রে সময় একটা সুযোগ তৈরী করেছিল। তিনি নিজের শ্রেণীকে মেনে নিতে পারছিলেন না, তাঁর সচেতন মন তার বিরোধিতা করছিল, আবার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে সেভাবে জড়ান নি। অন্য কোনো ভাবেও নিজেকে নিরন্তর ব্যাপৃত না রাখার ফলে, তাঁর পক্ষে শ্রেণী অবস্থান থেকে সম্পূর্ণ সরে আসাও সম্ভব হচ্ছিল না। কিন্তু ফ্যাসিবাদের ভয়ংকরতার বিরুদ্ধে পৃথিবীজোড়া সচেতন প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ তাঁকে, তাঁর কবিতাকে বিদ্রূপ আর বিক্ষোভের পাশাপশি কিছুটা বিশ্বাস এনে দিলেও, সেই বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর শ্রেণীর প্রতি ব্যঙ্গ থেকেই যায়। সেই সঙ্গে কিছুটা আত্মবিদ্রূপের সুরও—'আকাশে মেঘের মৃদঙ্গ,/ভারতের ভাগ্যাকাশে/অন্ধকারে স্তরে-স্তরে জানিনা কী ঝড় ঘনায়।/এ অবস্থায় বৃন্দাবনী বাঁশি যদি চকিতে শুনি,/তাহলে বলবে লোকে : রোমান্টিক ভুঁইফোড়।/অত্যধিক পরিশ্রম হা-হুতাশ চাপি,/কেননা ব্যক্তিগত গান গাওয়া কর্তব্য নয়;/যদিচ পৈত্রিক আশ্রয়ে এখনো বসবাস,/যদিচ বেকার, নিঃসঙ্গ, মনে মনে প্রেমিক,/তথাপি বামপন্থী পত্রিকায় আসন্ন বিপ্লবের গান অবশ্য উচিত।'[৪০]

এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে আত্মবিরোধিতার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য। অবশ্যই তা মধ্য শ্রেণীরই আত্মবিরোধিতা। কিন্তু সমর সেনেও যেন দ্বিধান্বিত কিছুটা। বিশেষ করে প্রেমিক ও বিপ্লবীর বিরোধ এবং দূরত্বের একটা ধারণা—সমর সেন ঠিক মেনে নিতে পারছিলেন না। তবু মানতে হচ্ছে বলে তাঁর অস্বস্তি। আবার উল্টোদিকে মধ্যশ্রেণীর নিতান্ত পলায়নী

আত্মমুখিনতা বহু সময়েই বহির্জৎকে অস্বীকার করে আশ্রয় খোঁজে প্রেম ভাবনাতে— কাজেই দুটি ভুল ধারণার বৈপরীত্যে সংঘাত তৈরী হয়। তখন জোর করে নিজেকে পাল্টানোর ভান করতে হয়, উপলব্ধি ছাড়াই এগোবার চেষ্টা করতে হয়। তখন বিপ্লবের ভাবনা হয়ে ওঠে শুধুই কর্তব্য, চেতনার তাগিদ নয়। তাই এখানে সুযোগসন্ধানী মনোভাবের প্রতি বিদ্রূপই প্রধান। সমর সেন নিজেকে নানা যোগাযোগ সত্ত্বেও কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য করার কথা ভাবেন নি যেমন, আবার নিজেকে নিয়ে বিপ্লবী ভাবনার বিলাসকে প্রশ্রয় দিয়ে আত্মপ্রতারণাও করতে পারেন নি। সচেতন ও সজাগ মন দিয়ে যে সত্যকে অনুভব করতে পারছিলেন, সেই সত্যের কাছে এসে দাঁড়াতে চাইছিলেন। কোনো শৌখিন মজদুরী করে প্রশংসা কুড়োতে চাননি। আধুনিক সাহিত্যের যে মারাত্মক প্রবণতার কথা সমালোচকরা নির্দেশ করেছেন, তার থেকে সমর সেন মুক্ত ছিলেন। 'আধুনিকতা আধুনিক সমাজ সভ্যতার বিরুদ্ধে এক শিল্পিত প্রতিবাদকে মূর্ত করতে চায়, এই ঘটনার মধ্যে নিহিত আছে এক গভীর বিপত্তি। প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন পেয়ে, সরকারি প্রসাদে পুষ্ট হয়ে, প্রচার মাধ্যমের দৌলতে যে মাস কালচারের দৌরাত্ম্য আজ সর্বত্র, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আধুনিকতা হয়ে যায় সংখ্যা-লঘিষ্ঠের সংস্কৃতি। আধুনিক কবি নিজেকে তখন সনাক্ত করেন দীক্ষিত মুষ্টিময়ের একজন বলে, তাঁর মনে হয় তিনি যেন সমাজের মাথার ইলেক, এমন কি যেন এক নতুন অভিজাত গোষ্ঠীর একজন।'[৪১]— এই মনোভাবের সস্তা মোহে সমর সেন নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি। একদা সুধীন্দ্রনাথ ও জনতার জঘন্য মিতালিতে বিরূপতা প্রকাশ করেছিলেন 'নপুংসক গড্ডালিকা আসিয়াছে রসালু আবেশে/সচিত্র স্বপ্নের রাজ্যে খিন্ন দেহে, সর্বভূকমনে' বলে।

মায়াকর্ভস্কি কবির ভূমিকার কথা মনে রেখে বলেছিলেন : 'I am a poet, That is what makes me interesting. that is what I am writing about.'[৪২] কবির এই ভূমিকা সমাজ-পরিবর্তনে তার দায়িত্ব কী ও কেমন, এ সবের বিচার অবশ্যই একথা মনে রেখে যে কবি, তাঁর উপলব্ধির কথাই বলতে পারেন, তার বেশী কিছু নয়। আর এই উপলব্ধির পূর্ণতা আসতে পারে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার যোগাযোগে। তা না হলেই চেতনাকে জোর করে পাল্টাতে হয়, বা পাল্টাচ্ছে, এমন ভাবতে হয়। সেই ভাবনা কবিতায় আনতে গেলে কখনো কখনো তা মনে হয় জোর করে বলা—'অনেক ঘাটের জল খেয়ে বুঝি/অনেক শোক যেখানে/সেখানে সত্তার নতুন সূর্য ওঠে,/কালের ঘোলাটে জলে জোয়ার লাগায়/সম্ভব হয় অনেকের খেয়া পারাবার/গভীর জলে একের শবদেহ ডোবে'[৪৩] —এই উচ্চারণ যতটা বুদ্ধিব বিচারে পাওয়া বলে মনে হয়, ততটা যেন উপলব্ধি জাত নয়। আর তখন কবির 'আমি'কেও একটু প্রসারিত করতে হয়। 'জানি জানি/ আমার রক্তের ছন্দে আজো বাজে জাতির ধমনী, আমাকে ডাকে/অসংখ্য সহোদর সেখানে প্রাণ দেয় লাখে লাখে/ফসলহীন শকুনের মাঠে।'[৪৪] এই 'আমি' শুধুই মধ্যশ্রেণীর অহং এর প্রকাশ মাত্র নয়, কবির নিজেকেও ভেবে নেওয়া নয়, এমন কি বিপ্লবের প্রতিনিধিও নয়। আসলে এখানে 'আমি'কে সমষ্টিতে মিলিয়ে দেওয়ার, জনসাধারণের

সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আকুলতাই তীব্র হয়ে ওঠে। এই আকুলতা স্বস্তি পেতে চায় সমকালীন ইতিহাসের আশ্রয়ে, কারখানায়-কলে যারা দধীচির হাড়ে সভ্যতার বনিয়াদ গ'ড়ে তোলে, তাদের হাতে। মার্কসীয় ধারণার অনুসরণে সমর সেন আস্থা রাখেন শ্রমিক-কৃষকের উপরে তখন। তথাপি তাঁর একটু দ্বিধা থেকেই যায়, কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারেন না মধ্যশ্রেণীর গণ্ডি থেকে। সমস্ত বোধ ও বুদ্ধি সত্ত্বেও মনে হয় নিজের শ্রেণীগত অবস্থানটাই টিকে যাচ্ছে। শুধু বিশ্বাস দিয়ে, মননের অভিজ্ঞতা দিয়ে তাকে পেরনো সম্ভব হয় না। কেননা তাঁর মতে, জীবনধারার ছাপ চেতনাকে গড়ে, চেতনার ছাপ কিন্তু জীবন ধারণাকে গড়ে না। ফলে নিজের দিকে তাকিয়ে করুণ সত্যটাই প্রকট হয়ে ওঠে।

মধ্যশ্রেণী ব্যাপক জনগণ থেকে একটু স্বতন্ত্র, তার একটা অংশ তাদের সহযাত্রী হলেও—এটা কাটানো যায় মার্কসীয় তত্ত্বের আলোকে। কিন্তু তত্ত্ব যাই হোক, কর্মসূচীতে যদি ভুল থাকে, তাহলে তো আবার জনগণই বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে—তখন কবির করণীয় কী! তিনি কী ভাবে পেরোবেন তাঁর শ্রেণীর সংশয়, কীভাবে মেলাবেন তাঁর কবি-উপলব্ধি। দ্বিধা, সংশয়বোধ আর দ্বিখণ্ডিত সত্তা নিয়েই তখন কবিকে এগোবার পথ খুঁজতে হয়।

> 'অন্ধ বধির খঞ্জের দলে ভিড়ি,
> যেখানে অন্তরঙ্গ বন্ধুরা আমার,
> পেশাদার নেতা, রুশভক্ত শৌখিন কবি, চিন্তিত কেরানি,
> কিম্বা স্বাধিকার প্রমত্ত স্বামী—
> বোমারু আকাশের তলে মূষিক বিবরে
> ঈগল আকাশের নীচে মূষিক পৃথিবীতে
> দ্বি-খণ্ডিত-সত্তা জীবনের উদ্বিগ্ন ক্লান্তিতে
> হাশিশ্ খোঁজে দ্বিধান্বিত নানা ভ্রান্তিতে।'[৪৫]

—এ সমস্যা কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের হয় নি, হয়নি কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের। তাঁরা নিষ্ঠাবান এবং অনুগত পার্টিকর্মী বা সমর্থক হিসাবে পার্টির যাবতীয় কর্মসূচীকেই মেনে নিয়েছিলেন, আর এভাবেই স্বশ্রেণীর গণ্ডি অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন। এর জন্য তাঁদের কখনো কখনো বিরোধিতা করতে হয়েছে পুরোনো উচ্চারণেরই, বা ইতিহাসের বিচারে ভ্রান্ত এমন উচ্চারণও করতে হয়েছে। সেক্ষেত্রে পার্টি বহির্ভূত ব্যক্তির মতোই সমর সেন বিচার, বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত করেছেন। এতে ব্যক্তির দ্বিধা দ্বন্দ্ব যেমন আছে, তেমনি পার্টির সাময়িক ভ্রান্তির ভার না বওয়ার সুযোগও আছে। তবে মাঝে মাঝে সমর সেনকে সংশয় নিয়েও শেষের কাজটি করতে হয়েছে। পার্টির নীতির আনুগত্যে নিজের শ্রেণী-অবস্থানকে পেরোতে চাননি বলে, সেই শ্রেণী অবস্থান তাঁর ভিতরে টান লাগায়, নিজের ভ্রান্তিকে জেনেও, তা পার হতে চান। সুধীন্দ্রনাথের মতো সমর সেনের কণ্ঠেও উচ্চারিত হয় : 'অগ্রচারী জনতা নই/তোমার বিশ্বরূপে তাই দেখি ধ্বংসের প্রতীক/অজ্ঞের দম্ভ চূর্ণ কর, ইতিহাস পতি,/বিপ্লবী চেতনার সেতুতে/সংকীর্ণ কর এ

দুস্তর ব্যবধান', কিন্তু এটাতো প্রার্থনার ব্যাপার নয়, ব্যবধান সংকীর্ণ হয়, বা হতে পারে নিজেকে পাল্টানোর মধ্যে দিয়ে। সে প্রক্রিয়াতেই সমর সেন আরো একটু এগিয়ে বললেন—'ভুলে, ভ্রান্তিতে, উৎকণ্ঠায় নতুন জীবনের ছাপ/আমাদের চেতনায় পড়ে।'[৪৬] একথা আধুনিকতাকে'ই দ্যোতিত করে।

আধুনিক বাংলা কবিতার যে পালাবদল শুরু হয়েছিল আগেই—জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসুরা এসে গেছেন আগেই, সমর সেনের কবিতার দিকে তাকালে অবশ্য টের পাওয়া যায় ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ থাকলেও, সেখানেই বাঁধা পড়েন নি তিনি। তাঁর উচ্চারণে যে দুর লাগছিল, তাতে কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকলেও বিষ্ণু দে বা সুধীন্দ্রনাথ থেকে স্বতন্ত্র। সম্ভবত প্রেম-উচ্চারণের নানা মুগ্ধতা সত্ত্বেও এত ক্লান্তির ছোঁয়া আগে কখনো অনুভব করা যায় নি। সমর সেন নাগরিক কবি বলে চিহ্নিত হলেও, তাঁর কবিতায় অনেকটাই জুড়ে আছে প্রকৃতি। সমর সেনের নাগরিকতা প্রকৃতি অনুভবে বাধা পায় না, বরং সেখানেই চিনে নেওয়া যায় নাগরিক বোধকে। প্রকৃতিকে পটভূমিতে রেখে তার অনুষঙ্গে বা বিপরীতে নয়—প্রকৃতিকেই নাগরিক কবির মন করে তোলা হয় যেন ক্লান্তি আর হাহাকারের যন্ত্রণা বয়ে। সমর সেন তাঁর কাব্যে যে সমস্যা ফুটিয়ে তুলেছেন বিশেষ ভাবে তা বাংলাদেশের সামাজিক জীবনের সমস্যা ততটা নয়, যতটা শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর সমস্যা। উপনিবেশের খণ্ডিত চারণার চাপেই তাদের সমস্যা আরো তীব্র হয়ে ওঠে। সামন্ত-অতীতে তাদের মানসিক আশ্রয় নেই, আবার বুর্জোয়া-বর্তমানও তাদের কাছে সম্পূর্ণ সত্য নয়—ফলে তারা আরো বেশি বিচ্ছিন্নতা অনুভব করেছিলেন। সমর সেনের কবিতায় যে বিচ্ছিন্নতা শোনা যায়, তারই আরেক প্রতিমূর্তি তো 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র শশী। এই মানসিক অনিকেত অবস্থা আসে ব্যক্তির মননের অভিজ্ঞতায়-ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির টানাপোড়েনে। তিনি ক্রমে ব্যক্তির যন্ত্রণা, হতাশা, ক্লান্তি থেকে পার হতে চেয়েছিলেন সমাজ বদলের ভাবনায়। কিন্তু তাঁর নিজস্ব সংশয় ছিল। প্রশ্নহীন বিশ্বাসে আপ্লুত হতে পারেন নি তিনি। আর সেকথা বারে বারে তাঁর কবিতায় ফুটিয়ে তুলতে নির্মোহ, নিরাবেগ গদ্যের সহায়তা নিয়েছিলেন। রাবীন্দ্রিক উত্তরাধিকার হয়েও তা স্বতন্ত্র। বস্তুত রোম্যান্টিকতার সমস্ত আকুলতা নিয়েও সমর সেন ছিঁড়তে চেয়েছিলেন রোম্যান্টিকতার বন্ধনকে—একে গদ্য ছন্দ ছাড়া প্রকাশ করা যেত না। মরুভূমি আর বালুচরের কথা তাঁর কবিতায় বারে বারে উল্লেখিত। নিঃসন্দেহে এলিয়টের কাছ থেকে পাওয়া এটি—কিন্তু বাংলা কবিতায় কোনো কোনো পূর্বসূরীর সঙ্গেই মেলে না। বিহারীলাল চক্রবর্তী তাঁর সর্বদা হুহুকরা মনের রোম্যান্টিক অকারণ বেদনাকে প্রকাশ করার জন্য লিখেছিলেন। 'বিশ্ব যেন মরুর মতন', যতীন্দ্রনাথের মরুমায়া বা মরীচিকা ও কিছুটা সাজানো দুঃখবাদ। সেখানের সঙ্গে সমর সেনের উপলব্ধির মিল নেই। বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমির জ্বালা সমর সেন অনুভব করেছিলেন, সে অনুভব মননের; সেই সঙ্গে টের পাচ্ছিলেন নগর জীবনের ক্লান্তি, আলোড়নহীন সমতল চেহারা, মধ্যশ্রেণীর নিস্তরঙ্গ, নিষ্প্রাণ রূপ, তাতে তো কোনো

ছন্দই নেই—সেজন্যই তাঁকে বেছে নিতে হয়েছিল গদ্যের টানা ভঙ্গিকে। আর এখানেই সমর সেনের আধুনিকতা।

উল্লেখপঞ্জী

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'রবীন্দ্ররচনাবলী'· জন্মশতবার্ষিকী সং। প.ব. সবকাব। ১৪শ খণ্ড : ১৯৬১। পৃ. ৩৪১

২ তদেব। পৃ. ৩৪৮

৩. তদেব। পৃ ৫১৩

৪. C Caudwell—'The Developement of Modern Poetry': 'Illusion and Reality': First Indian edition 1945; reprint 1956. Peoples Publishing House, Delhi P. 54

৫. জীবনানন্দ দাশ — 'কবিতার কথা', ৪র্থ সং। সিগনেট প্রেস। ১৩৮৭। পৃ ১৩৫।

৬. তদেব। পৃ. ১৩২

৭ বুদ্ধদেব বসু — 'আধুনিক বাংলা কবিতা' (ভূমিকা') (সম্পাদিত)। ৫ম পরিবর্ধিত সং। এম.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রা লি.। ১৯৭৩। পৃ. ৮

৮ দীপ্তি ত্রিপাঠী — 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়'। ৪র্থ, সং। দে'জ পাবলিশিং। মার্চ ১৯৮৮। পৃ ২-৪

৯ অশ্রুকুমাব সিকদাব — 'আধুনিক কবিতাব দিগ্‌বলয়'। পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত ২য় সং। অরুণা প্রকাশনী। পৌষ ১৩৮৬। পৃ. ৯৬-৯৭

১০. যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত — 'ঘুমেবঘোরে'। 'মবীচিকা'। 'যতীন্দ্রনাথ কাব্যসম্ভাব'। মিত্র ও ঘোষ। আশ্বিন ১৩৭৩। পৃ ২৩

১১ অশ্রুকুমার সিকদার — 'আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়'। প্রাগুক্ত। পৃ. ৩

১২. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত — 'প্রতীক্ষা, 'দশমী' ঃ কাব্য সংগ্রহ'। দে'জ পাবলিশিং। ১৯৭৬। পৃ. ৩১১

১৩ অশ্রুকুমার সিকদার — 'আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়'। প্রাগুক্ত। পৃ. ৭

১৪. দীপ্তি ত্রিপাঠী — 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়'। প্রাগুক্ত। পৃ. ৪৫

১৫. বিষ্ণু দে — ভূমিকা, 'এলিয়টের কবিতা'। সিগনেট প্রেস। ১৯৬০। পৃ. ১১

১৬. তদেব। পৃ ১০

১৭. দীপ্তি ত্রিপাঠী — 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়'। প্রাগুক্ত। পৃ. ৬১

১৮. বিষ্ণু দে — '২৫ শে বৈশাখ' : 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'। ৩য় সং। সিগনেট প্রেস। ১৩৭০। পৃ. ১৩০

১৯. জীবনানন্দ দাশ — 'রাত্রি', 'সাতটি তারার তিমির' : 'কাব্যগ্রন্থ'। বেঙ্গল পাবলিশার্স। বৈশাখ ১৩৭৭। ২য় খণ্ড। পৃ. ১৯

২০. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত — 'সর্বনাশ', 'অর্কেস্ট্রা' : 'কাব্যসংগ্রহ'। প্রাগুক্ত। পৃ. ৪৮

২১. জীবনানন্দ দাশ — 'বোধ', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', : 'কাব্যগ্রন্থ'; বেঙ্গল পাবলিশার্স'। বৈশাখ ১৩৭৭। প্রথম খণ্ড। পৃ. ৬৯

২২. বিষ্ণু দে — 'অন্বিষ্ট', 'অনিষ্ট' : 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'। পরিবর্ধিত ৫ম সং। নাভানা। ১৯৮৫। পৃ ৯০

২৩ শঙ্খ ঘোষ — 'গ্রাম থেকে একজন', 'মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়'। 'কবিতা সংগ্রহ'। দে'জ পাবলিশিং। পৌষ ১৩৮০। পৃ. ১৯২
২৪. অমিয় চক্রবর্তী — 'সত্যাগ্রহ', 'পারাপার' : 'কবিতা সংগ্রহ'। দে'জ পাবলিশিং। অগস্ট ১৯৭৭। ১ম খণ্ড। পৃ. ২২২
২৫. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত — 'অন্ধকার', 'তন্বী' : 'কাব্য সংগ্রহ'। প্রাগুক্ত। পৃ. ৩৪৯
২৬ নরেশ গুহ — 'বিকল্পে উটের সার', 'তাড়ার সমুদ্র ঘেবা', । আনন্দ পাবলিশার্স। ফেব্রুয়াবী ১৯৭৬। পৃ. ১২
২৭ অশ্রুকুমার সিকদাব — 'আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়'। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৬-২৭
২৮. সমর সেন — 'ঝড়' : 'কয়েকটি কবিতা'। অনুষ্টুপ সং। অনুষ্টুপ প্রকাশনী। জানুয়ারী ১৯৮৯। পৃ ১৩
২৯. যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত — 'কেতকী', 'মরুমায়া' . 'কাব্যসম্ভাব'। মিত্র ও ঘোষ। আশ্বিন ১৩৭৩। পৃ. ২০৭
৩০ সমর সেন — 'মেঘদূত' . 'কযেকটি কবিতা'। প্রাগুক্ত। পৃ. ৯
৩১ তদেব। 'মুক্তি'; পৃ. ১৬
৩২. অশ্রুকুমাব সিকদার — 'আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়'। প্রাগুক্ত। পৃ. ১৪-১৫
৩৩. সমব সেন — 'সন্ধ্যা ও প্রভাত' · 'গ্রহণ', অনুষ্টুপ সং। অনুষ্টুপ প্রকাশনী। জানুয়াবী ১৯৮৯। পৃ. ১২
৩৪ তদেব। 'একটি বুদ্ধিজীবী'। পৃ. ১৫
৩৫ তদেব। 'বিতর্ক' ১'। পৃ. ২৮-২৯
৩৬ তদেব। 'শেষ সন্ধ্যা'। পৃ ৩৬
৩৭ ইবাবান বসু রায় — 'গোধূলি প্রান্তবে লেখা কঠিন জিজ্ঞাসা' : 'অনুস্টুপ'। প্রাক শাবদীয় বিংশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা। ১৯৮৬
৩৮. সমব সেন -- 'বোমন্থন · ১'। 'নানা কথা'। অনুষ্টুপ সং। অনুষ্টুপ প্রকাশনী। জানুয়াবী ১৯৮৯। পৃ. ৯
৩৯ তদেব। 'হ্সন্তিকা ১'। পৃ. ১২
৪০ তদেব। 'পরিস্থিতি'। পৃ. ১৬
৪১. অশ্রুকুমার সিকদাব — 'আধুনিক কবিতার দিগবলয়'। প্রাগুক্ত। পৃ. ২৩
৪২. Mayakovsky, V—'I Myself' . 'MAYAKOVSKY'. Tr. & Ed. by Herbert Marshall Dennis Dobson, London, 1965 p. 75
৪৩. সমব সেন — 'নববর্ষের প্রস্তাব : ৪'। 'নানাকথা'। প্রাগুক্ত। পৃ. ৪০
৪৪. সমর সেন — 'পোড়া মাটি' : 'খোলাচিঠি'। অনুষ্টুপ সং। অনুষ্টুপ প্রকাশনী। জানুয়াবী ১৯৮৯। পৃ ৭
৪৫. তদেব। 'জাতীয় সংকট · ৬'; পৃ. ১৭
৪৬. তদেব· 'জাতীয় সংকট : ৭'; পৃ. ১৮

চতুর্থ অধ্যায়

সমর সেনের কাব্যাদর্শ

"...We must make a choice if we are to continue us living writers. This involves an entire reconstruction of our ways of living."

[In Defence of the Decadents : New Indian Literature. No. 2]

এই মন্তব্য করেছিলেন কবি সমর সেন, কবিতা লেখা শুরু করার চার বছর বাদে। কিন্তু এই চেতনা কবির প্রথম থেকেই পরিস্ফুট হতে থাকে, এবং পরবর্তীকালেও বার বার বস্তুবাদী দর্শন দিয়ে নিজের চেতনাকে বিশ্লেষণ করেছেন তিনি :

'জীবন ধারার ছাপ চেতনাকে গড়ে,
চেতনার ছাপ জীবন ধারাকে নয়।'[১]

কবি খুব ভালো ভাবে জানতেন যে, তাঁর বোদ্ধা মানসের মূল তাঁর মধ্যবিত্ত লালনে। বলাবাহুল্য, সেই লালন পুষ্ট ব্যষ্টি মুখী প্রবণতা এবং গ্লানিবোধ জনিত কারণেই অতিপরিচিত ঘটনার মধ্য দিয়ে, মানবতার অবমাননার অতি অভ্যস্ত নিদর্শনের মধ্য দিয়ে তাঁর রাগ, ঘৃণা ও সদা জাগ্রত ইতিহাসবোধ বিচ্ছুরিত হয়েছে কবিতায়। সেইসঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে বহুকথিত সমাধান সম্বন্ধে তাঁর আপোষহীন, আত্মছলনা বর্জিত মনোভাব। তৈরী হয়েছে নিজস্ব কাব্যাদর্শ।

কাব্যাদর্শের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা একটু এগিয়ে গিয়ে সাহিত্য তত্ত্বের মৌল বক্তব্য গুলিও স্মরণ করতে পারি। 'সাহিত্য' তার আনন্দকরতা নিয়ে আমাদেরকে নানাভাবে স্পর্শ করে যে, সেই 'সাহিত্যে'র সংজ্ঞা নিয়ে, স্বরূপ লক্ষণ নিয়ে, সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা নিয়ে, কৌশল নিয়ে, সাহিত্যের কাছে রসগ্রাহী পাঠক কি চান বা কি পান?—ইত্যাদি নিয়ে, সাহিত্যের সামাজিক ভূমিকা নিয়ে দেশীয় এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য শাস্ত্রীরা নানান বক্তব্য সাজিয়েছেন। কিন্তু সব দিকে সকলের সমান আগ্রহ প্রকাশ পায়নি। প্লেটো সাহিত্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ লক্ষণ নিয়ে এবং সাহিত্যের সামাজিক ভূমিকা নিয়ে বিশদ হয়েছেন। এ্যারিস্টটল্ অবশ্য সাহিত্যের সব দিক নিয়েই আলোচনা করেছেন। তাঁর মতো, প্রাচীনদের মধ্যে কারো সাহিত্যতত্ত্বই পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সমৃদ্ধ নয়। আবার ভারতীয় রসবাদী সাহিত্য শাস্ত্রীরা, সহৃদয় পাঠকের চিত্তভূমি-ভোক্তার রসাস্বাদন, বিশেষ করে রস কী, রসসঞ্চার কেমন করে ঘটে ইত্যাদি সম্পর্কেই অধিক মনোযোগী হয়েছিলেন। অন্যদিকে, প্রাচীন কালের ক্লাসিক পণ্ডিতেরা সাহিত্যের স্বরূপ নিয়ে এবং পরবর্তীকালের রোম্যান্টিক সাহিত্যের সাহিত্য শাস্ত্রীরা সাহিত্যিকের মনের রহস্য নিয়ে, সৃজন ক্রিয়ার রহস্য নিয়ে গভীর ভাবে আলোচনা করেছিলেন। ভাবপ্রেরণা সম্বন্ধে একটা রহস্যময়তার ধারণাও তাঁরা জন্মাতে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু সাহিত্যের রূপসিদ্ধি সাহিত্যিকের সচেতন প্রবর্তনার ফল, অন্তত ধ্রুপদী সাহিত্যাদর্শে এ ধরনের একটা মতবাদও প্রচলিত

ছিল। সেদিক থেকে বাংলা সাহিত্য কোনোদিনই ক্লাসিক বা রোম্যান্টিক কোনো বিশেষ একটি সাহিত্যাদর্শকে অনুসরণ করেনি। তাই বাংলা কাব্য, তথা সাহিত্যকে প্রচলিত রীতিতে ফেলে বিচার করা যুক্তিযুক্ত নয়।

কবি সাহিত্যিকরা যখন তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টি নিয়ে ভেবেছেন, তখন তাঁদের মনে একই সঙ্গে ভাব ও রূপের প্রসঙ্গ এসেছে। তাঁদের এই সৃষ্টি ভাবনা তাঁদেরই সচেতন সাহিত্য জিজ্ঞাসার ফসল, কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টিকালে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা সামর্থ্য সব সময়ে সেই সাহিত্যাদর্শ সমর্থন করেনি। এর থেকে বাঙালী কবি-সাহিত্যিকও ব্যতিক্রম নন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা বিশেষ নেই। সংস্কৃত কাব্যাদর্শের অনুকরণ বা অনুসরণই এ পর্বের বাঙালী লেখকদের সাহিত্যাদর্শ বলে গণ্য হয়েছে। মধ্যযুগের শেষ কবি, ভারতচন্দ্রই তাঁর কাব্য রচনা সম্বন্ধে দু একটি সূত্র দিয়ে গেছেন। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের আগে পর্যন্ত কোনো কবিই তাঁর কাব্যের মধ্যে বা স্বতন্ত্রভাবে সাহিত্য নিয়ে বিস্তারিত কোনো আলোচনা করেন নি। এই শতকে ইংরেজী সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগের ফলেই সাহিত্যচিন্তা ব্যাপারটি লক্ষ্য করা গেল। ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে যেমন সাহিত্যের রূপ ও রীতির পরিবর্তন হলো, তেমনি হলো তার সাহিত্য চিন্তার। সেই সঙ্গে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও নতুন মূল্যবোধ তাঁদের স্বমত প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছে।

ঈশ্বর গুপ্ত থেকেই প্রথম সাহিত্য চিন্তা দেখা গেলো। তিনি মনোভাব ব্যক্ত হওয়াকে কাব্যের লক্ষণ মনে করতেন। তাঁর শিষ্য স্থানীয় কবি, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতা বলতে বোঝেন কিছু কিছু প্রথাসিদ্ধ বর্ণনীয় বিষয়ের অলংকৃত প্রকাশ। মাইকেল মধুসূদন বাংলা কাব্যের নবযুগ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু বাংলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ বা কাব্যের গদ্য ভূমিকা লেখেননি তিনি। অথচ উনিশ শতকের বাঙালী কবিদের মধ্যে কাব্য নিয়ে তিনিই সবচেয়ে বেশী ভেবেছেন। তিনি কাব্য সৃষ্টিকে দৈবীপ্রেরণাজাত মনে করতেন। এবং কাব্য চিন্তায় উদ্ভাবনী শক্তি বলতে 'কল্পনা' কে প্রাধান্য দেন। তিনি বলেছেন— 'সেই কবি মোর মতে, কল্পনা সুন্দরী/যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন/অস্তগামি-ভানুপ্রভা-সদৃশ বিতরি/ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ কিরণ।'[২] 'ভাবের সংসার' সৃষ্টিই তাঁর লক্ষ্য ছিল। মধুসূদনের পরে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও 'লেখার চমোৎকারিত্ব' অপেক্ষা 'ভাবের চমোৎকারিত্ব'কে বেশী গুরুত্ব দেন।

অন্যদিকে মধুসূদনের সমসাময়িক ভূদেব ও বিদ্যাসাগর মূলত সংস্কৃত সাহিত্য ব্যাখ্যা বিচারে প্রবৃত্ত হলেও তার মধ্য দিয়ে সাহিত্য বিচারের কেন্দ্রীয় ভাবটি ধরবার চেষ্টা করেছেন। ভূদেব রসের চেয়ে, সৌন্দর্যের চেয়ে চিত্তশুদ্ধির প্রতি অধিক আগ্রহী ছিলেন। কর্মযোগী বিদ্যাসাগর সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে আলোচনার সুযোগ ও অবকাশ না পেলেও পাশ্চাত্য-সমালোচনা রীতির মতো, সাহিত্যের বিষয় বস্তু ও সাহিত্য স্রষ্টার রচনাকৌশল সম্পর্কে মাঝে মাঝে বিচার মূলক তীক্ষ্ণ মন্তব্য করেছেন। তবে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আলোচনাই বোধ হয় সবদিক দিয়ে পূর্ণতর।

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সাহিত্য কিভাবে সচেষ্ট হয়, তার উত্তর দিতে গিয়ে কোনো কোনো সময়ে নীতি ও মঙ্গলতত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হলেও সাহিত্যের উদ্দেশ্য যে সৌন্দর্যপ্রচার, আনন্দ দান—সে বিষয়ে তিনি অতিশয় অবহিত ছিলেন। তাঁর মতে,—'কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যের সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মানুষের চিত্তোৎকর্ষ সাধন—চিত্ত শুদ্ধি জনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতি ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও নীতিশিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষের সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কবির মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমোক্তটি গৌণ উদ্দেশ্য, শেষোক্তটি মুখ্য উদ্দেশ্য।'[৩] বঙ্কিমচন্দ্র মুখ্যত সৌন্দর্য সৃষ্টিকেই কবি সাহিত্যিকের প্রধান কলাকৃতি বলে স্বীকার করেছেন। এবং তাঁর সমকালে, তাঁর শিষ্যদের অনেকেই মঙ্গলতত্ত্বকে সাহিত্য বিচারের একমাত্র মানদণ্ড ধরেছিলেন এবং সে মঙ্গল বলতে তাঁরা বুঝেছিলেন কেবল রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের মঙ্গল।

নবীনচন্দ্র সেন আবার 'স্বভাব কবিত্বে'র প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তাঁর লেখা, 'আমার জীবন' (১৯০৮-১৯১৩) গ্রন্থে কাব্য নিয়ে প্রচুর আলোচনা বর্তমান। তিনি বঙ্কিমের 'সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষের মুখ্য উদ্দেশ্য'—উক্তি মানতে পারেননি। আবার গীতি কবিতার ভাবব্যঞ্জনা বা বস্তুনিরপেক্ষ অনুভূতির প্রকাশকেও স্বীকার করেননি। তিনি 'স্পষ্ট কাব্যে'র ভক্ত। আসলে তিনি সব কিছু বুঝতে চান ও বোঝাতে চান কবিতা রচনার মাধ্যমে। নবীনচন্দ্রের পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে এসেই বাংলা সাহিত্যতত্ত্ব বিস্তৃত ভাবে প্রকাশ পায়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমত এবং প্রধানত সমালোচক। আর সেই সমালোচনার প্রয়োজনেই তিনি সাহিত্যতাত্ত্বিক। সমালোচনার জন্য যতোটুকু প্রয়োজন, মাত্র ততোটুকুই সাহিত্যতাত্ত্বিক বঙ্কিম। তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব কোনো বিশেষ দর্শন ভূমির উপর ভিত্তি করে দাঁড়ায় নি, তার উপর কোনো বিশেষ ধরনের দর্শন চিন্তার প্রভাবও খুব উল্লেখ্য নয়; বরং বিচ্ছিন্ন। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের দর্শন চিন্তার সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ, প্রায় অভিন্ন। তিনি মনে করেন, তত্ত্বনিরপেক্ষ সৌন্দর্যের প্রকাশ, সৌন্দর্য-সৃষ্টিই কবির কাজ। এব্যাপারে তাঁর মন্তব্য ঃ 'কবিরা যদি একটি তত্ত্ব বিশেষকে সমুখে খাড়া করিয়া তাহারই গায়ের মাপে ছাঁট-ছোঁট করিয়া কবিতার মেরজাই ও পায়জামা বানাইতে থাকেন, ও সেই পোষাকে সুসজ্জিত করিয়া তত্ত্বকে সমাজে ছাড়িয়া দেন, তবে সে তত্ত্বগুলিকে কেমন খোকাবাবুর মত দেখায় ও সে কাজটাও ঠিক কবির উপযুক্ত হয়না।'[৪] রবীন্দ্রনাথের এই বোধ ক্রমে পরিণতি লাভ করে। তাঁর মতে সাহিত্যের লক্ষ্য সুন্দর নয়, সাহিত্যের লক্ষ্য আনন্দ। কিন্তু আনন্দ ও সত্য যেহেতু অভিন্ন, সেই হেতু সাহিত্যের লক্ষ্য বলা যেতে পারে। তাঁর মতে সাহিত্যের আর্টে 'আনন্দ'ই প্রথম ও শেষ-কথা—'আনন্দটিই হচ্ছে সবশেষের কথা, এর পরে আর কোনো কথা নেই। সেই আনন্দের মধ্যেই যখন প্রকাশের তত্ত্ব তখন এই প্রশ্নের কোনো অর্থই নেই যে, আর্টের দ্বারা আমাদের কোনো হিতসাধন হয় কিনা'।[৫]

মোটামুটি, উনিশ শতকে প্রধান বাঙালী সাহিত্যকাররা সাহিত্য নিয়ে যা ভেবেছিলেন, সেখানে 'সাহিত্য' সম্পর্কে একটা নতুন যুগের আত্মাসচেতনা এবং সাহিত্য জিজ্ঞাসা স্বতন্ত্র স্থান গ্রহণ করেছিল। পরবর্তীকালে বিশ শতকে আবার সেই 'সাহিত্য চিন্তায়' নতুন মাত্রারেখ যুক্ত হয়। বিশেষ করে আধুনিক কবিতা আন্দোলনের পুরোধা কবিরা যে কাব্য ভাবনা প্রকাশ করে গেছেন সেখানে তাঁদের 'সাহিত্য' সম্পর্কে ধারণার পরিচয় মেলে। এদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন প্রথমেই জীবনানন্দ দাশ।

জীবনানন্দ দাশের মতে, কল্পনা ও কল্পনার ভিতরে অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সারবত্তা যখন নানা রকম চরাচরের সম্পর্কে এসে প্রকাশিত হয় তখনই কাব্যের জন্ম ঘটে। তাঁর মতে, কবিতা কেবল মাত্র সমাজ বা জাতি বা মানুষের সমস্যা ঘটিত—অভিব্যক্তি সৌন্দর্য নয়। 'কোনো প্রাক্‌নির্দিষ্ট চিন্তা মতবাদের জমাট দানা থাকে না কবির মনে কিম্বা থাকলেও সেগুলোকে সম্পূর্ণ নিরস্ত করে থাকে কল্পনার আলো ও আবেগ; কাজেই চিন্তা ও সিদ্ধান্ত, প্রশ্ন ও মতবাদ প্রকৃত কবিতার ভিতর সুন্দরীর কটাক্ষের পিছনে শিরা, উপশিরা ও রক্তের কণিকার মতো লুকিয়ে থাকে যেন। লুকিয়ে থাকে; কিন্তু নিবিষ্ট পাঠক তাদের সে সংস্থান অনুভব করে; বুঝতে পারে যে তারা সঙ্গতির ভিতর রয়েছে, অসংস্থিত পীড়া দিচ্ছে না; কবিতার ভিতর আনন্দ পাওয়া যায়; জীবনের সমস্যা ঘোলা জলের মূষিকাঞ্জলির ভিতর শালিকের মতো স্নান না করে বরং যেন করে আসন্ন নদীর ভিতর বিকেলের সাদা রৌদ্রের মতো;'[৬] অর্থাৎ জীবনানন্দের মতে কাব্যের সঙ্গে জীবনের যে সম্বন্ধ তা প্রচলিত বাস্তবতার সঙ্গে মেলেনা। তিনি মনে করেন যে, কবিতা রচনা করে কবির বিবেক সান্ত্বনা পায়, কল্পনা মনীষা শান্তি বোধ করে, পাঠকের কল্পনা বোধও তৃপ্তি পায় ঠিকই, কিন্তু সাধারণ বাস্তবের পুনর্গঠন কাব্য শরীরে থাকে না। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজভাষায় কাব্যের উদ্দেশ্য, উপাদান ইত্যাদির বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 'কাব্যের ভিতর লোকশিক্ষা ইত্যাদি অর্ধনারীশ্বরের মতো একাত্ম হয়ে থাকে না; ঘাস, ফুল বা মানবীর প্রকট সৌন্দর্যের ভিতর গোপন ভাবে বিধৃত রেখা উপরেখার মতো যে জিনিসগুলো মানবী বা ঘাসের সৌন্দর্যের আভার মতো রসগ্রাহীকে প্রথমে ও প্রধান ভাবে মুগ্ধ করেনা—কিন্তু পরে বিবেচিত হয়—অবসরে তার বিচারকে তৃপ্ত করে। যাঁরা একথা স্বীকার করেন না, যাঁরা বলতে চান যে কবিতার ভিতর প্রথম প্রধান দর্শনীয় জিনিস কিংবা সৌন্দর্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সৌন্দর্যের মতোই প্রধান জিনিস হচ্ছে লোক শিক্ষা বা দর্শন বা নানারকম সমস্যার উদ্‌ঘাটন তাঁদের আমি এই কথা বলতে চাই যে মানুষ—সে যে অনৈতিহাসিক শতাব্দীতেই প্রথম হোক না কেন—একটা বিশেষ রস সৃষ্টি করল যা দর্শন বা ধর্ম বা বিজ্ঞানের রস নয়,—যাকে বলা হল কাব্য (বা শিল্প) —যার কতগুলো ন্যায্য পদ্ধতি ও বিকাশ রয়েছে; যার আস্বাদে আমরা এমন একটা তৃপ্তি পাই, বিজ্ঞান বা দর্শন এমন কি ধর্মের আস্বাদেও পাই না—এবং ধর্ম বা দর্শনের ভিতরে যে তৃপ্তি পাই কাব্যের ভিতর অবিকল তা পাই না,'[৭] অর্থাৎ কবিতা মুখ্যত লোক শিক্ষা যেমন নয় তাঁর মতে, তেমনি লোক শিক্ষাকে রসে মণ্ডিত করে পরিবেষণও

নয়। কবিতা এক স্বতন্ত্র রসের আধার। ব্যক্তি ও সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক তার আছে—কিন্তু সে সম্পর্ক জীবনের সঙ্গতিও সুষমা সাধনাতেই এক মাত্র নিয়োজিত নয়। কাব্য রচনার জন্য কবি কে তাই যেতে হবে প্রকৃতির সান্ত্বনার ভিতরে যেমন, তেমন শহরে বন্দরে, জনতার স্রোতের ভিতরে। কল্পনামনীষার প্রতিক্রিয়া নিয়ে নিরালম্ব অসঙ্গতিকে সময় বিশেষে আঘাতও করতে হবে সৃষ্টি করবার জন্য। তিনি আরও লক্ষ্য করেছেন যে, কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা প্রয়োজন। পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান ব্যতিরেকে সৎ কবিতা রচনা অসম্ভব।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতে, আবেগের সঙ্গে ছন্দের সংমিশ্রণেই কাব্যের উৎপত্তি। তিনি মনে করেন, কাব্য মানব চৈতন্যের শুদ্ধতম অবস্থা। প্রেরণার পরিবর্তে অভিজ্ঞতা ও অধ্যবসায়ের পুরস্কারই কাব্য। 'অর্কেস্ট্রা' কাব্যের ভূমিকায় তিনি স্বীকার করেছেন: 'প্রেরণাতে অলৌকিকের আভাস আছে বলে, সাহিত্য সৃষ্টির উক্ত উপকরণ আমি সাধ্যপক্ষে মানতে চাইনি। তার বদলে আঁকড়ে ধরেছিলুম অভিজ্ঞতাকে।......যে অসামান্য বিন্যাসে সেই চির পরিচিত উপকরণ সমূহ আমাদের বিস্ময় জাগায়, তার উৎপত্তি শিল্পীর একাগ্র সংকল্পে,.....উক্ত সমীকরণ এক প্রতিভার কর্ম নয়, অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরন্তর প্রযত্নের পুরস্কার।'[৮] সুধীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন স্বপ্নপ্রয়াণে রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করা যাবে না। কারণ রবীন্দ্রনাথের যুগ থেকে তাঁর যুগ অনেক দূরে সরে এসেছে। ফলে, আগের রোম্যান্টিক কাব্যেব সোনালী বাতাবরণে কবিকে আর আটকে রাখা যথার্থ হবে না। সুধীন্দ্রনাথের কালের মূল মন্ত্র হ'ল, অবৈকল্য আর অকপটতা। বিশ্বের সেই আদিম উর্বরতা আজ নেই। এখন সারা ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে বীজ সংগ্রহ না করলে কাব্যের কল্পতরু জন্মাবে না। তিনি কাব্যের উদ্দেশ্য বোঝাতে, মানব জীবনের মৌল সত্যের অনুসন্ধানকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। সমাজ-নিরপেক্ষ অবাস্তব কাব্যকে তাই বলে অভিহিত করেন নি। তাঁর মন্তব্য : 'প্রত্যেক সৎকবির রচনাই তার দেশ ও কালের মুকুর।'[৯] কাব্য রচনাকালে সুধীন্দ্রনাথ একটা 'লোকোত্তর পটভূমিকা'র প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। '.......একটা লোকোত্তর পটভূমি না জুটলে, কবিতো কবি, খুব স্থূল অনুভূতির মানুষও বাঁচে না। ব্রহ্মাণ্ডের মূলে যদি কোনও মাঙ্গলিক নিয়ম নাও থাকে, তবু কবির পক্ষে একটা এমন কাল্পনিক নিয়মেব প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক যার সূত্রে আমাদের দিনানুদৈনিক খণ্ড অভিজ্ঞতাগুলো সার্থক ও সংগ্রথিত: এবং চৈতন্য, বিশুদ্ধ চৈতন্য, আর সঙ্কল্প, নিরহংকার সঙ্কল্প, এই দুটি দুর্লভ গুণের সাহায্য ব্যতিরেকে আমাদের পারিপার্শ্বিক নাস্তির মধ্যে কোনও রকমের শৃঙ্খলা আনা অসম্ভব।'[১০] তিনি আরেকটু বিশদ হয়ে, কাব্যের উপাদান সংগ্রহের সময় জানিয়েছেন—'কবির কর্তব্য তার প্রতিদিনের বিশৃঙ্খল অভিজ্ঞতায় একটা পরম উপলব্ধির মাল্যরচনা। কবির উদ্দেশ্য তার চারপাশের অবিচ্ছিন্ন জীবনের সঙ্গে প্রবহমান জীবনের সমীকরণ। কবির ব্রত তার স্বকীয় চৈতন্যের রসায়নে শুদ্ধ চৈতন্যের উদ্ভাবন। বৈরাগ্যের দ্বারা, ত্যাগের সাহায্যে, আভিজাতিক মর্যাদাবোধের নির্দেশে এ সাধনায় সিদ্ধি পাওয়া যায় না—কাব্যের মুক্তি পরিগ্রহণে; এবং কবি যদি মহাকালের

প্রসাদ চায়, তবে শুচিবায়ু তার অবশ্য বর্জনীয়, তবে ভুক্তাবশিষ্টের সন্ধানে ভিক্ষাপাত্র হাতে নগর পরিক্রমা ভিন্ন তার গত্যন্তর নেই। কারণ কাব্যের পথে উল্লম্ফন চলে না ঃ সেখানকার প্রত্যেকটি খাত পদব্রজে তরণীয়, প্রত্যেকটি ধূলিকণা শিরোধার্য, প্রত্যেক কণ্টক রক্ত পিপাসু; সেখানে পলায়নের উপায় নেই, বিরতির পরিণাম মৃত্যু, বিমুখ অনুগামীর চরণাহত।'[১১] সুধীন্দ্রনাথ প্রধানত চেয়েছিলেন গদ্য-পদ্যের মধ্যে ব্যবধান দূর করতে। উচ্ছ্বাসকে এড়িয়ে, শৈথিল্যকে প্রশ্রয় না দিয়ে যা কিছু অবান্তর বর্জন করে কবিতাকে গদ্যের মতো ঋজু এবং ঘন সংবদ্ধ করে তুলতে। কিন্তু কাব্যকে অতি পবিত্র বস্তু মনে করায় তার রহস্যময় চক্রে অদীক্ষিত জন সাধারণের প্রবেশ অনধিকার ভাবতেন।

বিশুদ্ধ কাব্য সৃষ্টি বুদ্ধদেব বসুর আদর্শ। তাঁর কাছে কবিতা অনন্য পরতন্ত্র একটি নির্মাণ কর্ম; এবং শুধু তাই পবিত্র যা ব্যক্তিগত। কবিতা যে স্বরাট্ কোনো বাহ্যিক প্রয়োজনের উপর নির্ভরশীল নয়, শুধু ব্যক্তিগত আত্ম-পরীক্ষার নির্যাস একথা বুদ্ধদেব বিশ্বাস করতেন। তিনি বলেছেন, 'কবিতা লেখার প্রক্রিয়াটা বড়ো অদ্ভুত ঃ মডেল সামনে রেখে লোকে ছবি আঁকে, আকাশ দেখে দেখে ফুটিয়ে তোলে তার রং, কিন্তু এ পদ্ধতি কবিতায় খাটে না; যতক্ষণ আপনি সত্যি-সত্যি কিছু দেখছেন, দেখাতেই এত ব্যস্ত থাকেন, কথা নিয়ে ভাবনার সময় পান না। শেষ বিশ্লেষণে দেখা যাবে, কবিতা লেখা হৃদয়বেগের ব্যাপার যতটা, বুদ্ধিবৃত্তিরও ঠিক ততখানি। কারণ, যতই আপনার মন আবেগ ভারাক্রান্ত হোক, লেখবার সময় আপনাকে নিবিষ্ট হতে হবে শব্দ যোজনায়— এবং সেটা বুদ্ধিবৃত্তির কাজ।'[১২] তাঁর মনে হয়েছে বহির্বিশ্বের বর্ণালী ছলনায় না ভুলে নিজের মধ্যে নিজের কাজের মধ্যে, শিল্প সৃষ্টির পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকাতেই মুক্তির স্বাদ। কবি কোনো নীতির প্রবক্তা বা সমাজ-সংস্কারক নন। তিনি দ্রষ্টা। বিশ্বজগতের গূঢ় সম্বন্ধ সমূহের আবিষ্কারক। কাব্য সৃষ্টির পিছনে ব্যর্থকাম, বিফল অহমিকা, পলায়নী মনোবৃত্তির প্রয়োজন নেই। শুধু প্রয়োজন স্বেচ্ছাবৃত আত্মদহন। তাঁর ভাষায়—

'.......সবচেয়ে কম
কবির আলস্যময় উচ্চারণে, যেন নিজেবে কোনদিন
শুধায় নি উদ্দেশ্য, কারণ সূত্র, উৎসর্গের নিহিত নিয়ম;
শুধু, কোনো অচিকিৎস্য ক্ষরণের ব্যাধির অধীন—
যতক্ষণ পৃথিবী চলায় মত্ত—সে গেছে মোমের মতো জ্ব'লে,
আপনারে আলো দিয়ে, নামহীন, প্রাচীন অনলে।'[১৩]

সমাজ বদল সম্পর্কে বুদ্ধদেব জানিয়েছেন—'কাব্য লিখে কিন্তু আমরা সমাজের পরিবর্তন ঘটাতে পারব না।;'[১৪] অর্থাৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত শিল্প সাধনায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না।

বিষ্ণু দের মতে, 'কাব্য সম্বোধন, সম্বোধনে শ্রোতার সম্বন্ধ গ্রাহ্য।'[১৫] তিনি মনে করেন, কাব্যের উদ্দেশ্য কোনো লোকোত্তর আস্তিক্যের অন্বেষণ নয়, পরিবর্তে জনসাধারণের

আত্মসচেতনতার উদ্বোধন। তিনি আরও উপলব্ধি করেছিলেন প্রগতিশীল কাব্যের লক্ষণ 'চৈতন্য জা-বদ্ধ টান'[১৬] লক্ষ্য ভেদ করতে গেলে বিষয়ের ধনুতে চৈতন্যের জ্যা রোপণ করতে হবে এবং তার জন্য প্রয়োজন জীবনের প্রত্যক্ষ, সর্বসংস্কৃতিগত পরোক্ষ এবং এই উভয়ের দ্বন্দ্ব নিয়ন্ত্রণের জন্য শিল্পীর নৈর্ব্যক্তিকতা তথা আত্ম সচেতনতা। আর সর্বসংস্কৃতিগত পরোক্ষের প্রয়োজনীয়তায় বিষ্ণু দে বুঝেছিলেন বাংলা কাব্যের মুক্তি ঐতিহ্যসচেতনতায়। তিনি সচেতন ভাবে শিক্ষিত জনের সাহিত্যের সঙ্গে দেশজ ঐতিহ্যের মেলবন্ধনের কথাও স্বীকার করেছেন : 'আজ আমরা শিক্ষিত শ্রেণীর বিড়ম্বিত কাব্য সাধনার চূড়ান্তে এসেছি। আমাদের সংস্কৃতির ক্ষুরধার চূড়ায় সামাজিক সমর্থনের আশ্রয় নেই অথচ সমাজ জীবনের মরিয়া তাগিদ আমাদের ব্যক্তিত্ববাদের দোরগোড়ায় হানা দিচ্ছে। আজকে তাই কবিকুলকে ভাবতে হচ্ছে বাংলার জন সমাজের চৈতন্যের সঙ্গে, দেশজ সংস্কৃতির সঙ্গে সেতুবন্ধনের কথা।'[১৭] বিষ্ণু দে কাব্য রচনার পদ্ধতিরও উল্লেখ করেছেন। আপন সমস্যাকে শুধুমাত্র নিজের মনের গহ্বর নিষ্ক্রান্ত স্বয়ম্ভূজীব না ভেবে, সেই সমস্যা যে ইতিহাস ব্যাপী সমস্যারও অংশ—এই উপলব্ধির নিয়ত চর্চা লেখকের প্রয়োজন বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। কাবণ এ চর্চায় বিষয়বস্তুর ও আধারের যেমন বিস্তার ঘটে, তেমনি জীবনের ধারা বহুমিশ্রিত সমগ্রতা লাভ করে। তাঁর মতে সাহিত্যের উপজীব্য শূন্যে ঝোলানো নিরালম্ব ব্যক্তিত্ব বিশেষ নয়। সাহিত্য বা কাব্যের কাজ প্রত্যক্ষ নিয়ে বাস্তব নিয়ে। এবং অবশ্যই মানুষকে নিয়ে, ব্যক্তিস্বরূপ বা পার্সন্যালিটি নিয়ে। এ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য : 'সাহিত্যের অবশ্য স্বায়ত্তশাসনের দিকে ঝোঁকটা দীর্ঘকালের তাই এই সব বহির্জাত কারণকে, আকস্মিক সামাজিক হেতুকে সাহিত্যিকরা বরাবরই দাবিয়ে রেখেছেন, মর্যাদা দিয়েছেন মানুষকে, ব্যক্তিকে। তাই আমাদের মনে থাকে না যে গোবিন্দলাল বা রোহিনীকে স্বাধীন মানুষ বলার চেয়ে লোভের পুতুল বলাই সংগত। এই অসংগতি এড়াবার জন্যেই সেকালের সাহিত্যে পৌরাণিক গল্পের মাহাত্ম্য থাকত, না হয় থাকত প্লটের মাহাত্ম্য। প্লটের সম্মোহনে আপাত স্বাধীন মানুষও জীবনমৃত্যুর কাছে নিজেকে দিত বিকিয়ে। কিন্তু সাহিত্যের নিজস্ব ঐতিহাসিক বিকাশে ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগল সাহিত্যের আত্মমর্যাদা। ফলে আধুনিক সাহিত্যে প্লট গৌণ, চরিত্র বা ব্যক্তি, ও তার সঙ্গে জড়িত আবহাওয়াই মুখ্য। কিন্তু সমাজ এখনও সেই পুরোনো আর্থিক প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে চলেছে, ফলে এই আধুনিক সাহিত্যের স্বাধীন ব্যক্তিরা এতই স্বাধীন যে তাদের বাহির রূপ প্রায় নেই বললেই চলে, আছে শুধু তাদের মনের অন্তরঙ্গ স্বাধীনতা।'[১৮] এই 'স্বাধীনতা' সমাজ ভঙ্গের দিনে বাধা পায়। অর্থাৎ সমাজের সঙ্গে তাল রেখে চলে কাব্য-সাহিত্য। তিনি এও মনে করেন, সমাজ চেতনা মানে রাজনীতির কচকচানি নয়। রাজনৈতিক মতবাদের কুম্ভীরক বৃত্তিতে আর যাইহোক কাব্যের মুক্তি ঘটতে পারে না।

উপরের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখবো যে, আমাদের আলোচ্য কবি, সমর সেন কবিতা লিখেছেন খুবই কম। কাব্যচিন্তা মূলক প্রবন্ধ প্রায় লেখেন নি

বললেই চলে। তাঁর কাব্যাদর্শ সম্বন্ধে একটি পূর্ণায়ত সাহিত্য ধারণা গড়ে তোলা প্রায় অসম্ভব। কাব্য কী তার উদ্দেশ্য কী ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর সামগ্রিক চিন্তার পরিচয় প্রায় নেই। তবু বিভিন্ন সময়ে লেখা তাঁর সংক্ষিপ্ত কয়েকটি প্রবন্ধ থেকে এ বিষয়ে একটা স্থূল ধারণা পাওয়া যেতে পারে। এটা প্রয়োজন, কেননা সমর বাবু মনে করতেন— কাব্যবিচারের পার্থক্য প্রকৃত কাব্যরচনাকে প্রভাবিত করে।[১৯]

সমর সেনের সাহিত্য চিন্তা মূলক প্রবন্ধগুলির মধ্যে উল্লেখ্য—'In Defence of the Decadents' (১৯৩৯-'পরিচয়', ৯/১, শ্রাবণ ১৩৪৬), 'বাংলা কবিতা' ('কবিতা', বৈশাখ ১৩৪৫), 'সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা' ('কৃত্তিবাস', জুলাই ১৯৫৩)। এছাড়া বিষ্ণু দের কাব্য 'পূর্বলেখ' সম্পর্কে আলোচনায় প্রসঙ্গত বাংলা কবিতার কথা উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে বিষ্ণু দের প্রসঙ্গে 'The Still Centre' প্রবন্ধে নিজের কবিজীবন সম্পর্কে ইতস্তত মন্তব্য করেছেন। তবুও তাঁর সাহিত্য চিন্তা অস্পষ্টই থেকে যায়। উল্লিখিত লেখা গুলিতে তিনি এই বলে মত প্রকাশ করেছেন যে,—

প্রথমত, কবিতা যে শুধু অন্তঃপ্রেরণা সঞ্জাত তা ঠিক নয়।

দ্বিতীয়ত, বিশুদ্ধ কবিতায় তাঁর আস্থা নেই।

তৃতীয়ত, তিনি মনে করেন, কবিতা বিশুদ্ধ কল্পনা নয়, পরিবর্তনশীল শ্রেণীগতির, স্থানকাল পাত্রের মুখাপেক্ষী।

চতুর্থত, তাঁর মতে, কবিতা সমাজের মুখ বদলানোর কাজে সাহায্য করতে পারে। এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য—মুখ বদলানো অর্থে সমাজ বদল কিনা তা স্পষ্ট হয়নি এখানে।

পঞ্চমত, কবিতা রচনায় ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি বাঞ্ছনীয়। এখানে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি বলতে তিনি কি বুঝিয়েছেন তা স্পষ্ট হয়নি। আমাদের অনুমান এ হয়তো Historical criticism নয় Historical materialism। কেননা তাঁর মন্তব্য : 'ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে কাব্যে মূলসূত্র খুঁজে পাওয়া অসম্ভব, এবং মূল সূত্রহীন কাব্য এক ধরনের মস্তিষ্কবিকৃতির নামান্তর।'[২০]

ষষ্ঠত, কবিতা যেমন শুধু অন্তঃপ্রেরণা নয়, তেমন আবার শুধু সামাজিক পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীলও নয়। কেননা তিনি বলেছেন : 'সামাজিক পরিস্থিতি এবং অন্তঃপ্রেরণার মধ্যকার আত্মীয়তা জটিল কিন্তু অনস্বীকার্য।'[২১] আবার কাব্যের অন্তঃপ্রেরণাকে সমর সেন একদা বিশ্বাস ও বিক্ষুব্ধ বিহর্জগতের উপর নির্ভরশীল বলে মনে করেছেন।[২] ফলে উপরোক্ত সিদ্ধান্তের তাৎপর্য বোধ হয় এরকম দাঁড়ায়—যে বিশ্বাস বিক্ষুব্ধ বহির্জগতের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে কবির মনে যে কাব্য সৃষ্টির ইচ্ছা জন্মায় সেই ইচ্ছা বশত তিনি বহির্জগৎকে বা তাঁর সামাজিক পরিস্থিতি—তাঁর নিজস্ব অবস্থানের কথা মনে রেখে কাব্য রচনা করেন। প্রসঙ্গত সমর সেনের আবির্ভাবকালটি আমাদের ভুললে চলবে না। তিরিশের দশকের প্রথম ভাগে দুনিয়া জোড়া আর্থনীতিক মন্দা প্রকট করে তুলেছিল পুঁজিবাদী দুনিয়ার সংকটকে, তা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য মরিয়া প্রয়াস

চালাচ্ছিল ধনতান্ত্রিক জগৎ। তখন স্বদেশে রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের নানা চেহারা দেখা যাচ্ছিল, স্বদেশ-প্রেমের রোম্যান্টিক আবেগে মধ্যশ্রেণীর যুবশক্তি শেষবারের মতো জ্বলে উঠছিল চরমপন্থী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, অন্যদিকে সেই মধ্যশ্রেণী নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব আশ্রয় থেকে আস্তে আস্তে বিচ্যুত হচ্ছিল—তাদের সযত্ন রচিত নীড় কাঁপতে শুরু করেছিল নানান এলোমেলো হাওয়ায়। এরই মাঝে বয়ে যাচ্ছিল শিল্প সাহিত্যের স্রোত। রাবীন্দ্রিক আবহের মাঝেই তিরিশের প্রবাদপ্রতিম কবিরা অন্যসুর বাজাতে শুরু করেছিলেন। তারপরেই সেই নবীনদের তারুণ্যের গর্বকে ধূলিসাৎ করে যে তরুণতররা এলেন—সমর সেন তাঁদের অন্যতম। কাব্য রচনায় তিনি তাই কাব্য ভাষার ব্যক্তিগত বা স্বতন্ত্র ব্যবহারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন—'এ সূত্রে কবিতার ভাষা ও ভাষার ব্যক্তিগত, স্বতন্ত্র ব্যবহারের কথা উল্লেখ করতে পারি। আমরা কোনো **বিশেষ সমাজে বিশেষ সময়ে** জন্মাই, এবং সামাজিক জীব হিসেবে প্রচলিত কোনো ভাষা ব্যবহার করি। কিন্তু কবিতা লেখার সময় সে ভাষার উপরে যে স্বতন্ত্র ছাপ পড়ে তার নাম ডিক্‌শন, এবং এই স্বতন্ত্র ব্যবহারের শক্তি কবির পুরুষকারের পরিচায়ক।'[২৩] এখানে সমর সেনের পরিবেশ বা সমাজগতি এবং সময় বোধ লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ সচেতন, যুক্তিবাদী, বুদ্ধিবাদী মন দিয়ে তিনি বুঝতে চেয়েছেন সময়কে, ইতিহাসকে, সমাজ পরিবেশকে, শ্রেণী-অবস্থানকে। আর সেই বোঝার আলোয় নিজের পথও তৈরি করে নিতে চেয়েছিলেন। সেই পথ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বিশ্বাস ঘোষিত হয়েছে কবিতায়, কারণ যা চেতনার উপলব্ধি, কবিতা তো সেই উপলব্ধিরই ফসল। তবে কবিতার ভাষা যে দৈনন্দিনের ভাষা নয় সে কথাও স্পষ্ট।

সমর সেন বলেন স্বতন্ত্র কাব্যভাষা নির্মাণ কবির পুরুষকারের পরিচায়ক এবং কবিতার এই পুরুষকার কাজ করে।

১. বহু শতাব্দীর শ্রমলব্ধ জটিল ব্যাকরণের সাহায্যে
২. বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতির পটভূমিকায়।

এই ব্যাপারটিকে বর্তমান কালের ভাষা ও স্টাইল তত্ত্ববিদেরাও লক্ষ্য করেছেন। এ দুটি ব্যাপারকে প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন স্যকুর। তিনি একে ভাষার সিনেক্রোনিক ও ডায়াক্রোনিক আলোচনার পদ্ধতিতে ব্যবহার করেছিলেন।

কবি সমর সেন এই ভাষা ব্যবহার প্রবণতার ঐতিহাসিকতার উপরে—নিজের সামাজিক অবস্থানের কথা মনে রেখে স্বতন্ত্র কাব্য ভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী। এই প্রসঙ্গে মনে আসে তাঁর 'In Defence of the Decadents' প্রবন্ধের কথা। সেখানে তিনি বলেছিলেন : 'With huge and vital sections of our popualation illiterate and dim in the background, we cannot really hope to effect a revolution with our writings, That would be putting the cart before the horse. We can at present only soliloquise, we cannot address the real audience.'[২৪]

সঙ্গে সঙ্গে তিনি এও লক্ষ্য করেছেন, জনসাধারণের উপযোগী এমন কোনো সরল, সহজ, বলিষ্ঠ ভাষার ছক নেই, যার মধ্যে যে কোনো কবি অক্লেশে ঢুকে যেতে পারেন। আবার কবির হাতে ভাষার নবীকরণ হওয়া মানে—তাঁর উদ্দিষ্ট পাঠকের ভাষাগত অভ্যাসে আঘাত লাগা। তবু বলতে হয়, সমর সেন এসব জেনেও থেমে থাকেন নি। তিনি পরিচিত বাক্‌ভঙ্গিগুলি ভেঙে তাতে নতুন মাত্রা দিতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। সমর সেনের এই উদ্যোগকে সরোজ দত্ত ভালো মনে মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর মতে শ্রীসেনেব কবিতা আঙ্গিকের দিক থেকে পাঠক সম্প্রদায়েব প্রতি 'সানুনাসিক অবহেলা'র পরিচায়ক। 'শ্রীযুক্ত সেনের কবিতা সাধাবণের বোধগম্য নহে—কেবলমাত্র 'Chosen few' -এর উপভোগ্য। আমি যথেচ্ছ দুইটি স্থান উদ্ধার কবিতেছি :

আকাশচরের শব্দ আকাশ ভবায়।
নীবিবন্ধে কূটগ্রন্থি,
শিবিরে আর নিবিড় মায়া নেই
তুষার পাহাড়ের শান্তি যদিচ শিশিবে ঝরে।

কিংবা

পেস্তাচেরা চোখ মেলে শেষহীন পড়া
অন্ধকূপে স্তব্ধ ইঁদুরের মতো,
ততদিন গর্ভের ঘুমন্ত তপোবনে
বনিকের মানদণ্ডের পিঙ্গল প্রহার।

এ কবিতা 'Intellectual clique'-এর জন্য লেখা, আমার আপনার জন্য নহে। পাঠক-সম্প্রদায়ের প্রতি এই সানুনাসিক অবহেলা, আপনার কাব্যকে সর্বসাধারণের উপভোগ হইতে বাঁচাইয়া দুর্বোধ্য করিবার এই গলদঘর্ম প্রয়াস, ইহা আর যাহাই হউক, বিপ্লবী মনোভাবের পরিচায়ক নহে। মসী কৌলীন্যের অভিমানে শ্রীযুত সেন আজ আর্টের প্রচাররূপে ও Communicativeness-কে পরোক্ষভাবে অস্বীকার করিতেছেন। রচনার আবেদনের পরিধি সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইয়া ক্রমে আত্মতৃপ্তিতে পরিণত হইতে বসিয়াছে। এই শম্বুক বৃত্তিকে কি বিপ্লব প্রচেষ্টা বলিব? ইহা বিপ্লবের নামে individual anarchy-র চরম অবস্থামাত্র'।[২৫]

অর্থাৎ 'Communicativeness'-এর প্রয়োজন অস্বীকার করে শুধু একটি' intellectual clique'-এর লেখা—এটাই ছিল সরোজ দত্তের একটি অভিযোগ। অন্যদিকে সমর বাবু মেনে নিয়েছিলেন এ অভিযোগ এবং বলেছিলেন গণ আন্দোলনেব সঙ্গে যোগ নেই বলেই কবিদেব ভাষার এই সীমাবদ্ধতা অবশ্যম্ভাবী। তাহলে দেখতে হয় সমববাবুর কাব্যভাষা সম্বন্ধে নিজেরই এক দ্বিধা বর্তমান। কেননা একটি বিশেষ সমাজভাষা পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে কবি যে স্বতন্ত্রভাষা বচনা করবেন, তা একটি গণবিপ্লবের স্পর্শে কিভাবে Communicative হয়ে উঠবে সে বিষয়ে কোন ধারণা পাওয়া যায় না। তবে সকলেই স্বীকার করবেন, কাব্যভাষা চিরকালই সাধারণ ভাষা থেকে স্বতন্ত্র।

প্রতিদিনকার ভাষা থেকে পৃথক হয়ে ব্যক্তির কবিচিত্তের প্রকাশেই তার তাৎপর্য। এবং সেখানে বিশেষ শ্রেণী বা জন গোষ্ঠী কবির উদ্দিষ্ট হলেও তিনি নিছক কবিতা লেখার জন্য গণআন্দোলনে যোগ দেন না, তিনি একজন সচেতন মানুষ হিসাবে দায়বদ্ধতা থেকেই তা করেন। গণআন্দোলনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কবির যে লড়াই, আর কবিতা লেখার ক্ষেত্রে তাঁর যে ভাষাগত লড়াই, শৈলীগত লড়াই, তাদের পরস্পরের মধ্যে সংযোগ থাকলেও প্রত্যেক লড়াইয়েরই স্ব-স্ব পদ্ধতি, হাতিয়ার আছে। সমর সেন তাঁর কাব্য রচনা কালে সে কথাই জানাতে চেয়েছেন। অন্যদিকে তিনি মধ্যবিত্ত পাঠকের কাব্যবোধের গণ্ডিকে নাড়িয়ে দেবার প্রয়াস করেছিলেন বলেই তাঁকে পরিচিত বাক্‌ভঙ্গিগুলি ভেঙে তাতে নতুন মাত্রা দিতে হয়েছিল বলে আমাদের বিশ্বাস। প্রসঙ্গত অধ্যাপিকা মালিনী ভট্টাচার্যের মন্তব্য লক্ষণীয় : 'ত্রিশের দশকের শেষে সমর সেন যখন কবিতা লিখেছিলেন, তখন তিনি প্রগতি লেখক সংঘ নামক গণসংগঠনটির কাছাকাছি সরে এসেছিলেন। এসেছিলেন বলেই যে নতুন ধরণের কাব্যভাষা তৈরী করতে পেরেছিলেন তা নয়; তাঁর গণ আন্দোলনের কাছাকাছি আসা এবং তাঁর কাব্য ভাষার বিবর্তন এই দুইয়ের মধ্যে তবু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এটুকু নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। এই বিবর্তিত কাব্য ভাষা কঠিন হতে পারে, কিন্তু স্বগতোক্তি তাকে বলা যায় না। পাঠককে তা চিন্তার সংগ্রামে নামতে উদ্বুদ্ধ করে।'[২৬] এই পরিস্থিতিতে সরোজ দত্তের অভিযোগ যথার্থ ভাবতে পারা যায় না। যদিও আবার উত্তর কালে সমর সেন কাব্য ভাষা নিয়ে যে মত পোষণ করেছেন, তাতেও তাঁর পূর্ববর্তী বক্তব্য খণ্ডন হয় না। কিন্তু পরিবর্তিত হয়। রবি সিং এর কবিতা প্রসঙ্গে দেবব্রত পাণ্ডাকে একদা জানিয়েছিলেন—'এঁর কবিতায় কোন ভণিতা নেই, যে-কোনো বিষয়ে উনি বলছেন খুবই সোজাসুজি। কিছু মনে করবেন না, আমাদের কবিতায় শব্দ আর শৈলী নিয়ে যা সব কারবার চলে তা.......রীতিমতো অশ্লীল।'[২৭] অর্থাৎ কবিতায় সোজাসুজি বক্তব্য পছন্দ করছেন সমর সেন। সেই সঙ্গে শৈলী নিয়ে শব্দ নিয়ে কারদানি অপছন্দ করছেন কবিতায়।

সমর সেন মনে করতেন আমাদের দেশের বিশিষ্ট আধুনিক কবিরা নিঃসঙ্গ। কিন্তু একথাও বলতেন নিঃসঙ্গতায় লাভের চেয়ে লোকসান বেশী। প্রসঙ্গত মনে পড়ে সারা পৃথিবীর আধুনিকতা আন্দোলনই বড়ো বেশী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী এবং সমাজ বিচ্ছিন্নতার দিকে তার ঝোঁক। ফলে বহু কবিকেই শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করতে হয়েছে। তিনি আমেরিকার কবি হার্টক্রেন সম্পর্কে লিখেছেন—'হার্টক্রেন একটি জাহাজ থেকে সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন। রোম্যান্টিক আত্মহত্যা বোধ হয় আমেরিকায় তাঁর প্রসিদ্ধির অন্যতম কারণ।'[২৮]

একে রোম্যান্টিক আত্মহত্যা বলেছেন সমর বাবু। কিন্তু আধুনিক কবিতার ঐতিহ্যে দেখতে পাওয়া যায়, এই নিঃসঙ্গতা শেষ পর্যন্ত এক আতঙ্কজনক নেতিবাদে ও শূন্যবাদে মানুষকে পৌঁছে দেয়। তার ফলে এই সর্বশূন্যতার মুখে পৌঁছে—আর্নস্ট টেলার, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ, স্তেফান জ্বেয়াইগ, মায়াকভস্কি প্রমুখ বহু কবিকে আত্মহননের পথ বেছে নিতে হয়েছে। জীবনানন্দের কবিতার নায়কও আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় যখন, তখন কি

তার মধ্যে কবির নিজের জীবন সম্বন্ধে এক শূন্যতার পরিচয় ধরা পড়ে না? কবি সমর সেন নিজে ছিলেন মধ্যবিত্ত জীবনের নিঃসঙ্গতা বোধের কবি। তাঁর কাব্যে নিঃসঙ্গতা সর্বত্র ছড়ানো। তা থেকে তিনি উত্তরণ লাভ করেছেন তাঁর মার্কসবাদ বিশ্বাসে। এই তাত্ত্বিক আশ্রয় তাঁর মানব ধর্মকে নেতিবাচক থেকে একটি অস্তিবাদে পৌঁছে দিয়েছে। এই অস্তিবাদের কথা মনে রেখে তিনি ক্ষয়শীলতার সমর্থনে বলেছেন—'যতদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষে কোনো আমূল সমাজ বিপ্লব না ঘটে, কুটিল কালচক্রে ভাঙন না ধরে, ততদিন এই নিঃসঙ্গতা, হতাশা আর অবিশ্বাস, বর্তমান সভ্যতার যেগুলি বিশেষত্ব, তাঁদের ঘিরে থাকবে, ততদিন তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনা প্রাণবান মূলসূত্রের অভাবে পীড়িত হবে।'[২৯] এখানে কবি সমাজ বাস্তবকে স্বীকৃতি দেবার পক্ষপাতী। তিনি এও বলেছিলেন যে সমকালীন বাঙালী কবি দুই আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়ে। যদি তিনি তাঁর নিজ শ্রেণীর পাপ প্রত্যয়ের বিষয়ে লেখেন, সচেতন হয়ে নিজের পতন সম্পর্কে, তাহলে তাঁকে অশ্লীলতা ও দুর্বোধ্যতার অপবাদে অভিযুক্ত হতে হবে। আবার যদি তিনি বলেন শিল্পের চিরকালীন আদর্শ সত্য ও সুন্দরের কথা, তখন প্রগতি শিবির থেকে বলা হবে তিনি পরাভববাদী এবং দুর্বোধ। তিনি অবক্ষয়গ্রস্ত ও ঘোরতর পাতিবুর্জোয়া। এহেন অবস্থায় সমর বাবুর মতে কবিতায় sentimentalism পরিত্যাগ করা দরকার এবং সেই সঙ্গে সমাজগতি সম্বন্ধে জ্ঞাত হতে হবে। এর পরেই লক্ষ্য করতে হয় সমর সেনেব নিজের অবস্থান। সেই সঙ্গে কবি হিসেবে নিজের সীমাবদ্ধতার কথা বলে তাঁর আপন বিশিষ্ট প্রত্যয়টি জ্ঞাপন করেছেন যেখানে।

'............We have our roots deep in the demoralised petty bourgeoisie and lack the vitality of rising class. It is best to admit this and write about the class you know well than to exult infuture glories of class-less society. Consciousness of decay is also power.'[৩০]

আন্তরিকতার সঙ্গে ও সরলতার সঙ্গে নিজের সীমাবদ্ধতার কথা লিখলেও প্রগতিশিবিরের সরোজ দত্ত, সমর সেনের কবিতায় কোন সংগ্রামী চেতনা, সংকল্পের কথা, আশার কথা নেই বলে 'Text book Marxism', 'সুকৌশলী', 'ফাঁকি', 'বৈষয়িক ধূর্ততা' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগে এবং 'ইন্টেলেকচুয়ালী কুসংস্কার হইতে সাম্যবাদের সাবধান হইবার দিন আসিয়াছে' বাক্য প্রয়োগে লেখক ও লেখা সম্পর্কে সরব হয়েছিলেন।[৩১]

এখানে আমাদের ভুললে চলবেনা না যে, সরোজ কুমার প্রথমে রাজনৈতিক দ্রষ্টা, পরে কবি বা সাহিত্য সমালোচক। তাই তিনি সাহিত্যের সঙ্গে জনজীবনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাকে এভাবে বিজড়িত করে দেখতে চান : 'Literature must become a component of organisedm planned and integrated social democratic party work'.[৩২]

মোটকথা তিনি সমর সেনকে বিপ্লবী কবি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সমর সেনের সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধে ও রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের কথাবার্তা পেয়েছিলেন। কিন্তু সমর বাবু আগে কবি, পরে রাজনৈতিক দ্রষ্টা ছিলেন, তাই রাজনীতিকে সাহিত্যের

সঙ্গে এভাবে সম্পর্কিত করে তুলতে চান নি। তিনি সাহিত্যের জগতের নিয়মের সঙ্গে, রাজনৈতিক জগতের বা প্রাত্যহিক সংসারের নিয়মের পার্থক্যের কথায় সচেতন ছিলেন। তিনি বার বার স্মরণ করিয়েছেন—'আমাকে কেউ বিপ্লবী বললে মনে হতো—এবং এখনো হয়—যে বিপ্লবকে হেয় করা হচ্ছে।'[৩৩] এছাড়া তাঁর অন্তর্জগতে অত্যন্ত আন্তরিক ভাবে লালিত ছিল প্রকৃত অর্থে সাম্যবাদী-ভারতবর্ষের ছবি। এই সঙ্গে সমর বাবু ব্রিটিশ 'Decadence'-এর সর্বশ্রেষ্ঠ পদকর্তা, টি.এস. এলিয়টের প্রভাবের কথা স্মরণ করিয়েছেন আমাদের। আধুনিক প্রগতিক ইংরেজ কবিদের উপর এলিয়টের প্রভাব অসামান্য, যদিও তিনি বিপ্লবী কবি ছিলেন না। কিন্তু শক্তি থাকলে ধনতন্ত্রের অনেক গলিত অংশ নিঙড়ে বিপ্লবের ফোঁটা সংগ্রহ করা যে সম্ভব সেটা এলিয়ট প্রমাণ করেছেন। কারণ এলিয়টের 'Decadence' নিঙড়ে অনেক ফোঁটাই আধুনিক ইংরেজ কবিরা কাজে লাগিয়েছেন। এক্ষেত্রে সাম্যবাদী কবি অডেন বা সাম্যবাদী সাহিত্য সমালোচক কডওয়েল প্রমুখের এলিয়ট স্বীকৃতিও উল্লেখ্য। তাই, এলিয়টী সাহিত্যের ঐতিহাসিক মূল্য ও প্রভাব স্বীকার করতে সমর বাবুও কার্পণ্য করেন নি। তাঁর মতে, 'To be able to preserve one's personal integrity as a poet will help the progressive cause in the long run. People consider Hopkins and Eliot to be among the real pioneers of modern English poetry. And it will not be superfluous to remind that Eliot is often condemned for his obscurity, and is the one poet who is convinced to his bones of the decay of all civilisation.'[৩৪]

অবশ্যই এলিয়ট যা দেখেছিলেন, সেটা তাঁর স্বদেশে ও সমাজের সত্য, আর খণ্ডিত সত্য। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজনে শিল্পায়ন ঘটলেও, জলাজঙ্গল সাফ করে নগর বসলেও ভারতবর্ষ তো পৌঁছতে পারে না স্বাধীন বুর্জোয়া বিকাশের সেই স্তরে, ব্যক্তির বিকাশ যেখানে পরিণত বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদে। আর সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণার নানা টানই তো থেকে যায়, যৌথ পরিবার, সামাজিক আত্মীয়তা ইত্যাদির সূত্রে। এমনকি গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে শহুরে মধ্যশ্রেণীর যোগাযোগের সূত্রেও। তাহলে কোথা থেকে আসে বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা। আর এলিয়টের ফাঁপা মানুষের বেদনা। বস্তুত—এলিয়টের প্রভাব ছিল—কিন্তু সমর বাবুরা এলিয়টের হুবহু অনুসরণ করেছেন এমন ভাবার কোনো সুযোগ নেই। সমর বাবুদের সমস্যা বাংলাদেশের সামাজিক জীবনের সমস্যা ততটা নয়, তা অনেকটাই শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর সমস্যা। আর উপনিবেশের খণ্ডিত ধারণার চাপেই তাঁদের সমস্যা আরো তীব্র হয়ে ওঠে। সামন্ত-অতীতে তাঁদের মানসিক আশ্রয় নেই, আবার বুর্জোয়া-বর্তমানও তাঁদের কাছে সম্পূর্ণ সত্য নয়—ফলে তারা আরো বেশি বিচ্ছিন্নতা অনুভব করছিলেন। এই মানসিক অনিকেত অবস্থা সমর সেনের কাব্যাদর্শে বর্তমান।

উল্লেখপঞ্জী

১ সমর সেন—'জাতীয় সংকট : ৪'; 'খোলা চিঠি'। অনুষ্টুপ সং। অনুষ্টুপ প্রকাশনী। ১৯৮৯। পৃ ১৫

২ মাইকেল মধুসূদন দত্ত—'কবি' 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' : 'মধুসূদন রচনাবলী'; সাহিত্য সংসদ। ১৯৬৫। ১ম খণ্ড। পৃ ১৬২

৩ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—'উত্তর চরিত', 'বিবিধ প্রবন্ধ'। 'বংকিম রচনাবলী'। সাহিত্য সংসদ। ১৩৯০। পৃ ১৮৩

৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'রবীন্দ্র রচনাবলী', 'অচলিত সংগ্রহ', ২। বিশ্বভারতী। ১৯৬২। পৃ ৩১

৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে' : 'রচনাবলী' জন্মশত বর্ষ সং। প ব সরকার। ১৯৬১। ১৪ শ খণ্ড। পৃ ৩১১

৬. জীবনানন্দ দাস—'কবিতার কথা'। ৪র্থ সং। সিগনেট প্রেস। ১৩৮৭। পৃ. ৮-৯

৭. তদেব। পৃ. ৯-১০

৮. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—'অর্কেস্ট্রা', ভূমিকা। 'কাব্যসংগ্রহ'। দে'জ পাবলিশিং। ১৯৭৬। পৃ ৩-৪

৯. তদেব। 'সূর্যাবর্ত' : 'কুলায় ও কালপুরুষ'। সিগনেট প্রেস। ১৩৬৪। পৃ. ৬৬

১০ তদেব। 'কাব্যের মুক্তি' : 'স্বগত'। সিগনেট প্রেস। ১৩৬৪। পৃ ২৬-২৭

১১. তদেব। পৃ. ২৩

১২ বুদ্ধদেব বসু—'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'। পরিমার্জিত তৃতীয় মুদ্রণ। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা.লি। জুন ১৯৫৮। পৃ. ৩৫

১৩ তদেব। 'কেন?' 'যে-আঁধার আলোর অধিক'। 'রচনাবলী'। গ্রন্থালয়। ১৯৮৪। ৯ম খণ্ড। পৃ. ১১২

১৪. তদেব। 'সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য : আধুনিক লেখকদের অবস্থা'। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে কলকাতার আশুতোষ হলে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে বুদ্ধদেব বসু 'Bengali Literature Today : Positions of modern writers' নামক প্রবন্ধের ভাবানুবাদ আলোচ্য প্রবন্ধটি ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত 'মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক' ৩য় খণ্ডে সংকলিত।

১৫. বিষ্ণু দে—'বাংলা সাহিত্যে প্রগতি', 'জনসাধারণের রুচি'। বিশ্ববানী প্রকাশনী। ডিসেম্বর ১৯৭৫। পৃ ২২-২৩

১৬. তদেব। পৃ ২১

১৭. তদেব। 'ঈশ্বর গুপ্ত'। পৃ. ৫৩

১৮. তদেব। 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ'। পৃ ৬৩

১৯ সমর সেন—'বাংলা কবিতা'। 'কবিতা' পত্রিকা। বৈশাখ ১৩৪৫। পুনর্মুদ্রিত কলমের ফ্রন্ট' পত্রিকা। ৮ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ১৯৮৮। পৃ. ১৬

২০. তদেব।

২১. তদেব।

২২. তদেব। পৃ. ১৫

২৩. তদেব।

২৪. Samar Sen—'In Defence of the Decadents' New Indian Literature 1939. Reprinted. 'Anustup' vol-xxii. No 2 + 3. 1988 P 17

২৫ সরোজকুমার দত্ত—'অতি আধুনিক বাংলা কবিতা'। 'অগ্রণী', ২য় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৪০। 'অনুষ্টুপ'। ২২ শ বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা। ১৯৮৮-এ পুনর্মুদ্রিত। পৃ ৩৩-৩৪

২৬ মালিনী ভট্টাচার্য—'অবক্ষয়ের কবিতা না কবিতার অবক্ষয় সমর সেনের কবিতা ও একটি বিতর্ক'। 'অনুষ্টুপ'। ২২ বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা ১৯৮৮। পৃ ৬৮

২৭ দেবব্রত পাণ্ডা—'সমর সেন প্রসঙ্গে'। 'অনুষ্টুপ'। ২২বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা। ১৯৮৮। পৃ. ১২৩

২৮ সমর সেন—'দি কালেক্টেড পোয়েমস্ অব হার্টক্রেন' (সমালোচনা)। পুনর্মুদ্রিত, 'কলমের ফ্রন্ট'। ৮ম বর্ষ, ৯ সংখ্যা। ১৯৮৮। পৃ ১২

২৯. সমর সেন—'বাংলা কবিতা'। 'কবিতা', বৈশাখ ১৩৪৫। পুনর্মুদ্রিত। 'কলমের ফ্রন্ট'। ৮ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা। পৃ ১৮

৩০ Samar Sen—In Defence of the Decadents' 'Anustup' P 18

৩১. সরোজকুমার দত্ত—'অতি আধুনিক বাংলা কবিতা'। পুনর্মুদ্রিত, 'অনুষ্টুপ'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সমর সেন সরোজ কুমারের উপরোক্ত আলোচনার পাল্টা জবাব দিয়েছিলেন ওই একই শিরোনামে, একই পত্রিকায় পরের সংখ্যায় (অগ্রণী, ২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মে ১৯৪০)। অবশ্য খুব জোরালো ভাবে সরোজ দত্তের বিরোধিতা করতে পারেননি। সেই সংখ্যায় পুনশ্চ সরোজ কুমারেরও জবাব মুদ্রিত হয়েছিল। কিন্তু নতুন কোন বক্তব্য কেউই উপস্থাপিত করতে পারেননি। দীর্ঘদিন পরে সরোজ কুমারের মর্মান্তিক মৃত্যুতে ব্যথিত, সমর সেন আর এক প্রবন্ধে (উড়ো খৈ ৬) বিগত দিন গুলিকে স্মরণ করেছিলেন। সেখানে তিনি ধরতে পেরেছিলেন সরোজ কুমারের ভাবনার দিকটা। যদিও সে প্রবন্ধে নিজের পূর্বোক্ত প্রবন্ধটিকে 'বালখিল্য' বলে অভিহিত করেছেন সমর বাবু, কিন্তু তথাপি পূর্বোক্ত মতের কোন পরিবর্তন ঘটাননি।

৩২ Lenin. V I– 'Party Organisation And Party Literature' : 'Collected Works' Foreign Language Publishing House 1962 Vol. 10. P. 45

৩৩ সমর সেন—'বাবু বৃত্তান্ত'। দে'জ ২য় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সং। দে'জ পাবলিশিং। ১৯৮৮। পৃ ৫২

৩৪ Samar Sen– 'In Defence of the Decadents'. 'Anustup'. P 17

পঞ্চম অধ্যায়

কাব্যালোচনা

"পৃথিবীর কবিতার শেষ নেই :"

(For Thine is the Kingdom : গ্রহণ)

পৃথিবীর কবিতার শেষ নেই ঠিকই। আর সেই ধারণাতেই কবি সমর সেনের আবির্ভাব। যদিও কবির কবি-জীবন দীর্ঘ ছিলনা। মাত্র বারো বছর (১৯৩৪-'৪৬)—অপেক্ষাকৃত এই ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে তাঁর প্রায় সব কাব্যরচনা সীমাবদ্ধ। এর দর্পণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, ১৯৪৫-র জাগরণ আন্দোলনে উত্তাল কলকাতা, বোম্বাইয়ের নৌ-বিদ্রোহ, আজাদহিন্দ ফৌজের অন্তর্গত বন্দীদের মুক্তি নিয়ে ঝড়, রশিদ্ আলি দিবস, ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি প্রতিফলিত হয়েছে—বিষাদব্যঙ্গ বা আশা ও উদ্দীপনার সুরে। বিষয়বোধের সুবিধার্থে কয়েকটি উপবিভাগ মাধ্যমে তাঁর কাব্যগুলির আলোচনা করতে পারি।

ক. মধ্যবিত্ত জীবন

সমর সেনের জীবন কথা থেকে জানা যায়—তিনি যে সমাজে বসবাস করেন, সেই সমাজব্যবস্থায় অতীতকালের বহুতর মিলিত গলিত এক বিচিত্র মিশ্রণ বর্তমান। সেখানে মানুষের সমস্ত জিজ্ঞাসা নিয়ত প্রস্তাবই পেশ করে চলেছে, অথচ তার কোনো সদুত্তর মেলে না। এখানেব মানুষেরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন, কিন্তু জীবন যাপনের অন্তর্গূঢ় ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ। যারা স্বার্থবুদ্ধির ঐক্যসূত্রে জীবনের বা বস্তুর সমগ্ররূপ দেখতে পারে না। বিচারবুদ্ধি তাদের সর্বদা দোদুল্যমান। রক্তের জোয়ার তাদের হৃদয় কাঁপায়; কিন্তু স্বার্থবুদ্ধির প্রবল চাপের কাছে আত্ম সমর্পণেব দারুণ সাহস ছাড়া তাদের করার কিছু নেই। ভীরু মানুষ। এই ভীরু মানুষই মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি।

বৃটিশ শাসন প্রবর্তিত হবার পর প্রকৃতপক্ষে, এই মধ্যবিত্ত সমাজ সৃষ্টি হয়। এবং সমগ্র ঊনিশ শতকে মধ্যবিত্ত সমাজ অর্থনৈতিক দিক থেকে যথেষ্ট সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী ছিলেন। এই মধ্যবিত্ত সমাজই তখন থেকে দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ও স্রষ্টা। শুধু তাই নয়, ঊনিশ শতকের এবং তৎপরবর্তী বাংলা সাহিত্যের মুখ্য বিষয় বস্তু ও রচনার উপকরণ যুগিয়েছে এই মধ্যবিত্ত সমাজ। যদিও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী কাল থেকে মধ্যবিত্ত সমাজের অর্থনৈতিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হ্রাস পেতে থাকে।

এই সমাজের কথা আধুনিক বাঙালী কবি সাহিত্যিকদের অজানা ছিল না। তবু তাঁরা তাদেরকে কাব্যসাহিত্যে বিশদ করে তুলতে চাননি। তাঁরা মনে করতেন: 'বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে পীড়িত ও বিব্রত এটা ...... নতুন আবিষ্কার নয়, সকলেরই মর্মে মর্মে এ গ্লানিকর তথ্য জানা আছে। এবং এর তত্ত্বের দিকটাও খুব বেশী অননুভূত বা

অজ্ঞাত নয়, মূলত অর্থনৈতিক, কিন্তু এটা দাস দেশ বলে রাজনৈতিক দিকটারও উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক। কিন্তু এ সমস্তই জানা কথা। পুনরাবৃত্তি করা যে কেবল অনর্থক তাই নয়, বিরক্তিকরও।'[১] খণ্ড খণ্ড চিত্রে তাঁরা তাই মধ্যবিত্ত সমাজের কথা সাহিত্যে উপস্থাপিত করেছেন।

সমর সেনের কাছে এই বক্তব্য যথার্থ নয়। তিনি এই সমাজেরই উত্তরাধিকারী সেজে নিজ গোষ্ঠীর ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা, একপেশে দৃষ্টিভঙ্গী—সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলিকেই অতিবাল্য থেকে লক্ষ্য করেছেন। তিনি বুদ্ধি দিয়ে নিপুণভাবে উপলব্ধি করেছেন—রূঢ় বাস্তবতা দিয়ে আদর্শ, কর্তব্য ঠিক করেও পালনের সময় নিজের প্রকৃতি যদি বাধ্য না হয়, বা বিরুদ্ধ হয়ে পড়ে, তাহলে সমস্ত জীবনটাই ওলোট পালট হয়ে যায়। সমরবাবুর কাব্য জীবনে মধ্যবিত্তশ্রেণীর ইমেজ এসেছে—তাঁরই দেখা বাল্য—কৈশোরের—যৌবনের লালিত ধ্যান ধারণা থেকে। যার কথা বলতে গিয়ে একদা টি. এস. এলিয়ট-এর ভাষায় বলতে হয়—'It comes from the whole of his sensitive life since early childhood.'[২]

সমর সেনের আত্মচেতনা শ্রেণীবদ্ধতার দায়ে কলুষিত—একথা বারবার আমাদের জানিয়েছেন। কবিতায় বা গদ্য রচনায় তিনি বারংবার বলেছেন—'আমি সাধারণ মধ্যবিত্ত, চালচুলো বজায়ের চেষ্টা তাই আছে।' 'আমার গণ্ডী সীমাবদ্ধ ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে, সে গণ্ডী কখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি।' কিংবা 'ব্যক্তিগত জীবনে নানা বিভ্রান্তি আসে; তবু সময় কেটে যেতে থাকে মধ্যবিত্ত পথে' ইত্যাদি। এই সূত্রেই তিনি বাঙালী শ্রেণী চেতনায় মধ্যবিত্ত চরিত্রের মুখোশ খুলে তুলে ধরেছেন কাব্য চিন্তায়। সমাজ চেতনার এই বিশ্লেষণ গদ্যে যতটা সহজ, কবিতায় ততটা সহজ নয়। কবিতায় সে কাজ করতে গেলে গদ্যের প্রকোপ ঘটার সম্ভাবনা থেকেই যায়। সমরবাবু সেই দুরূহ কাজেই ব্রতী হয়েছিলেন কবিতা রচনার মাধ্যমে। তাঁর কবিতা তাই এক কঠিন প্রয়াসের রূপায়ণ। এখানেই তাঁর সার্থকতা ও ব্যর্থতা। তবে তাঁর কবিতায় যতটা সার্থকতা—তা বিশ্লেষণের গণ্ডীতে আটকে না রেখে উপলব্ধির প্রকাশেই অর্জিত। তাঁর এই প্রকাশ ভঙ্গিমা দেখে যশোধরা বাগচী মন্তব্য করেছেন ঃ 'যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষ সমাজ এবং ইতিহাস চেতনাকে নিজেদের জীবনের কষ্টি পাথরে যাচাই করবার সাহস এবং সততা আগাগোড়া বজায় রাখতে পেরেছিলেন সমর সেন তাঁদের অন্যতম।'[৩]

সমরবাবু কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরিপালিত হয়েছিলেন সেই সমাজেই। বিশেষ করে কলকাতার বাগবাজারের রকের আড্ডার সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটে অতি কৈশোর থেকেই। বাগবাজারে দেখা অনেক স্মৃতির ছবিকেই তিনি একের পর এক কবিতায় চিত্রিত করেছেন miniature painting এর মতন করে। রাস্তার কলে বারবধূদের জল নেওয়া নিয়ে ক্লান্ত কোলাহলের শব্দে ঘুম ভেঙে যাওয়া, মন্দিরে পুরোহিতের পুজোর ও পুজোর অবস্থার চরম দুর্দশা ইত্যাদি বর্ণনায় তৎকালীন কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজের গ্রাম্যতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। চিত্রিত করেছেন মধ্যবিত্ত

সমাজের ধর্মানুষ্ঠানুকেও। সেখানে সন্ন্যাসী, পুরোহিত, বৃদ্ধ অভিভাবকরা অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে ধর্মানুষ্ঠান রক্ষা করেন। সেখানে অদৃষ্ট, ঈশ্বর, হরির চরণ প্রভৃতি রক্ষা কবচের ধাত তৈরী হয় কিশোর বয়সে থেকেই। খুব স্বাভাবিক ভাবে এদের শাসনের দাপটে ধাবমান কালের চলোৎশক্তি পর্যন্ত মন্দির-মসজিদ্-গির্জায় মাথা কুটে মরবে যে তাতে সন্দেহ থাকে না। এদের অনুশাসন লঙ্ঘনের মজ্জাগত শক্তি অতি অল্প বয়সেই লোপ পায়। অন্যদিকে, সম্পূর্ণ বিপরীত শিক্ষার প্রভাবে মধ্যবিত্ত সমাজের কিছু মানুষ যখন হঠাৎ বুঝতে পারে—সমস্ত প্রাতঃস্মরণীয় বচন নেহাৎই আজগুবি কথা, সেদিন থেকেই তাদের বুদ্ধি নামহীন অশান্তিতে বিচলিত হয়। বিদ্রূপ ও বক্রোক্তিতে শাণিত হয় তাদের ঈশ্বর বিশ্বাস।

> 'কাঁচা ডিম খেয়ে প্রতিদিন দুপুরে ঘুম,
> স্ফীতোদর দাম্ভিক স্বামীর পিছনে গর্ভবতী সতী সাবিত্রী,
> আর বন্যার মতো পুত্রকন্যা, অরণ্যে রোদন;
> হে ঈশ্বর, এ কী অপরূপ!'[৪]

— এহেন 'ঈশ্বর'এ বিশ্বাস উৎপাদনে সাহায্যকারী, ধর্মব্যবস্থার তথাকথিত রক্ষীবৃন্দের বর্ণনাতেও কবি সূচী তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে দুর্মর :

> 'কালের স্থবির যাত্রায় স্থির অশান্তি আনে।
> আজ দুঃস্বপ্নে দেখি,
> বৃদ্ধশিশু আর বুদ্ধিহীন বৃদ্ধের দল
> স্খলিত দাঁতের ফাঁকে কাঁদে আর হাসে'[৫]

'বৃদ্ধশিশু আর বুদ্ধিহীন বৃদ্ধ' বোঝাতে সমরবাবু সমাজপতিদের বুঝিয়েছেন। যারা সর্বাবস্থাতেই ঈশ্বর-পুরোহিতের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের দ্বারস্থ হয় অনায়াসে। এদের পাশাপাশি সমাজ সংস্কারক, সাহিত্যিক, সন্ন্যাসী, রাজনৈতিক নেতাদেরও সাক্ষাৎ মেলে—যাদের ভণ্ডামিতে 'ঈশ্বরত্ব' থাকেনা বলেই কবির ধারণা।

> '...... সন্ন্যাসীর সাধনা-সঙিন দিনগুলি
> যুবতী সংকুল আসরে,
> সান্ধ্য সংগীতে সংহত।
> প্রভু, পৃথিবীতে তোমার লীলা অবিরাম,
> এ্যাসেম্ব্লি হলে বিরহচ্ছলে মিলন আনো
> প্রবীণ কবির মুখে আবার আনো
> স্বদেশী গান।'[৬]

অথবা

> 'সন্ধ্যায় ভিড়াক্রান্ত মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা
> দেবতারো চোখে অনিদ্রা আনে;
> পুজোর পচা ফলে-ফুলে পিচ্ছিল পথে

রক্তচক্ষু পুরোহিত হাঁকে,
হাঁকে জগদ্দল বৃষভ।
কালসন্ধ্যার এই কুটিল লগ্নে
রাস্তায় হাসির গর্‌রায় ঘোরে তুখোর ইয়ারের দল,
রেস্তহীন গুলিখোর, গেঁজেল, মাতাল;
অবশেষে শূন্যের সরাইখানায়
ভ্রাম্যমাণ বিলোল দিন অদৃশ্য হয়,
পিছনে রেখে যায় শুধু কারণের গন্ধ,
কয়েক প্রহরের নিশাচর শান্তি।
আবার ব্রাহ্ম মুহূর্তে
চিৎপুরের বারান্দায় কোকিল ডাকে,
অলস হাই তোলে বেকার কুকুর।
দেবনখরে লোলচর্ম, পীত চোখ
ক্রমে ক্রমে গঙ্গাতীরে নিরানন্দ নারীদল জমে।''

শিক্ষিত-অশিক্ষিতের এই হচ্ছে শহুরে মধ্যবিত্ত চেহারা-যারা সার্বভৌম লীলাময় ঈশ্বরের আসরে সমাসীন। এই আসরের বাইরে যারা 'সাবলীল ঝাউ-গাছ' হতে চায় অর্থাৎ যারা কারো সাতে পাঁচে না থেকে একা একা থাকতে চায়—তাদের উঠোন ভরে যায় নিঃসঙ্গ পরিত্যক্ত জীবনের শূন্যতায়। কিন্তু তাদের কণ্ঠেও শেষ পর্যন্ত উচ্চারিত হয়—'উদ্দাম নদীতে শেষ খেয়া নেই,/শিকারী কীট সোনার ধানে। /তাই বঙ্কিম ব্রহ্ম যীশু পরমহংস/সময় যখন আসে তখন সকলি মানি'।

এই দু-মুখো বিশ্বাসের মধ্যবর্তী উপত্যকায় প্রচ্ছন্ন মধ্যবিত্তের জীবন। মনের একদিকে অন্ধকারের প্রতি মমতা, অপরদিকে আলোর জন্যে তৃষ্ণা —এই দ্বৈত সত্তার টানাপোড়েনেই বিশিষ্ট মধ্যবিত্ত মানস। মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ তার নিজের কাছেই রয়ে যায় অর্ধপরিচিত বা অপরিচিত রূপে। সমরবাবু তাঁর কবিতায় একথা বারংবার স্বীকার করেছেন। তিনি নিজে এবং তাঁর পারিবারিক অবস্থান—বন্ধু বান্ধবের চৌহদ্দি, সমস্ত কিছুই এই ঘেরাটোপের ভিতরে। সেই অনুষঙ্গগুলি তাঁর কাব্যে বর্ণিত হয়েছে অতি নিপুণভাবে। এসব দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক, সমরবাবু যেন বহিরঙ্গের প্রতিই বেশী মনোযোগী। কিন্তু তা সর্বাংশে সত্য নয়। একটু লক্ষ্য করলেই দেখবো এটা তাঁর বিশেষ পদ্ধতি মাত্র। বহিরঙ্গ বিবরণ থেকেই তিনি পৌঁছে যান মধ্যশ্রেণীর জীবনের গভীরে, যে জীবনে নির্বোধ আনন্দ নেই—আছে শুধু ক্লান্তি ও হতাশা, এমনকি অশ্লীলতাও কোনো উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারেনা। তিনি সেই ফাঁপা দিকটিকেই চিহ্নিত করতে চান।

সমর সেন জানিয়েছেন, মধ্যবিত্ত সমাজে বিত্তবানদের সঙ্গে তথাকথিত কেরানী মধ্যবিত্তদের যথার্থ ভাবৈক্য থাকলেও—জীবন যাপনে কিন্তু আসমান-জমিন ফারাক। দেশের সুদিনে-দুর্দিনে নিরুদ্বিগ্ন শান্তিতে দিন কাটায় উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। এদের

জন্যে গোল্ড ফ্লেক সিগারেট। এদের জন্যে লাল শাড়িতে জড়ানো নরম বুকের নারী শরীর। এদের শ্যামল শরীরের জন্যে নির্জন দ্বীপের স্বাস্থ্য নিবাস। শনিবারের রেসের মাঠ। সন্ধ্যায় ইভিনিং-ইন-প্যারিস সেন্টের গন্ধ। পুরুরবা রূপে মোটর যানে যাত্রা করে রবিবারে ডায়মণ্ডহারবারের বারে বা রেস্টুরেন্টে এরা উর্বশী সম্ভোগ করে। শীতের মরশুমে এদের জন্যে কার্নিভাল। কখনো কখনো মহুয়া মদির গ্রাম্য পথে মোটর বিলাসী হয়ে সাঁওতাল পরগণায় ধাবমান হরিণ শিকার। অনায়াসে এরাই কলপ মেখে হয় যযাতি যুবক। উচ্চবিত্ত সমাজের বিগতদার বৃদ্ধের চোখেও কেঁপে যায় কোমলাঙ্গী কিশোরীর স্বপ্ন। প্রেমের ব্যাপারে এরা দিব্যি বেপরোয়া। বিশেষত, দাম্পত্যপ্রেমে এদের লজ্জাশরমের ব্যাপার থাকে না। ছেলেপিলে চায়না মোটেই এরা। পুন্নামের ভয়ে তাই বলে ভীতও নয়। শুধু নিজেদের সম্ভোগ নিয়েই দাম্পত্য জীবনে স্বচ্ছন্দ হতে চায়। রাজনীতিতে এই সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজন সময় বিশেষে নরমপন্থী-গরমপন্থী সেজে যায় অক্লেশে। প্রাক্‌স্বাধীনতাপর্বে নানা মূর্তিতে জনচিত্তে চিহ্ন রাখে এরা। কেউ কেউ তখন কারখানা মালিক, কেউবা সুযোগ সন্ধানি বেনে। কেউ কালোবাজারী, দালাল, কেউ আবার গ্রাম্য মহাজন-জমিদার। অন্যদিকে মীরজাফর চরিত্রের মতো বিশ্বাসঘাতকদেরও সাক্ষাৎ মেলে, সাক্ষাৎ মেলে ভাঁড়ুদত্তদের মতো চরিত্রেরও। যারা বিবেক সাফ রাখে, তাদের নিজেদের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের সময়—একমাত্র হরির চরণবন্দনার অজুহাতে।

.... সবি মায়ার ছলনা,
কে বাঁচে কে মরে কেউ জানে না,
হরিই চরম সান্ত্বনা।
ভবের ব্যাপারে তিনি ব্যাপারী,
খর নদীতে তিনি কাণ্ডারী,
আমরা অধম চালের ব্যাপারী,'[৮]

উচ্চবিত্তরা আলাপচারিতায় আবার অতুলনীয়। ক্ষেত্র বিশেষে ভদ্রতায়-সৌজন্যে অন্য মানুষদের আত্মীয় করে তুলতে এবং অদ্বিতীয়। কিন্তু কথা বলার ঢঙে স্বীয়শ্রেণী সম্পর্কে অতি সচেতন। এরা যদিও মধ্যবিত্ত সমাজেই বসবাস করে, তবু এদের কণ্ঠের উপদেশবাণী পলায়নপরতাকেই প্রশ্রয় দেয়। এই সমাজে তাদের অবস্থিতিকে কৃত্রিম করে তোলে।

'অনেক দিন পরে দেখা।
আপনি কিন্তু একটুও বদলাননি,
গায়ে মাংস এখনো লাগেনি,
বোধহয় কখনো লাগবে না।

....

এ লক্ষ্মীছাড়া দেশ ছাড়ুন মশাই,
ব্যক্তিত্বের মৃত্যু এখানে।'[৯]

অপরদিকে, মধ্যবিত্ত সমাজের এক বৃহৎ ক্ষেত্র জুড়ে বাস করে নিম্ন আয়ের মানুষ—কেরানী, শিক্ষক, কলকারখানার শ্রমিক, কর্মচারী ইত্যাদি। তাদের এক বিরাট অংশ শিক্ষিত'ও। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত আছে কেউ কেউ, ফ্রয়েড চর্চায় কেউ আবার আত্যন্তিক। মনে মনে সাম্যবাদী মনোভাবের অধিকারী কেউ। কেউ কেউ সাম্যবাদের সক্রিয় কর্মীও বটে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতবাদে বিশ্বাসী মানুষজন আছে। কিছু সংখ্যক বেকার যুবক, রুশ ভক্ত কবি, প্রেমিক, ছাত্রও এদের মধ্যে বর্তমান। জীবনের শিক্ষা-দীক্ষা, খাওয়া-পরা, আমোদ-প্রমোদে অর্থনৈতিক অনটন এদের নিত্যসঙ্গী। এদের ঘুম ভাঙে রাত্রির দূষিত রক্তে বিকলাঙ্গ দিনের প্রসবে। এদের কাছে জীবন প্রভুহীন কুকুরের মতো মনে হয়। এবং এই জীবনযাপন থেকে বেরিয়ে আসার প্রতিকারের পথ তাদের অজানা বলেই মনে হয়। তাই বিভিন্ন জাতীয় প্রহারের আশঙ্কায় এরা সোজা পলায়নজীবীর ভূমিকা গ্রহণ করে।

ক্ষমতা অনুযায়ী এরা হোস্টেল, ফ্ল্যাটবাড়িতে অথবা বিবর্ণবস্তিতে বসবাস করে। ধুলো-ধোঁয়া আর ঘামের গন্ধে ভরা এদের রাতদিন। চায়ের দোকান, বন্ধুদের হোস্টেলের আড্ডা, সরাইখানা, সিনেমা, ফুটবলমাঠ এরাই ভরিয়ে তোলে। কূপমণ্ডুকের মতো জীবন যাপন। সঙ্কীর্ণ পরিবেশে সঙ্কীর্ণ মানসিকতায় এরা বেশী মাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। ফলে জনতার রুদ্ররোষের অংশীদার হতেও সাহসে কুলোয় না। দিনগত পাপক্ষয়ে অল্প বয়সেই বৃদ্ধ হয়ে যায় এরা।

> 'বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ,
> তবু নিজেকে কতদিনের জীর্ণ বৃদ্ধ লাগে,
> জিভে স্বাদ নেই, জানিনা
> কীপাপে সুস্থ শরীর ঘুণের আশ্রয়।
> আমার অজ্ঞাত সারে
> পুরাতন প্রগল্ভ দিনরাত্রি আসা-যাওয়া করে,
> নদীর জোয়ারে, অন্ধকারে তিলেতিলে পৃথিবী মরে,
> বুঝি, পিঙ্গল বালুচর সর্বভুক, অবিনশ্বর।'[১০]

—এই না-জানাটা মধ্য শ্রেণীর অক্ষমতা, ইতিহাসের ধারাকে উপলব্ধি করতে না পারার ফল। সমর বাবু নিজে একথা জানতেন। তাঁর সঙ্গে এখানেই তাঁর শ্রেণীর দূরত্ব তৈরী হয়ে যায়। আর যৌবনের এই চিত্র দেখে অমলেন্দু বসু ভিন্ন ব্যাখ্যা করে মন্তব্য করেন ঃ 'একদা সমর সেন সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়েছিল—'নবযৌবনের কাব্য'—সে আখ্যা আদৌ সুষ্ঠু বলে আমার মনে হয় না। বরঞ্চ আমার মনে হয় সমর সেন শুধু মধ্যবিত্ত সমাজের কবি নন, মধ্যবয়সের কবি, এমন কি মধ্য বয়স পেরিয়ে জীর্ণজরার কবি।'[১১]

—উত্তরে আমাদের বলতেই হয়, অমলেন্দু বাবুর মন্তব্য সম্পূর্ণ যথার্থ নয়। কারণ আমরা জানি একজন যথার্থ কবি প্রায় সকলযুগেই জীবনের সমগ্র ও চিরন্তন মূল্যকে দেখবেন। স্থানীয় ও সাময়িক ঘটনায় আবদ্ধ হয়ে থাকবেন না। সমর বাবুও তাই

করেছেন। পারিপার্শ্বিক জীবনে ও সমাজে যা কিছু অশুভ, কুৎসিত ও নিষ্ঠুর তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানানোই নবযৌবনের ধর্ম। এবং সমর বাবুর কবিতায় এই বিদ্রোহের ভাব ও ভঙ্গি স্পষ্ট দেখেই বুদ্ধদেব বসু 'নবযৌবনের কাব্য' আখ্যা দিয়েছিলেন। বিশেষত সমর সেন আমাদের জীবনের পীড়িত যৌবনের চিত্রটিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি পীড়িত যৌবনের বর্ণনায় 'মধ্যবয়সের বা মধ্য বয়স পেরিয়ে জীর্ণজরার' কথা এনেছেন মাত্র। যৌবনের অকাল প্রয়াণের অশুভ-কুৎসিত দিকটির পরিস্ফূটনের জন্য। 'মধ্য বয়সের বা মধ্য বয়স পেরিয়ে জীর্ণজরার' বর্ণনাতেই সমর সেনের কবিপরিচিতি বললে তাই আমাদের আপত্তি। পাশাপাশি বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য এখানে স্মরণ করি ঃ 'সমর সেনের রচনায় একটি স্পর্শকাতর সুন্দর যৌবনকে দেখলুম, তাকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই। বাংলাদেশে আজ যেন যৌবনের বড়ো অভাব; পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো যে অনাসৃষ্টি—'Practical Young men'—তাদেরই সংখ্যা এদেশে আজকাল বেশী মনে হয়। জীবনের যে ঋতুতে অসম্ভবের কুঁড়ি ধরার কথা তখনই যারা মুনাফার চুলচেরা হিসেব করতে বসে, তাদের ভবিষ্যতের কথা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। নিষ্প্রাণ চাকরি, ব্যবসাদারি বিয়ে, কর্মজীবনে সংকীর্ণ স্বার্থপরতা—মোটের উপর এমন একটি স্থাবর ও ক্ষীণ দৃষ্টি মনোভাব, যা জীবনের যে কোনো রকম বিকাশের প্রতিকূল। আমাদের দেশে যেন যৌবনই নেই; আমরা বুড়ো হয়ে জন্মাই যদিও সাধারণত বড়ো না হয়েই মরি।'[১২]

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অসহায়ত্ব বোধ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সহচর হিসেবে থেকে যায়। জীবনের আশা আর আশার ছলনা ভরা জীবনটা এসময় থেকেই বারে বারে স্মৃতির হাত ধরে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু জীবনের কাছে, সমাজের কাছে, রাষ্ট্রের কাছে যদিও এদের চাওয়া আকাশ ছোঁয়া ছিল না। মাটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এদের চাহিদা। মনোমত একজন সঙ্গিনী। সঙ্গে কিছু টাকা। ছেলেপিলে বেশী নয়, মোটে দুটি অথবা তিনটি। একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। জীবনের নিরাপত্তার জন্য জীবনবীমা—একান্ত অবকাশের জন্য সান্ধ্যভ্রমণ—সময় বিশেষে তামাক সেবন। মোটামুটি এই সচ্ছল জীবন যাপনের পরে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের উপর সংসারের ভার অর্পণ করে পরলোকে গমন। কিন্তু সময় বিশেষে এটুকু চাহিদাও তাদের কপালে জোটে না। সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোর জন্যেই। শুরু হয় খুঁড়িয়ে চলা। সমর সেন তাঁর দেখার ভঙ্গিমায় সে কথাই বারবার ফুটিয়ে তুলেছেন। টুকরো টুকরো ছবি সাজিয়ে। এখানে কোনো উজ্জ্বল স্মৃতির ছবি ততখানি ফুটে ওঠে না—যতখানি তাঁর চোখে ভেসে ওঠে চারিধারের ধ্বংসের অদৃশ্য গ্লেসিয়ার।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা বিভিন্ন সংকটেও বাইরের ঠাট-ঠমক বজায়ের চেষ্টা করে যায় প্রাণপণে—যেটার হয়তো কোনোই প্রয়োজন নেই। সমর সেন মনে করেন এটা আসলে ঐ শ্রেণীর লোকের একটি বৈশিষ্ট্য মাত্র। অথচ জগৎ-জীবন সম্পর্কে তাদের মধ্যে কোনো গভীর প্রত্যয় থাকে না—এমন ভাবা ঠিক নয়। এ ব্যাপারে তাদের

মনোভঙ্গি লক্ষ্য করলে ববং দেখা যাবে, নির্বিকার ঔদাসীন্যে তোলা জিজ্ঞাসা দার্শনিক প্রত্যয়ের সমার্থক হয়েছে।

'এসেছি অন্ধকার থেকে, যাত্রা শেষ হবে অন্ধকারে।
মনে কি পড়ে জন্মক্ষণে আমাদের প্রথম কান্না,
সে তো শিশুর প্রথম প্রতিবাদ : কেন এখানে আসা,
কেন শৈশবের নির্বোধ হাসি, কৈশোরের নিরুদ্দেশ আবেশ,
আর যৌবনেব যন্ত্রণা আর বার্ধক্যের আসক্ত অনুতাপ?'[১৩]

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক সম্প্রদায় হলো বেকার যুবক, ছাত্র—যাদের পরনির্ভরতা হেতু জীবনে একটা ব্যর্থতা বোধ নিয়ে আসে। সঙ্গে আসে নানা ধরনেব বিক্ষোভ ও আত্মদ্বন্দ্ব। বিশেষ করে, বেকারের সকাল শুরু হয় চাকরি খালির বিজ্ঞাপন দেখে। অনাগত সর্বনাশের আশংকায় বিবেক দংশনে শতধা হয়ে যায় তাদের অদম্য উৎসাহ। বেকার যুবকদেব এ চিত্র-চিরকালীন চিত্র। তাদের আশেপাশে প্রতিদিনের বিবিধ ব্যর্থতায় মৃত্যুর আনাগোনা দেখতে দেখতে নিজেরাই একদিন মৃত্যু হয়ে যায়। কুখ্যাত সমাজ-বিরোধীরূপে কেউ বা পুনর্জন্ম লাভ করে। নিজের অন্তর্নিহিত দাহিকা শক্তিতে নিজে পুড়ে ভস্ম হওযার পরিবর্তে সমাজ বিরোধীরূপে পুনর্জন্ম লাভকে সহজ পথ ভেবে বসে তারা। কবি এদেব 'বিকার' নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর কাব্যে এদেরও আপ্যায়ন হয়েছে।

'চারিধারে বিকার মূর্তিমান চলে,
ট্রামে চড়ে, নামে,
কখনো সন্ধ্যার ছায়ায় প্রগল্‌ভ হাসে,'[১৪]

এরপরে ছাত্র শ্রেণীর কথা। ছাত্রশ্রেণী সাধারণত সমাজের ভালো মন্দ, আলো অন্ধকার, ব্যবস্থা-অব্যবস্থা, ন্যায়-অন্যায়, আহার অনাহার প্রভৃতি সমস্ত অবস্থা সম্পর্কেই সজাগ। কিন্তু আমাদের আলোচ্য কবি এদের সেই মূর্তিতে তুলে ধরেন নি। পরিবর্তে, এদের চটুল চঞ্চল প্রকৃতির অন্তঃসারশূন্য জালিয়াতের দিকটিকেই অভিহিত করতে বিশেষ মনোযোগী হয়েছেন। তাঁর চিত্রায়নে ধরা পড়ে—ছাত্ররা কলেজ ছুটির পরে ক্লান্ত-মন্থর বিকেলে বাড়ি না ফিরে কাছাকাছি কোনো বন্ধুর মেসে আড্ডা দিতে ভালোবাসে। অথবা কোনো হোটেলে উত্তেজনাহীন অশ্লীলতায় সান্ধ্য আড্ডা জমাতে ভালোবাসে। আড্ডাবাজ ছাত্রদের ইয়ার্কি করা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো পেশার কথা শোনা যায় না। এমনকি ১৯৪১ এর ২২শে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের মহৎ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তারা নিস্পৃহ থেকেছে। খুব স্বাভাবিক কারণেই তাই সমরবাবুর কণ্ঠে বিরক্তি প্রকাশ পেয়েছে

'.......... দুপুরে রেস্তরাঁয়
ছাত্রেরা কথায় চিঁড়ে ভেজায়,
দুনিয়ার সমস্যার সমাধান চলে,

অর্থহীন বোলে, লপেটা চালে, শৌখিন সঙ্গে দিন যায়;'[১৫]

—এই ছাত্রদের আশেপাশে একেবারে রং ছিল না—একথা সত্য নয়। নিঃসন্দেহে রং ছিল, ছিল কল্পনারও আকাশ। কিন্তু তাদের সেদিনের পরিচয় কাব্যে তেমনভাবে ফোটেনি। সমর বাবু শুনিয়েছিলেন ছাত্রদের হৃৎকম্পনের তীব্রতা। অর্থাৎ সমাজ পরিস্থিতিতে আড্ডাবাজ ছাত্ররাও কতখানি সচেতন—সেকথা তিনি স্মরণ করিয়েছেন। তারা জানে :

'তিলে তিলে মৃত্যু রুদ্ধশ্বাস মৃত্যু আমাদের প্রাণ;
দিকে দিকে আজ হানা দেয় বর্বর নগর,
আর সমস্তক্ষণ রক্তে জ্বলে
কত শতাব্দীর শূন্য মরুভূমি।'[১৬]

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সবথেকে উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায় হলো তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মহল। যাদের জীবিকা জীবনের মূল্যবোধের বিরোধী। বুদ্ধিজীবীরা অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো শোনে সবই, কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিলাপ করে—আমাদের মুক্তি নেই, আমাদের জয়াশা নেই' ব'লে। বুদ্ধিজীবীরা অন্তর্দ্বন্দ্বে দীর্ণ হচ্ছিল কেউ কেউ। কেউবা নিজস্ব-প্রকৃতি অনুযায়ী সহিষ্ণুতার গুণে পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে দিব্যি বনিবনা করে নিয়েছিল। কেউ আবার অতিরিক্ত বিবেক তাড়িত হয়ে 'না ঘরের না ঘাটের' অবস্থায় পড়েছিল। এরা তখন জনমানস থেকে বিচ্ছিন্ন। এসব বুদ্ধিজীবীরাই সাধারণত দেশের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রক্ষা করত প্রত্যক্ষভাবে। দেশবাসী এদের মান্য করত সাচ্চা প্রগতিক ভেবে কখনো কখনো। বুদ্ধিজীবীদের এরকম ভূমিকা বর্তমানেও অব্যাহত। কিন্তু এরা সমর বাবুর চোখে খুব একটা প্রশংসাযোগ্য ভূমিকায় ধরা পড়েনি। তিনি যেভাবে তাঁর কবিতায় এদেরকে চিত্রিত করেছেন—সেখানে এদের প্রতি কথায়, চিন্তা-ভাবনায় অহেতুক সন্দেহ বাতিক ছিল। এদের বাক্যশেষে 'হয়তো', 'হয়তো বোঝে' প্রভৃতি শব্দ প্রায়শ চোখে থাকে। কবির মতে এদের বিশ্বকে বিচলিত করার সাহস আছে, তবু প্রকাশ করতে পারে না এরা ঠিক মতো। তার কারণ এরা বুদ্ধিজীবী হলেও প্রত্যেকেই মধ্যবিত্ত গোত্রেরই মানুষ। এদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-টানাপোড়েনটাই সর্বদা প্রকট। তিনি নিজেও তো সেই সম্প্রদায়ভুক্ত। আত্ম সমালোচনা করতেও পিছপা হন না তিনি। তিনি জানিয়েছেন উপনিবেশের স্বার্থ বুদ্ধি সম্পন্ন এই শ্রেণী, নানাবিধ অগ্রসর চিন্তা সত্ত্বেও মধ্যস্বত্ব ভোগের ধারণা তার মজ্জাগত। নতুন তত্ত্বের বাক্যচ্ছটায় অস্বীকার করা যায় পুরনো দায়কে, অথচ নতুন দায় নেবার সামর্থ ও ইচ্ছা থাকে না। ফলে যে ভণ্ডামি আর ফাঁকি জন্ম নেয়, তাকে আবার তত্ত্বের মুখোশেই চাপা দিতে হয়।

'সত্তার কৌলিন্য খোয়াব না কোনদিন
এ গর্বে জিইয়ে থাকে বুদ্ধিজীবীরা।
বিশ্বকে বিচলিত করার সাহস রাখে না,
চিন্তিত দর্শক, হয়ত বোঝে

দুনিয়াদারির দুর্দিন, বাজার অন্ধকার,
পথে জমকালো স্তব্ধতা;
বেগতিক দেখে মহাত্মাদের প্রস্থান,'[১৭]

—এটুকু জানিয়েই কবি শেষ করেননি। তাঁর মতে এই বুদ্ধিজীবীরা মীরজাফরী অতীত ও মেকলের বিষবৃক্ষের ফল। বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহজ জীবন ও সহজ বিশ্বাস যে বিষবৃক্ষের কারণে নিঃশেষ হয়ে যায়। এর প্রভাবেই বুদ্ধিজীবীরা ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব দিয়ে সমস্ত ব্যর্থতার মূলে যৌন চৈতন্যের দোহাই পাড়ে। তাঁর ভাষায়—'ধ্বংসের ক্ষয় রোগে শিক্ষিত নপুংসক মন সমস্ত বার্থতার মূলে অবিরত খোঁজে অতৃপ্ত রতি উর্বশীর অভিশাপ।'

আমরা দেখেছি, মধ্যবিত্ত সমাজের আবির্ভাব ইংরেজ প্রভুত্বের আগমনে। ইংরেজ আমলের ভূমিস্বত্বের উপর ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে নগদ অর্থোপার্জনের দাক্ষিণ্যে এই নতুন সম্প্রদায়ের উদ্ভব। এদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয় : 'মধ্যবিত্ত দুই প্রকার ১. জমি বিহীন অর্থাৎ কোন প্রকার ছোটখাট চাকুরী বা ব্যবসাজীবী এবং ২. কিঞ্চিৎ জমিজমা আছে এমনিতরো। বাঙালী মধ্যবিত্ত এমনকি উনবিংশ শতকেও জমিবিহীন ছিল না। .... বিংশতি শতকে বাঙালী মধ্যবিত্ত বিশেষ করেই জমিজমা-বিহীন।'[১৮]—এই গোত্রভুক্ত মানুষদের না আছে সামন্ততন্ত্রীয় ঐশ্বর্যের ঔজ্জ্বল্য, না আছে ধনতন্ত্রীয় বৈশ্যবুদ্ধির স্ফুরণ। অথচ উভয় শ্রেণীরই আত্মমগ্ন স্বার্থ চিন্তা অভূতপূর্ব। পরস্পর বিরোধীযুক্তির বেড়াজালে এরা আবর্তিত হয়। বুদ্ধিজীবীদের সুবিধাবাদকে সমর সেন দুচোখে দেখতে পারেন না। নিজের শ্রেণী চেতনায় সদাসচেতন তিনি অক্লেশে বলেন : 'আমাদের দেশে বুদ্ধিজীবীদের মানসিক দ্বন্দ্বের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল কাজের সঙ্গে বিরোধ। অর্থাৎ যে কাজ, যে চাকরি করি তার সঙ্গে আমাদের মূল্যবোধ খাপ খায় না।'[১৯]

সমরবাবু আরও দেখিয়েছেন, তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা যদি নিজের 'বাবু' জন্ম স্বীকার না করে বিপ্লবী হিসেবে নিজেকে অভিহিত করতে চায়, তাহলে সে বিপ্লব বাবুগিরির নামান্তরই হ'য়ে দাঁড়ায়। এবং এই বাবু জন্মকেই অজুহাত হিসেবে ব্যবহার ক'রে মধ্যবিত্ত চেতনায় নিজেকে স্বেচ্ছায় আবদ্ধ রাখাও সমর্থনযোগ্য নয়। সমর্থনযোগ্য নয় শ্রেণী সত্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নেমে—ঐ শ্রেণী সত্তার আদর্শ সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকার মনোভঙ্গিও। এটা ঘটলে সীমাবদ্ধতা একটা আসবেই। তখন স্তব্ধতার কাছে জীবনের জয়যাত্রা। কূপমণ্ডুক ছাড়া আর দ্বিতীয় পরিচয় থাকবে না। সমরবাবু কখনো নিজের সেই সীমাবদ্ধতাকে অস্বীকার করেন না। ফলে নিজের দিকে তাকিয়ে করুণ সত্যটাই প্রকট হয়ে ওঠে। 'আমি সাধারণ মধ্যবিত্ত, কূপের মণ্ডুক, ছাপোষা মানুষ'[২০]। তিনি একথা সাম্যবাদী বিপ্লবের প্রসঙ্গ উত্থাপন কালেও ভুলতে পারেননি।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী ব্যাপক জনগণ থেকে একটু স্বতন্ত্র, তার একটা অংশ তাদের সহযাত্রী হলেও—এটা কাটানো যায় মার্কসীয় তত্ত্বের আলোকে, কিন্তু তত্ত্ব যাইহোক, কর্মসূচিতে

যদি ভুল থাকে, তাহলে তো আবার জনগণই বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে—তখন কী করতে পারেন কবি! কীভাবে তিনি পেরোবেন তাঁর শ্রেণীর সংশয়, কীভাবে মেলাবেন কবির উপলব্ধি! তখন দ্বিধা আর দ্বিখণ্ডিত সত্তা নিয়েই কবিকে এগোবার চেষ্টা করতে হয়। এ সমস্যা সুভাষ মুখোপাধ্যায় বা সুকান্ত ভট্টাচার্যের হয়নি! নিষ্ঠাবান ও অনুগত পার্টিকর্মী বা সমর্থক হিসেবে তাঁরা পার্টির যাবতীয় কর্মসূচীকেই মেনে নিয়েছিলেন, আর এভাবেই অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন স্বশ্রেণীর গণ্ডী। ফলে তাঁদের কখনো কখনো পুরনো উচ্চারণেরই বিরোধিতা কবতে হয়েছে, বা এমন উচ্চারণ করতে হয়েছে যা ইতিহাসের বিচারে ভ্রান্ত। সমর সেনের ক্ষেত্রে এটা সম্ভব হয়নি। অনায়াসে তিনি উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন—

'লেনিন, ষ্টালিন, জুখভ ও গোর্কি,
তাদের আমরা চিনি। কিন্তু বুঝিনা তাকে,
দুধ ও তামাকে সমান আগ্রহ যার,
দু-নৌকার যাত্রী, এই বাঙালী কবিকে,
বুঝি না নিজেকে।'[২১]

মধ্যবিত্ত চরিত্রের প্রতি অন্তহীন ঘৃণা-বিদ্রূপকে শেষপর্যন্ত আত্ম-ধিক্কারে রূপান্তরিত করেই এমন স্বীকারোক্তি তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

মোটকথা, সমর সেন মধ্যবিত্ত জীবনের নানা উৎকট অভিব্যক্তি সাবলীলতায় যেভাবে বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমিতে উপস্থাপনা করেছেন বা কবতে চেয়েছেন—তা সত্যি বাস্তবানুগ। এই সমাজের মানুষের একমাত্র পরিচয়—'অন্তহীন বালুতে কুব্জ পৃষ্ঠ ন্যুব্জ দেহ সারি সারি উট'। লবেজান শ্রেণীর এই জীবনকে কবির মনে হয়েছিল ফনিমনসায় আকীর্ণ, ধূসর, অনুর্বর, বালু ঢাকা। স্পষ্টতই তা এলিয়টের প্রভাবে অনেকটা, আর কিছুটা উপনিবেশের মধ্যশ্রেণীর আত্মরতি সর্বস্বতার ক্ষয় আব ক্লান্তি দেখে। মধ্যশ্রেণীর জীবনের আশা-নিরাশা-হতাশা, প্রাপ্তি-বিপর্যয়-বঞ্চনা, পূর্ব গরিমার স্মৃতি ও অবক্ষয়, আত্ম সচেতনতা ও আত্ম প্রতারণা—সবই সমর সেনকে আলোড়িত করেছে যে তাতে সন্দেহ থাকে না। তার মানে এ নয় যে মধ্য শ্রেণীর জীবন ও ধারণার হুবহু চিত্রায়নই তাঁর কবিতা। তিনি এই জীবনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন বিশ্লেষকের দৃষ্টিতে। সমালোচকের ভাষায় বলতে পারি : 'ছায়াভীরু, জলস্রোত ভীরু, বর্গীভীরু, জনতাভীরু যে প্রাণীটি আজকের মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের বেনামা বন্দরে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায় তার ঘুণে-ধরা সত্তায় নিজ কবি-ব্যক্তিত্ব একাত্ম করে নিজ সমীক্ষাপরায়ণ অহংকে এই প্রাণীটির চরিত্রে প্রোজেক্ট করে, কবি তাঁর বিদ্রূপ-শক্তিতে শাণ দিয়েছেন। ……… এহেন কাব্যায়নে কবি নিজের বিপরীত সত্তাটিকেই প্রকাশিত করেন, অর্থাৎ তিনি স্বয়ং যা নন, স্বয়ং যার বিরোধী ও ধ্বংসকামী, সেই বিপক্ষীয় সত্তার মুখোশ লাগিয়ে সেই সত্তারই বিনাশ করেন।'[২২]

খ. নাগরিকতা

সমর সেন তাঁর কবিতায় মধ্যবিত্ত জীবনের পাশাপাশি যে পরিবেশকে ফোটাতে চেয়েছেন—তা সম্পূর্ণই নাগরিক পরিবেশ। বিশেষ করে কলকাতার নাগরিক পরিবেশ। সমর সেনের আগে কলকাতা শহরকে কাব্যের বিষয় করে তুলেছিলেন যে সব আধুনিক কবি, তাঁদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু অগ্রগণ্য। এর কারণ হিসেবে বুদ্ধদেব জানিয়েছেন : 'আমাদের জীবনের কেন্দ্র তখন সরে এসেছে শহরে। শহর এখন আমাদের জীবনকে রূপায়িত করে, ধ্বংস করে, পরিপূর্ণ করে। শহরের মধ্যে, শহরের প্রাণের মধ্যে আমরা বাঁচি।'[২৩]

একদা বাংলা কাব্যে বিদ্যাপতি, ভারতচন্দ্র প্রমুখ কবিরা নাগরিক ছিলেন। ছিল তাঁদের নগর বন্দনা। ঊনবিংশ শতকের কবিরাও নগর বন্দনায় নেমেছিলেন। কিন্তু এঁদের থেকে আধুনিক কবিদের নগর বন্দনা স্বতন্ত্র। কেননা আধুনিক কবিদের নগর গড্ডল প্রবাহের নগর। এর থেকে সমর সেনও ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাঁর বাল্য-কৈশোর-যৌবন নগরে—কলকাতা নগরে অতিবাহিত হয়েছে। সেখানে তখন রাজতন্ত্র বা সামন্ততন্ত্রের দিন অবসিত। পরিবর্তে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার সৃষ্ট নগর উপস্থিত হয়েছে। ব্যবসা-চাকরি উপলক্ষে এই নগরের বিরাট বিরাট বাড়িগুলির খুপরিতে খুপরিতে নিজের স্বতন্ত্র-ইতিহাস, আর ব্যক্তিগত স্মৃতি নিয়ে সেখানের মানুষেরা বসবাস করে। সমর সেন তাঁর পারিপার্শ্বিকতায় এগুলি লক্ষ্য করেছিলেন নিপুণভাবে। এবং তিনি অনুভব করেছিলেন, পারিপার্শ্বিকের উপর নির্ভরতা অস্বীকার করা কখনোই সম্ভব নয়। তাঁর আরো মনে হয়েছিল : 'রিয়ালিটির থেকে নিস্কৃতির চেষ্টা পরাজয়ের দুর্বল ভঙ্গি, প্রকৃতির স্বপ্নলোক ক্লীবের অলীক স্বর্গ।'[২৪] তাই পারিপার্শ্বিকতার উপর নির্ভর করে তাঁর কাব্যে এসেছে নাগরিকতা। তিনি নগর-জীবনের নান্দীপাঠ করেছেন এভাবে—

> 'অগণন ধোঁয়ার ফণা, চিমনিতে চিরেছে আকাশ।
> তারি আশে পাশে ট্রাম বাস বিমর্ষ মানুষের ভীড়ে......।'[২৫]

আমাদের অজানা নয় যে, রবীন্দ্রনাথও বহুজন সমাকুল, ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধ, দম্ভ এবং দাসোর মিলিত চালচিত্রে নগর সংগীত গেয়েছিলেন। নগরের কুৎসিত পরিমণ্ডলকে বিতৃষ্ণা সহকারে দেখেছিলেন। কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিমায় দেখতে পারেননি। অপরপক্ষে, সমরবাবু নগরের একজন নাগরিক হিসেবে, সুখে-দুঃখে-শোকে সামগ্রিকভাবেই বিবেক-বদ্ধ হয়েছেন। নাগরিক জীবনের বীভৎসতাকে যেভাবে তাঁর কাব্যে প্রাধান্য দিয়েছেন, ঠিক একইভাবে আপাত বীভৎসতার মধ্যে তিনি সন্ধান করেছন স্বতন্ত্র এক সৌন্দর্য। এ সৌন্দর্যের সন্ধান সমর সেন ছাড়া আধুনিক বাংলা কাব্যেই আর মেলে না বলা চলে। বিশেষ করে তাঁর শহর বন্দনার মনোভঙ্গি, তীক্ষ্ণতা ও উপলব্ধি সৌন্দর্য সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে।

—স্বীকার করি, সমর সেন ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের একজন যথার্থ সমজদার। এও স্বীকার করি, তিনি টি. এস. এলিয়টের ফাঁপা-ভোঁতা-বিবেকশূন্য-কথাসর্বস্ব মানুষের শহরের সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। তবু তিনি সেই পাশ্চাত্য কবিকে একমাত্র অনুকরণ করেন নি। তিনি সম্পূর্ণ দেশীয় সমাজ-সংসারের পরিচিত নগর-কলকাতা মহানগরীর মানুষদের ক্লেদময়তার কথা, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা, প্রেম-ব্যথা-বেদনার কথা শুনিয়েছেন অকুণ্ঠভাবে। কোনো খণ্ডচিত্রের মাধ্যমে তিনি একাজ করেন নি। নগরের সামগ্রিক রূপটিকেই পরিস্ফুটনে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। প্রকৃতি যেমন একদা ছিল জীবনানন্দের রক্তমাংসে, ঠিক তেমনি সমর বাবুর রক্তে এসেছে কলকাতা। এ কলকাতা রোম্যান্টিকতার হাত ধরে আসেনি। জটিল আত্মবিরোধে বিক্ষুব্ধ মানুষের শহর—আলকাতরা, পেট্রোল ও মনুষ্য শ্রমের শহর, বর্ষা-সন্ধ্যার আলোঝলমল, কেরোসিনের তীব্র গন্ধের শহর, কলেরা আর কলের বাঁশি, গনোরিয়া আর বসন্তের শহর হিসেবে এ কলকাতা এসেছে। রবীন্দ্রকালের 'মধুময় পৃথিবীর ধুলি', সমর বাবুর শহরে এসে হয়েছে—'হাওয়ায় অসংখ্য ধুলোর কণা/জীবন্ত বীজাণুর মতো'।

এই শহরের সকাল হয় নিতান্তই যান্ত্রিকতায়। সেখানে আন্তরিকতার লেশমাত্র থাকে না।

> '.......... বিকলাঙ্গ দিনের প্রসবে
> আমাদের তন্দ্রা ভাঙে;
> তারপর আকাশ ভারি হয়ে ওঠে,
> বিরস কাজের সুরে
> কতদিনের ক্লান্তিতে কলের বাঁশি বাজে;
> পিছনে সমস্তক্ষণ ক্ষিপ্র গতি বাসের শব্দ।'[২৬]

—এরই পাশাপাশি তিনি দেখেন রাস্তার ধুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ধাবমান মোটরের উদ্ধত বেগের প্রাবল্য। দেখেন চারিদিকে ব্লিচিং পাউডারের তীক্ষ্ণ গন্ধে ভরা বাতাস। দেখেন শহরের এক শ্বাসরোধী, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ। স্তূপীকৃত জঞ্জাল, ধর্মঘটের প্রকোপে কর্পোরেশনের বেহাল অবস্থা। এ সবই আদি এবং অকৃত্রিম ভাবে বাঙালী পাঠকের মনে মুদ্রিত হয়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শহরের মানুষদের কর্মচাঞ্চল্য বেড়ে ওঠে। ছেলে মেয়েদের স্কুল-কলেজ শুরু হয় যথা নিয়মে। অফিস আদালতও সরব হয়ে ওঠে ক্রমে। অধ্যাপকদের সময় অতিবাহিত হয় নানান বক্তৃতায়। ট্রামের অবিরাম মুখর শব্দে সময় কাটে। সাড়ে বত্রিশ ভাজার আমন্ত্রণে গৃহস্থ লোকের সচেতনতা বাড়ে। অন্যদিকে, কর্মহীন লোকেরা চায়ের দোকানে শুধু মনান্তরের কর্কশ কোলাহলে আড্ডা জমায়। মাঝে মধ্যে এ শহরের মানুষজন মনের সঙ্গে কাজের অমিল দেখে যন্ত্রণা বিদ্ধ হয়। কখনো কখনো বা তারা মনুষ্যেতর প্রাণের সামিল হয়ে ওঠে। কবি জানিয়েছেন সেই সময়ে জানালার ফাঁক দিয়ে কাছের আকাশ দেখা যায় না। আকাশ তখন পীড়িত বলে অনুভূত হয়। সেখানে শীতের অজগরের মতো ঘন মেঘ জ'মে রুদ্ধশ্বাস পরিবেশ সৃষ্টি করে।

অর্থাৎ বণিক সভ্যতার শূন্যতায় পর্য্যুদস্ত হয় মহানগরীর জীবন।

সমর বাবুর কাব্যে ইতিহাস চেতনা যে মানবধর্মী দায়িত্ববোধ থেকে স্বতঃসিদ্ধ ভাবে উচ্চারিত তাতে আর সন্দেহ থাকে না। একদা এ শহরে আসা ১৯৩১ এর আইন অমান্য আন্দোলনের ঢেউয়ের কথা তিনি শুনিয়েছেন। যার সংস্পর্শে এসে শহরের সর্বস্তরের মানুষ জন আলোড়িত হয়। অন্যদিকে, কিছু কিছু মধ্যবিত্ত সুযোগ সন্ধানী মানুষ এ সময়ে দ্বিধায় থরো থরো হয়েও স্থান ত্যাগ—কলকাতা ত্যাগ করতে পিছপা হয় না। এ দৃশ্য কবির কণ্ঠে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে চিত্রিত হয়েছে—'দেশবন্ধু পার্কে এলোমেলো পলায়ন' ব'লে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে আইন অমান্য উপলক্ষে দেশবন্ধু পার্কে জমায়েত কালে হঠাৎ ব্রিটিশ পুলিশ লাঠি চালালে জনতার এক অংশ জনসভা ছেড়ে প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত হয়। কবি তারই উল্লেখ করেছেন। শহরে জীবিকার স্রোতে সমস্ত জীবন যৌবন ভেসে যায়। বসন্ত তো দীর্ঘ দিন শহর থেকে পাততাড়ি গুটিয়েছে। মৃত্যুহীন প্রেম এখানে প্রেমহীনতায় পরিবর্তিত হয়েছে অক্লেশে। কল্পনার স্বর্গের মধ্যে হানা দিচ্ছে নাগরিক কর্কশতা, দূষিত হচ্ছে পুরনো সৌন্দর্যের মৃত্যু। প্রেমের পরিবর্তে চলে তাই যৌন অনাচারের বিচিত্র প্রবাহ। কিন্তু যৌনতা আবার প্রেমের সমার্থক হিসেবে আসে না। যা আসে—তাই দেখে কবির হৃদয় ব্যথিত হয়।

> 'পরস্ত্রীকাতর চোখ মেলে অস্পষ্ট দেখে
> মাঠের অন্ধকারে প্রেমিক ফিরিঙ্গিদের ভিড়'[২৭]।

কলকাতা শহরের চারিপাশে শুধুই ক্ষয় আর ক্ষয়, বিকৃতি আর হাহাকারের চিত্র কবির কলমে মূর্ত হয়। শহরের বক্রদেহ নায়কের দল বিগলিত বিষণ্ণতায় ক্ষুবধার স্বপ্ন দেখতেই অভ্যস্ত। ফরাসী নগ্ন ছবির আমন্ত্রণে এবং ঝকঝকে ফিটনগাড়ির ইশারায় ময়দানের নষ্টনীড় মানুষেরা অতি সহজেই ভুলে যায় ক্ষুৎপীড়িত মানুষের কথা। ভুলে যায়, এ শহরেই বাসের-ট্রামের সামনে ভীড় করে থাকা ভিখারীদের। জীবন যাপনের এই গূঢ় কথা কবি বিস্মৃত হন না। গভীর আন্তরিকতায় তিনি আমাদের অক্লেশে শুনিয়ে দেন—উচ্ছিষ্ট নিয়ে ভিখিরীর সঙ্গে কুকুরের কাড়াকাড়ির কথা। নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিমায় তিনি শোনান শহরের উর্বশীদের কথা। চীনে গণিকার রাত্রি জাগরণের ক্লান্তিতে রিক্‌শার উপর চোখ বন্ধ করার দৃশ্য এবং লজ্জাহীন গণিকার সলজ্জ প্রণয়কে মমতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন তিনি। জীবনযাপনের অন্তহীন মূঢ় একঘেয়েমির সঙ্গে মিশে থাকা অসুস্থ, দীন, হতভাগিনী নারীর নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষীণ প্রচেষ্টাও সমরবাবুর চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি। যে নারী শুধুমাত্র যান্ত্রিক নিয়মেই ক্লান্ত-শীর্ণ হাতে অলসভাবে ঠোঁটে রং মেখে, মুখে পাউডার ঘষে রাত্রের খদ্দের ধরে। নিজেকে সাজাবার জন্যে যার মাথাব্যথা নেই, অথচ প্রত্যেক দিনই সাজতে হয়। নগর সভ্যতার অনিঃশেষ এবং অনিকেত অনুষঙ্গের এই হ'ল আসল ছবি। ক্রমবর্ধমান নগর মনস্কতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমাজে প্রাধান্য পেয়েছে অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশের ব্যাপ্তি। এখানে নিয়ত প্রকট হয় নাগর-মানুষের জান্তব ক্ষুধার বিলোল পরিচয়।

'মেয়েটি চোখ মেলল বাইরের আকাশে—
সে-চোখে নেই নীলার আভাস, নেই সমুদ্রের গভীরতা,
শুধু কীসের ক্ষুধার্ত দীপ্তি, কঠিন ইশারা,
কিসের হিংস্র হাহাকার সে-চোখে।'[২৮]

—এই 'হাহাকার' দেখে বিনয় ঘোষ মনে করেছিলেন সমর বাবুর ভিতরটা একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে।[২৯] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। নাগরিক অস্তিত্বের গ্লানি, তার বিবর্ণ দৈনন্দিনতা, তার সঙ্কীর্ণতা, আত্মপরায়ণতা এবং অসহায়তা সমর সেন তাঁর কবি জীবনে অল্প দিনেই চিনে নিয়েছিলেন। এবং সেখান থেকেই তিনি ঐতিহাসিক চেতনার হাত ধরে সামাজিক তাগিদকে অনুভব করছিলেন। সেই চেতনার প্রকাশের জন্য প্রাণহীন শহরের 'হাহাকার'কে স্পষ্ট করেছিলেন কবিতায় নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিমায়। বিনয় বাবু সেটা লক্ষ করেননি। লক্ষ করলে, তিনিও সমর সেনের মতো শুনতেন শহরে সমস্ত দিন ভরে রোলারের শব্দ। দ্বিতীয়ত, সমরবাবুরই ঐতিহাসিক চেতনাকে ধূর্জটি প্রসাদের বক্তব্যে প্রকাশ করলে দাঁড়ায় : 'Samar Sen is an up-to date representative poet. He needs to be progressive by informing himself with a sense of history. ...... No poet can be creative unless he is basically charged with the sense of history, with the dynamics of creation. I do believe that in Bengal to day, the literature has a definitely creative social role to play through his pen. It cannot be done if he gets stuck at the recognition of a fact, that is, if he does not change it into an event'[৩০]

বিশ শতকের তৃতীয় দশকে প্রায় সমস্ত শহর জুড়েই বেকারত্বের জ্বালা সঞ্চারিত হয়েছে। সমর বাবু নিজে সেই দুর্দশাগ্রস্ত বেকারের জীবন যাত্রার সঙ্গে একাত্ম বোধ করে দেখিয়েছেন—অর্থাভাবে জীবনের রসদ জোগাড় করতে বেকার চোরা-বাজারে দিনের পর দিন ঘোরাফেরা করতে বাধ্য হয়। নিঃসন্দেহে এখানে মূল্যবোধের অপমৃত্যু ঘটে, কিন্তু বাস্তবকেও অস্বীকার করার উপায় নেই। বেকারের অন্তরে সর্বদা জ্বলে বণিক সভ্যতার শূন্য মরুময় জ্বালা। তার স্বপ্ন-বাসনা-কামনা প্রেম-প্রীতি—সবই তখন তার কাছে অপ্রাসঙ্গিক ও মূল্যহীন। এর পাশাপাশি, ফুটবল মাঠের চঞ্চলতার মতো তার অবদমিত ইচ্ছা—ভদ্রমহিলা দেখার তীব্র ব্যাকুলতা প্রকাশিত হয়। কবির কলমে সাবলীল ভঙ্গিমায় এ প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে। বেকারের আত্মক্লিষ্টতার ছবিও ফুটে ওঠে তাঁর কবিতায়।

'হে প্রেমের দেবতা, ঘুম যে আসে না, সিগারেট টানি;
আর শহরের রাস্তায় কখনো বা প্রাণপণে দেখি
ফিরিঙ্গি মেয়ের উদ্ধত নরম বুক।
আর মদির মধ্যরাত্রে মাঝে মাঝে বলি -
মৃত্যুহীন প্রেম থেকে মুক্তি দাও .... ।'[৩১]

শহরের বিকেল ক্রমে ভরে যায় কর্কশ রঙে। লোহা আর ইঁটের অরণ্যে গড়া

মহানগরীতে শেষ হয় দশটা পাঁচটার দিনপঞ্জী। সাইকেলে, বাসে বাড়ি ফেরে ক্লান্ত কেরানী। ক্লাইভ স্ট্রীট জনশূন্য হয় আস্তে আস্তে। মূল অফিস-আদালত তো এখানেই অবস্থিত। অন্যদিকে স্কুল-কলেজেও ছুটি হয় বিকেলে। 'ধীরে ধীরে মহানগরীর দিন গড়িয়ে চলে রাত্রের আশ্রয়ে। কোটরহীন চোখের মতো গ্যাসের আলো ঝুলিয়ে শূন্য মাঠে সন্ধ্যা নামে। সন্ধ্যায় একদিকে নগর কলকাতায় গৃহস্থ ভক্তদের ঈশ্বর আরাধনা চলে ভণ্ড পুরোহিতের দৌত্যে, অন্যদিকে প্রকট হয় ভূল-ভুলাইয়ার মোহময়ী, কল্পনা রঙিন জীবনের আবিলরূপ। সিনেমার সামনে ঊর্ধ্বমুখ মানুষের রুদ্ধশ্বাস ভিড় বাড়ে। তীব্র শ্লেষে ঝলসে ওঠে কবির কলমে সান্ধ্যকালীন উপভোগ্যতা।

'আজ চলুন, শহরে বেরোই,
এখানকার সন্ধ্যা দেখুন,
কফির রং,
কোন খোঁয়ারিদেবতার পানীয় যেন!'[৩২]

—এমনিতর দিন যাপনে সপ্তাহের আর পাঁচটা দিন কাটলেও, শনিবার একটু অন্যভাবে হাজির হয়। এ শহর যাদের জন্য নির্দিষ্ট করেছে লালশাড়ী আর নরমবুকের অধিকারিনী নারী, যাদের জন্য গোল্ড ফ্লেকের গন্ধ বরাদ্দ—তারা শনিবারকে একটু বিশেষ ভাবে উপভোগ করে। তাদের শনিবারের উপভোগ্যতা, শহুরে সচ্ছল বিত্তবান মানুষের উপভোগ্যতারই নামান্তর।

'মোটরের সীটে দেখে শনিবারের বিলাস,
হর্নের আকস্মিক শব্দে
চকিতে ভোলে অমর আত্মার গাম্ভীর্য,
মুহূর্তে মুখর রাস্তা পারাপার করে'[৩৩]

শনিবারের পর রবিবারে কর্মাবসান। অফিস-আদালত বন্ধ। অবসর বিনোদনের জন্য এই রবিবারে শেষ পর্যন্ত উইক এণ্ড করতে শহর থেকে সামান্য দূরে, ডায়মণ্ড-হারবারের মতো কোনো নির্জন-শ্রান্ত-নিরিবিলি জায়গার বারে বা রেস্টুরেন্টে উপস্থিত হয় এই মানুষরা। নিজেদের মোটর যানে অথবা ভাড়া করা মোটর যানে বাহিত হ'য়ে। সমরবাবুর কবিতায় চিত্রিত এই মানুষদের দেখে মনে হয়, সম্ভোগ ছাড়া পৃথিবীতে এদের দ্বিতীয় কোনো কর্তব্য নেই।

শহরে রাত্রি নামার সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল হয় চিৎপুরের বেশ্যালয়ের চিত্র। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পিচের পথে উৎসুক চোখের অশ্লীল নাগরিক আনন্দ শ্লথ হয়। থেমে যায় অবশেষে ঘুঙুরের সুর ধ্বনি। রাতের গভীরতা নামে মাতালের স্খলিত চিৎকারে। যে রাত আলকাতরার অন্ধকারের মতো গাঢ়। অগণিত মানুষের ক্লান্তির অপনোদনের পরিবর্তে অদৃশ্য অন্ধকারই প্রতিমুহূর্তে ঘন হয়।

'ম্লান হয়ে এল রুমালে
ইভিনিং-ইন- প্যারিসের গন্ধ—

হে শহর, হে ধূসর শহর!
কালিঘাট ব্রিজের উপরে কখনো কি শুনতে পাও
লম্পটের পদধ্বনি ....।'[৩৪]

একদা এলিয়ট যেমন ধ্বংসোন্মুখ পশ্চিম ইউরোপের সভ্যতাকে লণ্ডন নগরীর পটভূমিকায় দেখেছিলেন, তেমনি কলকাতার পটভূমিকায় সমর বাবু পরাধীন দেশের নাগরিক, শহর জীবনের জটিল রুদ্ধশ্বাস ও রুগ্ন রূপকে দেখেছিলেন। তবে তিনি এলিয়টের মতো এই রুগ্ন সভ্যতা জাত ফাঁপা মানুষদের জন্য করুণা প্রকাশ করেননি। 'A heap of broken images'-এ ভর করে এলিয়ট বলেছিলেন : 'We are the hollow men/We are the stuffed men/Leaning together/Head piece filled with straw. Alas!/Our dried voices, when/ We whisper together/ Are quiet and meaningless........।'[৩৫] সমর সেনও চারিদিকে চেয়ে দেখেছেন ফাঁপা মানুষের দল, ধর্মধ্বজীর ভণ্ডামি, নকল নবিস প্রগতির ভান, ফাঁকা আভিজাত্যের গর্ব। তারা কখনো পথ খুঁজেছে ঈশ্বর আরাধনায় কখনো নৈশক্লাব আর নারী সম্ভোগের মাধ্যমে।

কবির অনুভবে প্রত্যক্ষ হয়—এ বড়ো সুখের সময় নয়, এ বড়ো দুঃখের সময়। তাঁর হৃদয় তলে পোকায় কাটা বিবেকও তখন সরব হয়। শহর বাসের সমস্যা কাতর জীবনে কবি যে বিশেষ আন্দোলিত তাতে সন্দেহ থাকে না। তাঁর দেখার শেষ নেই—এ শহরে বন্যার সময় স্বেচ্ছাসেবকেরা সদলবলে দান সংগ্রহে বেরোয়, বণিকের মানদণ্ড পিঙ্গল প্রহারের যন্ত্র মাত্র, মেছুনীর সামনে সরস কেরানীর টীকা-টিপ্পনী, অসংখ্য যৌবন বলি; পলিটিক্সের বিচিত্রগতি, রাজনীতিক কর্তাব্যক্তিদের শোঁকাশুঁকি ইত্যাদি। গোটা শহর জীবনে যেন 'গ্রহণ' লেগেছে। এই সঙ্গে সভ্যতার আরেক দান-কারখানায় ধর্মঘট কবির দৃষ্টি এড়ায়নি।

সমর সেন নগরের ঘুণ ধরা সম্প্রদায়—মধ্যবিত্ত মানুষদের বোধ-বোধিহীন স্বরূপকেও তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করেছেন। তিনি জেনেছেন—এ শহর অসংখ্য দুঃস্বপ্নের দেশ মাত্র। জন্ম-জরা-জীর্ণতার জালে বদ্ধ মানুষ প্রতিষ্ঠিত বৃত্ত থেকে যেমন দলছুট, তেমনি লক্ষ্যহীনতায় মগজ কেবলমাত্র স্মৃতিতে ভরে উঠেছে। বিশেষ করে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাব্য পংক্তি-'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' গ্রহণ করে বৈপরীত্য বোঝাতে, বিদ্রূপে তীব্রতা এনে মধ্যবিত্তদের পরিচয় দিয়েছেন। স্মরণীয়, রবীন্দ্রনাথের উক্ত কাব্য বাক্যাংশে বিদ্রূপ ছিল না।

'এদিকে তাই দেশরক্ষায় বিপ্লবী নেতা হঠাৎ তৎপর,
ফলে, উচ্ছ্বসিত ভারত বন্ধু;
ধামা ধরায় অক্লান্ত, নব্যবলশেভিক সাঙ্গপাঙ্গ
পার্শ্বচর আস্ফালনে মুখর;
এপ্রিলে যে সংগ্রাম শুরু, এ্যাসেম্ব্লি হলে হবে শেষ,
এ হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে
ঝলমল করে অনেক পার্টির চিত্ত।'[৩৬]

—এই সব সমাজ ধার্মিক দেশনেতারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীতেই অঙ্গীভূত। এদের মুখে মৈত্রী আর স্বাধীনতার বুলি, অথচ এরা নির্লজ্জ-বর্বর। পথে ঘাটে চলাফেরা করতে এদের কোনো কুণ্ঠা প্রকাশ পায় না। স্বচ্ছন্দেই চলাফেরা করে। হীন স্বার্থের নাগপাশে চক্রান্তের সেতুবন্ধে এরা আবদ্ধ হয়। মাঝে মাঝে এরা রাস্তার মোড়ে মোড়ে অন্যাকে দেখানোর জন্য শ্লোগান আর স্বদেশী গানে সরব হয়ে রাজনীতি মনস্কতার পরিচয় দেয়। চরিত্রানুযায়ী এরা কবির দৃষ্টিতে যথার্থভাবেই ফুটে উঠেছে। স্বাধীনতা পূর্ব দেশনেতারাও কবির চোখে খুব একটা শ্রদ্ধা-সম্মানের সঙ্গে ফুটে ওঠেনি। দুর্বিষহ তাদের রাজনীতিবোধ। তাদের রাজনীতি এক নোংরা বৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

> 'এখানে রাজনীতি শুধু পরনিন্দা, পরচর্চা, বুড়োর ঝামেলা;
> ইজ্জতের গোলাম যারা
> একরোখা অন্ধরাগে আত্মঘাতী যারা
> এ দুর্দিনে তাদেরি আসর, রাজনীতি তাদেরি পেশা।'[৩৭]

বলা যেতে পারে, সমর সেন কলকাতাকে যে ভালো বেসেছিলেন তা ঠিক নয়—তেমনি আবার মনেপ্রাণে শহরকে ঘৃণাও করতে পারেননি। তিনি প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে এক প্রবল উত্তেজনার ভেতর যে অস্থিরতা, নিরাপত্তার অভাব, ভণ্ডামি কিম্বা নৈরাশ্যের মুখোমুখি হয়েছিলেন—তা একজন বিদগ্ধ, আদর্শবান, দার্শনিক যুবকের মতো তাঁর কাছে প্রায় বিষতুল্য মনে হয়েছিল। এখানে যৌবন যেন প্রৌঢ়—ক্রমে বুড়ো হয়ে যায় অনায়াসে। তিনি চমকে ওঠেন চারপাশের অন্ধকারকে ঘনীভূত হতে দেখে। শতাব্দীর বয়েসী হ'য়ে ওঠে তিনি শহর কলকাতাকে শ্লেষে-বিদ্রূপে জর্জরিত করতে থাকেন। এরই মধ্যে পা পা হেঁটে এসে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে সমরবাবু কলকাতাকে ছেড়ে ভারতবর্ষ, তথা পৃথিবী ও নিজেকে শ্লেষে বিদ্ধ করতে থাকেন অসাধারণ চিত্রকল্প মাধ্যমে। অনাগত সর্বনাশার এই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ শাসকেরা শহরবাসীকে শাসনের নিষ্পেষণে তটস্থ, সন্ত্রস্ত করে তোলে। কবির কলমে সে চিত্র উজ্জ্বল হয়। চাঁদনীচকে কুৎসিত ভঙ্গিমায় শিস্ দেয় এ. আর. পি. সর্দার। আর তাদের অবাধ যৌনাচার শহর কলকাতাকে নরক করে তোলে। শহরের রাস্তাঘাট তখন বেশ বিপজ্জনক হ'য়ে পড়ে। চারিপাশে লক্ষিত হয় মড়কের পূর্বাভাষ। কুৎসিত মানুষ আর বক্র, গলিত নাসার রোগাক্রান্ত নারী সহাবস্থান করে। খাদ্যাভাবে শহরে উৎসবের উচ্ছিষ্ট এরা জঞ্জালজীবী কুকুরের সঙ্গে ভাগাভাগি করে খায়।

শহরের এই দৃশ্যের পাশাপাশি মধ্যবিত্ত সমাজের গোড়া ধরে টান পড়ে যে, কবির অনুভূতিতে তাও প্রত্যক্ষ। সামাজিক-আর্থিক পেষণে মধ্যবিত্তদের অস্তিত্ব সমাজ থেকে আস্তে আস্তে লোপ পেতে থাকে। পরিষ্কার ভাবে সমাজে দুটি মাত্র শ্রেণী-বিত্তবান ও দরিদ্র শ্রেণী ফুটে ওঠে। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে প্রথম সম্প্রদায় একের পর এক প্রাকার বানায়, আর নিরন্ন-বেকার-মজুর-ভিখিরি জাতীয় দ্বিতীয় সম্প্রদায় চক্রবৃদ্ধিহারে দিনে দিনে তাদের সংখ্যা বাড়ায়। শেষোক্ত সম্প্রদায়ের নবজন্মে শহরে জাগে তিলে তিলে

গড়া কারখানার ভগ্নাংশ মাত্র। পুরোপুরি তাদের অন্নসংস্থান করা সম্ভব হয় না। জনজীবনে এরা ব্যাধি রূপে প্রকট হয়। অন্যদিকে, প্রায় একই সময়ে তেতাল্লিশের মন্বন্তর কলকাতা শহরকে এনে দিয়েছে এক স্তব্ধতা। যে শহরে ফুটে উঠেছে,

'নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত দুর্ভিক্ষের ধূপে,
কৃষ্ণবর্ণ, লোলজিহ্বা, করাল বদন!
পদপ্রান্তে নিরুদ্দেশ ধান আর গম
আর পুঞ্জীভূত পুরুষের প্রাণহীন দেহ,
ছিন্নশিশুর রক্তজবা!'[৩৮]

—এ ক্রান্তিকাল অসীম ধৈর্য্যে পার হওয়া যাবে একদিন, বলেই কবির বিশ্বাস। পার হয়ে শহরবাসী দেখবে সুদিন। কালের যাত্রায় চালচুলোহীন হয়ে তারা আর থাকবে না তখন। অতীতের সঞ্চিত গ্লানি অসংকোচে ও দৃপ্ত মহিমায় মুছে ফেলবে তারা। যৌথ আসরে, তারা শুনবে নতুন বিপ্লবের গান। ধন্য হবে তাদের নবজন্ম। বলাবাহুল্য, কবি এখানে মার্কসবাদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এবং কবির 'Sense of history' প্রখর। এই ইতিহাস চেতনা জীবনানন্দ দাসের মধ্যেও দেখা গিয়েছিল। যদিও তা ছিল অতীতমুখী। স্পেন্ডারের ভাষায় 'Outside society, outside contemporary history'। অর্থাৎ অতীত সভ্যতার ঐশ্বর্যের রঙে জীবনানন্দ বর্তমানের বিবর্ণ পৃথিবীকে রাঙিয়ে তুলেছিলেন। কিন্তু সমরবাবুর ইতিহাস চেতনা তেমন অতীতমুখী নয়, বরং ভবিষ্যৎমুখী। সে ইতিহাসের প্রেক্ষাপট সমকালীন সমাজ, সাম্যবাদী বিপ্লবের পথে যার উত্তরণ ঘটবে মনে হয়েছে। মুহুর্মুহু ক্ষত বিক্ষতে মহানগরী কলকাতার সর্বৈব বিকৃতির পাশাপাশি থেকেও কবির সৃষ্টির স্বপ্ন তাই উৎসারিত হয়েছে।

'ভস্ম অপমান শয্যা ছাড়ো
হে মহানগরী!
রুদ্ধশ্বাস রাত্রির শেষে
জ্বলন্ত আগুনের পাশে আমাদের প্রার্থনা,
সমাজ জীবনের অস্পষ্ট চকিত স্বপ্ন ....।'[৩৯]

কিন্তু আমাদের মনে হয়, একদা সাম্যবাদী কবি বিষ্ণু দের এরকম উচ্চারণের পিছনে যে দ্বন্দ্ব মূলক বস্তুবাদ-লব্ধ দৃঢ় প্রত্যয়ও সাম্যবাদী বিপ্লবে বিশ্বাস ছিল তা যেন এখানে অনুপস্থিত। আমরা দেখি নিঃসন্দেহে এখানে কবি কণ্ঠে রোম্যান্টিকতা ঝরে পড়েছে। অবশ্য এ রোম্যান্টিকতা কোনো দোষণীয় নয়। সংযত রোমান্সের উপস্থিতি আধুনিক কাব্যের এক ধরনের আধুনিকতারই লক্ষণ—রোমান্সের বিলোপ নয়। আমরা এও জানি কবিতা কবির ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। পক্ষান্তরে পাঠকের রস পিপাসু মনের আকাঙ্ক্ষিত পানীয়ও বটে। কবির ব্যক্তিগত প্রযত্ন থাকবেই—প্রচ্ছন্নভাবে হলেও বিশুদ্ধ নির্বাচিত বিষয়কে কবিতা করে তুলতে রোমান্সকে প্রশ্রয়-দান। তাই এ উচ্চারণ একটু ছকে ফেলা বলে মনে হলেও বোঝা যায় কবির এখানে বিশ্বাসের একটা জোর আছে। এই জোর

অবশ্য দলগত নয় অনেকটাই ব্যক্তিগত ধারণাজাত।

সমর সেন সমকালের নির্মমতার ও সহিষ্ণুতার প্রতি বিবেকশীল প্রতিক্রিয়া এবং সমগ্র কবিতায় তার অপরিবর্তিত নানামুখী একধর্মী ব্যঞ্জনা তীক্ষ্ণতায় প্রকাশ করলেও সেখানে পরাজয় হীন চেতনার প্রত্যয় বারেবারেই উদ্ভাসিত হয়েছে। নাগরিক মধ্যবিত্তিক জীবন যন্ত্রণার শ্বেত রক্তিম ব্যঞ্জনায় এক সামগ্রিক ও অকৃত্রিম অবয়বে উর্মিমুখর হয়েছে তাঁর কবিতা। বিশেষ করে, বাবু বিলাস, পুঁজির লোলুপ চাহনি, ইউরোপীয় প্রভাবের (যুদ্ধের দামামায়) রেঁস্তোরায় চায়ের কাপে তুফান, পাড়ায় সান্ধ্য আড্ডা— যেখানে ইন্‌টেলেকচুয়ালি মদ খাওয়ার আরাম এবং সেই আরামজাত সমকালীন সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতির প্রাণবন্ত আসর—মার্ক্স, ফ্রয়েড, রাসেল, শ, ইবসেন, ব্রেখট থেকে রামমোহন রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের চর্চা, সাম্রাজ্যবাদের হিংস্র বিশ্বরূপ দর্শন—অসহায় শ্রেণীদ্বন্দ্বের ব্যর্থ ক্ষুধিত সঞ্চরণ-দর্শন এবং এদের সমগোত্রীয় বিচিত্র সহস্র অন্য কৌনিক প্রসঙ্গ ইত্যাদি। তথাপি বলতে হয় 'বণিকের মানদণ্ডের পিঙ্গল প্রহারে বিক্ষত পর্য্যুদস্ত মহানগরীর সর্বৈব বিকৃতির মধ্যেও কবির স্বপ্ন (পলায়নী বিলাপের নয়, সৃষ্টির) উত্থিত হয়েছে প্রচণ্ড প্রত্যয় থেকে এবং সে প্রত্যয় স্থায়ী, উচ্চশির হওয়া সম্ভব হতো না যদি না মননের দৃঢ় কাঠামো তার সঙ্গে জুড়ে থাকত।'[৪০]

গ. প্রেম

সমর সেন মধ্যবিত্ত জীবনের কবি। সমর সেন নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের কবি। তিনি কলকাতা মহানগরীর কবিও বটে। কলকাতা শিল্প নগরী, সেই নগরের চৌহদ্দি ইট সিমেন্টের দেওয়ালে সীমাবদ্ধ। এখানের সময় কাটে হিসেব করে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে। কোন সবুজ উদ্দাম বসন্তের প্রবেশ নিষেধ যেন এখানে। আর শিল্প নগরীর সভ্য শাসনে 'প্রেম' পণ্য ছাড়া কিছু নয়। ফলে সমর সেনের কবিতায় প্রেম ভাবনা একটু স্বতন্ত্র।

একদা কবি-কল্পনায় যে কিশলয় প্রেম অমলকে বলতে বলেছিল যে সুধা তাকে ভোলেনি অথবা মর্মর বেদীমূলে সজল কণ্ঠে যে পরিণত প্রেম 'ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া' বলে ঘোষণা করেছিল, সেই কমনীয়, রমনীয় প্রেমের ধারণা যুগের পদক্ষেপে আমূল পরিবর্তিত। সমর সেনের কাছে 'স্যাকারিনের মত মিষ্টি একটি মেয়ের প্রেম'[৪১] হিসেবে উপস্থিত। অর্থাৎ কতকগুলি রাসায়নিক যৌগ সংমিশ্রণে উৎপাদিত মিষ্ট দ্রব্য কৃত্রিম ও ক্রয়যোগ্য পণ্য হিসেবে স্যাকারিন যেমন উল্লেখ্য ঠিক তেমনি মানব মানবীর প্রেমও বর্তমানে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ চাহিদার সমন্বয় ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি জীবনানন্দের মতন যেমন বলতে পারেননি 'প্রেম ক্রমাগত আঁধারকে আলোকিত করার প্রমিতি'[৪২] মাত্র, তেমনি স্বীকার করতে পারেননি বুদ্ধদেব বসুর উচ্চারণও : 'যে প্রণয়/বিবসন বিশুদ্ধ, জান্তব/মৃত্যু নেই তার'।[৪৩] যদিও তার কবিতায় প্রাধান্য পেয়েছে প্রেমের স্থূল শরীরী রূপেরই উদ্দামতা। সূক্ষ্ম ভাবনার কোন স্থান নেই। সেখানে শ্রেণী

ভারানত সুন্দরীদের কালিদাসীয় সন্ধ্যা যেমন কল্পনা করা যায় না, তেমনি প্রেমের তুফানে ওঠা পড়া ভাবের টানাপোড়েনও আশা করা যেতে পারেনা।

যন্ত্রসভ্যতার অভিঘাত ছেদ টেনেছে প্রেমের ঐশ্বরিক ভাবনা ও অনুভবের মধ্যে। পবিত্র প্রেম আজ কল্পনার সামগ্রী মাত্র। যুগের অবক্ষয়িত মনোভাবকে কাব্যমধ্যে ধারণ করেছেন সমর সেন। তাঁর মনে হয়েছে একদা প্রেম ছিল, কিন্তু বর্তমানে আর তা অবশিষ্ট নেই।

> 'কোনো নগরে একদিন যেন ছিল
> চারিদিকে মেঘলার মতো শালবনের অন্ধকার,
> পাহাড়ের মত মেঘবর্ণ প্রাসাদ, অরণ্যে প্রেম,
> আর আজও তো আছে
> কাঁচা ডিম খেয়ে প্রতিদিন ঘুম,
> স্ফীতোদর দাম্ভিক স্বামীর পিছনে গর্ভবতী সতী সাবিত্রী,
> আর বন্যার মতো পুত্র কন্যা, অরণ্যে রোদন;'[৪৪]

—আমাদের অজানা নয়, নারী রত্ন লাভের জন্য পুরুষ চরিত্রে প্রয়োজন চারিত্রিক বলিষ্ঠতা, বীর্য, স্বাধীকার প্রমত্ত নির্ভিকতা, নন্দনকাননতুল্য বা পুরুরবার রাজ অন্তঃ পুরতুল্য অতুলনীয় ঐশ্বর্য—এ সমস্তই বর্তমানে নষ্ট হয়ে গেছে। নন্দনকানন, পুরুরবা, কেশী বর্তমানে কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। পক্ষান্তরে সেই নারীরত্নরাও আর বর্তমানে নারীরত্ন হিসাবে নেই। তাদেরও হারিয়ে গিয়েছে তপোবন ধন্য জীবন, হারিয়েছে তপোবন কন্যাতুল্য বা পুরাণ রমনীতুল্য ক্রিয়াকর্মাদি। পরিবর্তে উপস্থিত আছে কেবল শারীরিক উত্তেজনা। ক্লান্তিকর অভ্যস্থ সঙ্গম। আছে নারী ধর্ষণের ইতিহাস হওয়ার জন্য কাঁচা ডিম খেয়ে প্রতিদিন ঘুমের প্রস্তুতি। আইন শাসিত, শাস্ত্র শাসিত যে সভ্য সমাজ নারী ধর্ষণকে পাপ বলে জানে, শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে জানে, সেই আদিম অরণ্যচারী কামুকতাই আজ প্রাধান্য পেয়েছে। প্রেম নয়। স্বপ্ন যাই থাকুক না কেন—মধ্যবিত্ত রক্তে বীজমন্ত্র হয়েছে যে ভাবনা তা হল পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা। কবির দৃষ্টিতে সৃষ্টি তাই অবক্ষয়ের দিক থেকে মাত্রা পেয়েছে। এজন্যই জীবনানন্দের বিশ্বাস—'তবুও নদীর মানে স্নিগ্ধ শুশ্রূষার জল/সূর্য মানে আলো, এখনো নারীর মানে তুমি'[৪৫] সমর সেনের কাছে প্রাধান্য পায়নি।

সমরবাবু প্রেমকে উল্লেখ করেছেন 'রোমান্টিক ব্যাধি' হিসেবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রেম প্রসঙ্গে এই ব্যাধি জনিত নানা বিকারেরও আভাস দিয়েছেন। মধ্যবিত্ত সমাজের নানা সামাজিক, অর্থনৈতিক কারণে বহু হৃদয় জনিত ক্ষয়-ক্ষতি নানা প্রতিক্রিয়া ঘটায় যুবজীবনে—একথা জানিয়েছেন তিনি, সেই মধ্যবিত্ত সমাজের যুব সম্প্রদায়ের প্রতিভূ সেজে। তবে প্রেমকে রোম্যান্টিক ব্যাধি হিসেবে অভিহিত করলেও তার প্রথম পর্বের কবিতা বিশেষত ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে লেখা কবিতা রোম্যান্টিক ব্যাধির নিদর্শনই। এবং বলা বাহুল্য, এগুলির বেশ কিছু যথার্থ কবিতায় রূপান্তরিত হয়েছিল।

এর পশ্চাৎপট হিসেবে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, যে বাল্যকালে সকালে কলকাতায় ক্লান্ত গণিকাদের কোলাহলে কবির ঘুম ভাঙতো। সেই শৈশবের ঘুম ভাঙা অতীত থেকে গণিকারা বিভিন্ন ভঙ্গিতে তাদের উপস্থিতি জানিয়েছিল কবির কবিতায়। এবং কবির মমত্বও এদের প্রতি বর্ষিত হয়েছিল। 'ভিজে ফুলের মত নরম (এদের) প্রেম'[৪৬] কবিকে অনুতপ্ত করেছিল। বিশেষ করে একাধারে এদের মধ্যে প্রেমের মধুলাবণ্য ও অসহায়ত্ব— অন্যদিকে নির্মম পীড়নকে কবি অনুভব করেছিলেন। তাঁর মনে মুগ্ধতা ও তিক্ততা একই সঙ্গে কাজ করেছিল।

দ্বিতীয়ত, কবির মনে ব্রহ্মবিহারী বাবুর (প্রতিবেশী) প্রণয়িনী, অসাধারণ সুন্দরী, শিক্ষিতা ভদ্রমহিলার মার্জিত রুচি, গুণী, নম্র আদর্শ ভেঙে চুরে মিলেমিশে একাকার সৃষ্টি করেছিল। পাশাপাশি 'বাবুবৃত্তান্তে' উল্লিখিত আরেকটি ঘটনাও এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। 'একটি মেয়েকে দেখার জন্য সন্ধ্যেবেলায় আমাদের চার তলায় নেড়া ছাদে ভিড় হত। মেয়েটির নাম ইতি, পাকা সোনার মতো রঙ, দেহের গড়ন দেখার মতো। বিশেষ করে সাঁঝের বেলায় গা ধোয়ার পর যখন শাড়ি মেলে দিতে আসত'[৪৭] মন্তব্যে কবির নারীরূপ বর্ণনাতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।

'আমাদের স্তিমিত চোখের সামনে
আজ তোমার আবির্ভাব হল :
স্বপ্নের মত চোখ, সুন্দর, শুভ্র বুক,
রক্তিম ঠোঁট যেন শরীরের প্রথম প্রেম,
আর সমস্ত দেহে কামনার নির্ভীক আভাস,'[৪৮]

তৃতীয়ত, কবির সহপাঠী বন্ধু দেবীভূষণ ভট্টাচার্যের বোন—অপর্ণা ভট্টাচার্য্যের প্রতি কবি অনুরক্ত ছিলেন। কবির বর্ণনা : 'দেবীর ছোটবোন অপর্ণা কথা বার্তায়, ব্যবহারে বেশ সপ্রতিভ। চেহারা ও রঙের কথা উঠলে বলতো: আমাকে দেখতে ছাল ছাড়ানো মুরগির মতো। অপর্ণার প্রতি আমার বিশেষ টান ছিল।'[৪৯] বলা বাহুল্য, এরই টানে তিরিশের দশকের শেষে তিনি প্রায়ই যেতেন কৃষ্ণনগরে দেবীবাবুদের বাড়ি। সেখানে যাওয়া নিয়ে তাঁর অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁর সঙ্গে পরিহাস করতেন। অবশ্য কোনো এক বিশেষ কারণে দেবীবাবুদের পরিবারের সঙ্গে কবির সম্পর্ক তৈরী হ'তে পারেনি।

চতুর্থত, সাঁওতাল পরগণার প্রতি কবির অনুরক্তির কথাও এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য। বিশেষ করে, সেখানে অল্পবয়েসী সাঁওতাল মেয়েদের সৌন্দর্য দেখে কবির মনে হত তারা যেন খোদাই করা সৃষ্টি।

পঞ্চমত, তিনি কিছুকাল বুদ্ধদেব বসুর সান্নিধ্যে এসেছিলেন এবং বলা বাহুল্য, বুদ্ধদেব বসু লরেন্স ও বোদলেয়ারের কবিতায় আশ্রয় খুঁজেছিলেন কিছুদিন। লরেন্সের ছিল আদিমতার টান এবং বোদলেয়ারের নির্বেদ ও বিতৃষ্ণতা তো সর্বজন বিদিত। এই বোদলেয়ারের স্বভাব যেন কিছুটা সমর বাবুর কবিতায় বর্তেছিল। তবে তিনি বোদলেয়ার অপেক্ষা বেশ স্বতন্ত্র। অবশ্য তিনিও বোদলেয়ারের মতো বুঝেছিলেন, প্রেমের কার্যের

মধ্যে রয়েছে এক নির্যাতন ও কাঁটা ছেঁড়ার সাদৃশ্য। যার কথা বোদলেয়ার স্বয়ং তাঁর 'Intimate Journals'-এ জানিয়েছেন : "There is in the act of love, a great resemblance to torture or to a surgical operation."[৫০]

এই সমস্ত সূত্রের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে, সমর সেন প্রেমের কবিতায় রোম্যান্টিক ছিলেন। বিশেষ করে প্রথম পর্বের কবিতায়। এই সঙ্গে তাঁর কবিতার ক্ষেত্রে গীতিময়তার এক অরুণ প্রহব লক্ষিত হয়। ফলে লিরিসিজমের সঙ্গে রোম্যান্টিকতা যুক্ত বেণী রচনা করেছিল। উল্লেখ্য, এ রোম্যান্টিকতায় কল্পনা হয় মনন নির্ভর। আবেগ হয় শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং গতি হয় অ-অতীন্দ্রিয় মুখী। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়মুখী বা জীবনমুখী। এ বৈশিষ্ট্য কম্পটন রিকেট কথিত রোমান্টিসিজমের তিনটি বৈশিষ্ট্যের একটি—an instinct for the elemental simplicities of life—কে স্মরণ করায়। অর্থাৎ জীবনের সারল্যের প্রতি মমত্ববোধ সমর সেনেও বর্তমান। এই রোম্যান্টিকতায় ভর করে তিনি তার প্রণয়িনীকে নিয়ে যেখানে গৃহস্থালি সাজাতে চেয়েছেন, সে জগতে প্রভাতের রক্তিম আশা কম্পমান। কবির চারপাশের বর্ণহীন আকাশ, পারহীন অন্ধকার, ধূসর সমুদ্র থেকে আসা হাহাকারের কোনোখানেই এ জগৎ উপস্থিত নয়। অথচ এ সমস্তের পাশাপাশি থেকেই সেই জগত আবিষ্কারের স্বপ্ন কবির চোখে। এবং বর্তমান জগতের অন্ধকারের মোড়ক খুলেই তিনি সেই আশ্চর্য উপহার অর্জন করার পথে যাত্রী ছিলেন।

এছাড়া কবিরা এমনিতেই রোমান্টিক হন কম বা বেশী মাত্রায়। তারা স্ব হৃদয়কে এবং স্বহৃদয়-হৃদয়কে নতুন আলোকে উপস্থাপনা করতে প্রয়াসী হন। সমরবাবুও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। আবার এও উল্লেখ্য, কবি যখন সবেমাত্র কবিতা লিখতে শুরু করেন—তখন আমাদের দেশের উত্তরোম্যান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথ জীবিত ছিলেন। সেই রোম্যান্টিক আবহাওয়া অতিক্রম করতে করতেও তার সৌরভ সমরবাবুর কল্পনায় অনুরণিত বললে অত্যুক্তি হয়না।

তবে সমরবাবু রোম্যান্টিক হলেও যন্ত্রণাকে আবেগ প্রাবল্যে ভাসিয়ে দেননি। পদাবলীতে, গীতি কবিতায় এতদিন পর্যন্ত সব যন্ত্রণারই গান হয়েছে, সুর হয়েছে—কিন্তু আমাদের কবির কবিতায় যন্ত্রণা কোনো মূর্চ্ছনায় পর্যবসিত হয়নি। হয়েছে একটি চরিত্র। ক্ষুব্ধ, অ-সহিষ্ণু, বিকারগ্রস্ত, বিশৃঙ্খল এলোমেলো চিন্তায় চিহ্নিত এক চরিত্র। পাহাড়ের মতো পাষাণ, কঠিন এবং স্তব্ধ, মরুভূমির মতো জীবন্ত জ্বালার বিচিত্র এক চরিত্র। এ চরিত্র গান না গেয়ে, সুর না ভেঁজে, ক্লান্ত-তপ্ত মনের অন্ধকারে স্মৃতিলীনা নায়িকার ছায়ার আশেপাশে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। এ প্রসঙ্গে আলোচক রণজিৎ গুহের মন্তব্য যথার্থ : 'উদ্ভিন্ন যৌবন কামনা আধুনিক বাংলা কাব্যের একটি অভ্যস্ত বিষয় বলে গণ্য অন্ততঃ 'কড়ি ও কোমল' থেকে সুরু করে। কিন্তু সেই রেওয়াজে মাধুর্যের আধিক্য এতই যে যৌনোন্মেষের তিক্ততার দিকটা প্রায়শই অস্বীকৃত থেকে যায়। প্রেম তাই লজেঞ্চুষের মতো মিষ্টি ও শরবতের মতো তরল পদার্থ বলে বোধ হয়। কিন্তু সমরদার কবিতায় যৌনতা ও প্রেম আশংকায় সঙ্গীন ....এমনকি বিষাক্ত. .....।'[৫১]

যৌবন বড়ো যন্ত্রণার কাল। সেই যৌবনে যে প্রেম নরনারীর জীবনে দহন শেষের কর্পূর গন্ধী স্মৃতি ছাড়া বিশেষ কিছু রাখে না—কবির হাতে তার মর্মভেদী যন্ত্রণা, বিষাদ, করুণায় মাখামাখি হয়ে শিল্প ছন্দে শোভিত। কবিমনকে কোনোদিন হাওয়ার নামহীন ফুলের অদ্ভুত চাপা মদির গন্ধ আবিল ক'রে তোলে; কোনোদিন কবির মনে আসে চাঁদের অদ্ভুত রেখার সঙ্গে তাল মিলিয়ে দূরের বার্তা। গভীর অন্ধকারে অস্থির হ'য়ে ওঠে কবিমন রক্ত করবী ভালোবাসায়। কিন্তু ব্যর্থ প্রতীক্ষায় প্রহর শেষে গন্ধবহ বাতাস ও পাতার মর্মর ধ্বনিতে বিলীন হয় রক্তের চঞ্চল বলাকা। শুধু তা-ই নয়, স্মৃতি কুরে খায় কবিকে। একদা যে প্রেম এসেছিল, কিন্তু স্থায়ী হয়নি—তা স্মার্ত অর্জিত পরিস্ফুট হয়। ছোটো দহন, ছোটো আলো ও ছোটো ব্যথার কণিকায় ভর ক'রে। পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন অবস্থায় কবি মনের স্মরণীয় অভিজ্ঞতায় প্রেমের বিচিত্র চলচ্ছবি উদ্ভাসিত হয়। তিনি অনুভব করেন—শুধুই প্রেমিকার জন্য প্রেমিক হৃদয়, রক্তে উন্মাদনা তোলে প্রেমিকার স্মৃতি। তখন পরিষ্কার হয় রোম্যান্টিক ব্যাধিই কবিকে ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো সতত তাড়া করে ফেরে।

'রাত নেই, দিন নেই, বারে বারে চমকে উঠি,
আমার মনে শান্তি নেই, আমার চোখে ঘুম নেই,
স্পন্দমান দিনগুলি আমার দুঃস্বপ্ন।'[৫২]

অবশেষে সম্ভোগ তৃষ্ণায় পেয়ে বসে প্রেমিক কবিকে। এই তৃষ্ণায় গড়া এক জীবন্ত কামনা প্রেমিক শরীরের রক্ত উদ্বেলিত করে। সমস্ত দিন, আর সমস্ত রাত্রি ভরে প্রেমিকাকে পাবার বাসনা বিষাক্ত সাপের মতো জড়িয়ে ধরে কবির মনে। প্রেমিক মানসের এই বর্ণনায় সমরবাবু কল্লোলীয় কবিদের মতো বিশদ হয়ে সম্ভোগ দৃশ্য উপস্থাপনা করেননি। আভাসে একটি মাত্র উপমা—'বিষাক্ত সাপের মতো' ব'লে সম্ভোগের ক্ষুধা, আনন্দ, বেদনাময় চরিত্রেরই ইঙ্গিত দিয়েছেন। বিষাক্ত সাপের মিলন রীতিমতো শিল্প সামগ্রীর বিষয়তুল্য। বৈষ্ণব কবিদের সম্ভোগ চিত্রায়ন—'প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর'ও বুঝি এ সম্ভোগ তৃষ্ণার ছবির কাছে ম্লান হয়ে যায়। প্রসঙ্গত 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যের কবি বুদ্ধদেব বসুর অনুরূপ উচ্চারণ স্মরণ করা যেতে পারে—

'শিরায় শিরায় শত সরীসৃপ তোলে শিহরণ,
লোলুপ লালসা করে অন্য মনে রসনালেহন।'[৫৩]

কিন্তু সমরবাবু বুদ্ধদেব বসুর মতো প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে চিরন্তন বন্দী থাকতে চাননি। আর সেখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। ইন্দ্রিয়জ প্রেমের অবাধ উলঙ্গ বিক্রমকে তিনি এভাবে একটি মাত্র উপমা প্রয়োগে আরো কয়েক জায়গায় অব্যর্থ করে তুলেছেন, যার মধ্যে অন্যতম একটি :

'—উজ্জ্বল, ক্ষুধিত জাগুয়ার যেন
এপ্রিলের বসন্ত আজ।'[৫৪]

পুষ্পশর আর পুষ্পধনু রচিত বসন্ত কালীন সমস্ত কুসুম-পেলব প্রস্তাবনা পদদলিত

করে, অবদমিত কামনা বাসনার অন্ধকার অরণ্য থেকে জাগুয়ারের মতো সুযোগ সন্ধানী, শোণিত লোভী একটি বর্বর বলবান প্রবৃত্তি এসে কবির জাগ্রত চৈতন্যের দরজায় কড়া নাড়া দিয়েছে। অবশ্য কবির নির্লিপ্ততায় কোনো কম্পন শেষ পর্যন্ত সাড়া জাগাতে পারেনি। তাঁর নির্দ্বিধায় ঘোষণা তাই অর্থবহ।

'কেতকীর গন্ধে দুরন্ত,
এই অন্ধকার আমাকে কী করে ছোঁবে?
পাহাড়ের ধূসর স্তব্ধতায় শান্ত আমি,
আমার অন্ধকারে আমি
নির্জন দ্বীপের মতো সুদূর নিঃসঙ্গ।'[৫৫]

এখানে কবির 'অন্ধকার' এসেছে তাঁরই প্রেমের ব্যর্থতা বা মৃত্যুর দ্যোতকে। কীটসের মতো নাইটিঙ্গেলের কল্পলোকে তাঁর অধিষ্ঠান আর সম্ভব হয় না। তাঁকে ফিরে আসতে হয় বাস্তবের রূঢ় কঠিন মৃত্তিকায়। অর্থাৎ কবির রোম্যান্টিক ব্যাধিগ্রস্ত চিত্তের মুক্তি ঘটে দ্রুত। অন্যদিকে, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ততোদিন অন্য আরো অনেকের মতো মদনরাজত্ব থেকে বার কয়েক বিতাড়িত হয়েছেন। এব্যাপারে তাঁর স্বীকারোক্তি—'যৌবনের শুরুতে দু-একবার হোঁচট খেয়ে রোম্যান্টিক হাবভাব ছিল না।'[৫৬] ফলে কবির প্রেমের কবিতার দুটি চারিত্র ধর্ম—মৃত্যুহীন প্রেম থেকে মুক্তি প্রয়াস এবং অমৃতহীন প্রেমকে নির্বাসন লক্ষিত হয়।

অনুচ্চারিত কাল ব্যবধানে, কবির নারীর প্রতি মুগ্ধতা অপসৃত। পক্ষান্তরে, প্রকাশ পেয়েছে তিক্ততা। এ অবস্থায় নারীর প্রতি মত্ততা নারী বিদ্বেষে রূপান্তরিত হয়। আকুতি জানান তিনি,

'কতদিন, কত মন্থর, দীর্ঘদিন,
কত গোধূলি-মদির অন্ধকার,
কত মধুরাতি রভসে গোঙায়নু,
আজ মৃত্যুলোকে দাও প্রাণ........।'[৫৭]

—এখানে প্রেম জীবনও মৃত্যুলোক সমর্থক দেখা যায়। প্রত্যক্ষতাকে অবলম্বন করে অভিজ্ঞ নাবিকের মতো কবিব কবিচিত্ত বাস্তবের জমিতে নোঙর করেছে। হারিয়ে গেল কবির স্বপ্ন মদির কোনো সুদূর সৌন্দর্যলোক। তিনি ভুলতে চাইলেন জীবনের পরাজয়ের গ্লানি। পরোক্ষভাবে, কোনো সতেজ জীবন্ত উদ্দীপনার প্রশ্রয়ে হতাশা-ক্লান্ত জীবন আশ্বস্ত হ'তে চাইল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথের হাত ঘুরে পাওয়া পুরাণ প্রসঙ্গ এখানে ব্যবহৃত। কিন্তু প্রেমের আচ্ছন্নতা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টাতেই তার ব্যবহার। রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসী, বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে'—জাতীয় আবেশে তার সায় নেই। প্রেমের দেবতা মদনের বাসনাময় জগতে শুধু ক্লান্তিই আনে—তার অবসানই তাই শ্রেয়। সমরবাবু চান প্রস্তুতি হীন, ধৈর্যহীন, অকাল বসন্তের বদলে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে আসতে! যে মৃত্যু—আসলে প্রেম-হীন

বাসনারই মৃত্যু। স্পষ্টত যৌনতা আর শরীর সর্বস্বতা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাতেই তিনি 'আজ মৃত্যু লোকে দাও প্রাণ' উচ্চারণ করেছেন। অথচ সমরবাবুকে 'রুদ্ধরতির কবি' বলে অরুণ সরকার বুঝতে ভুল করলেন। তাঁর মতে—'রুদ্ধরতি আর রাজনীতির সামান্য ফাইফরমাস খেটেই তাঁর(সমর সেন) কবিতা আট বছরের মধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়ল।'[৫৮] কবি সমালোচক অরুণ সরকারের দ্বিতীয় অভিযোগ (রাজনীতি সম্পর্কে) পরে 'মেঘমদির মহুয়ার দেশ' শীর্ষক আলোচনায় কতটা সত্যতা আছে তা লক্ষ্য করব। এমনকি বুদ্ধদেব বসু ও সমর সেনের কবিতায় অশ্লীলতার গন্ধ পেলেন। যিনি একদা অভিমত প্রকাশ করেছিলেন সমর সেন রোম্যান্টিক হবার ভরপুর ইচ্ছে নিয়েও রোম্যান্টিক হতে পারেননি বলে। এ প্রসঙ্গে বিষ্ণু দে 'পরিচয়ের আড্ডা সম্পর্কিত শ্যামল কৃষ্ণ ঘোষের ১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭-এর ডায়েরিতে জানিয়েছেন : 'পরিচয়ের বুর্জোয়া পিউরিটানিজম এর প্রভাবে তিনি (বুদ্ধদেব) নাকি এতদূর আচ্ছন্ন হয়েছেন যে সমর সেনের একটি কবিতায় নারীদেহের বর্ণনা অশ্লীল বলে মনে হওয়ায় তিনি সেটা কবিতা কাগজে ছাপতে চাননি।'

ক্রমশ আত্মধিক্কারের ধাক্কায় উপকূলবর্তী হতে চাইল কবির নিমজ্জমান প্রাণ। প্রবঞ্চক প্রেমের প্রতি অপরিসীম তুচ্ছতাবোধ প্রকাশ পেল অনায়াসে। ধিক্কার মুহুর্মুহু ফেটে পড়ে কবিতায়।

> 'একটি মানুষকে ভুলতে কতদিনই আর লাগে,
> কতদিনই বা লাগে শরীর থেকে মুছে ফেলতে
> আর একজনের শরীর সর্বস্ব আলিঙ্গন
> মধ্যবিত্ত আত্মার বিকৃত বিলাস,'[৬০]

—অর্থাৎ প্রেমিকার প্রতি, শরীর সর্বস্ব আলিঙ্গন তথা ইন্দ্রিয়শক্তির প্রতি মধ্যবিত্ত আত্মার বিকৃত বিলাস তথা কবির নিজেরই প্রতি ধিক্কার। পাশাপাশি সমস্ত দুর্বলতাকে দূরে সরিয়ে কবি উদ্যাম ও উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ হন পুনরায়। কিন্তু অচিরেই কবির সেই প্রত্যাশা—সবুজ উদ্দাম বসন্ত নামবে—নিষ্ঠুর বাস্তবের ধাক্কায় ধূলিসাৎ হয়। কবির সামনে এসে আবির্ভূত সেই স্বল্পবিত্ত কেরানি জীবন—যে জীবন ঘড়ির কাঁটার তালে তাল মিলিয়ে চলে। ডাস্টবিনের সামনে মরা কুকুরের যন্ত্রণা কাতর মুখের সঙ্গে কেরানির মুখের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। যে প্রতিকারহীন শক্তির বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। যদিও সেই প্রতিকারহীন শক্তির হাতে মার খাওয়ার অজস্র ক্ষত চিহ্ন বর্তমান তার মধ্যে। কবির বিস্ময়ই বাড়ে—কোনদিন এখানে কি বসন্ত নামবে, যে বসন্ত উদ্দাম ও সবুজ! আস্তে আস্তে শহরবাসীর দুঃখের জোয়ারে ভেসে যায় প্রেম জীবন। তখন কবি নারীকে— শুধুমাত্র নারীকে কেন্দ্র করে আর একটাও কবিতা লিখলেন না। বাস্তবের তীব্র কূট কচালির মধ্যে প্রেম অনিবার্যভাবে প্রবিষ্ট হয়েই ক্ষত বিক্ষত হল। ততদিনে কবি জেনেছেন :

> 'আমাদের ডাল ভাঙা ক্রোশের শেষ নেই,

গুমোট কাল,
একদিন ছেড়ে অন্য মজ্জাহীন দিনে হাঁটি ঃ
উড়ন্ত চিল আকাশে নীলবিন্দু,
এক-একবার ঘুঘু ডাকে।'[৬১]

এই ক্রান্তিকালে শহুরে প্রেম যৌনতারই নামান্তর। সে যৌনতা পণ্যের সমগোত্রীয়। নরক শহরে ভীড় বাড়ে তাই গণিকাদের। যারা চোখের ইশারায় মদির কটাক্ষে আমন্ত্রণ জানায় পুরুষকে। কবি জানিয়েছেন ধনতান্ত্রিক সভ্যতায় 'প্রেম' মানেই 'পণ্য প্রেম'। এর ক্ষণিক নিষ্ফলতাকে তিনি বালুময় মরুভূমির ভাবাণুষঙ্গে দেখেছেন। অর্থাৎ 'আমাদের পিরীতি বালুর বাঁধ,/গণিকার প্রেম আমাদের উজ্জ্বল পৃথিবী।'[৬২]

নাগরিক জীবনে যুবসম্প্রদায় যৌবন যন্ত্রণার আশু উপশমের কোনো সুষ্ঠু সমাধান খুঁজে না পেয়ে দুর্বার যুবতী-উর্বশী সদৃশ গণিকাকে বেছে নেয়। এদের কথা বলতে গিয়ে সমরবাবু উপমাযোগে বলেছেন, বিজয়ী অর্জুন আজ পণ্যযুবতী-সঙ্কুল পথে সঙ্গোপনে ঘোরে। অর্জুন বোঝাতে এখানে যুবসম্প্রদায়। প্রসঙ্গত স্মরণ করতে পারি, ত্রিশ-চল্লিশের দশকে আমাদের যুবসম্প্রদায়ের এক অংশে—বিশেষত শিক্ষিত সাহিত্যিক মহলে যে বোহেমিয়ান বাতাস বয়েছিল, তাদের সম্পর্কে কবি অবহিত ছিলেন। 'বাবু বৃত্তান্তে' এদের সম্পর্কে বলেছেন : 'হামসুনের হাওয়ায় অনেক লেখক লম্বাচুল রেখে আদ্দির পাঞ্জাবি অনেকটা ছিঁড়ে ফেলে বারবধূদের ওখানে নানা রকম অনিয়ম করে যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হতেন। এঁদের নিয়ে ঠাট্টা করতে পারেন, কিন্তু নিজেদের ক্ষতি করে সাহিত্যাদর্শ ও জীবন যাত্রার সমন্বয়ের প্রয়াস আজ-কাল বড়ো একটা দেখা যায় না।'[৬৩] বস্তুত কবির এই অনুভূতি প্রেমিক যুবকের প্রকৃতি নির্ম্মাণে ক্রিয়াশীল ছিল। অতিনির্মমতার সঙ্গে পার্থিব করে তুলেছেন তাদের।

'নরম মাংস স্তূপে গভীর চিহ্ন এঁকে
নববর্ষের নাগরিক চলে গেল রিক্ত পথে,
বন্ধ্যা নারীর অন্ধকারে পৃথিবীকে রেখে।'[৬৪]

এই যুবকদের সমুদ্র-মদির উর্বশীর কল্পনাও স্বভাব বশত শরীর সর্বস্ব। তাদের কাছে উর্বশীর বিকল্পে সেই মেয়েরাই বধূ হিসেবে বরণীয়া—যারা সাংসারিক হাজারো দায়-দায়িত্বের ভার বহনে ক্লান্ত, কিন্তু উর্বর। অর্থাৎ গর্ভ ধারণে সক্ষম। তাদের চোখে নারী ভোগ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সমরবাবুর কলমের ডগায় এই যুব সম্প্রদায়ের প্রতি যেমন শ্লেষ বর্ষিত, তেমনি ঐ নারীদের সম্পর্কেও মমতা ঝ'রে প'ড়ে। চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে যেসব উর্বর মেয়েরা তাদের গর্ভ নিয়ে বিষণ্নমুখে হেঁটে আসে—তারা আসলে এই সভ্যতার অনুর্বর চরিত্র ধর্মকেই রূঢ় ভাবে ব্যঙ্গ করে। তারা সন্তান ধারণের আগে সবুজ-সকালে তিক্ততার সঙ্গে পার হয়ে আসে অতৃপ্ত রাত্রির ক্ষুধিত ক্লান্তি আর দীর্ঘশ্বাস। তাদের স্বাধীন সত্তা ব'লে তখন আর অবশিষ্ট থাকেনা কিছু। এর আগে বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায়ও

বন্ধ্যা সভ্যতার সৃষ্টিশূন্যতাকে আমরা যেমন লক্ষ্য করেছি, ঠিক তেমনি সমরবাবুও সভ্যতার এই অবক্ষয়কে কবিতায় অভিহিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। এরই অনুসৃতিতে তাঁর 'ঘরে বাইরে' কবিতাটির কথা তুলতে পারি। সেখানে কেরানীর সংসারে স্বামী-স্ত্রীর অভ্যাস-আচরণ, তাদের আর্থিক দুরবস্থা এবং এই দুরবস্থা পরিবর্তনের আশ্বাস—সমস্ত দিক উল্লিখিত হলেও প্রেমের প্রসঙ্গ বা প্রেম অনুপস্থিত। নিত্য অভাব-নিত্য অনটনের রাজ্যে কোনো নবজাতকের আবির্ভাব সূচনা শুভ না হয়ে বিরক্ত ও ক্ষোভেরই কারণ হয়। অথচ তারা স্ত্রীকে শারীরিক ভাবে উত্তেজিত করতে প্রতিদিন কাঁচা ডিম খাওয়াতে যে কৌশল গ্রহণ করে, তা দৃষ্টিকটুভাবেই চোখে পড়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতে নারীর সেই গর্ভস্থ অনাগত অতিথিকে সমরবাবু একটু বিচিত্রভাবে অভিহিত করেছেন।

'.......... গর্ভের ঘুমন্ত তপোবনে কৃষ্ণবর্ণপুরুষ
তোমাকে নিরন্তর কাপুরুষ প্রহার করে;
সেইদিন লুপ্ত হোক যেদিন মানুষ পৃথিবীতে আসে।'[৬৫]

আজ তপোবন নেই। তপোবনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও নেই। নেই আদিত্য বর্ণপুরুষকে জানতে পারার মতো দিব্যজ্ঞান। কিন্তু ঋষি ও অপ্সরার মিলন হেতু 'গর্ভধারণ' ব্যাপারটি অব্যয় স্বরূপ রয়ে গেছে। সেজন্য এখানে ঘুমন্ত তপোবন সদৃশ গর্ভ, আর একালের দৈন্য পীড়িত মানুষের একমাত্র বর্ণ—কলিকালের কৃষ্ণবর্ণ অভিহিত হয়েছে। ক্ষয়িষ্ণু জীবন জন্ম দেয় ক্ষয়িষ্ণু জীবনকেই। কেরানী মধ্যবিত্তের জীবনে 'নবজন্ম' তাই প্রহসনের জন্য ছাড়া কিছু নয়।

এ সংসারে মানুষ দিনগত পাপক্ষয়কে সম্বল করে কলুর বলদের মতো ঘানিগাছের চারিপাশে শুধুই আবর্তিত হয়। এদের যেন কোনো প্রেম, মাধুর্য, রোমান্স থাকতে পারে না। সমরবাবু পুরাণের ঐতিহ্যে এদেরকে নতুন ভাবে স্মরণ করেছেন। পৌরাণিক (রঘুবংশম্) রাজা অগ্নিবর্ণ যথেচ্ছ যৌনাচারে ও আনুষঙ্গিক সুরাপানে লিপ্ত হয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। তার বংশের পূর্বপুরুষ দিলীপ, রঘু বা রামচন্দ্রের মতো সংযত-সুন্দর দাম্পত্য জীবন যাপনে আগ্রহী ছিল না সে। এই রাজা অগ্নিবর্ণের মতো একালের অগ্নিবর্ণরাও দাম্পত্য প্রেমে আস্থা রাখতে পারে না। এরা তারই মতো যথেচ্ছ নিষ্ফল রতিক্রিয়ায় রত হয়েছে। সমরবাবু আমাদের এও জানিয়েছেন, যে নারী সমস্ত অসহনীয় অবস্থা মেনে নিয়ে এবং মানিয়ে নিয়ে যখন বধূ হয়ে জননী হয়—তখন যথা নিয়মে বর্ষা এলেও প্রেমের বাতাবরণ সৃষ্টিকারক, মেঘদূতের উদয় হয় না। সেই নারীর স্বাধীন সত্তা, স্বাধীন মতামত বলে কিছু থাকে না। সেখানে প্রেম তো দূরের কথা, দাম্পত্য প্রেমও থাকেনা। থাকে শুধু স্বামীর সঙ্গে অভ্যস্ত সহবাস। পৃথিবীর সমস্ত দুর্যোগেও তাকে ফিরতে বাধ্য হ'তে হয় তাই তার চিরাচরিত সংসারে। এর সংসারে ফিরে যাওয়ার কারণ কবির কাছে দুর্জ্ঞেয়ই থেকে যায়। কবির উদ্বিগ্নতাই বাড়ে : 'হে ম্লান মেয়ে, প্রেমে কী আনন্দ পাও,/কী আনন্দ পাও সন্তান ধারণে?'[৬৬]

ক্রমে সমরবাবু উপলব্ধি করেছেন, আমরা যে সমাজে বাস করি সেই সমাজের

অন্যতম অনেক কারণের মধ্যে অর্থনৈতিক কারণেও প্রেম প্রত্যাখ্যাত বা প্রতিহত হয়। তাঁর ভাষায়—বাসনার বিষণ্ণ দুঃস্বপ্ন—অর্থনৈতিক কারণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এজন্য প্রেমিক মধ্যবিত্ত বেকার যুবকের মনোমত সঙ্গিনীকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় না। চোখের সামনে পারহীন অন্ধকারই প্রকট হয়। অন্যদিকে, নায়িকাদের চোখেও ভাসে—বাসনার বিষণ্ণ দুঃস্বপ্ন। এ দুঃস্বপ্ন অন্ধকারের মতো ভারি। খ্যাতি, উচ্চাশা, প্রতিপত্তি, স্বার্থরক্ষা ইত্যাদিতে পূর্ণ চাহিদায় তাদের মন আক্রান্ত। মোট কথা একালের বিত্তবাসনায় সেকালের প্রেম চাপা পড়ে। কবিদের কলমে মোটারেখায় ধরা পড়ে মন-উচাটন ভঙ্গিমায় প্রেম এখন আর দেখা যাবে না। সমরবাবুর তাই জিজ্ঞাস্য—'আজ কী করে যাবে যমুনার জলে, নীল চোখে, নীল মেঘলা শরীরে, বিলম্বিত পদক্ষেপে, উদ্ধত যৌবনে?'[৬৭]

যুবক যযাতিতে দেশ ভরেছে যেমন, তেমনি পরিহাসে-কলরবে-বিলোল নরনারীর সুরায়-সঙ্গীতে-ব্যভিচারে কাটে অন্তিম সময়। বেড়ে চলে ক্লীবের সংখ্যা। বৈশ্য সভ্যতার জারজ সন্তানেরা শুধু বোঝে—নীলচে চোখ, তুঙ্গ বুক আর উরুর নিরুদ্দেশ অন্ধকার। কিন্তু প্রেম বোঝে না। তবু সমরবাবু আশাবাদী। প্রেমের ব্যর্থতার মূলে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অপকৌশল—তা নিঃসন্দেহে একদিন পার হওয়া যাবে বলেই তাঁর বিশ্বাস। হয়তো সাময়িক ভাবে তা দেরী হবে। তবু হবে। বসন্ত আসন্ন। কারণ,

> এ করাল সংক্রান্তি নিঃসন্দেহে পার হব
> যে-মৃত্যু প্রাণ আনে তার ফিনিক্স গানে,........।'[৬৮]

প্রেম সম্পর্কে সমর সেনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সূত্রাকারে সাজালে দাঁড়ায়—প্রথমত, সমর বাবু মানব-মানবীর পরস্পরের প্রতি অভিলাষ বা অভিরুচির নিয়ত প্রবাহে যে প্রেমের সর্বাঙ্গীন পূর্ণতা, তার কোনো চিত্র উপস্থাপনা করেননি। এর জন্য শুধু মাত্র তাঁর সমকালই দায়ী—একথা ঠিক নয়। তাঁর সমকালের কবিরা অনেকেই প্রেমের পরিণত ও গভীর ভাবব্যঞ্জক কবিতা লিখেছিলেন। এ ব্যাপারে সমরবাবুর লালিত মনোভঙ্গিমা সতত সজাগ ও সক্রিয় ছিল বলে, সমকালের কবিদের সমগোত্রীয় হয়ে সহজে বাজিমাৎ করতে চাননি।

দ্বিতীয়ত, তাঁর কবিতায় নায়িকার রূপবর্ণনা প্রাধান্য পায়নি। পাঠক চিত্তে বারবার উর্বশীর উল্লেখ সুন্দরী-রূপসী নারীর স্বপ্ন এনে দেয় কেবল কল্লোলীয় কবিদের মতো বিস্তৃত না হয়ে, মৌনী সেজে সমরবাবু কল্লোলীয়দের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন যেন।

তৃতীয়ত, কেবলমাত্র রিরংসা বৃত্তির উদ্দীপক যে বর্ণনা—সেই বর্ণনাকেও গ্রহণে তিনি অনাগ্রহী ছিলেন। নারী রূপের এই বর্ণনাতে সমরবাবুর স্ব-কালের বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে প্রমুখ বিশেষ সাবলীল ও স্বচ্ছন্দচারী হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি হননি।

চতুর্থত, চোখের চাহনির মধ্যে এবং স্তিমিত হাসির মধ্যে নারী চরিত্রের রহস্যের

ঠিকানা খুঁজেছেন তিনি। তাঁর সমকালে নারীর রূপের সঙ্গে যে শহুরে খাদ মিশে যাচ্ছিল, তাকে পরিস্ফুট করতেই সমরবাবু ক্লান্তিকর অতিশয়োক্তিতে না গিয়ে এ পদ্ধতিকে গ্রহণ করে বাস্তবতার পরিচয় দিয়েছেন।

পঞ্চমত, তাঁর প্রেমের কবিতায় অবদমনের প্রবল পেষণে পিষ্ট মর্মলোকের আর্ত, যন্ত্রণাকাতর বিলাপ শোনা যায়, এই অবদমন বা Repression-এর ফলে নানারকম প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। মানুষের স্বপ্নচারিতা-র মধ্যে, তার আকাশ কুসুম কল্পনার মধ্যে। এ প্রসঙ্গে আমাদের বেশী করে মনে পড়ে ফ্রয়েডকে। যাঁর কথা কবির স্বীকারোক্তিতেও মেলে : 'ফ্রয়েডকে ঋষি মনে হয়।'[৬৯] আবার কারো নিঃসঙ্গ মূর্তি চকিতে দেখতে পাওয়ার আশায় কল্পনায় একটি বসন্তের রাত, একটি ছায়াঘন জলভরা পদ্মদীঘির মায়াময় পরিবেশ তৈরী, অথবা অনেক দূরের দেশে হারিয়ে যাওয়া—যেখানে রাতে স্বপ্ন নামে সবুজ পাতায় ম্লান পাখির মতো. ইত্যাদি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করনের কবিতাতে কবির মনোভিত্তিক ব্যাধির উপস্থিতি একেবারে নেই বলা বোধ হয় চলে না। বিশেষ করে নিদ্রাহীনতা, বিষাদ গ্রস্ততা, দুঃস্বপ্ন দর্শন প্রসঙ্গে। কখনো আবার কবি নিজেকে জুপিটার বা সূর্যের সঙ্গে অভেদ কল্পনায় ব্যস্ত থেকেছেন-যা ফ্রয়েডীয় মতে Identification এর ইচ্ছাও অবদমনের প্রতিক্রিয়ার সামিল।

তবে ফ্রয়েড যাই বলুন না কেন, একথা সত্য যে স্বপ্ন ভঙ্গের যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য আরো বেশী করে স্বপ্ন তৈরী করতে এবং স্বপ্ন দেখতে বাধ্য হয় মানুষ। পছন্দ মতো নিজের ভিতরে, গহীন মনের অবচেতনের নির্জনে অভিজ্ঞতা এবং স্মৃতির রোমন্থনে আমরা সকলেই কম বেশী সচেষ্ট থাকি। সমরবাবুও তার ব্যতিক্রম নন। তাছাড়া তিনি এও জানতেন—'মানুষ শরীর সর্বস্ব নয়, তার প্রমাণ যৌবনে দেহগত জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে অনেকে বাইরের জগৎ সম্বন্ধে সচেতন হন।'[৭০] ফলে ফ্রয়েড তাঁর দৃষ্টিপথ থেকে সরে গিয়েছেন যে, তাতে সন্দেহ থাকে না।

ষষ্ঠত, কবির প্রেম সম্পর্কে ধারণা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রচনার মধ্যেও পরিবর্তন লক্ষিত হয়। ১৯৩৭ সালের পরের থেকে লেখায় হা-হুতাশ দীর্ঘশ্বাস, বাতাসে ফুলের গন্ধ, হাহাকার ইত্যাদি প্রসঙ্গের ক্রমশ অবলুপ্তি ঘটে।

উপসংহারে আমরা বলতে পারি, সমর সেনের কবিমন এত বেশী তথ্যবিলাসী ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কারবারী ছিল যে, নিজের জীবনের প্রমাণপত্রের বাইরে কাল্পনিক প্রেমের কবিতা লেখেননি একটাও। যা ঘটেছে বাস্তবে তাকে কেন্দ্র করে যতটুকু কল্পনা বা স্বপ্নচারিতা সম্ভব—এতটুকুই তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে। আর যা তাঁর আপন জীবনে ঘটেনি. অন্যের কল্পনা ধার করে তাকে কবিতায় বিশদ করে তুলতে চাননি। এছাড়া আমাদের আরো মনে হয়—তিনি গভীরভাবে বিশ্বাসী ছিলেন, নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতা এবং সামাজিক জীবনের গতানুগতিক জড়তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রেম তার রূপানুরাগের অঙ্কুর থেকে পর্বে পর্বে ভাবোল্লাসের মহীরুহ হিসেবে সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হয়ে উঠতেই পারে না। এজন্য কোনো রকম বানিয়ে তোলা প্রেমের কবিতা সমর সেন

লেখেননি বললেই চলে। তাঁর প্রেমের কবিতা আমাদের বুঝিয়ে ছাড়ে, যে প্রতিনিয়তের দিন যাপনের জীবনটাকে আমরা এখনো পর্যন্ত সম্যকভাবে জানি না। প্রেম সম্পর্কে এর চেয়ে বড়ো সত্য আমাদের জীবনে আর কী হ'তে পারে? বিশেষ করে যখন উচ্চারণে শুধু একথাই মাত্রা পায়—'ও ধ্রুপদী শান্তি আমাদের জন্য নয়।' সমালোচকরা বুঝি এ কারণেই লিখতে বাধ্য হন : 'আমাদের প্রেম ভাবনার মহিমময় ঐতিহ্যের বুকে সমর সেনের প্রেমের কবিতার মূল্য একটি মৃত প্রজাপতির সমান।'[৭১]

ঘ. নৈরাশ্য বিষাদ-বিচ্ছিন্নতা অবক্ষয়

প্রজ্ঞা এবং বোধি প্রখর ও বিস্তৃত হলে অতি অনায়াসেই চোখে পড়ে আলো-অন্ধকারের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া। কখনো কখনো সেই আলোর উজ্জ্বল উদ্ভাসে আনন্দ ও সৌন্দর্যের ধ্রুব এক মেল বন্ধনও ঘটে যায়। একদা যেমন হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্ষেত্রে। এবং রবীন্দ্র মুহূর্তের সমস্ত কবিদের ক্ষেত্রে। ফলে তখন শিল্পিত প্রকাশ মাত্রই রোম্যান্টিকতার নামান্তর হয়েছিল। জীবনের ছলনা, গ্লানি, অত্যাচার সহ্য করেও সেই ধ্রুববোধ অন্ধকারের পরপারে পূর্ণতার অস্তিত্বের মধ্যে বিশ্বাস সমর্পণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ তাই তাঁর মৃত্যু মুহূর্তেও আস্তিক্যবোধে অবিচলিত ছিলেন। যদিও রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনেই পৃথিবীর রং বদলাতে শুরু করে। এর প্রভাবে তিনি নিজেই বারবার কেঁপে উঠেছেন। চমকিত হয়েছেন কখনো, কখনো বা অবসন্ন বোধ করেছেন তিনি। মাঝে মধ্যে ঝড়ে ভেঙেও পড়েছেন। তবু তাঁর আধ্যাত্মিক আস্থা অনেক প্রাচীন। তাঁর মনে হয়েছে -- পরম শান্ত বিশ্ব সত্তা ঝড়ের মধ্যে দিয়েই তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

এই পরম স্থিতিবিন্দুকে ঝাঁকিয়ে-নাড়িয়ে নগ্ন করে দেয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালীন এবং এর সামান্য কিছু আগের-পরের সমাজ। অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর আর্থিক সংকটের প্রভাব-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, অন্যতম শক্তি ইংলণ্ডের উপর যেমন পড়েছিল, তেমনি ইংলণ্ডের উপনিবেশ-ভারতের উপরও পড়েছিল যেখানে উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে পাঁচিলের উচ্চতা বাড়ছিল এবং শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রকট হয়ে উঠছিল। প্রকট হচ্ছিল বৈশ্যশাসিত শহরে নানা ব্যভিচারের লীলা। এই সব দেখে পাশ্চাত্য সাহিত্যে টি.এস.এলিয়ট উচ্চারণ করেছিলেন 'My house is a decayed house', এবং তাঁর চারপাশে শুধুই অন্ধকার জমা হচ্ছিল : 'O dark dark dark. They all go into the dark./ The vacant interestellar spaces the vacant into the vacant./ The captains, merchant bankers, eminent men of letters.' [৭২]

পাশ্চাত্য কবির এই যুগগত নৈরাশ্য-অন্ধকার চিন্তার পাশাপাশি ফ্রয়েডের কাম-সর্বস্বতার তত্ত্ব আলোড়ন তোলে। নীৎসে জানালেন ক্ষমতা লোলুপতার কথা। ক্ষমতা অচরিতার্থ থেকে যাওয়ার ফলে মানবসমাজে হীনম্মন্যতা প্রাধান্য পায়—ক্রমে পরিণামে বিস্তৃতিলাভ করে বিচ্ছিন্নতাবোধ। অর্থনীতির ক্ষেত্রে পুঁজির একচেটিয়া চিন্তার এবং শ্রমের বিস্তৃত শোষণ। সমাজের চারভাগের একভাগ বাদে বাকি মানুষের অভুক্ত থাকার

যন্ত্রণা। এসব থেকেই সামাজিক নিউরোসিস বা হতাশার ভয়াবহ আক্রমণ। এ প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ মন্তব্য করেছেন : 'মানুষের জীবনে সর্বক্ষেত্রে পদে পদে যান্ত্রিকতা এবং তার সঙ্গে পাশাপাশি দৈত্যের মতো বিপুল জনতার দলন মর্দন। এর মধ্যে পড়ে মানুষ তার নিজস্ব মানবিক মূল থেকে কখন যে বিচ্যুত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তা সে নিজেই জানতে পারে না। মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রাণীগত সম্পর্কের ক্ষীণ সূত্রটুকুও লোপ পেয়ে যায়। স্থূল দৈহিক সান্নিধ্য আছে—সান্নিধ্য কেন, দৈহিক দলন বলা চলে......। বহু মানুষ একত্রে চলাফেরা করছে কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে কারও সঙ্গে কোনো আত্মিক সংযোগ নেই। মনোবিজ্ঞানী বারো (Trigant Burrow) বলেছেন : 'Today human relations are through out superficial and not fundamental. They are psycho-social, not biological' মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ—সামাজিক হোক আর ব্যক্তিগত হোক—একটা বাহ্য আচার সর্বস্ব গতানুগতিক সম্পর্ক মাত্র। এমন কোনো গভীর সম্পর্ক নয়, প্রাণ পর্যন্ত যার শিকড় প্রসারিত। এই বাহ্য সম্পর্ক আধুনিক মানুষের বিশেষ করে ধনতান্ত্রিক যুগের নাগরিক মানুষের লোকৈকাত্মতাবোধ (Community feeling) নষ্ট করে দিচ্ছে। লরেন্স একবার চিঠিতে বারোকে লিখেছিলেন : 'I believe as you do ....that it is our being cut off that is our ailment and out of this ailment every thing bad arises'। আমাদের আসল ব্যাধি হলো আজকের দিনে অত্যন্ত কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও মানুষে মানুষে দূরত্ব কমছে না, বরং প্রতিদিন বাড়ছে। মানসিক সম্পর্কের এই দূরত্ব বোধ থেকে সামাজিক জীবনে সবরকমের কদর্যতা ফুটে উঠেছে এবং কদর্যতার বীভৎস বৈচিত্র্যও বাড়ছে। মহানগরের উত্তাল জনসমুদ্রে প্রত্যেকটি মানুষ যে যার জীবন-নৌকায় ভেসে বেড়াচ্ছে, ঢেউয়ের আঘাতে ওঠানামা করছে, কোথাও কোনো কূল নেই, কিনারা নেই, দ্বীপ নেই যেখানে সে নোঙ্গর করতে পারে। নোঙ্গরহীন নৌকোর যাত্রীর মতো সারাজীবন যদি সমুদ্রে ভেসে বেড়াতে হয় তাহলে সামাজিক মানুষ হিসেবে তো বটেই, একান্ত ব্যক্তিগত মানুষ হিসেবেও জীবনের পূর্ণতা বোধ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। এই পূর্ণতা বোধের অভাবের প্রতিক্রিয়া ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কতকটা প্রকৃতির প্রতিশোধের মতো দেখা দিতে থাকে। অথচ নাগরিক জীবনে জন সমাবেশের সুযোগ অফুরন্ত। .... কিন্তু জনতা মিছিল বা শোভাযাত্রা কোনোটাই সত্যকার সমাজ সংঘবদ্ধতা (Socialization) সামাজিক জন-সংযোগ (social participation) অথবা মানবিক একাত্মবোধ জাগ্রত করে না বরং সামাজিক বিচ্ছিন্নতার (De-socialization) পথ সুগম করে দেয়।'[৭৩]

অবশ্য মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানী, ডঃ ধীরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় অন্য মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মন্তব্য : 'দেশজয়ী কালজয়ী মানুষ দূরকে নিকট করছে, মহাসাগর-বিজ্ঞান দেশ দেশান্তরের মাঝে সংযোগ স্থাপন করেছে; কিন্তু অন্য মানুষ থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, মানুষকে মানুষের শত্রু মনে করছে। তার ফলেই দেখা দিয়েছে অপরাধমনতা, অসহায়ত্ব বোধ আর নিঃসঙ্গতা। 'The world is more one than ever, and yet,

man is more than ever divided'। এ যুগের এই হল বৈশিষ্ট্য। এই যুগকে কেউ বলছেন পারমাণবিক যুগ, কেউ বলছেন অটোমেশনের যুগ। মনস্তাত্ত্বিকের বিচারে এটা বিচ্ছিন্নতার যুগ। মানুষই আজ মানুষের প্রধান শত্রু। 'His enemy number one is MAN ...he has been transferred by man into a convict for their use' (Sastre)। আজ মানুষের মনে তীব্র সন্দেহ আর হতাশা ও সমাজের প্রতি অবজ্ঞা আর বিতৃষ্ণা। শুধু তাই নয়। পরস্পর বিচ্ছিন্ন মানুষ আজ আত্মসত্তা থেকেও বিচ্ছিন্ন, আত্মহননে সচেষ্ট। These men are not merely rejecting life, many of them are anti-life'। কলিন উইলসন তাঁর 'আউটসাইডার' গ্রন্থে পশ্চিম ইউরোপের সাহিত্যে 'আউটসাইডারে'র প্রাধান্য নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে আউটসাইডারের চরিত্রে যুগমানস প্রতিফলিত জীবনের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হবার ব্যর্থ প্রয়াসের ফলে যুগনায়ক আউটসাইডার জীবন বিযুক্ত। এ জীবনের কোনো সুস্থিত ভিত্তি নেই; আছে শুধু অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা। .... ডারউইন-ফ্রেজার-ফ্রয়েড-আইনস্টাইনোত্তর যুগে বিচ্ছিন্নতাই মানসধর্ম বলে স্বীকৃত। সমাজ ও জীবনের বিশৃঙ্খলা, বিচ্ছিন্নতাকে আজ আর আকস্মিক দুর্ঘটনা বা আরোগ্য সাপেক্ষ কোনো অসুস্থতা মনে করা চলে না। বিচ্ছিন্নতা মানব প্রকৃতির অন্তর্নিহিত অপরিবর্তনীয় স্বভাবধর্ম থেকে উদ্ভূত।'[৭৪]

উপরে উদ্ধৃত দুটি মন্তব্যের মূল যে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ইতিহাসের মধ্যে নিহিত তাতে সন্দেহ থাকে না। আমরা জানি, বাঙলা সাহিত্যেও বিচ্ছিন্নতাবোধ-নিসঙ্গতাবোধ এসেছে সুগভীর সমাজ চেতনা থেকে। একদিকে ধনীর ধনলিপ্সা, বিলাস-বহুল অট্টালিকা, অন্যদিকে রাস্তার ফুটপাতে কুঁকড়ে পড়ে থাকা হা-ভাতের দলের কোনো রকমে টিকে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা—বৈচিত্র্যহীন এই চিত্র দেখতে দেখতে বাঙালী কবিরা, সাহিত্যিকরা সমাধান খুঁজেছেন এবং ব্যর্থ হয়েছে তাঁদের অন্বেষণ। এই ব্যর্থতার গ্লানিতে তাঁদের বিষাদমগ্নতা এবং নিঃসঙ্গতার কোটরে অপসরণ ঘটেছে।

সমাজের এই দিকে তাকিয়ে বাংলাদেশে কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকরা পারিপার্শ্বিক পৃথিবীর জন্য কল্লোল ধ্বনিকে নতুন মাত্রা দান করলেও, তাঁদের সব তরঙ্গই স্ফুলিঙ্গের মতো উড়ে গিয়েই ফুরিয়ে গিয়েছিল। এরই অব্যবহিত পরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সমর সেন প্রমুখ নিজেদের প্রত্যয়কে বিক্রি করে প্রচলিত জীবন ও সাহিত্য ধারার সঙ্গে আপোষ করতে চাননি। পক্ষান্তরে তাঁরা সমকালকে তাঁদের সাহিত্যে ধরে রাখতে চাইলেন। অবশ্য জীবনানন্দ দাশের মতো কবির কণ্ঠেও সমকালকে ধরার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তিনিও মানবাত্মার সুগভীর অবক্ষয়ে ব্যথিত। তিনি সারাজীবন ধরে জীবনের মূল সত্যকে অন্বেষণ করেছেন, খুঁজতে চেয়েছেন আপাত জাগতিক দুঃসহ পরিবেশের অন্তরালে পরম কল্যাণের স্পর্শ। কিন্তু তাঁর ললাট লিখনেও ব্যর্থতা এবং হতাশার বস্তুনিষ্ঠ প্রতিফলন ঘটেছে। মৃত্তিকা সংলগ্ন, ডানাভাঙ্গা পাখির সঙ্গে মানুষের সমার্থকে তিনি উচ্চারণ করতে বাধ্য হয়েছেন—

'ডানা ভেঙ্গে ঘুরে ঘুরে ঘুরে পড়ে গেল ঘাসের উপরে;

কে তার ভেঙ্গেছে ডানা জানেনা সে; আকাশের ঘরে
কোন দিন-কোন দিন আর তার হবে না প্রবেশ?
জানেনা সে; কোনো এক অন্ধকার হিম নিরুদ্দেশ
ঘনায়ে এসেছে তার? জানে না সে, আহা
সে যে আর পাখি নয়-রঙ নয়-খেলা নয় তাহা
জানে না সে; ঈর্ষা নয়-হিংসা নয়-বেদনা নিয়েছে তারে কেড়ে।
সাধ নয়-স্বপ্ন নয়—একবার দুই ডানা ঝেড়ে
বেদনারে মুছে ফেলে দিতে চায়; রূপালি বৃষ্টির গানে, রৌদ্রের আস্বাদ
মুছে যাক শুধু তার,-মুছে যায় বেদনারে মুছিবার সাধ।'[৭৫]

সমর সেনের সমকালও অনুরূপ ভারসাম্যহীনতায় টলমলে। ব্যক্তিত্বের বিপন্নতায় ম্লান মুখ। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সংঘর্ষে ব্যক্তি একাকিত্বে অবসন্নবোধ করে। যে মানুষেরা সমাজকে চলমান রাখে, তারাও তখন বিচ্ছিন্নতায় ক্লান্ত হয়ে সমাজ থেকে দূরে উৎক্ষিপ্ত এবং বঞ্চিত হয়। তারা নিজেদের শ্রম ও শ্রম ফল থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়। এই বিচ্ছিন্নতা তাদের নিজের সত্তাকে খণ্ড খণ্ড করে। ছিন্ন সত্তা থেকে উদ্ভূত এক নির্মম-বুকচেরা অসহায়ত্ববোধের ঘেরাটোপে আটকে পড়ে মানুষ। তাদের অবস্থা তখন অবর্ণনীয়।

'আমার অন্ধকারে আমি
নির্জন দ্বীপের মতো সুদূর নিঃসঙ্গ।'[৭৬]

সমাজ জীবনের মর্মান্তিক ব্যর্থতাবোধে সমরবাবুর যৌবন বেদনা সঞ্জাত এই উপলব্ধি নিরালোক 'আমিত্বে'র প্রধান শর্ত হিসেবে এখানে নিঃসঙ্গতা ও নৈঃশব্দতা এসেছে। আশমান-জমিন জুড়ে একাকিত্বের এক বিশাল উৎপ্রেক্ষা কবিকে বারেবারে অশ্লিষ্ট করে। তিনি জেনেছেন, যে গভীর বনেও এখন সৌন্দর্যের পূর্ণমূর্তি-হরিণ পাওয়া যাবে না। সবুজ পাখিদের সমারোহের কলতান এখন হারিয়ে গেছে। পরিবর্তে আছে শুধু পাহাড় প্রমাণ ধূসর অন্ধকার এবং ডানা ঝরা পাখির দল। অর্থাৎ সভ্যতার সূক্ষ্ম প্রহারে আজ ব্যক্তিজীবনে আমরা ছিন্ন ভিন্ন। আমাদের সামনে শান্তিসমাহিত সুস্থ সৌন্দর্য বিলাস অবলুপ্ত। তাই কবি যখন অবসর কালে সন্ধ্যায় বাইরে আসেন, তখন তাঁর একমাত্র সঙ্গী হয় নির্জন প্রান্তরের সুকঠিন নিঃসঙ্গতা এবং সাধারণের একজন হয়ে তিনি যাকে পেতে চেয়েছেন—হয়তো সে তাঁর প্রেয়সী, হয়তো তাঁর পরম উপলব্ধি, হয়তো তাঁর কাঙ্ক্ষিত সুন্দর জীবন, কিম্বা সবকিছু নিয়ে সমস্ত জগৎ। তাকে পেতে চেয়েছেন সকল ধূসরতা, ক্লান্তি ও স্তব্ধতাকে অতিক্রম করে। সকল নিঃসঙ্গতাকে পেরিয়ে প্রভাতের নিষ্কলুষ অরুণ আলোয় সমুদ্রের অনাবিল গভীরতায় এবং তারা ভর্তি আকাশে, যেখানে নিঃসঙ্গতা বাসা বাঁধতে পারেনা। কিন্তু কবির আকুতি ফলবতী হয় না। অন্ধকার সত্তার বিশিষ্টতায় নৈঃশব্দের হাহাকারে তাঁর আকুতি চাপা পড়ে। আমরা মিলনকে যদি জীবনের উৎস বলে মেনে নিই, তবে খুব স্বাভাবিক কারণেই বিচ্ছেদকে মূক ভাবতে পারি। এবং এর অনিবার্য পরিণাম আঠারো বছর বয়সের দগ্ধ যৌবন যন্ত্রণা। আর নিঃশব্দতার সঙ্গী

তখন নীরবতা। সমরবাবু কবিতায় সেটাই উপলব্ধি করেছেন।

'কেন তুমি বাইরে যাও স্তব্ধ রাত্রে
আমাকে একলা ফেলে?
কেন তুমি চেয়ে থাক ভাষাহীন, নিঃশব্দ পাথরের মতো?
আকাশে চাঁদ নেই, আকাশ অন্ধকার,
বাতাসে গাছের পাতা নড়ে,
আর দেবদারু গাছের পিছনে তারাটি কাঁপে আর কাঁপে;
আমাকে কেন ছেড়ে যাও
মিলনের মুহূর্ত হতে বিরহের স্তব্ধতায়?'[৭৭]

—এহেন সঙ্গীহীন, শব্দহীন জগতে 'আমিত্বে'র অন্ধকারে অভাববোধ প্রকট হয়। যার চরম অভিব্যক্তি শূন্যতায়। যেহেতু সব অভাববোধের—সব অসম্পূর্ণতার প্রতীকই হ'ল শূন্য। খুব সহজে এখানে, কোপেনহেগেনের দার্শনিক—সোরেন কীয়ের্কগার্ডের (১৮১৩-১৮৫৫) আত্মগত ও শূন্যতাবাদ দর্শনের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। 'কীয়ের্কগার্ড বলেছিলেন। 'nothingness, the object of angst, gradually becomes an entity'। শূন্যতা, উদ্বেগ যন্ত্রণার মূলবস্তু, ধীরে ধীরে মূর্ত হয়। এই শূন্যতা ও যন্ত্রণার আরাধনা আধুনিক শিল্প ও চিন্তার প্রধান লক্ষণ। আধুনিক সাহিত্যে এই যুগের নিহিলিজম (Nihilism) নৈরাজ্যবাদ ও যন্ত্রণার প্রতিফলন দেখা যায়। বিবিক্ত আত্মযুক্ত মানুষের আত্মাই নেতিবাদ সত্তার উৎস।'[৭৮]

কীয়ের্কগার্ড-এর এই Nihilism বা শূন্যতাবাদ আধুনিক বাঙালী কবিদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, কখনো কখনো বা বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় দেখা যায়। তবে সুধীন্দ্রনাথ ছাড়া আধুনিক যুগের প্রথম পুরোধা অন্যান্য কবিদের মধ্যে আধুনিক যুগোচিত এবং আধুনিক যুগোত্থিত এই শূন্যতার হাহাকার অপেক্ষাকৃত কম। সুধীন্দ্রনাথ ১৯২৯-এ ইউরোপ গিয়েছিলেন এবং প্রায় এক বৎসর সেখানে আধুনিক সভ্যতার নগ্নতম রূপ প্রত্যক্ষ করেন। বিজ্ঞান-দর্শন সুধীন্দ্রনাথের সকল ঐশ্বরিক প্রত্যয় ভেঙ্গে দেয়। অন্যান্য সকল রকম মূঢ় প্রত্যয়ের শূন্যগর্ভতা তিনি অনুধাবন করেন। রিলিজিয়ন তাঁকে আশ্রয় দেয়নি, মার্কসবাদও তাঁর উপলব্ধিতে ভিন্নতর রিলিজিয়ন রূপে প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ জীবনের কোনো সদর্থক সার্থকতা মানুষের কল্পনামাত্র বলে মনে হয়। তাঁর কাছে একমাত্র অবশিষ্ট নৈরাশ্য; নৈরাশ্য নিখিল নাস্তি—পরম শূন্যতার প্রতীকে উপস্থিত।

আমার কথা কি শুনিতে পাওনা তুমি?
কেন মুখ গুঁজে আছে তবে মিছে ছলে?
কোথায় লুকাবে? ধূ ধূ করে মরুভূমি,
ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছায়া মরে গেছে পদতলে।
আজ দিগন্তে মরীচিকাও যে নেই,
নির্বাক, নীল, নির্মম মহাকাশ।'[৭৯]

অনুরূপভাবে, কবি সমর সেনের মধ্যেও দেখা যায়—আধুনিক যুগ ও জীবনের ভান-ভণিতার অন্তরালস্থ এই শূন্যতার প্রকাশ।

সমর সেনের প্রত্যয়ে ঈশ্বর মৃতপ্রায়, প্রকৃতি নির্মম এবং উদাসীন; রাষ্ট্র কপট, সমাজ ব্যভিচারী। তাই 'মহাকাশ', 'মরুভূমি' ও 'মৃত্যু'—এই তিন শূন্যের উচ্চারণে তিনি সচেতন ভাবে দেশ ও কালের পটভূমিকায় তাঁর চিন্তাকে যুক্ত রেখেছেন। মহাকাশ ও মহাশূন্য আমাদের অভিধানে সমার্থক, এবং মরুভূমি বলতে দেশ বিশেষ বোঝালেও মানুষের সঙ্গ সেখানে দুর্লভ। কারণ তার উত্তাপে ও ঊষরতায় প্রাণের বীজ অঙ্কুরিত হতে পারে না। মরুভূমি যেমন দৈশিক অর্থে প্রাণের অবধি, কালিক অর্থে তেমনি মৃত্যুরও অবধি। এবং ভাষা সেখানে কালাত্মক বলেই নিষ্প্রাণ ও নিঃশব্দ। প্রসঙ্গত আলোচক রণজিৎ গুহ যে মন্তব্য করেছেন, তা উল্লেখের দাবি রাখে : ' যে অভাববোধের নিদর্শন এই সঙ্গীহীন ও শব্দহীন জগৎ, আমিত্বের অন্ধকারে আমি নিজেই যেখানে অচেনা, তার উৎস ঐতরিকতায়, এবং ঐতরিকতা তো পরত্বেরই প্রকারভেদ মাত্র। 'তর্ক সংগ্রহ' প্রণেতা অন্নাভট্টের মতে পরত্ব-অপরত্ব দুরকমের হয় : 'তে দ্বিবিধে। দিক্‌কৃতে কালকৃতে চেতি।' দিক্‌কৃত বা দৈশিক; কালকৃত বা কালিক। নিঃসঙ্গতার ধর্ম দৈশিক : যে দেশগত সন্নিকর্ষ না হলে সঙ্গলাভ সম্ভব নয়, তারই অভাবকে বলা হয় সঙ্গীহীনতা। তেমনি নিস্তব্ধতার ধর্ম কালিক, কালগত সন্নিকর্ষ না হলে ভাষার সংকেতগুলিকে পরম্পরানুযায়ী সাজানো যায় না শব্দে বা বাক্যে, তাই সন্নিকর্ষের সেই বিশেষ অভাবই ভাষাহীনতার আরেক নাম। এই উভয় ঐতরিকতার চরম অভিব্যক্তি শূন্যতায়, কারণ শূন্যই সব অভাবের সম্পূর্ণতার প্রতীক। সমরদার কবিতায় তাই মহাকাশ, মরুভূমিও মৃত্যু—এই ত্রিবিধ শূন্য একই বাঁশির তিনটি রন্ধ্রের মতো ঐতরিক ফুৎকারকে বাজাচ্ছে কখনো বিষণ্ণতায়, কখনো বা উদাসীনতায়। আকাশ ও মরুভূমি যে শূন্যতার দৈশিক উপমা তা বলাই বাহুল্য।'[৮০]

এই শূন্যতাবোধেই কবির হাতে অসীম ব্যাপ্ত-বিষণ্ণতা সুনিবিড় ব্যঞ্জনায় অর্থবহ হয়ে ওঠে।

> 'ফাঁকা মাঠের নিঃশব্দ, গভীর রাত্রি,
> আর নীড়হারা পাখির শব্দ নিঃসঙ্গ আকাশে।'[৮১]

এখানের 'নীড়হারা পাখির শব্দ' গভীর রাতে কবির মনের অবচেতন অন্ধকারে আলোড়ন তুলেছে। সেই সঙ্গে মন্থনজাত একটি বিগত ব্যাকুলতার চিত্র কবির বর্তমান পিপাসাকে ব্যাকুলতর করেছে।

> মাঝরাতের ঘুমের মতো তোমার কালোচুল
> আমার মুখের উপরে নামল :
> সেই চুল, সেই গভীর চোখ, নরম শরীরে
> সেই পুরনো মরুভূমির ব্যাকুলতা;'

লক্ষ্য করতে হয় **'সেই পুরনো মরুভূমির ব্যাকুলতা'** বাক্যাংশটি। যেখানে কবি

তৃষ্ণায় গড়া, নারীপ্রেমের তীব্র জ্বালাময় ইন্দ্রিয়াসক্তির প্রতি আকণ্ঠ পিপাসা উজাড় করে দিয়েছেন। বাসনা এখানে অবাধ, উদগ্র-পুরুষের মতোই। কিন্তু সমালোচকরা সেকথা মানতে রাজি নয়। এমনকি বিষ্ণু দে পর্যন্ত বলেছেন—'সমরের বিষাদ যৌবনোচিত বাসনা ও ক্লান্তির নেতিতেই উৎস খোঁজে।'[৮২] একথা দ্বিধাহীন কণ্ঠে উচ্চারণ করতে পারা যায় না। পুরুষের ভোগ-বাসনা যেখানে বিষাক্ত সাপ বা জাগুয়ারের মতো গতিতে কুটিল এবং বিক্রমে বলবান—সেখানে কবি নারীর প্রতি আকাঙ্ক্ষাকে নির্জলা, ধূ ধূ মরুভূমির সন্তাপিত প্রাণের পিপাসায় পরিণত করেছেন।

সমর সেন বাংলা কবিতায় আবির্ভূত হয়েছিলেন ঠিক সেই সময়ে—যখন দেশের রাজনৈতিক চেতনার স্রোতে একটা থমথমে ভাব ভাটার টানে শেষ হয়েছে, কিন্তু জোয়ার আসে নি। যদিও ইতস্তত জলের ঘূর্ণিতে তার পূর্বাভাস স্পষ্টই রয়ে গেছে। অর্থাৎ জোয়ার-ভাটার সেই সন্ধিক্ষণের ঘুরপাকের মধ্যে আবর্ত, কবির নিজের অস্তিত্বের সন্ধিক্ষণে। বয়ঃসন্ধির সময়ে। যার প্রাধান বৈশিষ্ট্য যৌনতা। কিন্তু তিনি সেই যৌনতা ও প্রেমে রোম্যান্টিক মেজাজের আশঙ্কায় থরথর হলেও এই রোম্যান্টিকতায় বুঁদ হয়ে থাকেননি। অচিরেই নিঃসঙ্গতার তিক্ত মধুরতাকে বৃহত্তর সংকটের আবর্তে উপস্থিত করেছিলেন। কাব্যপংক্তিতে তাই বৈপরীত্যের চতুর ব্যবহার মাধ্যমে একদিকে যেমন তিনি দেখিয়েছেন জীবনের ধাবমান [illegible] একাকিত্বকে চঞ্চল করে তোলে—অন্যদিকে তেমনি প্রাণ বাঁচানোর আতুর আর্তনাদে স্তব্ধতা আন্দোলিত হয়। এভাবেই তিনি অনায়াস পটুত্বে 'আমিত্বে'র অন্ধকারকে বিব্রত করে তুলেছেন। সেই অন্ধকারে নিঃসঙ্গতা স্বাভাবিকভাবেই নৈঃশব্দের বাসাবাড়ি।

> সাঁওতাল পরগণার নিঃসঙ্গ স্তব্ধতা।
> ধুলো ভরা নির্জন পথে মোটরেব কর্কশ শব্দে
> একটি হরিণের উর্ধ্বশ্বাস, ধাবমান বেগ,
> আর সেই ক্ষিপ্রগতি চঞ্চল যেখায়
> উর্বশীর দীর্ঘশ্বাস,
> মৃত্যুহীন অতীতেব শেষ হাহাকার।'[৮৩]

এখানে 'আমিত্ব'কে অতিক্রম করার ব্যাকুলতা চোখে পড়ে। ফলে রোম্যান্টিকতা সতেজ ও সুস্থ চেতনার অনুষঙ্গী হয়। কবি তাঁর মধ্যবিত্ত শ্রেণী সত্তার সংকীর্ণতা এবং ব্যক্তিসত্তায় অসহ্যবোধ করেন বলেই রোম্যান্টিকতা এখানে সবল। ফলে কবির অন্ধকার, ক্লান্তি, হাহাকার, বিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গতা, বিধুর বাসনার বিমূর্ত যন্ত্রণাকে কবি-অধ্যাপক অরুণ মিত্র Romantic agony ব'লে যে অভিহিত করেছেন,[৮৪] তা একেবারে অস্বীকার করার উপায় নেই। তবু বলতে হয়, সমর সেন নিজের সামাজিক ও মানসিক পিছুটানের কথা ক্ষণিকের জন্যও ভুলতে পারেননি। বরং পিছুটানের জন্যেই সজ্ঞানে বিপরীত ঝোঁকে কলম চালিয়েছেন। আমিত্ব-অপরত্বের দ্বন্দ্বে বৈপরীত্যের যেসব লক্ষণ জীবনযুদ্ধের বৃহত্তর ইতিহাসের, বিশেষ করে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ইতিহাসের দিক থেকে জরুরী এবং

প্রাসঙ্গিক—সেগুলিকেই কবিতায় তখন প্রকট করে তুলেছিলেন তিনি। এজন্যেই কবিতার ছত্রে ছত্রে হাহাকার ও দীর্ঘশ্বাস মিশে থাকলেও পাঠকের কাছে সেগুলি টংকার তোলে।

কবি সচেতন ভাবে জানতেন, যে তাঁর বোদ্ধা মানসের মূল তাঁর মধ্যবিত্ত লালনে। সেই মধ্যবিত্তের অস্তিত্বের গ্লানি, তার বিবর্ণ দৈনন্দিনতা, তার সংকীর্ণতা, আত্মপরায়ণতা ও অসহায়তা কবিজীবনে তিনি অচিরেই চিনেছিলেন। এই সচেতনতা তাঁকে বিষাদে ও একাকিত্বে আচ্ছন্ন করেছিল। এই মধ্যবিত্ত প্রাণ ধারণের অংশীদার হিসেবে তাঁকে আত্ম করুণাতে নিমগ্ন করতেও প্রণোদিত করেছিল। তবু মধ্যবিত্তের প্রাত্যহিকের গ্লানিকর চেতনা থেকেই কবি সমর সেনের স্বপ্ন উজ্জ্বল হয় :

'হয়ত অনেক যন্ত্রণার পর,
নগর মন্থনে নীলকণ্ঠ আকাশের তলে
এক শ্রেণীহীন সাম্য রাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত পৃথিবী।'[৮৫]

—এই ইতিবাচক দিক তাঁর কবিতায় পরে আরো স্পষ্টতা পায়। কিন্তু শূন্য মাঠে স্তব্ধ দিনের কথা কবির মন থেকে কিছুতেই নিশ্চিহ্ন হয় না। আর তিনিও সেকথা স্মরণ করিয়েছেন আমাদের বারে বারে। অবশ্য তার একাকিত্বকে দেশজোড়া দুর্গতির অস্বস্তিকর বাস্তবতার ভাবানুষঙ্গে মিলিত হতে দেখা যায়। কবি-সত্তায় তখন ভারতবর্ষের সমগ্র জন-অরণ্য একাকিত্বের পটভূমিকা হিসেবে এসেছে।

'তাই দিনান্তে কলের বাঁশিতে
মনে হয় পৃথিবীর শেষ প্রান্তে
করাল শূন্যের বৃত্তে
নাভিচ্যুত শূন্য যেন কাঁদে;
লুপ্ত পাহাড়, লুপ্ত বোধ,
শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ।'[৮৬]

যেমনটি একদা ইউরোপীয় পটভূমিকায় টি. এস. এলিয়ট শুনিয়েছিলেন : 'I have lost my passion. why should I need to keep it/ since what is kept must be adulterated?/ I have lost my sight, smell, hearing, taste and touch:'[৮৭] প্রসঙ্গত বাঙালী কবি বুদ্ধদেব বসুর কথাও বলতে হয়। তিনি শহরবৃত্তে হতাশা ও একঘেয়েমির বেদনায় 'নতুন পাতা' কাব্যের 'বৃষ্টি আর ঝড়' কবিতায় উচ্চারণ করেছিলেন—

'শূন্য, শূন্য হৃদয়, ব্যর্থ,
ব্যর্থ রাত্রি শুধু ক্রুদ্ধ শহরের গুমরানি।'

কিন্তু বুদ্ধদেবের এই একঘেয়েমির বিরাট দানবিক আকার ধারণের কথা এসেছিল ফরাসি কবি চার্লস্ বোদ্‌লেয়ারের সমান্তরালে।

'Till boredom, fruits of mind's inert, incurious tree,
Assumes the shape and size of immortality'[৮৮]

অথচ সমর সেন তা করতে চাননি। তিনি জানিয়েছেন, এখানে শূন্যতার আগমন ঘটেছে **দিনান্তে কলের বাঁশি** বাজার সঙ্গে সঙ্গে। অর্থাৎ শহর জীবনে রাত্রি নামার সঙ্গে সঙ্গেই। ফলে তিনি বোদ্‌লেয়ার বা বুদ্ধদেব বসু হতে সরে এসেছেন। সরে এসেছেন কীয়ের্কেগার্ড-এর শূন্যতাবাদ দর্শন হতেও। কারণ শূন্যতাবাদ জনিত চাপে কবির চৈতন্য অসাড় হয়ে যায় নি। প্রতিষ্ঠিত বৃত্ত হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে, কারখানার ধর্মঘটে এবং গ্রামে গ্রামে খাজনা বন্ধের লড়াইয়ে সামিল হওয়ার বাসনায় তিনি বাস্তব হতে পালাবার চেষ্টা না করে বরং নিজে নিজেই পালাবার পথ বন্ধ করেছেন। সজ্ঞানে দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন এই ব'লে যে, সামনে বরাবর কালের জোয়ার বর্তমান--কিন্তু একে সাঁতারে অতিক্রম করার শক্তি এবং সাহস কখনো প্রকাশ করতে পারেননি। অথচ সেই কালের জোয়ারে নেমে সাঁতার দেবার সম্ভাবনাও তিনি একেবারে বাতিল করে দিতে পারেননি। আগের অক্ষমতাকে স্বীকার ক'রে আগামী দিনের প্রতিশ্রুতির কথাই পরোক্ষভাবে স্মরণ করিয়েছেন পাঠকদের। তাই অলস অস্তিত্বের চর্বিত চর্বন না করে, আরাম না চেয়ে—সামাজিক ও রাজনৈতিক আঘাতে-সংঘাতের মধ্যে নিজের ভূমিকা খোঁজার যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়েছেন।

আবার মধ্যবিত্ত চেতনার গণ্ডিতে নিজেকে স্বেচ্ছায় বন্দী রাখা এবং শ্রেণীসত্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আদর্শ মেনে নিয়েও ঐ শ্রেণী সত্তার নামে সেই আদর্শ সম্পর্কে নিষ্ক্রিয় থাকার প্রবৃত্তিকে তিনি প্রাধান্য দেননি। কর্মে এবং কবিতায় তিনি মেনেছেন :

> 'যে জন বন্ধ ঘরে থাকে,
> স্তব্ধতার কাছে জীবনের জয়যাত্রা?
> কূপমণ্ডুক শোনে না সমুদ্রের গান,
> কিন্তু সে তো দেখে কূপের উপরে
> বৃত্তবদ্ধ নীল আকাশ,
> দু-একটি অমর নক্ষত্র,
> বৈশাখী মেঘের ভগ্নাংশ কোনোদিন।'[৮৯]

ঝড় শান্তির শর্ত যেখানে এবং ঝড় বৈশাখী মেঘের সঙ্গে সাপেক্ষ ভাবে সম্পর্কযুক্ত যেখানে—সেখানে 'শান্তি চাই' বললেই শান্তি আসবে না। আসবে অশান্তিই। সেই অশান্তির দেশে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের জীবন বৈশাখের মেঘ বাহিত ঝড়ে ক্ষুব্ধ হলে মনুষ্যত্বের মর্যাদায় ধন্য হয়। এই ঝড়ের কেন্দ্রে শান্তির সম্ভাবনা খুঁজতে গিয়ে একদা কবি স্বয়ং বয়ঃসন্ধির মুহূর্তে নিজের শান্তিভঙ্গ করেছিলেন। যদিও বিকল্প বাসনার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই চৈতন্যের পথ আবিষ্কৃত হয়েছিল। তাই সেই চৈতন্য 'আমিত্বে'র নিরালা কোণ ছেড়ে যখন ইতিহাসের পথে পা বাড়ায় এবং ঝড় আসে, তখন মেনে নিতে হয় সে ঝড় শান্তির বাহন নয় মোটে। সমর সেনের দ্বিতীয় পর্বের কবিতায় সেকথা নানান ভাবে প্রকাশিত।

সমর সেন নিঃসন্দেহে ছিন্নপত্র জীবনের কবি। দরিদ্র ও দুঃস্থ জীবনের কথাকেই

তিনি আধুনিক প্রতীকে, ভাষাকে, রূপকল্পে বারেবারে কবিতায় রূপান্তরিত করেছেন।

'ছানি পড়া চোখে
অন্ধকারে নীল বিদ্যুৎ চমকায়।
শূন্যপেট ইতস্তত উদ্‌ভ্রান্ত মানুষ
চড়কের যন্ত্রণায় সান্তনা চায়।
.... মনে হয়
এক অতিকায় তৃষ্ণার্ত মহিষের চোখ
শূন্য থেকে একমনে জলাশয় খোঁজা,
ব্যর্থ নিঃশ্বাসে হাওয়ারা হঠাৎ দল বেঁধে চলে,
ছিন্নপত্রে, বালুতে, পাথরে অনর্থক হিজিবিজি কেটে।'[৯০]

—এ চিত্র যুদ্ধের সময়কার ঠিকই। সারা বিশ্বব্যাপী নিরন্ধ্র নৈরাশ্য, হাহাকারের আনাগোনা। কবির চোখে সেকথা অস্পষ্ট থাকে না। একটার পর একটা কবিতায় অবক্ষয়ের ছবিই শুধু ফুটে ওঠে তখন। খুব স্বাভাবিকভাবে এসব কবিতার অবক্ষয়ের কবিতা আখ্যা দেওয়া অযৌক্তিক হয় না। 'সমর সেন শহরের কবি, কলকাতার কবি, আমাদের আজকালকার জীবনের সমস্ত বিকার, বিক্ষোভ ও ক্লান্তির কবি।'[৯১] — বুদ্ধদেব বসুর সেই মূল্যবান মন্তব্য ১৯৩৭-এর হলেও তাঁর নির্ভুল মূল্যায়ন সমর সেনের শেষ পর্বের কবিতার ক্ষেত্রেও অভ্রান্ত। আমরা দেখি ক্লান্তির পায়ে পায়ে দৈনন্দিন দুস্বপ্ন ও নিঃসঙ্গতার আর্তি এখানেও প্রকট,

'শূন্যগর্ভ আকাশের নিচে আদিগন্ত মাঠের দুঃস্বপ্ন
স্বপ্ন বলে ঠেকে লোকের হাটে............।'[৯২]

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও ঠিক, ঘর থেকে বাইরে মার্ক্সীয় ঐতিহাসিক বিচ্ছিন্নতা ও অবক্ষয় সমাজ মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান—সমর সেনের কবিতায় তারও প্রতিবিম্ব মেলে এসময়ে। তবে আর পাঁচজন মার্কসিস্ট আধুনিক কবিদের মতো তিনি অবক্ষয়ের পিছনে শ্রেণীসংগ্রাম ও বিপ্লবের লাল সংকেতের আলো দেখতে বা দেখাতে পারেননি। অবশ্য তিনি কয়েকবার অকুতোভয়ে উচ্চারণ করেছেন—

'দূরে শুনি ঝড়ের ডাক; উদ্‌ভ্রান্ত ঘরে ফেরে কাক,
পাখার শঙ্কিত শব্দ; তারপর পৃথিবী নির্বাক।
স্তব্ধতা পাকে পাকে জমে; সংহত শক্তির উত্তাপ,
বিস্ফোরক সম্ভাবনা! ....
সংহত শক্তির বেগ উচ্চকিত স্নায়ু শিরায়,
পুঞ্জীভূত অতিকায় ছায়া আশ্বিনের রৌদ্র হারায়।'[৯৩]

তথাপি বলতে হয়, এ বক্তব্যের ইতিবাচক দৃঢ়তা ঠিক ততখানি যেন ফুটে ওঠে না। তখনকার প্রচলিত বাম রাজনৈতিক অবস্থানের প্রতি কবির অনাস্থা এবং তজ্জনিত হতাশা তাঁকে দীর্ণ করে ছিল। অন্যদিকে, অখণ্ড জাতীয়তাবোধ আর পাঁচজন পরিশীলিত

মানুষের মতোই কবি হৃদয়েও স্বপ্ন জাগরূঢ় ছিল।

'আজ দেশে দেশে
মুষ্টিবদ্ধ প্রতিজ্ঞায়, আত্মদানে, আপনজনের ক্ষয়ে
জীবনের বনিয়াদ গড়ে। যেন মনে রাখি
চল্লিশ কোটি ক ারা, বিরাট এদেশ, এখানে নোকর শাহীর হবে শেষ
যদি বাজে রাম ও রহিমের কণ্ঠে আ-সমুদ্র হিমাচল গান ....।'[১৪]

কবির এ স্বপ্ন কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয় নি। যতদিন এগিয়েছে তত বেশী রকম বিচ্ছিন্নতাবোধ তাঁর মগজের কোষে কোষে চিড় ধরিয়েছে। শোষণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা দেখে তাঁর বিক্ষুব্ধবোধ সোচ্চার হয়েছে। প্রত্যয়ের স্থান কোথাও মেলে না। মানুষের মনে মিথ্যে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো কোনো মরীচিকার মায়াও আর অবশিষ্ট নেই। যা আছে, তা কেবল অন্তহীন, তপ্ত, ক্রুর ছলনাময় বালুরাশি সদৃশ বিস্তার। মানুষ তার সকল ক্ষমতা, শক্তি ও সকল ঐশ্বর্য নিয়েও নিঃসঙ্গ-নিরালম্ব-অনিকেতরূপে আবির্ভূত। নবতর কোনো সুস্থতার আকাঙ্ক্ষা দগ্ধ—পারিজাত বনের ভস্ম শেষের মধ্যে মাথা কোটার সামিল মাত্র। অর্থাৎ সকল নব সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা শেষ পর্যন্ত বদ্ধ হাহাকার ধ্বনিতে পরিণত। একটি নয়—কয়েকটি নয়—সমগ্র দেশের জীবনেই গ্রহণ লেগেছে। কবি একটি উপমা মাধ্যমে জানিয়েছেন, বছরের শেষে প্রত্যেকবারেই গাছ তার পুরনো পাতা ঝরিয়ে নবযৌবনের অভিষেকে অভিষিক্ত হয়, কিন্তু গ্রহণ লাগা মানুষের ক্ষেত্রে ক্রমশই অন্ধকারের অতল গহ্বরে প্রবিষ্ট হয়। আলোকের উৎসারী — শান্তির নীড় অনেক দূরে সরে যায়। তখন নিত্যসঙ্গী 'অশান্ত বিষণ্ণতা', আশ্রয়দাতা ধূসর মৃত্যু। তখন—

'জলের উদ্দাম জোয়ার ঘোলাটে প্রলাপ,
মাঝে মাঝে শুধু মাঝের ঝলক।
ইলিশের স্বাদ কিন্তু ভুলেছে ছেলেরা,
উলঙ্গ তাঁতিনীর লজ্জা মহাপ্রাণ মৃত্যু ঢাকে।'[১৫]

ঙ. মেঘ মদির মহুয়ার দেশ

শহর কলকাতার কবি সমর সেন। কয়েক বছর দিল্লী প্রবাসের কবিও বটে তিনি। মুখ্যত তাঁর কাব্যজীবনের সূচনা কলকাতা মহানগরীতে। এই নগরে তাঁর বাল্য-কৈশোর-যৌবন অতিবাহিত। এখানের অনেক কিছুই তাঁর মনে স্থায়ী রেখাপাত করেছে। তাঁর পারিবারিক পরিবেশ আবার একেবারেই বেখাপ্পা; প্রতিকূল বলাই সঙ্গত। তাঁর মনের আগ্নেয় উদ্দীপনাকে ধ্বংস করতে সে পরিবেশ নিয়ত নিয়োজিত। এহেন প্রতিকূল পরিবেশে থেকেও তিনি নগরের বৈশ্য আদর্শের আধিপত্য, ন্যায়-অন্যায় বোধ না মানার আত্মম্ভরিতা, অর্থস্ফীতি লক্ষ করেন। লক্ষ্য করেন নিজ নিজ স্বার্থ সংরক্ষণ ও

সম্প্রসারণের ব্যস্ততা, ছোট-খাটো গণ্ডির মাধ্যমে রক্ষিত স্বার্থের খাতিরে বহুর দৈহিক ও আত্মিক বিনাশ, বড় বড় নীতি-কথার অন্তরালে অনাচার, অত্যাচার, ভ্রষ্টাচার। সেই সঙ্গে যৌন-বাসনার বিকৃতি ও প্রেমের অবমাননা, নিরানন্দ যান্ত্রিকতায় নিষ্পেষণ,ও ক্লীব সম্ভোগের ক্লান্তি, আবিলতা ইত্যাদিতে মানুষ নামক প্রাণীটির সারা জীবন এক কঠিন-নিষ্ঠুর নিয়মের ক্রীতদাস হয়ে থাকাও লক্ষ্য করেন তিনি। এ সমস্ত দেখে ভিতরে ভিতরে তিনি অস্থির ও অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিলেন। সুযোগ পেয়েই তাঁর কণ্ঠ উচ্চকিত :

'বৃষ্টির আভাসে করুণ পথে ধুলো উড়ছে,
এমন দিনে সে-ধুলো মনে শুধু আনে
সাঁওতাল পরগনার মেঘমদির আকাশ;'[৯৬]

অনিবার্যভাবেই তাঁর মনে পড়েছে সাঁওতাল পরগণার কথা। এখানে এলে বা এখানকার প্রসঙ্গ মনে উদয় হলে তিনি মনে শান্তি ও স্বস্তি অনুভব করতেন। সাঁওতাল পরগণার প্রতি কবির বিশেষ ঝোঁক ছিল যৌবনে—একথা তাঁর জীবনকথা থেকে আমরা জানতে পারি। এখানের রাতের আকাশ গভীর, স্বচ্ছ ও বিরাট মনে হত তাঁর কাছে। এখানের মাঠ, আলো-বাতাস, অন্ধকার, মেঘ, পাহাড়, খনি, মহুয়া-শালবন, সূর্যাস্ত কবিকে অপার বিস্তৃতি দান করেছে। এরা বিভিন্ন কবিতায় লক্ষিত শূন্যতা ও বিষণ্ণতার ভাষাও যোগান দিয়েছে। শহরের সামান্য বৃষ্টির আভাসে তাই যখন নিশ্বাস ফেলার অবকাশ পান কবি, তখনই মহুয়ার দেশের এই আবেদন যেন খানিকটা নষ্ট্যালজিক—যেন খানিকটা রোম্যান্টিক মনোভঙ্গির দূরাভাস জানিয়ে যায় তাঁকে। মোট কথা এই অঞ্চলটি তাঁর কবিত্বের শিলাইদা-পতিসর।[৯৭] এখানের উল্লেখ তিনি প্রায়শ করেছেন।

'আর অন্ধকারে লাল কাঁকরের পথ
পড়ে থাকে অলস স্বপ্নের মতো।'[৯৮]

অথবা,

রক্তিম প্রাণ গ্রীষ্মে কৃষ্ণচূড়া গাছে আসে;
আজ শহর হতে বহুদূরে শালবনের পথে
বালুতে অতিক্রান্ত দিনরাত্রির ভগ্নস্তূপ,
বিকেলে কাঁকরেরুক্ষ দিগন্ত প্লাবিত লালসৌন্দর্য।'[৯৯]

কিম্বা,

কিছু দূর দেশে দিগন্তে লোহিত সূর্য
কুয়াশায় ঝাপসা পাহাড়
লালপথে কালো সাঁওতাল মেয়ে।'[১০০]—ইত্যাদি।

এমন কি ১৯৪০-'৪২ সাল নাগাদ কবি যখন অনুভব করছেন প্রখরভাবে মধ্যবিত্ত অস্তিত্বকে, 'কলে বিকল ইঁদুরে'র সাদৃশ্যে এবং তাদের 'দিনগুলি বুকে জগদ্দল পাথর' সদৃশ বলে—তখনও কবির মহুয়ার বন মাঝে মাঝে মনে প'ড়ে।

এই সূত্রে আমাদের বলা যেতে পারে, মেঘমদির মহুয়ার দেশ কবি সমর সেনের

স্বপ্নের অমরাবতী। সেখানে শহরের ক্লীশতা নেই, নেই আলকাতরার মতো বিবর্ণতা ও ক্লান্তি। পক্ষান্তরে আছে ক্লান্তি অপনোদনের উপকরণ—আছে প্রেমময় বাতাবরণ—আছে সর্বশ্রেণীর জনতার সমতা। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে বারে বারেই তাই শহর জীবন থেকে মাঝে মধ্যে ছুটি নিয়ে, ক্ষণিক ভ্রমণ দুরত্ব অতিক্রম করে সাঁওতাল পরগণার এখানে সেখানে কাটিয়েছেন।

নিঃসন্দেহে কবি এই স্বপ্নপুরী রচনাতে রোম্যান্টিকতার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। বিশেষত, যে রোমান্স সংযত—তাকেই তীক্ষ্ণভাবে, বেদনার্তভাবে বস্তু সচেতন করে তুলেছেন। ভাব বিলাসী সেজে নয়। এজন্যে অনায়াসে সাঁওতাল পরগণার নৈসর্গিক সৌন্দর্যের গভীরে যে সব প্রতিপন্থা নিহিত, সেগুলি নির্দেশ করতেও ভুল হয় না তাঁর। তিনি জানিয়েছেন ললিত মাধুর্যের বেদনা মাখানো রহস্যময়তায় থেমে থাকার দিন অবসিত। বৈপরীত্যের সংশ্লেষে তিনি এও জানিয়েছেন সভ্যতার করাল গ্রাসে কবলিত হয়েছে মহুয়ার দেশ নামক স্বপ্নের অমরাবতীটিও। দৈশিক লক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে কালিক লক্ষণও তাকে আক্রমণ করেছে বৈদ্যুতিক অস্থিরতায় তাঁর একাকিত্বকে চঞ্চল করেছে জীবনের গতিশীলতা। আর্তনাদে আন্দোলিত হয় নিঃসঙ্গতা ও স্তব্ধতা। সাঁওতাল পরগণার ধুলোভরা নির্জন পথে মোটরের কর্কশ শব্দে, নিঃসঙ্গ স্তব্ধতা ভেঙে একটি হরিণের ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন চিত্র কবির মনে গভীর রেখাপাত করে। নিশ্চিতভাবে বলা চলে এটিই কালিক লক্ষণ। গ্রহণলাগা মানব জীবনে প্রাণের উৎস ক্রমশ যে নিস্তেজ হয়ে পড়ে — সেকথাও মহুয়ার দেশে বর্তমান।

> 'মহুয়া বনের ধারে কয়লার খনির
> গভীর বিশাল শব্দ
> আর শিশিরে ভেজা সবুজ সকালে,
> অবসন্ন মানুষের শরীরে দেখি ধুলোর কলঙ্ক,
> ঘুমহীন তাদের চোখে হানা দেয়
> কিসের ক্লান্ত দুঃস্বপ্ন।'[১০১]

বেদনার মাধুরী নিয়ে নিছক রোম্যান্টিক হ'য়ে থাকার মধ্যে স্বস্তি ও আরাম খুঁজে পান নি যে তাতে সন্দেহ থাকে না। খুব অল্পকালের মধ্যেই তিনি বাস্তবের পৃথিবীতে শিকড় দৃঢ়মূল করতে চেয়েছেন। বলা বাহুল্য, এ পৃথিবী শহুরে, মধ্যবিত্ত সমাজ ও তার পারিপার্শ্বিকতা নিয়ে গঠিত। ব্যক্তিসত্তা এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীসত্তার সংকীর্ণতার দ্বন্দ্বে তিনি উপলব্ধি করেছেন :

> সাঁওতালি পাহাড়ে সূর্য ফেলেছে লাল রং,
> একদা শালবনে কেটেছে রোম্যান্টিক দিন,
> সাপের ভয় স্বল্প ছিল।
> আজ সব লণ্ডভণ্ড।'[১০২]

সমর সেনের এই চেতনা একদিকে তাঁকে বিষাদে ও একাকিত্বে নিমজ্জিত করেছিল

ঠিকই, কিন্তু তবু মধ্যবিত্ত প্রাণধারণের অংশীদার হিসেবে তিনি ভুলতে চেয়েছিলেন সাঁওতাল পরগণার একদা দেখা লালমাটি ও দিগন্তের উদ্যত পাহাড়। কবির কাছে তিরিশ-চল্লিশ দশকের ঔপনিবেশিক সমাজের সংকট ও সংক্রান্তির বিষয় অধিক গুরুত্ব পেয়েছিল। তিনি ঐ সমাজের কবি ছিলেন, সেই সঙ্গে ছিলেন শোষিত সম্প্রদায় ভুক্ত একজন। শোষিতের অভিজ্ঞতার সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষায় অর্জিত লিবারল সংস্কৃতির সমন্বয়ের ফলে তাঁর উপর অলিখিত ভাবে ঐতিহাসিক দায়িত্ব বর্তেছিল। সেজন্যে তিনি অলস অস্তিত্বের চর্বিত চর্বন করেন নি। সামাজিক ও রাজনৈতিক আঘাত-সংঘাতের মধ্যে নিজের ভূমিকা খোঁজার যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে আপন শ্রেণী সত্তাকেও স্বীকার করে নিয়েছিলেন। পাশাপাশি শ্রেণী সত্তার সংকীর্ণতা হেতু আত্মরক্ষার অস্বস্তিকর উল্লেখ কবিতা মধ্যে যত্রতত্র ছড়ানো।

প্রসঙ্গত সে সময়ের সামাজিক ইতিহাস সংক্ষেপে স্মরণ করতে পারি। সমগ্র জাতিকে দেশব্যাপী সংগ্রামে সামিল করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে গান্ধীজী ও কংগ্রেসের উদ্যোগে যে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা আপোষেই শেষ হয়। অথচ সন্ত্রাসবাদ বা সমাজবাদ—কোনো রাজনীতিই তখন সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করতে যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। উচ্চবর্ণের নেতৃত্বের ব্যর্থতায় হতাশ হয়ে অনেকেই জঙ্গী লড়াইয়ের সম্ভাবনা দেখেছিলেন সাম্যবাদের পতাকা, লাল নিশানের সংকেতে। যদিও সে নিশান, তখনো শুধুই আঞ্চলিক ও খণ্ড প্রতিরোধের প্রতীক মাত্র। অন্যদিকে, বিদেশে হিটলার ও মুসোলিনীর দৌরাত্ম্য ক্রমশ বেড়ে চলেছে তখন। স্পেনে শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। প্রথম পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হবার পর রাশিয়া অক্লান্ত ভাবে যুক্তফ্রন্টের আহ্বান করে চলেছে। আর দেশে গান্ধীজীর আন্দোলন ব্যর্থ হবার পর অবসাদ। নেহরু বিভিন্ন সভাসমিতিতে সমাজতন্ত্রের কথা বলে চলেছেন। গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুর মতভেদ এ সময়েই। এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায়, গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলন সমর সেনকে তেমনভাবে প্রভাবিত করতে পারে নি। অবশ্য তাঁদের বাড়িতে কংগ্রেসী রাজনীতির আলাপ-আলোচনা ছিল না। তবে ভারতবর্ষে তখন কংগ্রেসীরা একমাত্র আত্মপ্রতিষ্ঠ পার্টি, তাই কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে কোনো রাজনীতির আলোচনা সেদিন সম্ভবপর ছিল না। অথচ কবি এই রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন নি।

কারণ অতি অল্প বয়স থেকেই তিনি পারিবারিক পরিবেশে সন্ত্রাসবাদীদের বাড়িতে যাতায়াত লক্ষ্য করেছেন। এই পরিবেশে অবস্থান কালেই তিনি মার্কসবাদী রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত হন। ১৯২৯ এর মীরাট ষড়যন্ত্রের মামলার অন্যতম আসামী রাধারমণ মিত্রের নিকট তাঁর কমিউনিজমে দীক্ষা লাভ। ১৯৩২-'৩৭ সাল পর্যন্ত বেহালার বাড়িতে তিনি ছিলেন। বেশ কিছুদিন রাধারমণ মিত্র সেখানেও পারিবারিক ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে বসবাস করেন। এছাড়া তখন মার্কসবাদের ব্যাপক প্রভাব ছাত্রসমাজে বর্তমান। কবি সেই সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তিনি তখন ছাত্র। তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু-বান্ধবেরাও অনেকে মার্কসবাদী। যদিও তিনি নিজে কমিউনিষ্ট পার্টির মেম্বারশিপ নেননি কোনোদিন।

এই অবস্থার পাশাপাশি লক্ষিত হয় শ্রমিক সংগঠন ও আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচি। বিশেষ করে, শ্রমিক আন্দোলনগুলি শ্রমজীবী মানুষের জীবনের মান উন্নয়নের জন্য নানা ধর্মঘটে নিয়মিত অংশ নিচ্ছিল। অপরপক্ষে, ১৯৩৯ এর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় অন্য অনেকের মতো কবিও ভেবেছিলেন এটা যুগসন্ধি। এ কেবল কয়েকটি রাষ্ট্রের জয় পরাজয় ব্যাপার নয়। প্রাচীন পৃথিবী ভেঙে নতুন পৃথিবী গড়ার উদ্যোগ চলেছে। এখানে মধ্যবিত্তের কোনো স্থায়ী ভিত্তি নেই। তার একমাত্র বাঁচার আশা—ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্রের সেবার পরিবর্তে ভবিষ্যতের বাহক. শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে হাত মেলানো। এখানেই কবি সমর সেনের রাজনৈতিক সচেতনতা এবং প্রকৃত গণতান্ত্রিক চেতনা এক বিরল মহিমায় মহিমান্বিত। এই বোধ থেকেই তাঁকে প্রাতিষ্ঠানিকতার সঙ্গে একদিকে অমিত্রসুলভ সম্পর্কের জায়গায় নিয়ে এসেছিল, নিয়োজিত করেছিল যে কোনো ধরনের আপোষকামিতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে যেমন—তেমনি অন্যদিকে, সাহসী রৌদ্রের মতো তাঁর স্পষ্ট কণ্ঠস্বর শত্রুর লাল চোখের উপর এক বিপ্লবী প্রতিস্পর্ধায় আন্দোলনকে ছুঁড়ে দিয়েছিল। এই আত্মপ্রত্যয় থেকেই তিনি জানিয়েছেন—রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিতায় যে নৈরাশ্য, যে সংশয়, অ-প্রেম ও অবিশ্বাস এবং সমাজ ও সামাজিকতার যে ক্ষয় ফুটে উঠেছিল বেশির ভাগ কবির কবিতায়, তা খুবই স্বাভাবিক। কারণ এটাই যুগধর্ম।

তথাপি এই শক্তিও একদিন নিঃশেষ হবে। এ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য : 'But a critical situation arises when we find that this (consciousness) also is not enough even from the point of view of poetic integrity. We will reach that stage very soon and we must make a choice if we are to continue as living writers. This involves an entire reconstruction of our ways of living. An active part in the mass movement will certainly help that poet who has been able to preserve his integrity. He will then perhaps cease to soliloquise and will begin to be a representative. Such a reconstruction of living is not an easy job for the present generation of Bengali poets, most of them settled in life and approaching the critical age of thirty.'[১০৩]

সমর সেনের বক্তব্য এখানে খুবই স্পষ্ট। একটা সময় বিপ্লবী জীবনে আসেই, —কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ার লগ্ন হয়ে ভাবতে হয় জীবনযাত্রার পদ্ধতির আমূল পরিবর্তনের কথা, যদি সাম্যবাদী কবির নিষ্ঠা আর কাব্যপ্রীতিকে তখনও সে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। এই সূত্রেই আমরা দেখি, একদা কবির স্বপ্নপুরী-সাঁওতাল পরগণার রোমান্টিকতা আস্তে আস্তে সাম্যবাদের বৈকুণ্ঠে পরিবর্তিত হয়ে বাস্তবে ঋদ্ধি লাভ করতে চাইছে। এ কাজ সংসারী মানুষের পক্ষে, বা সংসার গড়ার কাছাকাছি বয়েসীদের পক্ষে সহজ সাধ্য নয়। কারণ দু'পক্ষেরই অনেক সমস্যা আর দায় দায়িত্ব থাকে—যা উত্তীর্ণ হতে পারলে ভালো, কিন্তু সাম্যবাদে যথার্থ নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও সকলের সাধ্যে তা কুলিয়ে ওঠে না। এদিক থেকেও সমর সেন ব্যতিক্রম। তিনি জানতেন সাম্যবাদী কর্মকাণ্ডে অংশ নিলে স্বগত ভাষণের অবকাশ থাকে না, অথচ স্বগত ভাষণই দেশের সেদিনের অবস্থায়

একমাত্র পথ। 'With huge and vital section of our population illiterate and dim in the background .... We can at present only soliloquise, we can not address the real audience.'[১০৪] যে দেশে আজও শিক্ষিতের হার লজ্জাজনক—সেদিনকার শোচনীয়তা সে দেশে আরও কত সর্বাতিশয়ী ছিল, তা সহজেই অনুমেয়। এই সূত্রেই কবি কণ্ঠে উচ্চারিত : 'আমি রোমান্টিক কবি নই আমি মার্ক্সিস্ট।'[১০৫]

আজকের অভিজ্ঞতায় মানুষ জানে, শিক্ষা ব্যতীত মানুষের যে কোনো মতবাদ গ্রহণ করবার মতো সামান্যতম সজাগ-সচেতন মন তৈরী হয় না। এবং তা না হলে মুহূর্তে মুহূর্তে মনের বিশ্বাসের স্থানচ্যুতি সর্বনাশা পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। কবির চেতনায় ধরাও পড়ে সেকথা।

অসংখ্য নিরক্ষর দুঃস্থের দেশে
নিঃসম্বল পর্যটক মাত্র,
বিশাল ভারত,
জন্ম আর জরা; জীর্ণ জাল,
জন্ম আর জরা,
প্রতিষ্ঠিত বৃন্ত থেকে বিচ্ছিন্ন
লক্ষ্যহীন কত লোক,
মগজ স্মৃতির জাবরে ভরা, চা আর ধূমপান,
নিষিদ্ধ গান।'[১০৬]

অক্ষরজ্ঞানহীন বৃহদংশের কাছে পৌঁছতে না পেরে কবি বিচ্ছিন্নতার বোধে ভুগেছেন। বিশেষত তাঁর মধ্যবিত্ত মানসিকতা এই বোধকে প্রকট করে তুলেছিল কৈশোর থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত সর্বদা। তিনি তাঁর মধ্যবিত্ত পাঠকের কাব্যবোধের গণ্ডিকে নাড়িয়ে দেবার প্রয়াসে, রোমান্সে ভরা সাঁওতাল পরগণার মেহ মদির মহুয়ার দেশকে মার্কসবাদী ভাবাদর্শের সমীপ্যে উপস্থাপনা করতে সচেষ্ট হন। ফলে তিনি উদ্বুদ্ধ হন এবং প্রাণিত হন মার্কসের এই কথায়—'It is the consciousness of men that determines their being, but on the contrary, their social being that determines their consciousness.'[১০৭] কবি এও মনে করেন, সমাজের মুক্তি না হলে কোনো ব্যক্তি মানুষের মনের মুক্তি ঘটে না। অর্থাৎ 'জীবন ধারার ছাপ চেতনা ও সৃষ্টি শক্তিকে গড়ে, চেতনা নয়। অপর পক্ষে এটা পরে বলা হয়েছে যে উপরি কাঠামোর প্রভাব—জীবন ধারার পরিবর্তনে সাহায্য করে। এটা যৌথ জীবনে যতটা সম্ভব ব্যক্তিগত জীবনে ততটা নয়।'[১০৮] সমর সেনের তাই বিশ্বাস—জীবন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে শক্তি অর্জন করেননি, কোমর বেঁধে কবিতায় সেই রং ফলিয়ে তোলার শৌখিন মজদুরিও তিনি করেননি। এর ফলে তিনি সততার প্রতি আস্থা রেখে মুখরক্ষা করেছেন। কবির চোখে রোমান্সের রং গাঢ় থাকাকালীনই অবশ্য এর আভাস পাওয়া গিয়েছিল।

'তবু জানি, কালের গলিত গর্ভ থেকে বিপ্লবের ধাত্রী
যুগে যুগে নতুন জন্ম আনে,

তবু জানি,
জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে চূর্ণ হবে ভস্ম হবে
আকাশ গঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে।'[১০৯]

এখানের 'তবু জানি' টুকু নিয়ে একদা প্রগতি সাহিত্য সংঘের আসরে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ধারা বয়ে যায় যে, তা আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'দেশ-কাল কবিতা'র উপরিভাগ' 'প্রগতি লেখক সংঘের কথা' আলোচনায় দেখি। 'আকাশ গঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে'—বোঝাতে সমর সেন দুটি দিকের উল্লেখ করতে চেয়েছেন। এক, মধ্যবিত্তের কর্মভীরু চেতনায় আবার অসহনীয় জীবনকে সহনীয় করে তুলবে; দুই, মধ্যবিত্ত হিসেবে কবির নিজের নিশ্চেষ্ট বুলি-আওড়ানোকেই আবার নির্মম বিদ্রূপে বিদ্ধকরণ। সে যাই হোক, এই 'জানা'র ভিতর দিয়েই মার্কস এর সঙ্গে কবির যোগসূত্র হয়।

কবির কাছে ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রেক্ষাপট ও একেবারে অচেনা-অজানা ছিল না। বিশেষত, যুগ যুগ ধরে অগণিত খেটে খাওয়া মানুষের উপর মুষ্টিমেয় শোষক সম্প্রদায়ের কাহিনীই হ'ল সেই ইতিহাস। আর ভারতবর্ষের ইতিহাসের যে অংশের সুবিধাভোগী, উত্তরাধিকারী হিসেবে তিনি নিজেকে মনে করতেন—সেই অংশের জীবন প্রণালী তাঁকে উঠতে বসতে দীর্ণ করতো। হাজার হাজার বছরের শ্রমে গড়া যাদের সভ্যতা—সেই সব মানুষদের চরম অপমানে কবি-হৃদয় আর্তনাদে উচ্চকিত। অতিপরিচিত ঘটনা মাধ্যমে, মানবতার অবমাননার অতি অভ্যস্ত নিদর্শনের মধ্য দিয়ে তাঁর ঘৃণা, রাগ এবং সদাজাগ্রত ইতিহাসবোধ পরিস্ফুট। বাঙালী বুদ্ধিজীবীকে 'মীরজাফরী অতীতের উত্তরাধিকারী' হিসেবে অভিহিত করেছেন তিনি। তাঁর কাছে এরা মেকলে'র শিক্ষাপ্রাপ্ত বিষবৃক্ষের ফল সদৃশ। তবে তিনি এখানেই থামেননি, ক্রমশ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের প্রসঙ্গ টেনে এই বুদ্ধিজীবীদের বিশ্লেষণও করেছেন।

'দুর্দান্ত যবন কালে ধরেছি উপনিষদ্।
ভাগ্যক্রমে ইংরেজ এল, স্বাগতম্!
পড়েছে মুসলমান, বন্দেমাতরম
ধ্বনি উঠে ঘটিরাম ডিপুটির ঘরে,'[১১০]

মুখে অহিংসাধর্মের কথা, আর অন্যদিকে ইংরেজ তোষণ ও স্বজাতি-নিধনে লিপ্ত থাকা—তথাকথিত 'জাতীয়তাবাদী'দের সমর সেন বারংবার তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করেছেন। এদেরকে তিনি বাল্যকাল থেকেই ক্ষমা করতে পারেননি। তিনি ভাবতে পারেন না, মানুষের প্রেমের অবক্ষীণ রূপ। মানবত্বের পরাকাষ্ঠার দোহাই পেড়ে, যে মসৃণ-মানুষ জীবন কাটিয়ে দেয় শুধুমাত্র জান্তব প্রজননবৃত্তি আশ্রয় ক'রে এবং বণিক সভ্যতার দীর্ণ মরুভূমি থেকে জীবনের অন্ধকার প্রদেশের দিকে চোখে চোখ রেখে—তাদেরও প্রশ্রয় দিতে নারাজ তিনি। তিনি 'জনতা'কে দেখতে চেয়েছিলেন সংগ্রামী মানুষের সচেতন সমষ্টি হিসেবে। বাড়তি মালগুজারী না দিতে যে চাষী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং ইউরোপীয় ফ্যাসিবাদকে যে শ্রমিক তার হাতিয়ার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে—সেই চাষী এবং সেই

শ্রমিকের জাগরণের অনুরণন সমর সেনের কবিতায় বর্তমান। তিনি উৎসাহী হ'য়ে 'বাবুবৃত্তান্তে' জানিয়েছেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দরুন বাংলার শ্রমিক শ্রেণী কিছুটা লাভবান হয়েছিল। কারণ কর্মসংস্থান বাড়ে এবং শিল্পোন্নতি ঘটে তখন। তাই কমিউনিস্ট দলের যুদ্ধ সমর্থন খুব একটা দোষনীয় নয়।[১১১]

কিন্তু অব্যবহিত পরেই বিশ্বযুদ্ধের ত্রিকোণরূপ কবির দৃষ্টিতে অস্পষ্ট থাকেনি। ফ্যাসিবাদ প্রধান শত্রু; অন্তত সাময়িক ভাবে। বৃটেন ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সাময়িক মিত্র —কিন্তু বন্ধু নয়। প্রয়োজনীয় মিত্রতায় যার সূচনা, তার শেষ সমগ্র পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদের বিলুপ্তিতে—এ সম্পর্কে কবির কোনো সন্দেহ ছিল না। 'খোলা চিঠি' কাব্যগ্রন্থের গোড়াতেই তিনি লেনিনের থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন : 'I support Henderson with my vote as the rope supports a man who is being hanged.' কমিউনিস্টরা প্রয়োজন মতো শোধনবাদী সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের সমর্থন করবে, এমন কি তাদের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠন করবে বলেই লেনিন মনে করতেন। বিপ্লবী কমিউনিজমের প্রসার এবং জয়—এর প্রকৃত উদ্দেশ্য। একথা কবিরও কিছুটা যেন মনঃপূত ছিল। তাই তিনি একইভাবে ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামে রং বেরঙের সাম্রাজ্যবাদ—বিশেষ করে ভারতের ব্রিটিশ প্রভুদের সঙ্গে হাত মেলাতেও রাজি। কিন্তু সেই মুহূর্তেই আবার তাদের ধ্বংসের অমোঘ ইঙ্গিতও তাঁর চোখে পড়ে।

> অবশ্য রাজ্যলোভী দস্যু নয়, পৃথিবী করুক বিচার,
> অবসর মতো পড়ে দেখ অতলান্তিক চার্টার।
>
> ....
>
> হুজুর বড়োলাট, জঙ্গিলাট বর্মাবীর আলোকজান্ডার,
> আমরা বান্দা এখনো, তবু বন্দী তোমরা নিজেদের জালে
> ইতিহাসের জাঁতাকলে, আত্মঘাতী নসারের ফলে।'[১১২]

—কতখানি সঠিক ছিল এই রণনীতি? বিশেষ করে, ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য উপনিবেশ গুলির ক্ষেত্রে? যুক্তফ্রন্টের ছিদ্র দিয়ে শোধনবাদের কালসাপ প্রবেশ করেছিল কিনা?— ইত্যাদি বিতর্কে না গিয়েও বলা যেতে পারে, সমর সেন যে অধরা-পৃথিবীর স্বপ্ন একদা মহুয়ার দেশে দেখেছিলেন এবং পাঠককেও দেখিয়েছিলেন—তাকেই রাজনীতি মনস্কতার মধ্য দিয়ে কবিতায় ধরতে চেয়েছেন। তাঁর মতে সেখানে সর্বতোভাবে প্রাধান্য পাবে সাম্য।

প্রসঙ্গত বলতে পারি সমাজতন্ত্র হ'ল যুদ্ধের তৃতীয় কোন। সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রতিষ্ঠিত বাস্তবিক সমাজতন্ত্র। অন্যত্র শ্রমিক কৃষক আন্দোলনের মধ্যে নিহিত ভবিষ্যৎ— সম্ভাব্য সমাজতন্ত্র। ফলে সোভিয়েত রাশিয়া স্বাভাবিক কারণেই ছিল সে যুগের বামপন্থীদের কাছে ধ্রুবতারা সদৃশ। ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের সময় রাশিয়ার অসাধারণ বীরত্ব, দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ অ-রাজনৈতিক মানুষেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। এদিক থেকে বাঙালী কবি লেখকরাও শ্রদ্ধা জানাতে কার্পণ্য করেননি। এই বিপ্লবের ৮ মাস

পরে ১৯১৮ সালের জুলাই মাসের 'Modern Review' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'At the Cross Road' নামে এক প্রবন্ধে লেখেন : 'We know very little of the history of the present revolution in Russia, and with the scanty materials in our hands we cannot be certain if she in her tribulations, is giving expression to man's indomitable soul against prosperity built upon moral nihilism. All that we can say is that the time to judge has not yet come, especially as Real politik is in such a sorry plight itself. No doubt if modern Russia did try to adjust herself to the orthodox tradition of Nation-worship, she would be in a more comfortable situation today, but this tremendousness of her struggle and hopelessness of her tangles do not, in themselves prove that she has gone astray. It is not unlikely that, as nation, she will fail; but if she fails with the flag of true ideals in her hands, then her failure will fade, like the morning star, only to usher in the sunrise of the new age.' আর এই দেশের শহর স্টালিনগ্রাড অখণ্ড এক আন্তর্জাতিক চেতনার রূপ দিয়েছিল। সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'স্টালিনগ্রাড' কবিতায় লিখলেন—

প্রতিরোধ চলে টিমোলেঙ্কোর পলটন দলে দলে—
স্টালিনগ্রাডের প্রিয় পথ পদতলে।
গৃহ আজ দৃঢ় দুর্গ, শরীর ব্যূহ।
লেনিনেব স্মৃতিশক্তি জোগায় কণ্ঠে কঠিন ধূয়ো।
স্পর্ধিত হাত বাড়ালো শত্রু, ৭ই নভেম্বর।'

এই চেতনা কবি সমর সেনের প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞার প্রতীকে ধরা পড়ে অনায়াসে।

'গভীর রাত্রে অনেক লোক জাগে,
বিপুল বিক্ষুব্ধ পৃথিবীর
হৃৎপিণ্ডে এখনো গরীয়ান
কত বর্বরের গোরস্থান এ-শহরে,
রাত্রে ভয়ংকর মৃত্যুর মুখে জীবনের জয়গান বাজে',[১১৩]

দেশ রক্ষার যুদ্ধ জয়ের পর দেশ গঠন। শান্তি ও উন্নত সমাজ সেখানে উপস্থিত হবে বলেই কবির বিশ্বাস। 'সেখানে ট্যাঙ্কের শব্দ স্তব্ধ হলে/বিধ্বস্ত মাটিতে আনে ট্রাক্টরের দিন/জোসেফ স্টালিন।'[১১৪]

রাশিয়া শুধুমাত্র মুক্তিযুদ্ধ ও শান্তির অগ্রদূতই ছিল না। সকলের সততার কষ্টিপাথর, বিচারের মানদণ্ড হিসেবেও রাশিয়া বিবেচ্য হ'ত। প্রসঙ্গত এখানে স্মরণ করতে পারি, পরবর্তীকালে সমর সেনের কর্ম উপলক্ষে রাশিয়ায় চার বছর থাকাকালীন, এদেশ সম্পর্কে তাঁর মুগ্ধতা অনেক কমে গিয়েছিল। যদিও তিনি সোভিয়েত সমাজের নানা ইতিবাচক দিক লক্ষ্য করেছিলেন এবং এখানের সাধারণ মানুষের বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার তাঁর দৃষ্টিতে পড়ে।

সমর সেন কবিতায় রাশিয়ার সুন্দর উজ্জ্বল চিত্র পরিস্ফুটনের বৈপরীত্যে স্থাপন করেছেন ভারতবর্ষীয় মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজ, যেখান থেকে কবির উদ্ভব। কবি শিল্পীও

বটে। শিল্পীর মন দল মত নির্বিশেষে যদি সমস্ত মানুষের তথা—মানব সম্প্রদায়ের পিপাসার তৃপ্তি বিধানের দায়বদ্ধতা স্বীকার করে, তাহলে তা যে কোনো দলীয় স্বার্থকে উপেক্ষা বা অস্বীকার না করে বরং তার মহৎ উদ্দেশ্যকেই অভিব্যক্ত করে। মার্ক্সীয় বিশ্বাসের এতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা কম। পক্ষান্তরে, তার শিকড় অচেতন অশিক্ষিত মানব সমাজের গভীরে সহজ বিস্তারের পথ পায়—এসমস্তই সমর সেনের বিশ্বাস। কিন্তু সমালোচক ও রাজনৈতিক কর্মী সরোজ দত্ত তা স্বীকার করতে চাননি। দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'প্রগতি লেখক সংঘের কথা' উপবিভাগে আমরা দেখি, সরোজ দত্ত এ ব্যাপারে কবির সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এই তর্ক-বিতর্কের ফলে দুটি দিক প্রাধান্য পায়। যথা—ক. কবিতার চৌহদ্দীকে কট্টর রাজনৈতিক অনুশাসনের বেড়ায় ঘিরে রাখার দুষ্প্রবৃত্তি, খ. কবিতাকে উচ্চাঙ্গের আঙ্গিক—কলাকৌশলে অভিজাত শ্রেণীর শিল্প কীর্তি হিসেবে রক্ষা করবার মজুতদারী কূটবুদ্ধি। এই দ্বিবিধ ষড়যন্ত্রের শিকার কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গোটা সমাজ জীবন। প্রগতি সাহিত্যের ঝড়-ঝঞ্ঝা, ধূসর-ধূলি ছাড়াও আন্দোলনের ধাক্কায় দুদিকেই দোল খাওয়া ছাড়া—সাধারণের জীবনে বিশেষ কিছু নগদ লাভ হয় না। প্রগতি-সাহিত্যের ধারণাধারীদের প্রতি কবির কটাক্ষ তাই লক্ষ্য করার মতো। কারণ তথাকথিত এই প্রগতিবাদীরা পরম সুবিধাবাদী। এরা মার্ক্সিস্ট মন্ত্রোচ্চারণে যেমন উচ্চকণ্ঠ, তেমনি দক্ষিণাদি গ্রহণেও সদা স্বার্থপর। আত্মচর্চায় সতত দ্বিধাহীন। অর্থাৎ বামপন্থী-ডানপন্থী সমান অবস্থানেই আগ্রহী। কবির আক্ষেপ :

> লেনিন, স্টালিন, জুখভ ও গোর্কি,
> তাদের আমরা চিনি। কিন্তু বুঝি না তাকে,
> দুধ ও তামাকে সমান আগ্রহ যার,
> দু-নৌকোর যাত্রী, এই বাঙালী কবিকে,
> বুঝিনা নিজেকে।'[১১৫]

অন্যদিকে, আবার ১৯৪৩-এ একদা কলকাতায় ফ্যাসীবিরোধী লেখক সংঘের সম্মেলনে যে মধ্যবিত্ত অহংকার ত্যাগ করে জনতার হাতে হাত মেলানোর কথা ঘোষিত হয়েছিল—তা অনেক ক্ষেত্রেই হাত মেলানো হয়েছিল নোতুনত্বের সন্ধানে। তত্ত্বগতভাবে শ্রমিক-কৃষক প্রীতিতে। এখানেও একটা ফাঁকি চোখে পড়ার মতো। গণনাট্য সংঘের যে অভিনেতারা চাকরি-বাকরির পরোয়া না করে জলকাদা ভেঙে গ্রামে-গঞ্জে দেশের লোককে নাচগান শুনিয়েছেন, দুর্ভিক্ষ ত্রাণে অর্থ সংগ্রহ করেছেন—তারাই কিন্তু 'পরে শহরে এসে হয় দলীয় কোন্দলে মেতেছেন, অথবা গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের শিকার হয়েছেন। তাই সাহিত্য ও গণসংগ্রাম সম্পর্কে প্রবন্ধ মারফৎ শিল্পী সাহিত্যিককে প্রয়োজন হলে কলমের পরিবর্তে বন্দুক বা কাস্তে ধরার প্রস্তাব প্রায় কোনো সৎ লেখকেরই বাস্তবে অভিপ্রেত নয়। যদিও এঁদের কবিতায় বন্দুক বা কাস্তের প্রসঙ্গ বহুবার উত্থাপিত। এ সমস্ত দেখে সমর সেনের আশা-আকাঙ্ক্ষা খণ্ডিত হ'য়ে পড়ে। পাশাপাশি ভারতের সাম্প্রদায়িক বিরোধ-মিলন, দেশ ভাগের ছায়া চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তৎকালীন কমিউনিস্ট

দল জাতীয় স্বায়ত্ত শাসনের নামে পাকিস্তানের দাবি সমর্থন করে। আশাহত হলেও কবির চোখে স্বপ্ন তখনো সামান্য অবশিষ্ট। কেননা তিনি ভেবেছিলেন, পরাধীন ভারত ভেঙে জন্ম নেবে দুই স্বাধীন-স্বতন্ত্র অথচ বন্ধুত্বের ডোরে বাঁধা দেশ। এটা কম কথা নয়। যদিও বাস্তবে তা হয়নি। রাম আর রহিমেরা, অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান পরস্পর পরস্পরের গলা কাটলে কবির স্বপ্ন অচিরেই দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়। তখন মরণেই একমাত্র মিলনের যোগবন্ধন তাদের।

'মৃত্যু হয়তো মিতালি আনে :
ভবলীলা সাঙ্গ হলে সবাই সমান—
বিহারের হিন্দু আর নোয়াখালির মুসলমান
নোয়াখালির হিন্দু আর বিহারের মুসলমান।'[১১৬]

এরপরে রাজনৈতিক নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতায় সমর সেন বিষণ্ণতা বোধ করেন। বিশেষত বোম্বাইয়ের নৌবিদ্রোহেব পরাজয় ঘটে এই নেতাদেরই অদূরদর্শিতায়। এসম্পর্কে 'জয়হিন্দ' কবিতায় উল্লেখ করেছেন : 'বম্বেতে দিন রেখে গেল বারুদের গন্ধ, / রাস্তায় রক্তের ছিটে। /বন্ধুদের খর শব্দ থামলে শহরে/বিপ্লবী নেতারা জমে বক্তৃতার মাঠে, /সর্দারের ধমকে পার্কের রেলিং কাঁপে, /হয়তো কৃত পাপের লজ্জা জাগে/মর্গে জমা দুশো সত্তরটা লাসে।/ধোঁকায় জব্দ জাহাজেরা বন্দরে স্তব্ধ, / মাঝে মাঝে উদ্যত সঙিন, সাম্রাজ্যের উদ্ধত প্রতীক।' এই নেতাদের একমাত্র পরিচয়—মাঠে বিপ্লবী বক্তৃতা দেওয়া। এদের সম্পর্কে তিনি দিল্লী থেকে [তিনি তখন কর্মসূত্রে দিল্লীর বাসিন্দা] বন্ধু বান্ধবকে আরও জানান : 'এখানকার সাম্যবাদী নেতার.........সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি বললেন : সব বিলকুল পাগলামি। .... যখন চাঁদনীচকে লাঠি এবং আরো অনেক কিছু চলেছিল তখন তিনি সংগ্রাম প্রচেষ্টার ভবিষ্যতে উৎকণ্ঠিত হয়ে কফি-হাউসে কফি পান করছিলেন। আমাদের কলেজে প্রায়ই আসেন, বলেন যে General Wavell নাকি হিন্দুস্থানে সবচেয়ে progressive লোক, এসব গড়বড় যে হচ্ছে তার জন্য অবশ্য সরকার কিছুটা দায়ী, ইত্যাদি। এসব আত্মম্ভরী চিড়িয়া দেখে দেখে অত্যন্ত বিমর্ষ লাগে। ....কী করে জাতীয় গভর্নমেন্ট হবে সেটা ঈশ্বর ও কম্যুনিস্ট পার্টি জানেন।'[১১৭] শুধু এখানেই থেমে থাকেননি তিনি। তাঁর বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা প্রকট হয়েছিল ক্রমশ। বিষ্ণু দে-কে অবশ্য আগেই এক পত্রে সেকথা জানিয়েছেন তিনি—'সভার পর সুভাষের [সুভাষ মুখোপাধ্যায়] hero জগদত্ শর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। মিটিং সম্বন্ধে ভদ্রলোকের উন্নাসিক মনোভাব দেখে পশ্চাদ্ভাগে চপেটাঘাতের ইচ্ছা হয়েছিল।'[১১৮] আরও পববর্তীকালে এই নেতাদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে কবিকণ্ঠ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে সোচ্চার।

'একদা বেজায় ক্ষমতা ছিল আমার নেতার!
চোখের পলকে তাঁর
সিংহরাজ মাথা নিচু করে
পাতাত মিতালি ছাগের সঙ্গে।

আজ দেবতা আমার বোবা আর কালা,
নেড়া বটগাছের তলায়
ফোকলা হাসিতে আপন মনে সময় কাটান
নির্বিকার।'[১১৯]

অর্থাৎ কবির আশাভঙ্গের তালিকা ক্রমেই বেড়ে চলে। সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কয়েকটি ঘটনাও উল্লেখের দাবি রাখে। জাপানীদের বিতাড়ন করে ব্রিটিশ, ফরাসী ও ওলন্দাজরা ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে অগ্রসর হয়। বিশ্বযুদ্ধের অবসান পুরোপুরি অবসান না ঘটলেও ফ্যাসিবাদের পরাজয় ঘটে। তবে জাপানী নিপ্পনের সরব কোলাহল ও ব্যর্থতা অপেক্ষা সমর সেনের দৃষ্টিভঙ্গি মন্বন্তর পীড়িত ভারতের দুঃস্থ-শ্রমজীবী-বস্ত্রহীনাদের প্রতি অধিক। তিনি মনে করেন, মহাপ্রাণ মৃত্যু ছাড়া এসব আতুর-অভাগার লজ্জা নিবারণ সম্ভব নয়। এই রাজনীতি সচেতন পর্বে কবি তাই স্বস্তি পান না কিছুতে। তাঁকে কেউ তখন দুদণ্ড শান্তি দিতে পারে না; এমন কি প্রথম যৌবনের অমরাবতী, মেঘমদির মহুয়ার দেশও কবির কাছে মনে হয় অধরা। কারণ তিনি ততদিনে বুঝেছেন, বামপন্থী মধ্যবিত্ত-বুদ্ধিজীবী-শ্রমিকের-কৃষকের সঙ্গে একাত্ম হবেন এবং সেই অনুপ্রেরণা মহান গণসাহিত্য রচনা করবেন—এ আদর্শ নিঃসন্দেহে খুব উচ্চ। কিন্তু সে কাজ তাঁর একার পক্ষে সম্ভব নয়। সদিচ্ছা থাকলেও নয়। কমিউনিস্ট দলের দায়িত্ব উপযুক্ত পরিমণ্ডল তৈবী করা। কিন্তু ভারতীয় কমিউনিস্ট দলে তখনও পর্যন্ত তা হয়ে ওঠেনি। ২২ শে জুন, ১৯৪১ এ ভোর রাতে অতর্কিতে হিটলারের রাশিয়া আক্রমণে ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টি আইনত চালু হলে (যদিও অনেক আগেই প্রতিষ্ঠিত), হু হু করে সাম্যবাদীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তারপর ক্রমেই বামপন্থীদের কর্মোদ্যোগ থেমে যায়। অবশ্য দু একজন যে একেবারেই সক্রিয় ছিল না তা ঠিক নয়। এহেন সমাজ বোধের প্রত্যক্ষতায় অরুণোদয়ের প্রত্যাশী সংলাপ লেখা সমসাময়িক কবিদের পক্ষে সম্ভব হলেও সমর সেনের মতো ঋজু ও প্রখর মস্তিষ্ক সচেতন মানুষের চেতনায় তা নিছক এক 'শূন্য পাহাড়ে কুয়াশা', অতএব নিরর্থক মেঘমদির মহুয়ার দেশের সন্ধান।

অন্যদিকে যে সব মধ্যপন্থী দেবদূত ঈশ্বরের পক্ষ অবলম্বন করেনি এবং শয়তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহেও অংশ নেয়নি, তারা স্বর্গ-নরকের মধ্যে অনন্তকাল ভেসে বেড়ায়। কোথাও তাদের স্থান নেই। এই মধ্যপন্থীরা শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের নীরব দর্শক ছাড়া কিছু নয়। এরা সংখ্যায় বেশী। এদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে সমর সেন দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—'This miserable mode the dreary souls of those sustain, who lived without blame, and without praise' [১২০] বলে। চূড়ান্ত শোষণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এদের নিরুপায় ভঙ্গিমা দর্শনে তাঁর একদা রক্তে জাগা চঞ্চল বলাকাঘেঁষা পাপড়িগুলো একে একে ঝরে যায়।

পুরানো কথায় আবার ফিরে আসি, জনজীবনকে দর্শক এবং সাথী (Comrade) হিসেবে দেখার কিছু অভিজ্ঞতা কবির হয়েছিল। জনজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত সম্পর্ক

ব্যতিরেকে জনজীবনের প্রতিফলন কবিতায় অসম্ভব বুঝেছিলেন। তিনি অন্য সচেতন কবিদের মতোই একথা মেনেছিলেন—

'যা লেখ কবিতা লেখ কিন্তু তোমার মাথায় দিয়েছে দিব্যি, যা
কদাচ প্রকাশ্য নয়, এ ভর-সন্ধ্যায়, এই কালবেলায়
করতে হবে উচ্চারণ? দেশের আপৎকালে এ সকল
গোঁয়ার্তুমি ছাড় হে, যে লেখ, ইচ্ছে মত লেখ;
বদলেয়ার ভেঙে খাও, স্বপ্নে দেখ নাজিম হিকমত
অনুবাদ করো পাবলো নেরুদা
কিন্তু সাবধান!'[১২১]

অতএব সক্রিয় জীবনে মৃত্যুর ৪২ বছর আগেই কবি সমর সেন, কবিতা লেখার কলমকে কবিতার জগৎ থেকে সরিয়ে আনলেন। তাঁর মানসিকতায় তো সেই কবে থেকেই রোম্যান্টিক বাতাবরণ অনুপস্থিত, অথচ টেকসই কবিতায় শুধুমাত্র ক্লিন্ন বৃষ্টির কথা বলে থেমে থাকলেই চলবে না। আঁকতে হবে রোম্যান্টিক পর্বত উপত্যকায় জীবনের মেঘ বাদলের কল্লোলগীতির লিরিক ছবিও। কিন্তু সে সম্ভাবনা একেবারেই নেই। যেহেতু কবি অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করেছেন : 'রোম্যান্টিক ব্যাধি আর রূপান্তরিত হয় না কবিতায়।'[১২২]

জনগণের কবি হ'তে গেলে জনসংগ্রামের অংশীদার হওয়া ছাড়া পথ নেই। তর্থাৎ জনজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত সম্পর্ক ব্যতিরেকে জনজীবনের প্রতিফলন কবিতায় অসম্ভব। তাই তুরস্কের কবি, 'নাজিম হিকমত' সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান হলেও নৌবাহিনীতে শিক্ষানবীশ কালেই নৌ-বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেন। এজন্যে তাঁকে দেশত্যাগ করতে হয়। কিছুদিন পরে দেশে ফিরে তিনি কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৩৭ সালে ছাত্রদের মধ্যে বিপ্লবী প্ররোচনার অভিযোগে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। সামরিক এবং নৌবহরের আদালতে তাঁর ২৮ বছরের সাজা হয়। জেল জীবনে তিনি বন্দী থাকাকালীন বন্দী কৃষকদের সংস্পর্শে আসেন; তাদের মারফৎ তিনি বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। এই বন্দী কৃষকরা জেলের মধ্যে লেখা হিকমতের কবিতাগুলি বাইরে পাঠাতে সাহায্য করে। ধান ভাঙতে বসে শিবের গীত শোনানোর মতো আরও বলতে হয়, স্পেনের বিখ্যাত কবি 'রাফয়েল আলবের্তি' ১৯৩৬ এর স্পেনীয় গৃহযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন,প্রগতি বিরোধী সন্ত্রাসে সংগ্রাম বিপর্যস্ত হলে তিনি দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তাঁকে খুন করতে বা ফাঁসী দিতেও অনেক চক্রান্ত হয়। তাঁর কঠোর জীবনাচরণও তাঁর কবিতার ভিত্তিভূমি বলে পাবলো নেরুদা মত প্রকাশ করেছিলেন। আলবের্তি যেমন আবিষ্কার করেছিলেন কবিতায় গেরিলা যুদ্ধ, তেমনি যুদ্ধের বিরুদ্ধে কবিতা নিয়ে যুদ্ধ তাঁর মধ্যে দেখা যায়। 'পাবলো নেরুদা' ১৯৩৮-৫০, এই বারো বছরের মধ্যে ন'বছর ছিলেন লড়াইয়ের প্রত্যক্ষ শরিক। শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে গড়ে ওঠে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক। চিলির প্রেসিডেন্টের সমালোচনা করায়

তাঁকে গ্রেপ্তারের সিদ্ধান্ত হয়। তিনি আত্মগোপন করেন শ্রমিকদের ঘরে শেষে আন্দিজ পর্বত ডিঙিয়ে মেক্সিকোর পথে দেশত্যাগ করেন। অনুরূপ ভাবে স্পেনীয় কবি, 'মিগুয়েল এর্নেন্দেথ' ছিলেন রিপাবলিকের জঙ্গী সমর্থক। কারারুদ্ধ অবস্থায় জঘন্য পরিবেশে তাঁর মৃত্যু হয়। চিলির কবি, 'জারা' কারাগারে গান গাইবার অপরাধে প্রথমে হস্তছিন্ন এবং পরে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। বুলগেরিয়ার ফ্যাসিস্ট সরকার গুলি করে হত্যা করেছিল তার দেশের অন্যতম বিখ্যাত কবি, 'নিকোলাভা পৎ সারোজ'কে। মোট কথা এঁদের জীবন কথা অন্যান্য বাঙালী বামপন্থী কবিদের মতোই সমর সেনের কাছেও জ্ঞাত ছিল। তিনি জানতেন কোনো কোনো যুদ্ধ সাহিত্যের পটভূমিকা রচনায় বড়ো বেশী ভূমিকা নেয়। যুদ্ধ চেতনার রঙ বদলায় এবং ক্রমান্বয় মানবনিধন সাহিত্য কল্পনাকে নতুন চেহারা নিতে বাধ্য করে। এমনই এক যুদ্ধ ভিয়েতনামের যুদ্ধ। এই ভিয়েতনামের যুদ্ধের পরিণতির জন্য কবির উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষা লক্ষ্য করার বিষয় : 'বেঁচে থাকার প্রয়োজন বোধ করেছিলাম ভিয়েতনামের যুদ্ধের সময়।'[১২৩]

কিন্তু এই ভিয়েতনামের যুদ্ধে কি ঘটেছিল? যার জন্যে সমর সেনের সাগ্রহ প্রতীক্ষা! ইতিহাস বলে—'During thirty years of war, a total war in which a people with nothing had to fight two big industrial powers, most of the time poets and writers lacked paper, documents and time, and often food and clothing. They dug shelters against bombs, cultivated the land to feed themselves, took up weapons against the enemy, all before having any time to write.'(Glimpses of Vietnamese Literature – Nguyen Khacvien, p. 147)। এ সত্ত্বেও 'তাদের রাজনৈতিক আনুগত্য পুরোপুরি থাকলেও সাহিত্যগত sensitivity তখনও বদলায়নি। কারণ ব্যাপারটা বেশ কঠিন, একথা স্বীকার করতে তাদের লজ্জা নেই। আমাদের দেশে এতো গল্প কথা মাত্র। যে কঠোর অনুশীলনের পথ বেয়েই ভিয়েতনামের শিল্পী ও সাহিত্যিক জন সংগ্রামের একজন হয়ে উঠেছিলেন সে প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা এদেশে আসেনি।'[১২৪] এই উপলব্ধির ফল হেতু কবি সমর সেন তার কবিতা না লিখতে মনস্থির করেন। এবং নিয়মিত কবিতা লেখা ছেড়েও দেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, কবি তাঁর এই উপলব্ধি বা বোধ কবিতা লেখা ছেড়ে দেওয়ার বেশ কিছু বছর বাদে প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি পরিষ্কার অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেন ঃ 'তিরিশ শতকের [দশকের] কবিদের উপর প্রভাব ছিল এলিয়ট, পাউণ্ড, ইয়েটস্ ইত্যাদির। তারপর সাহিত্য গোষ্ঠী এসেছে প্রত্যক্ষ রাজনীতির দুর্বার প্রভাবে; যুদ্ধের বিপর্যয় ও জয়ের গৌরব, নতুন চীনের আবির্ভাব এবং আমাদের দেশে ১৯৪৭-এর মনিব বদলের ফলে রুশ, ফরাসি, তুর্কি, চিলির কবিদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে। তাঁদের বিস্তার ও মানবিকতা যে আমাদের লেখায় ছাপ ফেলবে সেটা স্বাভাবিক এবং সুখের বিষয়। কিন্তু তাঁদের সহজ মানবিকতার পেছনে যন্ত্রণার ইতিহাস আছে, যে যন্ত্রণায় পোড় খেয়ে লোকে নতুন উপলব্ধির পাহাড় চূড়ায় আসতে পারে। আমাদের অভিজ্ঞতা এখনও ধার করা, বই পড়া; দেশের মাটির দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয়

বলতে গেলে সবে মাত্র শুরু হয়েছে, আত্মীয়তায় এখনও পরিণত হয়নি ....।'[১২৫]

একথা অবশ্য ঠিক, ভারতবর্ষ চীন বা রাশিয়া নয়। নয় ভিয়েতনাম, চিলি বা স্পেন। সমর সেনেরও সেকথা জানা খুব ভালো ভাবে। তবু এটাও ঠিক—ভারতবর্ষে জনতার বঞ্চনা এবং তৎপ্রতিকারার্থে সংগ্রাম ছিল, এখনও আছে। ফলে সমর সেনের কবিতা থেকে সক্রিয় সোচ্চার প্রাণশক্তি চলে এলো সাংবাদিকতায়। অপরিবর্তিত থাকলো তাঁর সঙ্গের অবচেতনে কবিতার সরব উপস্থিতি। কেননা অবচেতনা থেকে তো আর কবিতাকে উৎখাত করা যাবে না সহজে। একদা 'নানা কথা'য় যে কবি, পৃথিবীর স্পন্দমান লাল হৃৎপিণ্ডে হাত রেখে গেয়েছিলেন—

> 'জানি, এরা নয় বৈশ্য সভ্যতার জারজ সন্তান
> গলিত ধনতন্ত্রের চতুর বিভীষণ,
> তাই সক্রিয় আশা মৃত্যুহীন জাগে অনেকের মনে;
> অপরের শস্যালোভী, পরজীবী পঙ্গপাল
> পিষ্ট হবে হাতুড়িতে, ছিন্ন হবে কাস্তেতে।'

—সেখান থেকেই সাংবাদিকতায় এনেছেন নির্মোহ দৃষ্টি, কবিতার জলভরা গভীরতা; কবিতার গর্ভবান ভাষার সঞ্চারণ। সাংবাদিকতার তাৎক্ষণিক মূল্যবোধের ভাষার মধ্যে এক স্থায়ী সম্পদ প্রবাহিত করে দিয়েছে। প্রথমে তিনি 'নাউ' পত্রিকা এবং পরে 'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকায় ভিন্ন ভাষায়, ভিন্ন স্বরক্ষেপে অতীতের কবিতারই রূপান্তরিত প্রকাশ ঘটিয়েছেন যেন। ফলে সম্পূর্ণভাবে নাহোক, আংশিকভাবেই কবির একদা অধরা ভূমা—মেঘমদির মহুয়া দেশের মূর্তরূপ প্রকাশিত। এর জন্য তাঁকে ব্যক্তিগত জীবনে অনেক দণ্ড গুণগার দিতে হয়েছে।

উল্লেখপঞ্জী

১. মনীন্দ্র রায় — 'নানাকথা' (সমালোচনা)। 'কবিতা' আশ্বিন।১৩৪৯। পুনর্মুদ্রণ। 'অনুষ্টুপ'। ২২শ বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা। ১৯৮৮। পৃ ৬০

২ T S Eliot – 'Poetic Imagery' . 'Selected prose Ed. by John Hay Word Penguin Books. Harmonds Worth Reprint 1963. p.89

৩. যশোধরা বাগচী — 'মেকলের বিষবৃক্ষ ও সমর সেনের গদ্য'। 'অনুষ্টুপ'। ২২শ বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা। ১৯৮৮। পৃ ৭০

৪ সমর সেন — 'ঘরে বাইরে' : 'গ্রহণ'। অনুষ্টুপ সং। ১৯৮৯। পৃ. ১১

৫. তদেব। 'কয়েকটি দিন' : 'গ্রহণ'। পৃ. ১৪

৬. তদেব। 'For thine is the Kingdom' 'গ্রহণ'। পৃ. ২৭

৭. তদেব। 'বকধর্মিক' : 'গ্রহণ'। পৃ. ৩২-৩৩

৮. তদেব। 'গৃহস্থবিলাপ : চার', 'তিনপুরুষ'। অনুষ্টুপ সং,। ১৯৮৯। পৃ ২০

৯. তদেব। 'নানাকথা : ৪' 'নানাকথা'। অনুষ্টুপ সং;। ১৯৮৯। পৃ. ৩২

১০. তদেব। 'রোমন্থন : ২'। পৃ. ১১

১১ অমলেন্দু বসু — 'সমর সেনের কবিতা'। 'চতুরঙ্গ'। শ্রাবণ ১৩৭৪। পুনর্মুদ্রণ। 'অনুষ্টুপ'। ২২শ বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা। ১৯৮৮। পৃ. ৯১
১২. বুদ্ধদেব বসু — 'সমর সেন : কয়েকটি কবিতা,' 'কালের পুতুল'। ২য় সং: ডি এম পাবলিশার্স প্রা. লি.। ১৯৮৪। পৃ. ৬১
১৩. সমর সেন — 'ইতিহাস' 'খোলা চিঠি'। অনুষ্টুপ সং। ১৯৮৯। পৃ ৮
১৪. তদেব। 'হসন্তিকা : ১', 'নানাকথা'। পৃ. ১২
১৫. তদেব 'নানাকথা : ৬'। পৃ. ৩৩
১৬. তদেব। 'পোস্ট গ্রাজুয়েট' : 'কয়েকটি কবিতা'। অনুষ্টুপ সং। ১৯৮৯। পৃ ৩৩
১৭ তদেব। 'নববর্ষের প্রস্তাব : ৩', 'নানাকথা'। পৃ. ৩৯
১৮. নৃপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য — 'বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস'; ওরিয়েন্ট বুক কোং। ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ। পৃ. ১৩৬
১৯ সমর সেন — 'চন্দ্রবিন্দু বাদে' · 'বাবু বৃত্তান্ত'; দে'জ দ্বিতীয় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সং। দে'জ পাবলিশিং। ১৯৮৮। পৃ ৮৩
২০ সমর সেন — 'লোকের হাটে : ৪', 'সমর সেনের কবিতা'। ৪র্থ পরিবর্ধিত সং। সিগনেট প্রেস। ১৩৮৪। পৃ. ১৩৬
২১. তদেব। '২২ শে জুন ১৯৪৪' : 'তিনপুরুষ'। পৃ. ২৭
২২. অমলেন্দু বসু — 'সমর সেনের কবিতা'। 'চতুরঙ্গ'। ১৩৭৪ পুনর্মুদ্রণ। অনুষ্টুপ'। ২২ শ বর্ষ. ২য়-৩য় সংখ্যা। ১৯৮৮। পৃ. ৯৪
২৩ বুদ্ধদেব বসু — 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি'। 'রচনা সংগ্রহ'। গ্রন্থালয়। ১৯৭৮। ৫ম খণ্ড। পৃ ৪৩০
২৪. সমর সেন — 'বাংলা কবিতা'। 'কবিতা'। বৈশাখ, ১৩৪৫। পুনর্মুদ্রণ। 'কলমের ফ্রন্ট'। ৮ম বর্ষ সংখ্যা-১; ১৯৮৮। পৃ. ১৮
২৫. তদেব। 'হসন্তিকা : ৩', 'নানাকথা'। পৃ. ১৪
২৬. তদেব। 'For thine is the Kingdom' : 'গ্রহণ'। পৃ. ২৭
২৭. তদেব। 'অখ্যাত নায়ক'। পৃ. ৯
২৮. তদেব। 'নাগরিকা' : 'কয়েকটি কবিতা'। পৃ. ৯
২৯. বিনয় ঘোষ — 'সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা' : 'নতুন সাহিত্য ও সমালোচনা'। ১৯৪০। পুনর্মুদ্রণ। 'অনুষ্টুপ'। ২২ শ বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা। ১৯৮৮। পৃ. ৫৪
৩০. Dhurjati Mukherjee – 'A modern poet, But not progressive'। Amrita Bazar Patrika. June 13. 1937. পুনর্মুদ্রণ। 'অনুষ্টুপ'। ২২ শ বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা ১৯৮৮। পৃ. ১৪, ১৩
৩১. সমর সেন — 'একটি বেকার প্রেমিক' : 'কয়েকটি কবিতা'। পৃ. ৩৫
৩২. তদেব। 'নানাকথা : ৪', 'নানাকথা'। পৃ. ৩২
৩৩. তদেব। 'অখ্যাত নায়ক' : 'গ্রহণ'। পৃ. ৯
৩৪. তদেব। 'স্বর্গ হতে বিদায়' : কয়েকটি কবিতা'। পৃ. ৩১
৩৫. T. S. Eliot – 'The Hollow Men ; 'Collected Poems' (1909-1962) Faber & Faber Ltd. London. 1963.p.89
৩৬. সমর সেন — 'পরিস্থিতি' : 'নানাকথা'। পৃ. ১৬
৩৭. তদেব। '৯ই আগষ্ট ১৯৪৫' : 'সমর সেনের কবিতা'। পৃ. ১৩৯

৩৮. তদেব। 'জাতীয় সংকট : ৫', 'খোলা চিঠি'। পৃ. ১৭
৩৯. তদেব। 'নাগরিক' : 'কয়েকটি কবিতা'। পৃ. ২৮
৪০. অমলেন্দু বসু — 'সমর সেনের কবিতা'। 'চতুরঙ্গ'। ১৩৭৪। পুনর্মুদ্রণ। 'অনুষ্টুপ'। ২২ শ বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা। ১৯৮৮। পৃ. ৯০
৪১. সমর সেন — 'মুক্তি : চার অধ্যায়', 'কয়েকটি কবিতা'। পৃ. ১৯
৪২. জীবনানন্দ দাশ — 'অনেক নদীর জল' : 'বেলা অবেলা কালবেলা'; 'কাব্যগ্রন্থ'। বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৩৭৮। পৃ. ৬৩
৪৩. বুদ্ধদেব বসু — 'দময়ন্তী' : 'দময়ন্তী', 'রচনা সংগ্রহ'। গ্রন্থালয়। ১৯৮৯। ৮ম খণ্ড। পৃ. ৫৬
৪৪. সমর সেন — 'ঘরে বাইরে' : 'গ্রহণ'। পৃ. ১১
৪৫. জীবনানন্দ দাশ — 'মিতভাষণ' : বনলতা সেন', 'কাব্যগ্রন্থ'। বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৩৭৭। ১ম খণ্ড। পৃ. ৩২
৪৬. সমর সেন — 'আমন্ত্রণ' : 'কয়েকটি কবিতা'। পৃ. ২৪
৪৭. তদেব। 'বাবুবৃত্তান্ত'। ১৯৮৮, পৃ. ১৭
৪৮. তদেব। 'একটি মেয়ে' : 'কয়েকটি কবিতা'। পৃ. ২২
৪৯ তদেব। 'বাবু বৃত্তান্ত'। ১৯৮৮, পৃ. ৩৫
৫০ Charles Boudelaire – 'Intimate Journals'. Tr. by Christopher Isherwood. Introd. by W.H. Auden. London. Methuen & Co. Ltd. 1949.p. 14
৫১ রণজিৎ গুহ — 'শান্তি নেই'। 'অনুষ্টুপ'। ২২ শ বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা। ১৯৮৮। পৃ. ৩৩-৩৪
৫২ সমর সেন — 'একটি রাত্রি' : 'চার অধ্যায়', 'কয়েকটি কবিতা'। পৃ. ১৮
৫৩ বুদ্ধদেব বসু — 'বন্দীর বন্দনা' : 'কবিতা সংগ্রহ'। দে'জ পাবলিশিং। ১ম খণ্ড। পৃ. ৩৭
৫৪ সমর সেন — 'মুক্তি' : 'চার অধ্যায়', 'কয়েকটি কবিতা'। পৃ. ২০
৫৫ তদেব। 'মুক্তি'। পৃ. ১৬
৫৬ তদেব। 'বাবুবৃত্তান্ত'। ১৯৮৮। পৃ. ৪৩
৫৭ তদেব। 'মদন ভস্মের প্রার্থনা' : 'কয়েকটি কবিতা'। পৃ. ৩২
৫৮ অরুণ কুমার সরকার — তিরিশের কবিতা এবং পরবর্তী'। প্যাপিরাস। নভেম্বর ১৯৮১। পৃ. ৭৮
৫৯ হিরণ কুমার সান্যাল — 'পরিচয়'-এর কুড়ি বছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্র'। প্যাপিরাস। ১৯৭৮। পৃ. ১৩২
৬০ সমর সেন — 'মুক্তি : চার অধ্যায়', 'কয়েকটি কবিতা'। পৃ. ১৯
৬১ তদেব। 'শবযাত্রা : ৬', 'নানাকথা'। পৃ. ২৮
৬২ তদেব। 'চিত্রাঙ্গদা' : 'গ্রহণ'। পৃ. ১৯
৬৩ তদেব। 'উড়ো খৈ : ৪', 'বাবুবৃত্তান্ত'। পৃ. ১৩০
৬৪ তদেব। 'কয়েকটি দিন' : 'গ্রহণ'। পৃ. ১৩
৬৫ তদেব। 'ঘরে বাইরে'। পৃ. ১০
৬৬ সমর সেন — 'মেঘদূত' : 'কয়েকটি কবিতা'। পৃ. ৯
৬৭ তদেব। 'ঘরোয়া' : 'নানাকথা'। পৃ. ১৮
৬৮ তদেব। 'বসন্ত'। পৃ. ৩৬
৬৯ তদেব। 'উড়ো খৈ : ২', 'বাবুবৃত্তান্ত'। পৃ. ১২১

৭০ তদেব।
৭১ নন্দরানী চৌধুরী — 'জীবন অন্বেষায় কবি সমর সেন'। পিপলস্ বুক পাবলিশিং। ১৯৮২। পৃ. ১০১
৭২ T. S. Eliot – 'Collected poems'। 1909-1962. Feber & Faber Ltd. London. 1963. p. 39,199
৭৩ বিনয় ঘোষ — 'মেট্রোপলিটন মন : মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ'। ওরিয়েন্ট লংম্যান। ১৯৭৩। পৃ. ৩৪-৩৫
৭৪ ধীরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় — 'বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ'। আশা প্রকাশনী। ১৩৮১। প্রথম খণ্ড: পৃ. ৬৪-৬৫
৭৫ জীবনানন্দ দাশ — 'মৃত মাংস', 'আমিশাষী তরবার' : 'মহাপৃথিবী' (পুনশ্চ)। কাব্যগ্রন্থ। বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৩৭৭। প্রথম খণ্ড। পৃ. ১৬৫
৭৬ সমর সেন — 'মুক্তি' : 'কয়েকটি কবিতা'। পৃ. ১৬
৭৭ তদেব। 'নিঃশব্দতার ছন্দ'। পৃ. ৫-৬
৭৮ মঞ্জুভাষ মিত্র — 'আধুনিক বাংলা কবিতায় ইউরোপীয় প্রভাব'। নবার্ক। ১৯৮৬। পৃ. ১০৩
৭৯ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত — 'উটপাখি', 'ক্রন্দসী' : 'কাব্য সংগ্রহ'। দে'জ। ১৯৭৬। পৃ ৭৩
৮০ রণজিৎ গুহ — 'শান্তি নেই'। 'অনুষ্টুপ'। ২২ শ বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা। ১৯৮৮। পৃ. ৩১
৮১ সমর সেন — 'আর একটি রাত্রি', 'চার অধ্যায়' : 'কয়েকটি কবিতা'। পৃ. ১৮
৮২ বিষ্ণু দে — 'বাংলা গদ্য কবিতা' : 'জনসাধারণের রুচি'। বিশ্ববাণী প্রকাশনী। ১৯৭৫। পৃ. ১৪৬
৮৩ সমর সেন — 'মেঘদূত', 'ঝড়' : 'কয়েকটি কবিতা'। পৃ. ১১
৮৪ অরুণ মিত্র — 'কবি সমর সেন'। 'অনুষ্টুপ'। ২২ শ বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা। ১৯৮৮। পৃ ৫
৮৫ সমর সেন — বিতর্ক : ২'; 'গ্রহণ'। পৃ. ২৯
৮৬ তদেব। 'রোমন্থন : ২', 'নানাকথা'। পৃ. ১২
৮৭ T. S. Eliot – 'Gerontion' : 'Collected Poems' London Faber & Faber. 1963. p 41
৮৮ Charles Baudelaire – 'Spleenet Ideal' : Les Fleur's Dumal'. Selected & ed. by Marthiel & Jackson Matheus. Tr. by Edua St. Vincent Millay. New York. James Laughlin 1955. p. 91
৮৯ সমর সেন — 'জোয়ার ভাঁটা : এক', 'তিন পুরুষ'। পৃ. ৮
৯০ তদেব। 'জাতীয় সংকট : ১'; 'খোলা চিঠি'। পৃ. ১৩-১৪
৯১ বুদ্ধদেব বসু — 'সমর সেন : কয়েকটি কবিতা'; 'কালের পুতুল'। ২য় সং। নিউ এজ পাবলিশার্স। ১৯৮৪। পৃ. ৬০
৯২ সমর সেন — লোকের হাটে : ২'; 'সমর সেনের কবিতা'। পৃ.
৯৩ তদেব। পৃ ১৩৫-১৩৬
৯৪ তদেব। 'লোকের হাটে : ৫'। পৃ. ১৩৭
৯৫ তদেব। '৯ই আগষ্ট ১৯৪৫'। পৃ. ১৩৯
৯৬ তদেব। 'মেঘদূত' : 'ঝড়', 'কয়েকটি কবিতা'। পৃ. ১১
৯৭ রণজিৎ গুহ — 'শান্তি নেই'। 'অনুষ্টুপ'। ২২ শ বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা। ১৯৮৮। পৃ. ৩৫
৯৮ সমর সেন — 'প্রেম' : 'কয়কটি কবিতা'। পৃ. ১৬

৯৯ তদেব। 'কয়েকটি দিন' : 'গ্রহণ'। পৃ. ১৩
১০০ তদেব। 'বক ধার্মিক'। পৃ. ৩২
১০১ তদেব 'মহুয়ার দেশ : ২'; 'কয়েকটি কবিতা'। পৃ. ২৩
১০২ তদেব। 'সাফাই' : 'নানাকথা'। পৃ. ১৭
১০৩ Samar Sen – 'In Deference of the Decadents' 'New Indian Literature'. No.2. Indian Progressive Writers' Association. 1939. Reprint.'Anustup' No. 2-3. Vol. xxii.1988. p. 18
১০৪ Ibid. p.17
১০৫ সমর সেন — 'সাফাই : ৪'; 'তিন পুরুষ'। পৃ. ২৪
১০৬ তদেব। 'রোমন্থন : ১', 'নানা কথা'। পৃ. ১১
১০৭ Karl Mark – 'Preface to a contribution to the Critique of Political Economy' : 'Selected Works' by Marx & Engeles. Progress Publishers. Moscow. 1968. p. 181
১০৮ সমর সেন — 'প্রস্তুতি পর্ব' : 'বাবুবৃত্তান্ত'। পৃ. ৯১
১০৯ তদেব। 'ঘরে বাইরে' : 'গ্রহণ'। পৃ. ১১-১২
১১০ তদেব। 'বাবুবৃত্তান্ত : এক'; 'তিন পুরুষ'। পৃ. ১৫
১১১ তদেব। 'বাবুবৃত্তান্ত'। পৃ. ৪৮
১১২ সমর সেন — 'খোলা চিঠি'। পৃ. ১১-১৩
১১৩ তদেব। 'একটি শহর'। পৃ. ১০
১১৪ তদেব। ২২' শে জুন ১৯৪৪ : দুই', 'তিন পুরুষ'। পৃ. ২৬
১১৫ তদেব। '২২ শে জুন ১৯৪৪ তিন'; 'তিন পুরুষ'। পৃ. ২৭
১১৬ তদেব। 'জন্মদিনের' 'সমর সেনের কবিতা'। সিগনেট। পৃ. ১৪২
১১৭ তদেব। দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত, 'চিঠিপত্র : ২২'। 'অনুষ্টুপ'। ২২শ বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা। ১৯৮৮। পৃ. ১১৭-১১৮
১১৮ তদেব। বিষ্ণু দে লেখা ১০-৮-৪২ তারিখের পত্র। 'চিঠিপত্র : ২৩'। 'অনুষ্টুপ'। ২২শ বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা। পৃ. ৬২
১১৯ তদেব। 'একটি অপ্রকাশিত কবিতা'। 'চতুরঙ্গ'। শ্রাবণ সংখ্যা, ১৩৭২। কবিতাটি গ্রন্থ মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।
১২০ তদেব। 'রোমন্থন' : 'নানা কথা'। পৃ. ৯
১২১ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — 'যা লেখ কবিতা লেখ' : 'মুণ্ডহীন ধড়গুলি আহ্লাদে চিৎকার করে'। 'নির্বাচিত কবিতা'। কথা শিল্প। ২য় পরিবর্ধিত সং। ১৯৮৬। পৃ. ৪৮
১২২ সমর সেন — 'জন্মদিনে : ২'; 'সমর সেনের কবিতা'। পৃ. ১৪২
১২৩ তদেব। 'উড়ো খৈ ২'; 'বাবুবৃত্তান্ত'। পৃ. ১২৪
১২৪ নির্মল রক্ষিত — 'বামপন্থী কবিতা প্রসঙ্গে'। 'শব্দ শাব্দিক' ৫০। ১৩শ বর্ষ; ২য় সংখ্যা। ১৯৮৮। পৃ. ৬৯
১২৫ সমর সেন — 'সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা'। 'কৃত্তিবাস'। জুলাই; ১ম সংখ্যা। ১৯৫৩। পুনর্মুদ্রিত। 'কলমের ফ্রন্ট'। ৮ম বর্ষ; সংখ্যা-৯। ১৯৮৮। পৃ. ২০

ষষ্ঠ অধ্যায়

কবিতার নির্মাণ

"আর্টের কৈবল্য শুধু, অখণ্ড চৈতন্য শুধু,.......
কালক্রমে টেক্‌নিক নিয়ে যাবে নব্যকাব্যলোকে"

(সাফাই : চার; তিনপুরুষ)

বাংলা কাব্যে মনন প্রধান আধুনিক কবিরা শৃঙ্খলিত আবেগ ও চিন্তার সমন্বয়ে, বুদ্ধির সার সংযোগে, অভিজ্ঞতার ধারাবাহিক সেচসিঞ্চনে তাঁদের কবিতার ক্ষেত্রকে সু-ফলপ্রসূ ও উর্বর করেছেন বলে দাবী করেন। সমর সেনের কাব্যালোচনায়ও সে দাবীর যৌক্তিকতা বর্তমান। তিনি মনে করেন—'রবীন্দ্রনাথকে যে যুগ জন্ম দিয়েছিল, সে যুগের প্রাণশক্তি বহুপূর্বে নিঃশেষিত। তাঁর সময়ে যেটা ছিল কাব্যের বিষয়বস্তুর উপযুক্ত, এবং যে ভঙ্গিতে তিনি তা প্রকাশ করেছিলেন, তাঁদের জীবন শক্তি আজকে নেই।'[১]

এখানে 'ভঙ্গি' দিয়ে চোখ ভোলানো কবিতার লক্ষ্য না হলেও, মনোহারিণী ভঙ্গি যে শুধু চোখ নয়—মনও ভোলায়, এমনকি জয় করে, তার কথাই কবি স্মরণ করিয়েছেন পাঠকদের। অন্যান্য আধুনিক কবিদের মতো সমর সেনও আসলে ভঙ্গি বা টেক্‌নিক বোঝাতে কবিতার কারুশিল্পের দিকটিকেই অভিহিত করতে চেয়েছেন। যদিও তাঁর স্মরণে ছিল যে কবিতায় উৎকর্ষতার সহজ দীপ্তি ও সংযত রসস্ফূরণে নির্ভর করে, শরীর চর্চার গলদঘর্ম ব্যায়ামে নয়। প্রসঙ্গত একটু বিশদ হয়ে বলা যেতে পারে, কোল্‌রিজ, এলিয়ট এবং রবীন্দ্রনাথ-তিন কবিই মনে করতেন কবিতা শুধু মাত্র একটা নির্মিতি নয়, একটা সৃষ্টি। যদিও 'সৃষ্টি' বলতে তিন জন একই মন্তব্য করেন নি। সৃষ্টিকে কোল্‌রিজ বলেছেন The unity of manifold। এলিয়ট কোল্‌রিজের মতো কোনো একটা সংজ্ঞার মধ্যে নির্দিষ্ট করতে না পারলেও তাঁর Tradition and Individual Talent নামক প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে এবং পরে পরিণত বয়সে রচিত What is a classic? Music in Poetry, Three Voice of Poetry ইত্যাদি প্রবন্ধে নানা প্রসঙ্গে তিনি সৃষ্টি প্রকরণের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার তাৎপর্য অনুধাবন করলে দেখা যায় তার মধ্যে কবিতার যে সংজ্ঞাটি উহ্য আছে তা কোল্‌রিজের সংজ্ঞা থেকে অভিন্ন। আর রবীন্দ্রনাথ কোল্‌রিজের The unity of manifold কে বললেন 'রূপ'। সৃষ্টি মানেই 'রূপ সৃষ্টি'। এই সৃষ্টি কলে তৈরী জিনিস নয়, সে আপনি ফলে ওঠা জিনিস। আর্টিস্টকে তিনি তাই রূপকার বলে অভিহিত করলেন—যিনি একটি সমগ্র রূপের স্রষ্টা। রবীন্দ্রনাথ রূপ শব্দের দুটি দিককে বুঝিয়েছেন—এক হ'ল সীমার দিক, অপরটি হ'ল সম্পূর্ণতার দিক। এই সীমার মধ্যেই যেখানে সম্পূর্ণতার একটা স্বচ্ছন্দ সুষম এবং সমহিম প্রকাশ দেখা যায় সেখানেই আমরা আর্টের বা কবিতার ঐক্য ও অখণ্ডতাকে প্রত্যক্ষ করি। রূপকে কবি বলেছেন পরিপূর্ণতার অখণ্ড প্রতিমা। সেটাই আবার আর্টের আক্ষরিক অর্থে রূপ বা সৌন্দর্য। আর্টে বা কবিতায় সৌন্দর্য কথাটার আর কোনো অর্থই নেই। রূপের

ঐ অখণ্ড প্রতিমা থেকে বিশ্লিষ্ট আর্টের বা কবিতার কোনো অংশ-বিশেষের অথবা উপাদান বিশেষের মধ্যে তার সৌন্দর্য বা তাৎপর্য বা মূল্যের সন্ধান করাটাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বেনে-সুলভ বৈষয়িকতা।

কাব্য আপন সীমার মধ্যে সমগ্রতার মূর্তি নিয়ে বিকশিত হয়ে ওঠে বলেই অপরিসীম। এই বিশেষ অর্থে কাব্য রূপ সর্বস্ব, উপাদানের প্রদর্শনী নয়। অর্থাৎ কবিতা একটা বিশেষ ধরনের বক্তব্য নয়, বিশেষ চিন্তার উপস্থাপন বা প্রচার নয়, এমনকি মুখ্যত কোনো ভাব বা অনুভূতিরও প্রকাশ নয়। উপাদান হিসেবে সবই বৈধ। কিন্তু কবিতা উপাদানকে বর্জন করে না, তাকে ছাড়িয়ে যায়, দেহ থেকে বিবিক্ত না হয়েও নৃত্য যেমন দেহকে ছাড়িয়ে যায়। সমস্ত উপাদানকে মিলিয়ে গলিয়ে যে অবিভাজ্য অখণ্ডতার সৃষ্টি হয়, সেটাই কবিতার স্বরূপ। একেই মোহিতলাল মজুমদার একটু ঘুরিয়ে বলেছেন বাগ্ দেবতার নৃত্যচপল লাস্যলীলার অসীম ছলনা।

এখন লক্ষ্য করার বিষয়, কবিতার শরীর কেমন হবে। দীর্ঘ নাকি নাতিদীর্ঘ? তার মুখের গানের ভাষা-কথা শুধুই সাধু হবে নাকি? তার মুখের বোলের চলন কবিতার নন্দন পথে, নাকি গদ্য কবিতার চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে যতি-পর্ব-মাত্রা উপেক্ষা করে? কবিতার দেহ-বল্লরীর মাপ কেমন হবে? কবিতা-বণিতা লতা ধরে নিয়ে এই মাপ হবে, নাকি কবিতা এক ঘোড়সওয়ারের যোগ্য সহচর ধরে নিয়ে পৌরুষ-দীপ্তির ঝক্‌ঝকে মাত্রা বহতার প্রতীকের মাপ হবে? অলংকার, রূপক, সমাসোক্তির বাহার এই কাব্য সুষমাকে কোথায় নিয়ে যাবে—মানুষের অভ্যন্তরে, নাকি আঁচল খসানো আল্‌গাচালে হেঁটে যাবে?—ইত্যাদি নানাবিধ প্রশ্নের কমবেশী সব উত্তরের প্রত্যাশায় সমর সেনের কবিতা আলোচনা করলে প্রথমেই নজরে আসে কবিতার আকৃতির কথা।

সমর সেনের কবিতার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ কখনোই দীর্ঘ নয়। মোটামুটি ছোটোই। কবির এক একটা গোটা কবিতা মাত্র ৮ চরণের। যার পর্ব-পর্বাংশ আবার তুলনায় ছোটো। যেমন—

"তুমি যেখানেই যাও,
কোনো চকিত মুহূর্তের নিঃশব্দতায়
হঠাৎ শুনতে পাবে
মৃত্যুর গম্ভীর, অবিরাম পদক্ষেপ।
আর আমাকে ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে?
তুমি যেখানেই যাও—
আকাশের মহাশূন্য হতে জুপিটারের তীক্ষ্ণদৃষ্টি
লেডার শুভ্র বুকে পড়বে।'[২]

আঙ্গিকের এই প্রকরণ সৃষ্টিতে সমর সেন পথিকৃৎ। তাঁর মতো দক্ষতায় এই ছোটো আয়তনে বিশাল দর্শনের বক্তব্যকে স্পষ্ট করার কঠিন কাজ খুব কম কবিই করেছেন। তাঁর উত্তর কালেও এই ধাঁচের আঙ্গিক নৈপুণ্য খুব বেশী দেখা যায় না। সমকালীনদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশের নিজস্ব ফ্যাশন দীর্ঘ পয়ারীর সমারোহ কবিতায় স্বল্প ভাষণের পথে মূল বাধার সৃষ্টি করে। অবশ্য জীবনানন্দ দাশের বেশ কিছু ছোটো কবিতা

বর্তমান। কিন্তু ছোটো কবিতাতেই যেমন সমর সেনের পরিচয় মেলে, জীবনানন্দের ক্ষেত্রে তা নয়। একথা বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রমুখদের ক্ষেত্রেও একশোবার খাঁটি। তবে মনে হয় অমিয় চক্রবর্তী এই মাপের কবিতা সৃষ্টিতে সমর সেনের কাছাকাছি। কিন্তু তাঁর কবিতায় সমর সেনের মতো একেবারে বক্তব্যের মাপে বাঁধা আঁটো সাঁটো ছোটো চেহারা অবর্তমান। পাশাপাশি একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—

'অতন্দ্রিলা,
ঘুমোওনি জানি
তাই চুপি চুপি গাঢ় রাত্রে শুয়ে
বলি, শোনো,
সৌরতারা ছাওয়া এই বিছানায়
—সূক্ষ্মজালে রাত্রির মশারি
কতদীর্ঘ দু-জনার গেল সারাদিন,
আলাদা নিঃশ্বাসে—
এতক্ষণে ছায়া-ছায়া পাশে ছুঁই
কী আশ্চর্য দু-জনে-দুজনা-অতন্দ্রিলা,
হঠাৎ কখন শুভ্র বিছানায় পড়ে জ্যোৎস্না,
দেখি তুমি নেই।'[৩]

উপরের 'পাশাপাশি' শব্দটির বিশ্লেষণ নানামুখী হতে পারে সন্দেহ নেই তাতে, কিন্তু কবিতার শরীরী মাপের আলোচনায় অবশ্যই কাছাকাছি। তাছাড়া আলাদা নিঃশ্বাসে **হঠাৎ কখন শুভ্রবিছানায় পড়ে** জ্যোৎস্না, **দেখি তুমি নেই**—ইত্যাদি প্রকাশে সমর সেনীয় তরঙ্গের ভগ্ন ফেনা বললে অত্যুক্তি হয় না। বিশেষত স্টাইলে। যাই হোক, সমর সেনের কবিস্বভাব এক স্বকীয় কাব্যধর্মে উন্নীত হয়েছিল।

কবিতার ভাষা

একটি তথ্য—তা সে সত্য হোক, মিথ্যা হোক তার প্রতিপাদনের জন্যে একটি বক্তব্য-বিবৃতিকে প্রকাশই ভাষার কাজ। কিন্তু একে আবার আবেগ ও মনোভঙ্গির ফলাফল দেখাতেও প্রয়োগ করা হয়। 'A statement may be used for the sake of reference, true or false, which it causes. This is the scientific use of Language. But it may also be used for the sake of the effects in emotion and attitude.....This is the emotive use of Language।'[৪] ভাষাকে তাই সাহিত্যে ভাবের সঙ্গে বিযুক্ত করা বা বিযুক্ত করে দেখা প্রায় অসাধ্য। অন্যদিকে, একটি প্রাণবান রূপের ঐক্য হ'ল কবিতা। কিন্তু ঐ রূপটি তৈরী হয় ভাষার মাধ্যমেই। একাধারে উপাদান এবং রূপসৃষ্টির বা Integration'র হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে ভাষা। এর একদিকে আছে প্রাণের স্পন্দন, অন্যদিকে আছে সমন্বয়ের বা বেঁধে তোলার-গ'ড়ে তোলার আকর্ষণী শক্তি ও সূত্র।

প্রসঙ্গত মিডল্টন মারীকে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি কবিতা সম্পর্কে আলোচনায় Per Henri Bremond-র বক্তব্য তুলে ধরে বলেছিলেন, Bremond কবিতা বলতে বোঝেন-কবির এক মরমী উপলব্ধি যা শব্দের মাধ্যমে পাঠকের মনে সঞ্চারিত হয়ে পড়ে। এবং অতঃপর তিনি এই বক্তব্যের উন্নতি সাধন করে বললেন 'Poetry will, therefore, be words which do communicate a thought' and the emotional 'field' which it excites from the mind of the poet to the mind of the reader.'[৫] কবির মনের এই আবেগ ক্ষেত্রের সঞ্চার করে দেওয়া যায় ভাষার মাধ্যমে। কবির চিন্তা আর আবেগ তখন একাকার। তাঁর মতে 'thought' should be an intrinsic part of an emotional field in the poet's mind,'[৬] কবিতাকে তিনি বললেন 'communication of an entire experience.'[৭] এবং কবি এই কাজ করেন ভাষা দিয়ে। মিডল্টন মারীর ভাষায়–'He has the word. The word in the poet's mind partly arises out of the emotional field, partly is deliberately fitted to convey it. This mating of the word to the entire mental experience of thought and emotional field experienced as one is the specific poetic act.'[৮] অর্থাৎ কবি তাঁর সেই চিন্তামথিত আবেগ ময়তা টুকুকে কবিতার পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবেন কখনো স্বতোৎসারিত শব্দে, কখনো বা নিজের পরিশ্রমে নির্বাচিত শব্দ দিয়ে। নিজের চিন্তা ও আবেগকে শব্দ দিয়ে প্রকাশ করাটাই হ'ল কবিতার কাজ।

একথা ঠিক কবিতার ভাষা আমাদের প্রতিদিনকার মুখের ভাষা নয়। Thomas Gray বলেছিলেন the language of the age is never the language of poetry। তার ফলে সমাজভাষা থেকে কবিতা নিজের শিল্পগুণে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্র হয়ে উঠবার চেষ্টা করেছে। সাধারণের মুখের ভাষা বাইরের জগতের সঙ্গে প্রতিদিনকার যোগাযোগের প্রয়োজনে লাগে। সে ভাষাকে পৃথক করে আমরা দেখিনা। কবিতার ভাষার গুরুত্ব সাধারণের মুখের ভাষার চেয়ে বেশী, কেননা—

১। ভাষার মধ্যে দিয়েই লেখককে তার বক্তব্য সঞ্চার করে দিতে হয়। সে ভাষাকে তাই শুধু বোধগম্য হলে চলে না তাকে বোধিয়ও ভাষা হতে হয়।

২। দ্বিতীয়ত, কবিতার ভাষা নিজেই দর্শনীয়। বাইরের প্রতিদিনকার জগতের ভাষা নিজে দর্শনীয় নয়।

তথাপি প্রতিদিনকার মুখের ভাষা থেকেই কবিতার ভাষা পায় তার প্রাণশক্তি, তার প্রকাশ শক্তি, তার গতি ও ছন্দের সহজ এবং অবাধ সঞ্চরণ ক্ষমতা। এজন্যেই T S Eliot বলেছেন—'The law that poetry must not stray too for from the ordinary everyday language which we use or hear. Whether poetry is accentual or syllabic, rhymed or rhymeless, formal or free, it cannot afford to lose its contact with the changing language of common intercourse।[৯]

এখানে এলিয়ট কাব্যভাষার আদর্শ বোঝাতে মুখের ভাষাকেই অভিহিত করেন নি, বা ঐ আদর্শের কোনো একটা বৈশিষ্ট্যে কাব্য-ভাষা বাঁধা থাকবে—এমন প্রস্তাবও করেননি। কথ্যভাষার সজীব স্পর্শ থেকে কাব্য ভাষা দূরে যেতে পারে না যে—সেকথাই তিনি

বলতে চেয়েছেন। মোট কথা কথ্য ভাষার সঙ্গে কাব্যভাষার যোগ রাখতে হবে ভাষার সজীবতার মাধ্যমেই। কিন্তু কাব্যভাষার যেটা গড়নের দিক, সেখানে সামঞ্জস্য পরিমিতি ঘনতা স্থায়িত্ব প্রভৃতি এমন-সব গুণের সমাবেশ প্রয়োজন যা সাধারণত মৌখিক ভাষার নাগালের বাইরে। আবার মুখের ভাষায় প্রাণশক্তি থাকলেও এর দৃঢ়তা ঘনতা বা স্থায়িত্ব নেই। মুখের ভাষা নিয়ত পরিবর্তন-শীল, নিয়ত ক্ষয়িষ্ণু। ক্ষণস্থায়ী। মুখের ভাষার অভাবের দিকটা গদ্যে কিছুটা পূরণের আভাস আছে। বলা বাহুল্য, এখানেই মুখের ভাষার মতো গদ্যের সঙ্গেও কাব্য ভাষার একটা আদান-প্রদান সম্বন্ধ উপস্থিত হয়। এবং গদ্য কাব্য ভাষার আদর্শ না হলেও তার মধ্যে কাব্য-ভাষার উপজীব্য উপকরণ আছে।

কাব্যভাষার জন্ম ভাষার সমগ্র সম্ভাবনাকে মন্থন করে, আত্মসাৎ করে। এর একদিকে আছে ভাষার স্থূল উপাদান, অন্য দিকে আছে কবিতার মধ্যে ভাষার পরিপূর্ণতা। আর মাঝে আছে রূপান্তরের প্রচ্ছন্ন ইতিহাস। রূপান্তরের ফলে যে কাব্যভাষার সৃষ্টি তার প্রাথমিক লক্ষণ হ'ল প্রাণপ্রাচুর্য এবং শেষ লক্ষণ হ'ল সামঞ্জস্য পরিমিতি ও প্রশান্তি। মোটকথা সব মিলিয়ে পূর্ণতার আদর্শ। এ প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটলকে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি কবিভাষার তিনটি মুখ্য বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন—

১। কাব্যভাষা গদ্যভাষা থেকে স্বতন্ত্র হবে;
২। সে ভাষায় নতুন শব্দধ্বনি ও চিত্রকলার ব্যবহার ঘটবে;
৩। সে ভাষা প্রাঞ্জল হয়ে উঠবে।

কাব্যভাষা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন : 'The perfection of Diction is for it to be at once clear and not mean.......On the other hand, the Diction becomes distinguished and non prosaic by the use of unfamiliar terms, i. e. strange words, metaphors, lengthened forms, and every thing that deviates from the ordinary modes of speech.'[১০]

অর্থাৎ কাব্যের ভাষা একদিকে যেমন প্রাঞ্জল হবে, তেমনি অন্য দিকে ব্যঞ্জনাময় (not mean) হবে। কাব্যভাষা গদ্যের ভাষা থেকে স্বতন্ত্র (non-prosaic)। অভিনব শব্দাবলীর ব্যবহারে, উপমা রূপকাদি অলংকারের প্রয়োগে দীর্ঘায়িত বাক্‌পর্বের সহায়তায় স্বাতন্ত্র্যকে আনতে হবে।

বাংলা কাব্যভাষার ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায়, চর্যাপদের যুগ থেকেই ভাষাতে যে আকৃত ব্যক্তিভাষা, সে যুগের দৈনন্দিন কথ্যভাষার আকৃত রূপ বেশ কিছু চলে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে সহজ স্বরন্যাসের পাশে ধ্বনি মাধুর্য লাবণ্যময় স্বরন্যাস, গম্ভীর রুক্ষ স্বভাবের পাশে অতিললিত কান্ত কোমল স্বভাব। এখানে 'আকৃত' বলতে বোঝায়— 'কবি যেভাবে কথাবার্তা বলেন লেখার সময় সেটা খানিকটা পাল্টে যায় নানারকম ভাবে। কবি তাঁর বাক্যকে আকৃত করেন কবিতার প্রয়োজনে। একেক কবির একেক কবিতায় এই আকরণ প্রক্রিয়া আলাদা। কেউ কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার স্বাভাবিক অবস্থান ঘুরিয়ে দেন, কেউ তার সঙ্গে নিয়ে আসেন-তৎসম, দেশজ বা বিদেশী শব্দ যেটা দৈনন্দিন কথাবার্তার ভাষায় পাওয়া যায় না।'[১১] যাই হোক, বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা ছিল অতি কোমল, অতিআকৃত ললিত ভাষা। অর্থাৎ একেবারেই কৃত্রিম কাব্যভাষা। যদিও এখানে

'বাদল দোল/নীল-নিচোলের'—লালিত্যের সঙ্গে 'কঠিন কপাটে'র গাম্ভীর্যকে পাওয়া যায়, পাওয়া যায় প্রবাদ ব্যবহারের বাস্তব লোকসংস্কৃতি ও কথ্যভাষাকে, তথাপি ভাষার কোমলতা ও অতিলালিত্যই প্রকট। মঙ্গলকাব্য, কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারতের আকৃত ভাষা কথ্যভাষারই পাশাপাশি। ঈশ্বর গুপ্ত নতুন যুগের বাঙলা কাব্যের ভাষাকে মৌখিক রীতির দিকে টেনে নিয়ে গেছেন। তৎসম শব্দ তাঁর কবিতায় আছে, কিন্তু তার সঙ্গে নতুন ইংরেজি সমাজব্যবস্থার ব্যবহৃত শব্দ, বিশেষ করে বাঙালি উচ্চারণের ইংরেজি শব্দ এবং বাঙলা স্ল্যাং মিশিয়ে সমসাময়িক উঠতি সমাজের উচ্ছল স্ফূর্তিকে আশ্চর্যভাবে ফুটিয়ে তুললেন তিনি। ভারতচন্দ্র ও কবিওয়ালাদের আদর্শে তিনি পদবন্ধ সৃষ্টি ও আলংকারিক ধ্বনি অনুপ্রাস বৃদ্ধির দিকে নজর রেখেছেন যেমন, তেমনি বাক্‌ধর্মী উচ্চারণদৃঢ়তার প্রতিও লক্ষ্য রেখেছেন।

বাংলা কাব্যে ঈশ্বর গুপ্ত পর্যন্ত আকৃতির ঐক্য পয়ার, ত্রিপদী এবং অন্তর্মিলেই লক্ষিত হয়। কাব্যভাষার বহিরঙ্গে পরিবর্তন বহুভাবে বহুবার ঘটলেও পয়ার, ত্রিপদী এবং অন্তর্মিলে বাংলা কাব্যের গৃহীত রূপটি ধরা ছিল। ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ প্রমুখ কবিরা আবার আশ্চর্যভাবে সরলপ্রবাদ আকৃত কাব্যভাষায় প্রবেশ করিয়ে ভাষার আটপৌরে রূপে এবং বহুকালের সংস্কৃতির ধারায় কাব্যের তাৎপর্য বাড়িয়ে দিয়েছেন। মধুসূদনের কাব্যে এসে ভাষা অতিলালিত্যের চেয়ে গাম্ভীর্যের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছে অধিক পরিমাণে। তিনি যখন অমিত্রাক্ষর ছন্দ শুরু করলেন বাংলায় তখন পয়ার বন্ধন ভেঙে গেল। দীর্ঘবাক্য জটিল বাক্য এদের সমন্বয়ে গড়ে তোলা সম্ভব হল কাব্যের নতুন আকৃতি। পদ্যের বাঁধনকে অটুট রেখেও গদ্যের স্বাধীনতাকে প্রকাশ করলেন মধুসূদন।[১২] কিন্তু মধুসূদন সবলে যে-ভাষাপথ খনন করেছিলেন তা ধরে বেশী দূর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব ভেবেছিলেন পরবর্তী কবিরা। ভাব অনুযায়ী ভাষাকে পরিবর্তিত হতে না দিয়ে কৃত্রিম ভাষার কঠিন পিঞ্জরের মধ্যে সবরকম ভাবকেই ঢুকিয়ে দেবার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় মধুসূদনের কাব্য ভাষায়। তবুও কৃত্রিম ভাবে প্রস্তুত এই আড়ষ্ট ভাষাকে অল্পস্বল্প এদিক ওদিক করে যতটুকু নমনীয়তা আনা সম্ভব মধুসূদন সেটুকু চেষ্টা অবশ্যই করেছেন। বিশেষ করে ছোট ছোট শব্দ এবং যুক্তাক্ষর-নির্ভর অনুপ্রাস ঘন ঘন বসিয়ে ঢেউ ও সুরের দোলা লাগিয়ে ভাষাকে আকৃত করতে চেয়েছেন।

বাংলা কাব্যভাষার ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম এর পরেই উল্লেখ্য। কাব্যভাষার মধ্যে সামঞ্জস্য, পরিমিতি ও প্রশান্তি মিলিয়ে যে পরিপূর্ণতার কথা বলা হয়ে থাকে, তার সম্পূর্ণ এবং সমগ্র পরিচয় একমাত্র রবীন্দ্র রচনায়। ষাট বছরের সৃষ্টি কর্মের ভিতর দিয়ে যে ভাষা রবীন্দ্রনাথ গড়ে তুলেছেন তার অস্থিমজ্জা শক্তি পেয়েছে ভাষার সকল স্তর থেকে সমাহৃত প্রাণশক্তিতে। বাঙালীর কণ্ঠকে আশ্রিত করে অঞ্চলে অঞ্চলে, শহরে পল্লীতে কাল থেকে কালান্তরে যত ভাবের যত অনুভূতির যত আবেগের অভিব্যক্তি হয়েছে, তার সুর তার ছন্দ, তার আন্দোলন, তার সংরাগ যেন এই ভাষার অঙ্গে অঙ্গে মিলিয়ে আছে। ঐতিহ্যবাহিত শব্দ ও প্রাগ্‌সৃষ্ট শব্দবন্ধ ব্যবহারেও রবীন্দ্রনাথের ক্লিষ্ট অনাত্মতার ছায়া পড়ে না যেমন ভাষায়, তেমনি ধ্বনির বুনট, স্বর ও ব্যঞ্জনের প্রবাহ

ভাবের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে ভাষাকে সমৃদ্ধ ও সাবয়ব করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিকের কবিতায় কাব্যিক ক্রিয়াপদ, ক্রিয়ার সাধুরূপ ব্যবহার করেছেন। যেমন—'ফেলিতেছে', 'শোনাইবে', 'হতেছে' ইত্যাদি। তেমনি চলিত ক্রিয়াপদও—'নেবার', 'যাই' প্রভৃতিও ব্যবহার করেছেন। শেষ দিকে তিনি দৈনন্দিন কথাবার্তার ভাষার খুব কাছে চলে আসছিলেন। এবং তিনি অপেক্ষাকৃত ভারী ও ধ্রুপদী চলনের সাধুরীতির গদ্যকে পরিত্যাগ করে হসন্ত-প্রধান, ব্যঞ্জন ধ্বনি-প্রধান, প্রস্বর প্রধান, হ্রস্ব ও ক্ষিপ্র ক্রিয়াপদ যুক্ত, লঘু অসমাপিকার সাহায্যে সন্ধি সমাসভার ব্যতিরেকে মুক্তগতি, স্রোতস্বিনী, দ্রুতগামী চলিত ভাষাকেই পছন্দ করেছিলেন। যদিও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত অন্যমত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে—'রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ভাষায় খুব চমকপ্রদ কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না। কাব্যে ব্যবহৃত কিছু কিছু শব্দ প্রয়োগ—চলিনু, কহিনু, শুনিনু, মম, তব ইত্যাদি-ইংরেজিতে যাকে বলে Poetic diction ক্রমে ক্রমে তিনি সে-সব ত্যাগ করেছিলেন। অবশ্য ছন্দের বৈচিত্র্য প্রচুর; শেষপর্বে গদ্যছন্দের ব্যবহার। কিন্তু ছন্দে যতখানি বৈচিত্র্য, ভাষায় ততখানি বৈচিত্র্য নেই।'[১৩]

রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাষায় যুক্তাক্ষরের ধ্বনি ও ছন্দ-ঝংকারের পেছনে যে পেশল শক্তি ও উপলব্ধির সরব উপস্থিতি আছে, সেটি অনুকরণ করতে গিয়ে রবীন্দ্র সমকালীন কবিরা—করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন—কিরণধন, কুমুদরঞ্জন প্রমুখরা তাঁদের কবিতায় এক অপ্রকৃত বিক্ষোপ সৃষ্টি করেছিলেন মাত্র।

তিরিশের দশক বিক্ষুব্ধ দশক। কবিরাও অত্যন্ত সজাগ এবং মুখর। তাঁদের বক্তব্যও অনেক-ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে। দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে তিরিশের দশকের কবিতা বিশেষ বক্তব্যবাহী রচনা এবং এর ভাষা মৌখিক ভাষারই গতিপ্রকৃতি এবং ছন্দকে অনুসরণ করেছে। সরাসরি ঘোষণা না করলেও এ সময়ের কবিরা-জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে. অমিয় চক্রবর্তী সরে গেলেন 'পদ-লালিত্য ঝংকার' তত্ত্বের থেকে। সুধীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করলেন 'অবাস্তব সুললিত সে পদ্যের মতো/যাতে রেণু, কদাচ ধেনুও মিলে ক্রমাগত/অতিভাবে আত্মোপলব্ধির অভাব লুকিয়ে রাখে/এবং অলীক ভেবে, উদ্ভাসিত স্বপ্ন রচনাকে যখন করেছি ত্যাগ।'[১৪]

নবীন চিত্রকল্প, নতুন শব্দবন্ধ রচনার ধীরস্থির গতি জীবনানন্দের কবিতার পয়ারের শান্ত স্নিগ্ধ প্রবহমানতাকে স্মরণ করায় তার প্রাসঙ্গিক ভাষার কারণে। প্রশ্ন উত্থাপন, নানা আলোক সম্পাতে তার বিশ্লেষণ এবং শেষে নিজের অভিজ্ঞতার আবেদন উপসংহারে পৌঁছুতে তিনি আমাদের ঐতিহ্যগত বুদ্ধিগ্রাহ্য ভাষার সঙ্গে তাঁর মন্ময় ভঙ্গিমার সাযুজ্য ঘটিয়ে অনন্য এক নতুন কাব্য ভাষার সৃষ্টি করেচেন। সুধীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় সংস্কৃত শব্দের সংস্কৃত অর্থেই ব্যবহার তথা পয়ারের আঁট সাঁট গড়ন নির্মাণ করে তাঁর বক্তব্যকে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। বিষ্ণু দের রচনায় চিন্তার যে ক্ষিপ্রতা বর্তমান, তা প্রকাশের জন্য তিনি বিদেশী ভাষা ছাড়াও বিভিন্ন শিল্পরীতির কথা বল্লেম। বক্তব্য উপস্থাপনের ভাষা হিসেবে বহু জায়গায় তিনি তির্যক, শ্লিষ্ট শ্লেষ বা ব্যঙ্গ-ব্যবহারেও তৎপর। তাঁর মধ্যে জীবনানন্দের নির্লিপ্ত, সুধীন্দ্রনাথের মাত্রাগত বিন্যাসকে আমরা লক্ষ্য করি না; বরং লক্ষ্য করি আবিশ্বচঞ্চল একটা উন্মুখের প্রকাশ ভঙ্গির

ভাষা। আর বুদ্ধদেবের কবিতায় পেলব শব্দের ব্যবহার, ঝরঝরে শিল্পিত ভঙ্গিমা, পুনরুক্তি এক স্বতন্ত্র কাব্যভাষার সৃষ্টি করেছে।

বলা বাহুল্য, এই পর্বের কবিরা ব্যক্তিভাষার আকরণ বিস্তৃত করতে প্রয়াসী ছিলেন। বিশেষ করে, কবিতায় পদসমূহের গ্রহণ বর্জন, ভাষাকে বেছে সাজানো, সম্মত ভাষার সঙ্গে গোষ্ঠীভাষা, উপভাষার ব্যবহার, তৎসম-তদ্ভব শব্দের সঙ্গে দেশজ, গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার, নানা রকমের পদক্রম নির্মাণ, নানা রকম শব্দের পাশাপাশি ব্যবহার ইত্যাদি মাধ্যমে কবিরা তৎপর ছিলেন।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে সমর সেনের কাব্যভাষার প্রতি দৃষ্টি দিলে, প্রথমেই দেখতে হয় কাব্যভাষা বিষয়ে কবির অভিমত কি ছিল। কবিতার ভাষা ও ভাষার ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র ব্যবহারের কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—'আমরা কোনো বিশেষ সমাজে বিশেষ সময়ে জন্মাই, এবং সামাজিক জীব হিসেবে প্রচলিত কোনো ভাষা ব্যবহার কবি। কিন্তু কবিতা লেখার সময় সে ভাষার উপরে যে স্বতন্ত্র ছাপ পড়ে তার নাম ডিক্‌শন, এবং এই স্বতন্ত্র ব্যবহারের শক্তি কবির পুরুষকারের পরিচায়ক।[১৫]

এই সূত্রেই দেখা যায় প্রথম কবিতা লিখতে শুরু করেই সমর সেন তৈরী করে নিতে পেরেছিলেন নিজস্ব এক ভাষা, এক স্বতন্ত্র স্টাইল। চালাক, সপ্রতিভ, ঝকঝকে এবং আধুনিক কথাবার্তা বলার এক নিজস্ব রীতি। কবিতার প্রখর আবেগটানকে অচঞ্চল সংহতিতে বাঁধতে চেয়েছিলেন। শব্দের ঘনতা, অনতি প্রলম্বিত লাইন, থমকলাগা কাটা কাটা উচ্চারণ, কোথাও কোথাও একাধিক যুক্তবর্ণের আঘাত, ক্রিয়াপদের স্বল্প প্রয়োগ কিম্বা ক্রিয়াহীন খর্ব বাক্য প্রয়োগের রীতির মাধ্যমে বক্তব্যকে অনন্য করে তুলেছিলো। 'সময়ের একটা চাপ ছিল, ছত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ সাল ছিল দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক এক টাল মাটালের সময় তাকে লক্ষ করা অনিবার্য ছিল সমর সেনের পক্ষে। কিন্তু ঠিক যে অর্থে সরল প্রগতির ভাবনাকে কবিতায় প্রতিফলিত দেখতে চান অনেকে, সে অর্থে কবিতা লিখবার রুচি হয়নি তাঁর, বরং মনে হয়েছিল সে পথে আছে শুধু ভাবালুতা বা বাগাড়ম্বর।'[১৬] অতএব নতুন সৃষ্টির প্রয়োজন তাঁর কাছে অপবিহার্য হ'ল। সমর সেনও সে ভাষা সৃষ্টিতে উৎসাহী হলেন। টি. এস. এলিয়টের মতন তিনি কবিতাকে মুখের ভাষার কাছাকাছি সংস্থাপিত করতে চাইলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি এও দেখলেন, জনসাধারণের উপযোগী এমন কোনো সরল, সহজ, বালিষ্ঠ ভাষার ছক নেই, যার মধ্যে যে কোনো কবি অক্লেশে প্রবেশ করতে পারেন। তাছাড়া কবির হাতে ভাষার নবীকরণ হওয়া মানে তাঁর উদ্দিষ্ট পাঠকের ভাষাগত অভ্যাসে আঘাত লাগা। তথাপি, সমর সেন এসব জেনেও থেমে থাকেন নি। তিনি তাঁর মধ্যবিত্ত পাঠকের কাব্য বোধের গণ্ডীকে নাড়িয়ে দিতে প্রয়াসী ছিলেন, তিনি পরিচিত বাক্ ভঙ্গিগুলি ভেঙ্গে তাতে নতুন মাত্রা দিতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। যেহেতু তাঁকে সতত কুরে খাচ্ছিল—"....a language is always changing; its developments in vocabulary, in syntax, pronounceation, and intonation—even, in the long run, its deterioration—must be accepted by the poet and made the best of"[১৭]. অর্থাৎ আমাদের সমধিক পরিচিত বাংলা কবিতার ভাষাকে

নতুন ভাবে উপস্থাপনা করলেন তিনি। যার নিদর্শন ভুরি ভুরি।

'শান্তশীল চোখে জীবনের ক্লান্তি,
সেই পুরাতন স্পন্দমান বাসনা আর নেই,
সেই স্বাধিকার প্রমত্ত রক্তের অন্ধ জয়গান।
শুধু গোয়ালে গরুর কাশি, অগ্নিচক্রে পৃথিবী কাটে,
আর শীর্ণছায়ারা ঘোরে শীতের শব্দখর শহরে,
তুচ্ছ পরিণাম!'[১৮]

এখানে ক্ষয়শীল সমাজ বর্ণনায় কবির ভাষা মুখর নিঃসন্দেহে, বিশেষ করে, 'শান্তশীল চোখে জীবনের ক্লান্তি', 'স্বাধিকার প্রমত্ত রক্তের অন্ধ জয়গান', 'গোয়ালে গরুর কাশি', 'অগ্নিচক্রে পৃথিবী কাটা' বা 'শীতের শব্দখর শহর' ইত্যাদি এতদিনকার বিশ্বাসের ভিত্‌কে নড়বড়ে করে দিতে প্রস্তুত যেন। পাশাপাশি এখানে 'সেই' কথাটি অতিরিক্ত এক মাত্রা যোগ করেছে। অনুরূপ ভাবে,

'কোনো নগরে একদিন যেন ছিল
চারিদিকে মেঘলার মতো শালবনের অন্ধকার,
পাহাড়ের মতো মেঘবর্ণ প্রাসাদ, অরণ্যে প্রেম;'[১৯]

স্মৃতি মেদুর ছবিটিকে 'যেন' কথাটি এখানে অনেক ধূসর দূরত্বে টেনে নিয়ে যায়। সত্যিই কোনোদিন এসব ছিল কিনা—সেই বিশ্বাসের ভিত্তিকেও নড়বড়ে করে দেয়। এবং বিপরীতে আজকের কাঁচা ডিম খেয়ে প্রতিদিন দুপুরে ঘুম—এই ছবিটি ঐ নস্‌টালজিয়ার মূলে আঘাত করে—তার অসুন্দর, অশ্লীল বাস্তব ভিত্তিকে অপরিষ্কার রাখে না। আরও দেখা যায়, ভাষা কোনো সমতাল, একমুখী গতিতে প্রবাহিত হয়নি। পরিবর্তে আমাদের সংবেদনের ধারাকে শুধুই দুমড়ে একদিক থেকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। এই চেষ্টাতেই কবি মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের মুখের কথা বসাতে, দেবভাষা থেকে শুরু ক'রে গ্রাম্য-ইতর ভাষা এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহারে কার্পণ্য করেন নি। মায় কথোপকথন রীতিটুকু পর্যন্ত গ্রহণ করেছেন। যেমন—

'দাড়ি নেড়ে ঝোড়ো হাওয়ায়
বুড়ো মজুর বলে : হমারা হিন্দুস্থান নেহি দেঙ্গে।
হিম্মৎ হ্যায়, জানোয়ার মারণে কো লিয়ে মরণেকোলিয়ে তৈয়ার,
ভাই আনোয়ার, হাতিয়ার চাহিয়ে, তেজ্ হাতিয়ার।'[২০]

কাব্য ভাষার অন্যতম উপাদান হল শব্দ। শব্দ কতটুকু বলতে পারে বা বোঝাতে পারে কবিকে তা জানতে হবে। এবং শব্দের সেই ক্ষমতা কী ভাবে বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে সে রহস্যও কবিকে আবিষ্কার করতে হবে। আপন আপন কবি-স্বভাব অনুযায়ী শব্দ সন্নিবেশ করাই প্রচলিত রীতি। ফলে কবি মাত্রেই কবিতায় নিজস্ব শব্দ-রীতির নজির সৃষ্টি করেন। সমর সেনও এর ব্যতিক্রমী নন।

সমর সেনের কাব্য শব্দ ভাণ্ডারে কৃতঋণ শব্দ বা গৃহীত শব্দ (Loan words) বাংলা শব্দ ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে বললে অত্যুক্তি হয় না।

ঐতিহ্যানুসৃতি

ঐতিহ্যের সঙ্গে কবিদের যোগ থাকে। কেউ কেউ আবার পুরনো ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে এগিয়ে যান, গড়ে তোলেন নতুন কাব্য-ঐতিহ্য। কাব্য-সংসারে নিঃসন্দেহে এঁরা যথার্থ কীর্তিমান।

সমর সেন ঐতিহ্য-সচেতন কবি। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শহর কলকাতায় জন্ম তাঁর। অন্যান্য আধুনিক কবিদের মতো তিনিও বুঝেছিলেন বাংলা কাব্যের মুক্তি রবীন্দ্র অনুসরণে সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে আসতে গিয়েই তিনি সমকালীন আরো অনেকের মতো প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য চিন্তা-ভাবনা ও আদর্শ-ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। সমর সেনের কবিতায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য চিন্তা-ভাবনা, অভিজ্ঞতা-কল্পনার আদর্শ ও ঐতিহ্যের প্রভাব লক্ষণীয়।

সমর সেন কবি সমালোচক টি. এস. এলিয়টের মতো বিশ্বাস করতেন—'No poet, no artist of any art, has his complete meaning alone. His significance, his appreciation is the appreciation of his relation to the dead poets and artists. You cannot value him alone; you must set him, for contrast and comparison, among the dead.'[২১]

বাংলা কাব্যে একদা মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ দেশী-বিদেশী ঐতিহ্যের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। কিন্তু এঁদের এই চেষ্টা বিচ্ছিন্ন একদেশদর্শী অতীতমুখী মাত্র। সমকালীন কাব্য আন্দোলন সম্পর্কে এঁরা প্রায় প্রত্যেকেই উদাসীন ছিলেন। সেদিক দিয়ে সমর সেনের ঐতিহ্যসচেতনতা স্বতন্ত্র। বিষ্ণু দের মতোই তাঁর মতে ঐতিহ্য কোনো বিশেষ দেশকালে সীমাবদ্ধ নয়। দ্বিতীয়ত, সে ঐতিহ্যকে সম্যক উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন -বিচ্ছিন্ন নয়, পরিকল্পিত পঠন ও বিশ্লেষণ কেবল অতীতমুখিনতা নয়, সমসাময়িক কাব্য আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতির সম্যক অনুধাবন। তৃতীয়ত, ক্লাসিক, রোম্যান্টিক, অভিজাত, দেশজ প্রভৃতি শ্রেণী ভেদের শুচিবায়ু (dogma) পরিহার।[২২] সমর সেন ঐতিহ্যের স্বীকরণে কৃতিত্বই দেখিয়েছেন। একজন সৎ কবি যা গ্রহণ করে তাকে এক অনুভূতির সমগ্রতায় বয়ন করে নেন যেমন ভাবে, তিনিও তেমনি করেই গ্রহণ করেছেন। টি. এস এলিয়টের মন্তব্য তাঁর অজানা ছিল না। এক্ষেত্রে : 'Immature poets imitate; mature poets steal; bad poets deface what they take, and good poets make it into something better, or at least something different.'

এখন তাঁর কবিতায় ঐতিহ্য-প্রভাবের পরিমাণ ও স্বরূপটি নির্দেশ করা যেতে পারে।

প্রাচ্য ঐতিহ্য ও সমর সেন

সমর সেনের কাব্য- কবিতায় প্রাচ্য ঐতিহ্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিবিধ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উপনিষদ থেকে শুরু করে তিনি সমকালীন কবি, বিষ্ণু দের কাব্য পর্যন্ত এবং

লোক প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচন সমূহ থেকে নানা অবসরে নানা চরিত্র চিত্র সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে দেশের লোক জীবনের সংগে সংযোগ রেখেছেন। তিনি বাঙালীর জীবনের দিনরাত্রির সমস্যা ও ভাবনার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করে প্রকাশ করেছেন প্রাচ্য ঐতিহ্যকে।

তাঁর কবিতায় উপনিষদের প্রসঙ্গ, পৌরাণিক প্রসঙ্গ, জীবনের বর্তমান প্রসঙ্গ সমূহের মধ্যে এমন সহজ আন্তরিকতায় সুসংলগ্ন যে, মূল প্রসঙ্গগুলির উৎস অজানা থাকলেও পাঠকের রসাস্বাদনে বাধা ঘটে না। উপনিষদের প্রসঙ্গ অনুসরণে সমর সেন 'নচিকেতা', (তিনপুরুষ/পৃঃ ২১) কবিতায় প্রেতলোকের বর্ণনা দিয়েছেন। অবশ্যই মর্তের প্রেতলোকে 'বিকটশমনদূত' স্বরূপ সমর সেন বজ্রনখ উলুখ, দেশভক্ত বিভীষণ ও তাঁর সঙ্গী সাথী নানা হন্তারকের জমায়েত ঘটিয়েছেন। কবিতার পরিস্থিতি ভিন্ন ঠিকই, কিন্তু প্রেতপুরী বর্ণনায় খুব সহজেই উপনিষদের উপস্থিতি ঘটে যায়। অনুরূপভাবে মানুষ জন্মকে ব্যঙ্গ করে তিনি উপনিষদীয় পংক্তি উচ্চারণ করেছেন 'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।'

পুরাণ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে আসে 'উর্বশীর দীর্ঘশ্বাস' ('ঝড়'/কয়েকটি কবিতা/পৃঃ ১১)-এর কথা। কল্পনার স্বর্গের মধ্যে হানা দিচ্ছে নাগরিক কর্কশতা, সূচিত হচ্ছে পুরনো সৌন্দর্যের মৃত্যু। উর্বশী সমর সেনের কবিতায় অনেকবার এসেছে। করেছেন কবিতার শিরোনাম ('উর্বশী'/কয়েকটি কবিতা/পৃঃ ২১)। সৌন্দর্য প্রতিমা উর্বশীকে ঘিরে বর্তমানে কোনো অপার্থিব স্বপ্নিলতা থাকে না। তাকে কেনা যায় দশ টাকায় ('স্বর্গ হতে বিদায়'/কয়েকটি কবিতা/পৃঃ ৩১)। সেখানে পুরুরবার সত্যপ্রেমও নেই, যে দেখবে নগ্ন উর্বশীকে। পুরুরবা-উর্বশী প্রসঙ্গ ব্যবহারে সমর সেন আমাদের মনে করান প্রেমহীনতার দায়কে।

এর পরেই উল্লেখ্য 'অগ্নিবর্ণ' (কয়েকটি কবিতা/পৃঃ ২৭) কবিতার কথা। অমিত যৌনাচারে রাজা অগ্নিবণর ক্ষয়রোগ ধরেছিল—এই সমাজ পরিবেশে সেই ক্ষয়ের পরিণতিতেই টেনে নিতে চায়। অগ্নিবর্ণের মতো মৃত্যু বলতে সম্ভবত তিনি বিশ্বযুদ্ধের আঙিনায় যাদেরকে অপরিসীম ভোগ টেনে নিয়েছে মৃত্যুর মুখে, তাদেরকেই বুঝিয়েছেন। প্রেম নামক বহু-উচ্চারিত আচ্ছন্নতা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টায় পুরাণ প্রসঙ্গকে সমর সেন ব্যবহৃত করেছেন 'মদন ভস্মের প্রার্থনা' কবিতায় (কয়েকটি কবিতা/পৃঃ ৩২)। 'ঘরে বাইরে' (গ্রহণ/ পৃঃ১১) কবিতায় সাবিত্রীর তুলনা, 'শেষ সন্ধ্যা'-য় (গ্রহণ/পৃঃ ৩৬) ইন্দ্রের ভ্রূকুটি কুটিলতা, 'ঘরোয়া'-য় যমুনার জল, যদুবংশ, 'জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে চলে তাঁরি ধর্মসংগ্রাম' তথা কৃষ্ণের বিচরণ সাদৃশ্যে রাজনৈতিক নেতার কর্মাদি বর্ণনা (ঘরে বাইরে/নানাকথা পৃঃ ২২), শ্যামের বাঁশি, বৃন্দাবন, বিশ্বরূপ দর্শন,(জাতীয় সংকট/ খোলা চিঠি), তপোভঙ্গ (শহরে/তিনপুরুষ/পৃঃ ৮), রাসলীলা (স্তোত্র/তিনপুরুষ), 'রাধিকা রমন স্নিগ্ধ কৃষ্ণ' (অকাল/তিনপুরুষ/পৃঃ ১৫),রাখালবিলাপ (বাবুবৃত্তান্ত/তিনপুরুষ/পৃঃ ১৬) ইত্যাদি বর্ণনায় পুরাণ প্রসঙ্গ উপস্থিত। এছাড়া 'আত্মস্থ রাখাল ফিরেছে আপন বাটে', (জোয়ার ভাটা/তিনপুরুষ/পৃঃ ৮) পংক্তিটিতে মনে হয় শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার বিবিধ দানবদলন প্রসঙ্গ—পরিচিত গোষ্ঠলীলার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বর্তমান। বিশেষ করে,

কালিয়দমনের পর শ্রীদাম, সুদাম, বলরাম পরিবেষ্টিত আত্মবিশ্বাসে ভরপুর কৃষ্ণের চিত্রটিই যেন 'আত্মস্থ রাখাল' এবং 'দধিচির হাড়' (খোলা চিঠি/পৃ. ১২) বলাতে মনে আসে পুরাণে উল্লেখিত দধিচির আত্মত্যাগের মহিমা।

পুরাণ প্রসঙ্গের পরে সমর সেনের কবিতায় মহাভারত ও রামায়ণের উপস্থিতির কথা তুলতেই হয়। তিনি মনে করিয়ে দেন 'আমাদের মৃত্যু হবে পাণ্ডুর মতো' (মৃত্যু/ কয়েকটি কবিতা/পৃ. ২৬)। স্ত্রী সংসর্গকালে মৃত্যু ঘটবে এই ছিল পাণ্ডুর উপর ঋষি কুমারের শাপ। তবু বসন্ত সময়ে মাদ্রীর যৌবন সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে পাণ্ডু তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, তাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। সমর বাবু মনে করিয়ে দেন প্রতিকূল, রুক্ষনগর প্রতিবেশে কোনো সুস্থ কামনা নেই, সেখানে অসুস্থ কামনার পরিণতি মৃত্যুই। পাণ্ডুর মতো ধৃতরাষ্ট্র চরিত্রের প্রসঙ্গও উল্লেখ্য। 'একটি বুদ্ধিজীবী' (গ্রহণ/পৃঃ ১৫) কবিতায় মহাভারতীয় ধৃতরাষ্ট্রের মতোই সমকালীন বুদ্ধিজীবীদের অঙ্কিত করেছেন— অক্ষম, নিরাসক্ত, অন্ধ সর্ব বিষয়ে, সৃষ্টিতে অপারগ ও প্রলয় প্রতিরোধে অসমর্থ হিসেবে। এছাড়া চিত্রাঙ্গদা, বিজয়ী অর্জুন (চিত্রাঙ্গদা/গ্রহণ/পৃঃ ১৯), চক্রবূহ্য (গ্রহণ/ পৃঃ ৩৪), কুরুক্ষেত্র (পরিস্থিতি/নানাকথা/ পৃঃ ১৬), পাণ্ডব বর্জিত (ঘরে বাইরে/নানাকথা/পৃঃ ২১), যুবক যযাতি (শবযাত্রা/নানাকথা/পৃঃ ২৬), যমরাজ ছদ্মবেশী (নানাকথা/পৃঃ ৩৪), ধর্মরাজ (খোলাচিঠি/পৃঃ ১১), ইত্যাদি শব্দরাজি লক্ষ্য করলে মহাভারতের প্রসঙ্গ মনে আসবেই। এই মহাভারতীয় প্রসঙ্গের টানে সমর সেন বলেছেন 'আজ সে রাখাল কালের সারথি', (জোয়ার ভাটা/তিনপুরুষ/পৃঃ ৮)। এখানে যেন প্রকট হয়ে ওঠে নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা, আর সে নিঃসঙ্গতা ব্যক্তিগত নয়, সম্পূর্ণই সামাজিক, শ্রেণীগত। ৪২' আন্দোলন, যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে কবি কঠিন কালের বা সময়ের সারথি অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের সারথির সাদৃশ্যে প্রতিতুলনা করেছেন।

রামায়ণ প্রসঙ্গও সমর সেনের কাব্যে ইতস্তত বর্তমান। ইন্দ্রজিতের কুণ্ডল (রক্তকরবী/কয়েকটি কবিতা/পৃঃ ৮), নীলপদ্ম (হস্তিকা/নানাকথা/পৃঃ ১৪), 'বিভীষণ ধরে গুপ্তঘাতী হাতিয়ার'(বসন্ত/নানাকথা/পৃঃ ৩৫), বীর হনুমান, রাবণ, সেতুবন্ধ (আত্মসমালোচনা/খোলাচিঠি/পৃঃ ১৩) সীতা (জাতীয় সংকট/ খোলাচিঠি/পৃঃ ১৬), রাম (তদেব/পৃঃ ১৮) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারে সমর সেনের স্মৃতিতে রামায়ণ উপস্থিত ছিল।

সংস্কৃত সাহিত্যের উত্তরাধিকারে পাওয়া প্রসঙ্গগুলির মধ্যে কালিদাসের কাব্য প্রসঙ্গকে সমর সেন সমধিক মূল্য দিয়েছেন। কবিতার নামকরণও করেছেন কালিদাসকে স্মরণ রেখে। 'মেঘদূত' (কয়েকটি কবিতা/পৃঃ ৯) যার উদাহরণ। ভারতীয় সাহিত্যে দীর্ঘকাল ধরে মেঘদূতের ঐতিহ্য প্রবহমান। সমর সেন ঐ ঐতিহ্যকে যাচাই করেন আধুনিক নগর প্রতিবেশে। তাঁর নগর কালিদাসের বিদিশা বা উজ্জয়িনী নয়, এমন কি শেষ উনিশ শতকের কলকাতাও নয়। ক্লান্তি আর মলিনতা মাখানো নিরানন্দের শহরের চিত্র স্ফুটনে কালিদাসকে তাঁর গভীর ভাবে মনে পড়েছে। অলকা (কয়েকটি কবিতা/পৃঃ ২৯), 'শ্রোণীভারানত সুন্দরীর কালিদাসী সন্ধ্যা' (গৃহস্থ বিলাপ/তিনপুরুষ/পৃঃ ২৯) ইত্যাদি

শব্দ বা পংক্তিতে অনিঃশেষে কালিদাস উপস্থিত। এছাড়া প্রেম-পরিবেশ রচনাতেও অতীতের স্বপ্নময়তাকে ব্যঙ্গ করতে অলক্ষিতে কালিদাসকেই কমবেশী স্মরণীয় করে তুলেছেন সমর সেন—

'কোনো নগরে একদিন যেন ছিল
চারিদিকে মেঘলার মতো শালবনের অন্ধকার,
পাহাড়ের মতো মেঘবর্ণ প্রাসাদ, অরণ্যে প্রেম;'[২৩]

উদ্ধৃতি ও উল্লেখের মাধ্যমে ঐতিহ্যকে রূপ দেবার প্রচেষ্টা সমর সেনের কাব্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই উদ্দেশ্যেই তিনি যেমন কালিদাস বা তাঁর পংক্তি মিশিয়েছেন, তেমনি বিদ্যাপতি-বৈষ্ণবপদাবলীর উদ্ধৃতিও মিশিয়ে দিয়েছেন। ভোগ বীতস্পৃহ মানুষের হতাশা-নৈরাশ্য ফুটিয়ে তুলতে কবির 'কত মধুররাতি রভসে গোঙায়নু'[২৪] - বলাতে মনে পড়ে যায় ব্রজবুলিতে ধৃত বিদ্যাপতির বৈষ্ণবপদ :

'আধ জনম হম নিন্দে গোঙায়লুঁ
জরা সিসু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণি রঙ্গে মাতলুঁ
তোহে ভজব কোনবেলা।। ...
মাধব, হম পরিণাম নিরাসা।'[২৫]

অনুরূপ ভাবে বৈষ্ণব পদকর্তার পদ—'আমারি বঁধুয়া আন বাড়ি যায় আমারি আঙিনা দিয়া'—সমর সেনের নিজের মুখের ভাষায় ভাষা খুঁজে নিয়ে হয়েছে—

'এ ঘোর রজনী, মেঘের ঘটা,
কী করে আসবে বাটে
দূর বার্লিনে বঁধুয়া তিতিছে,
বেতারে শুনে পরাণ ফাটে।'[২৬]

এছাড়া 'হরির চরণ সান্ত্বনা' (গৃহস্থবিলাপ : চার/ তিনপুরুষ/পৃঃ ২০)-তেও বৈষ্ণব পদাবলীর অনুরণন বাজে।

মঙ্গলকাব্যের বিশিষ্ট রীতি, চরিত্র ইত্যাদিও সমর সেনের কাব্যে লক্ষিত হয়। বিশেষ করে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের ও 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের 'স্বপ্নাদেশ' ভঙ্গিমাটি সমর সেন তাঁর 'গৃহস্থবিলাপ' (তিনপুরুষ/পৃঃ ১৭-১৮) কবিতায় গ্রহণ করেছেন। এবং 'চণ্ডীমঙ্গলে'র (মুকুন্দরামের) মুরারী শীল চরিত্র ও ভাঁড়ুদত্ত, 'অন্নদামঙ্গলে'র অন্নদা ইত্যাদির প্রসঙ্গও উত্থাপিত হয়েছে সেখানে। এইভাবে সমর সেনের কবিতায় কখনো সদর্থক ভাবে, কখনো নঞর্থক ভাবে উপনিষদ, পুরাণ, সংস্কৃত কাব্য, 'বৈষ্ণব পদাবলী', মঙ্গলকাব্যের উল্লেখ-উদ্ধৃতি লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়াও ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিষ্ণু দে তাঁর কবিতায় যাতায়াত করেছেন। কখনো কখনো বা পর্বে পর্বে বিভক্ত কবিতা গুলিতে এক একটি পর্বে একজন অথবা দুজনের উল্লেখ বা উদ্ধৃতি দেখা যায়। এর প্রকৃত উদাহরণ 'গৃহস্থবিলাপ' কবিতার প্রথম পর্বে

মঙ্গলকাব্যের 'স্বপ্নাদেশ' রীতির সঙ্গে ভারতচন্দ্রের উদ্ধৃতি ও বিলাপে সমর সেনের বক্তব্য উচ্চারিত। দ্বিতীয় পর্বে দুর্ভিক্ষের বিলাপে ঈশ্বর গুপ্তের দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতার এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে বর্ণিত পদচিহ্ন গ্রামের করুণ বর্ণনার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তৃতীয় পর্বে মধুসূদনের বিলাপের সুরে শুরু হয়ে ক্রমশ মধুসূদনেরই প্রশস্তি বাচক সিদ্ধান্তকে স্মরণ করিয়েছে। চতুর্থ পর্বের বিলাপকে উচ্চকিত করেছে মুকুন্দরামের ভাঁড়ু দত্ত ও ঈশ্বর গুপ্তের 'ভবের ব্যাপারী'র চাল ধান চোরাকারবারের চরিত্রকে মনে পড়িয়ে। পঞ্চম পর্বের একেবারে প্রথমে মধুসূদনের একটি উদ্ধৃতি এবং তারপরের অংশে গৃহস্থের বিলাপে রবীন্দ্র কথিত 'পরমাযতি'র সীমা নির্দেশ করে, মাটির কাছাকাছি জীবনের প্রতি সমর সেন ইঙ্গিত করেছেন। মুকুন্দরাম থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিভিন্ন কবিদের একত্রিত করে তিনি প্রবহমান বিলাপ সঙ্গীতকে—দুর্ভিক্ষ মন্বন্তরের কবলে পড়া গৃহস্থের বিলাপ সঙ্গীতকেই অভিহিত করতে চেয়েছেন। জীবনের অভিজ্ঞতা ও সাহিত্যপাঠ লব্ধ অনুভূতির সুষ্ঠু সমন্বয় যে তিনি করতে চেয়েছেন তা এ আলোচনা থেকেই জানতে পারা যায়।

ভারতচন্দ্র রায়

সমর সেন মানবজীবনের কোনো সত্যদর্শন বর্ণনা কালে প্রতিনিধি স্থানীয় কবিদের উক্তির জোড়-কলম বানিয়ে তাঁর নিজের এবং প্রায় প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রে রূপায়িত করেছেন একটি নতুন সত্য অভিজ্ঞতাকে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উচ্চারিত হয় ভারতচন্দ্র রায়ের নাম। তাঁর 'বড়র পিরীতি বালুর বাঁধ' (এটি প্রচলিত প্রবাদও) সমর সেন করেছেন 'আমাদের পিরীতি বালুর বাঁধ' (চিত্রাঙ্গদা/গ্রহণ/পৃঃ ১৯)। অনুরূপভাবে, ভারতচন্দ্রের মহাকালীর রূপে সতীর রূপ বর্ণনার পংক্তি—'নীলবর্ণা, কৃষ্ণবর্ণ, লোল জিহ্বা, করাল বদন'[২৭]—সমর সেনের দুর্ভিক্ষ বর্ণনায় পরিবর্তিত হয়েছে—'কৃষ্ণবর্ণ, লোল জিহ্বা, করাল বদন!' (জাতীয় সংকট : ৫/খোলাচিঠি/ পৃঃ ১৬)। বলাবাহুল্য, ভারতচন্দ্রের 'নীলবর্ণা' শব্দটিকে সমর সেন 'কৃষ্ণবর্ণ' শব্দে রূপায়িত করেছেন। 'স্তোত্র' (তিনপুরুষ/পৃঃ ১৩) কবিতার প্রথম পংক্তি 'আদিদেব একা সাজে পুরুষ প্রকৃতি' এবং 'অক্ষম এ রায়বার ঈশ্বর কথনে' পংক্তিটি ভারতচন্দ্রের রচনারই পরিবর্তিত রূপ। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' উচ্চারিত প্রবাদ প্রতিম বাক্য—'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'—পরিবর্তিত হয়ে সমর সেনের 'গৃহস্থবিলাস' কবিতায় (তিনপুরুষ/পৃঃ ১৮) দাঁড়িয়েছে 'দুধে ভাতে বাঁচিবেক তোমার সন্তান।' সমর সেনের ফার্সী শব্দ গ্রহণে আমাদের মনে হয় তিনি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রকে অনুসরণ করেছিলেন। অথচ তিনি 'রায়বার' (স্তোত্র), 'কেরামৎ', 'হালাল' (অকাল/ তিনপুরুষ/পৃঃ ১৪-১৫), 'চোয়াড়ে' (২২ শে জুন ১৯৪৪/তিনপুরুষ/পৃঃ ২৮) ইত্যাদি শব্দ গ্রহণ করেছেন অনায়াসে। এগুলি ভারতচন্দ্র থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে গ্রহণ করেছেন বলেই আমাদের অনুমান।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

সমর সেনের সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সামাজিক ইতিহাস রচয়িতা কবি হিসেবে বিশিষ্ট হয়ে ছিলেন। ব্যঙ্গ কবিতায় চিত্রিত তাঁর সমাজ দর্শন সমর সেনের সময়ের সমাজের সঙ্গে সাদৃশ্য সৃষ্টি করেছিল। অবশ্য বৈসাদৃশ্যও চোখে প'ড়ে। গুপ্ত কবির কালে বাইরের জীবন যাত্রায়, চাল-চলনে, আচার-আচরণে, ইংরেজ প্রভুত্বের প্রতি আনুগত্যে সমাজ মানসে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল, সমর সেনের সময়ে—সে পরিবর্তনের চেহারা ভয়ংকর রকমের হয়েছিল। বাইরের দিকে ইতিহাস অনেক কিছুর পরিবর্তন ঘটালেও সমাজ-মানসের অন্দর মহলের পরিবর্তন তেমন করে চোখে পড়ে না বলেই সমর সেন ইঙ্গিত করেছেন তাঁর কবিতায়।

একদা সমর সেন বিষ্ণু দে-র 'পূর্বলেখ' গ্রন্থের সমালোচনা কালে মন্তব্য করেছিলেন : 'আমাদের কাব্যজীবনে অলসতা ও অকর্মন্যতা সম্ভবপর হয়েছে তার কারণ এই যে, বাক্তাল্লা সত্ত্বেও আমরা অতীতের বাংলা ঐশ্বর্যের সন্ধান করি না, আমাদের সাহিত্যাগ্রজদের স্বচ্ছন্দ রসবোধ এবং সহজ আলোকজ্ঞান থেকে ক্রমশ আমরা নিজেদের বঞ্চিত করেছি।'[২৮] তিনি সমকালীন সমাজ জীবনের দিকে লক্ষ্য রেখেই ঐতিহ্যের সন্ধানে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাবলীকে স্মরণ করেছেন। লোকালয়ে নিজেকে বেঁধে লোকোত্তরের সন্ধান করেছেন। তাই ঈশ্বর গুপ্তের আমলের সভ্যতাভিমানী স্বার্থপর বুদ্ধিমানরা সমর সেনের কবিতায় স্বার্থপর, আত্মচিন্তায় রত, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকায় বুদ্ধিজীবী রূপে উপস্থিত হয়েছেন। কবির এই বুদ্ধিজীবীদের প্রতি 'পোড়ামুখ'(বিকলন/তিনপুরুষ/পৃঃ ১৭) বিশেষণটি এসেছে ঈশ্বর গুপ্তের অপদার্থ বুদ্ধিজীবী অর্থে। এবং এ কবিতার 'রজকের কিবা লাভ উলঙ্গের কাছে।' পংক্তিটিও ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা থেকে অনুসৃত। সুদীর্ঘকালের ব্যবধান পার হয়েও বিত্তবান মানুষদের চিত্তহীন স্বার্থপরতা ও বিত্তহীন মানুষদের সম্ভ্রমহীন মোসাহেবী প্রবণতা অপরিবর্তিত রয়ে গেছে যে, সেকথাই এখানে পরিস্ফুট।

ঈশ্বর গুপ্ত এবং সমর সেন উভয় কবির সামাজিক ইতিহাসেই দেখা যায় ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত, অদৃষ্ট ভাগ্যের প্রতি যুক্তিহীন আনুগত্যে হরির চরণ বন্দনা ইত্যাদি বেপরোয়া পাপ কর্মের অনুষ্ঠানে বর্তমান। তাই উভয় কবিই প্রায় সমস্বরে একই ধরনের স্তব পাঠ করেছেন। ধান চালের চোরাকারবারী অংশীদার হিসেবে ঈশ্বর গুপ্তের 'ভবের ব্যাপারী', মন্ত্রণাদাতা রূপে যে চরিত্রের পরিচয় মেলে, তা হল—

> 'ঐহিক সম্পদ ভোগের সুখ,
> তাহাতে দিতেছে দারুণ দুখ,
> ভোগেতে বঞ্চনা, যোগেতে বঞ্চনা
> লাঞ্ছনা হইল্ সার হে.......।'[২৯]

—একে আশ্রয় করেই আধুনিক কবির হাতে গোটা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সমাজের প্রতীকে উচ্চারিত হয়েছে—

> 'ধান যদি ধরে রাখি লোকের গঞ্জনা,

মাল ছেড়ে দিলে হায় ক্ষতির যন্ত্রণা,
যোগেতে লাঞ্ছনা, ভোগেতে লাঞ্ছনা,
হরির চরণ স্বান্ত্বনা।'[৩০]

এখানের যেটুকু পার্থক্য তা কালান্তরের পাঠান্তর জনিত। অন্য কিছু নয়। আবার ঈশ্বরানুরক্তির পরে দেশের দুর্দিনে উভয় কবির বিশেষণও এক—'পোড়া আকাল'।

আদিম আকাঙ্ক্ষায় যৌবনের ক্রন্দন যখন আধুনিক কবি বর্ণনা দেন—'বিষাক্ত সাপের মতো তোমাকে পাবার বাসনা আমার রক্তে' (প্রেম/কয়েকটি কবিতা/পৃঃ ১৬) —তখন যেন গুপ্ত কবির কণ্ঠস্বরের অনুরণন দেখি,-

সরল হইলে সাপ বুকে তারি ধরি
তার মুখে মুখ দিয়া বিষপান করি।'[৩১]

রক্ত বাহিত এই ক্ষুধার উপবাসী ক্রন্দন আসলে সর্বদেশের সর্বকালের দুরন্ত যৌবনের ক্রন্দন। এই ক্রন্দন ভিন্ন দেশী ভাষা ভাষী কবিদের (D. H. Lawrence) উস্কানি থেকে এসেছে ভাবা ভুল হবে। আসলে সদৃশ উপলব্ধিতে সমস্ত কবিই প্রায় এক। তার ফলে নানা মৌলিক রচনাতেও আমরা অন্যের অনুপ্রবেশকে লক্ষ্য করি। এ ভুল সচরাচর বৃদ্ধি পায় আক্ষরিক অনুসরণ দেখে। যেমন—ভণ্ড বয়স্ক সমাজপতিরা একদা ছিল 'গলিত দর্শন' আর 'স্খলিত বচন' নিয়ে। এরাই সমর সেনের হাতে অবিকৃত থেকে গেছে—'বৃদ্ধ শিশু আর বুদ্ধিহীন বৃদ্ধের দল/স্খলিত দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে আর হাসে' (কয়েকটি দিন/গ্রহণ/পৃঃ ১৪)। এমনিতর একাধিক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। 'বিবিজান চলে যান লবেজান করে'[৩২] —পংক্তিটিতে 'লবেজান' শব্দটি ঈশ্বর গুপ্ত যে অর্থে ব্যবহার করেছিলেন, ঠিক সেই অর্থেই অথচ বিপরীত প্রয়োগে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুর্বল অবস্থা ব্যাখ্যায় সমর সেন কাল সম্মত করে তোলেন—'আমাদের শ্রেণী লবেজান' পংক্তিটি (গৃহস্থ বিলাপ/তিনপুরুষ/পৃঃ ১৯)। এবং সমর সেনের 'ভবের ব্যাপারে তিনি ব্যাপারী,/খরনদীতে তিনি কাণ্ডারী' (গৃহস্থ বিলাপ) পংক্তিটিও অনিঃশেষে ঈশ্বর গুপ্ত থেকে অনুসৃত বললে ভুল হবে না। সেখানে আছে—

'ভবের ব্যাপারে হয়েছ ব্যাপারী,
বিষম ব্যাপার বুঝিতে না পারি,
মূলধন কোথা মনে না বিচারি,
লাভের ব্যাপারে মানিলাম হারি,
অসার সংসারে করেছ সংসারী........।'[৩৩]

সামাজিক ইতিহাসে সমাজে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকার সমস্ত ঘটনাই মূল্যবান উপাদান। যুদ্ধ তেমন একটি ঘটনা। ঈশ্বর গুপ্তের কালে ইংরেজ ও প্রাদেশিক রাজ্যের মধ্যে সংঘটিত বিবিধ যুদ্ধের বিবরণের মতো সমর সেনও তাঁর সময়ের ইতিহাস লিখতে দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময়ের ঘটনা কবিতার বিষয়বস্তু করেছেন। সমর সেনের যুদ্ধ বিষয়ক কবিতা লিখতে ঈশ্বর গুপ্তের প্রেরণা ছিল না। এ বিষয়ে 'বাবুবৃত্তান্তে' তিনি জানিয়েছেন

ঃ 'নানা সূত্রে খবর বাছাই করে রেডিও-র নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বুলেটিন তৈরী করে মুখে মুখে স্টেনোগ্রাফারকে বলে টাইপ করিয়ে নিয়ে স্টুডিওতে পাঠিয়ে দেওয়া। কাজের চাপ ছিল বেশ, যুদ্ধ ক্ষেত্রের নানা স্থানের নাম ও ঘটনা পরম্পরার সৃষ্টি একটা ধারণা মনে রাখতে হতো।'[৩৪] ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে অল ইন্ডিয়া রেডিও-র সংবাদ বিভাগে যোগ দিয়ে সমর সেন যুদ্ধ প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। যদিও এর আগে লেখা কবিতায় যুদ্ধ প্রসঙ্গ পরোক্ষ ভাবে উপস্থিত থাকতো। যাই হোক যুদ্ধ বিষয়ক কবিতা রচনায় গুপ্ত কবির অনুপ্রেরণা কাজ না করলেও যুদ্ধ নির্ভর কবিতায় 'বুলেটিন' তৈরীর আদলটিতে গুপ্ত কবিকে স্মরণ করা যেতে পারে। অবশ্যই সমর সেন আধুনিক ভাবনায় পরিবর্তিত করে নিয়েছেন।

উপসংহারে একথা বলতেই হয় যে, গুপ্ত কবির ব্যঙ্গ লঘু চাপল্যের সীমানা কখনো অতিক্রম করেনি। কিন্তু সমর সেনের প্রচ্ছন্ন চাপা হাসি সব সময়েই হতাশা-ধিক্কার-বিক্ষোভে বিদ্যুৎ গর্ভ। সমালোচক অমলেন্দু বসু যাকে 'বারুদঠাসা ব্যঙ্গ' বলে অভিহিত করেছেন।[৩৫]

মধুসূদন দত্ত

বাঙলা কাব্যে বিদেশী প্রভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে সমর সেন মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁর মতে : 'ভারতীয়দের মধ্যে বাঙালি প্রথম বিদেশি ভাষার সাহায্যে বিদেশি শিক্ষা পায়, কিন্তু আমাদের সাহিত্যের প্রাণধারা জাগ্রত ছিল বলে ভারের সমন্বয় সম্ভব হয়। মাইকেল মধুসূদনের অসাধারণ কাব্য এ সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত।'[৩৬] বলা বাহুল্য, এহেন মাইকেলকে তিনি স্থানে স্থানে স্মরণ করতেই পারেন। সেই সঙ্গে আমাদের স্মৃতির মণিকোঠায় তাঁকে মাঝে মাঝে স্মরণ করাতেও ছাড়েন না। বিশেষ করে, আমাদের কবি যখন উচ্চারণ করেন—'সম্মুখ সমরে হত' (অজ্ঞাতবাস/গ্রহণ/পৃঃ ৩০), তখন আমাদের অবচেতনে মধুসূদন দত্তের উপস্থিতিকেই টের পাওয়া যায় যে তাতে সন্দেহ থাকে না।

মধুসূদনের 'অকাল মরণ শেষে এ কাল সমরে'—প্রবাদতুল্য পংক্তিটিকেও সমর সেন আত্মস্মাৎ করে তাঁর 'গৃহস্থবিলাপ' (তিনপুরুষ/পৃঃ ২১) কবিতার পঞ্চম পর্বের প্রথম পংক্তি করেছেন। এই কবিতাটির তৃতীয় পর্বে দেশের নিদারুণ দুর্দিনে দেশবাসীর হয়ে কবির নিবেদিত জিজ্ঞাস্য—'সুচন্দন বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ কখনো কি ধরে!' পংক্তিটি মধুকবির সরস্বতীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত, 'তোমার পরশে/সুচন্দন বিষবৃক্ষ ধরে'[৩৭] পংক্তি থেকে অনিবার্য ভাবে অনুসৃত। সমর সেন মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের সঙ্গেও বিশেষ পরিচিত ছিলেন যে তাতে সন্দেহ থাকে না। 'হারানো রতন খোঁজে কেরানি হৃদয়', 'রাধিকামন' (অকাল/তিনপুরুষ/পৃঃ ১৫), 'ঘন বনে সাপ খোঁজে হারানো মণি' (ঘুম/তিনপুরুষ/পৃঃ ২৫) ইত্যাদি পংক্তি ও শব্দ লক্ষ্য রাখলেই 'ব্রজাঙ্গনা'র কথা স্মরণ হয়। বিশেষ করে, 'রাধিকারমণ' শব্দটি তো মধু কবির 'নাচিছে কদম্বমূলে/বাজায়ে মুরলী

রে, রাধিকারমণ'[৩৮] পংক্তি থেকে অনুসৃত।

'বিকলন' (তিনপুরুষ/পৃ. ১৭)-এ 'মাইকেলী মেঘনাদে'র উল্লেখের পাশাপাশি সমর সেন মধুকবির একটি প্রবাদ প্রতিম বাক্যকেও আত্মসাৎ করেছেন 'যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে বয়সে বাঙালী' বলে। আধুনিক কবি সমস্ত মধ্যবিত্ত মানসের বিড়ম্বিত গ্লানির এবং বৈকল্য দশার নির্ভুল ইতিহাসের সঙ্গে মধুসূদনের দীর্ঘশ্বাস রচিত ইতিহাসটিকে একত্রে গেঁথেছেন। অনুরূপ ভাবে, 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের অষ্টম সর্গের রামচন্দ্রের প্রতি মায়া দেবীর উক্তি—'পশতুমি কৃতান্ত নগরে, সীতাকান্ত'[৩৯]-কে সমর সেন পরিবর্তিত করেছেন—'কে এসেছে কাল রাত্রে কৃতান্ত নগরে'? (নচিকেতা/তিনপুরুষ/পৃ. ২১)-তে। তবে আমাদের অনুমান, এক্ষেত্রে মধুসূদনের লাইনটির অনুসারিতার চেয়ে নচিকেতার মূল গল্পটির প্রতিই সমর সেন সমধিক আগ্রহশীল ছিলেন। মধুসূদনের পংক্তিটির তাৎপর্য এবং সিচ্যুয়েশন বেশ স্বতন্ত্র। এছাড়া কয়েকটি বিশেষ শব্দও কিন্তু মধুকবির কাব্য থেকে সরাসরি সমর সেনের কাব্যে এসেছে।—'কুম্ভীপাক' (নানাকথা/পৃ. ৩৪), 'জাঙাল' (খোলাচিঠি/পৃ. ১২), 'পাখসাট্' (জাতীয় সংকট/খোলাচিঠি/পৃ. ১৪), 'রৌরব' (অকাল/তিনপুরুষ/পৃ. ১৫) ইত্যাদি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনার নানা উল্লেখ উদ্ধৃতিও সমর সেনের কবিতায় আছে। প্রথমত, 'বিষবৃক্ষ' শব্দটির নানান ব্যবহার তিনি করেছেন। 'সেকালের শিক্ষাপ্রাপ্ত বিষবৃক্ষের ফল', 'এ বিষবৃক্ষ শেষ হোক' (পঞ্চমবাহিনী/নানাকথা/পৃ. ৩৭) ইত্যাদি।

মীরজাফরী অতীত ও সেকালের বিষবৃক্ষের ফল হিসেবে বাঙালী বুদ্ধিজীবীকে দেখে তিনি ক্ষান্ত থাকেন নি। তার পর এসেছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-স্বরূপ বিষবৃক্ষের ফলের বৈজ্ঞানিক ব্যবচ্ছেদ। 'আনন্দমঠে' সন্ন্যাসীরাই যবন অর্থাৎ মুসলমান নিধনে লিপ্ত হল এবং ভারতের পুনর্জাগরণের আশায় ইংরেজশাসনকে স্বাগত জানাল :

> 'দুর্দান্ত যবন কালে ধরেছি উপনিষদ।
> ভাগ্যক্রমে ইংরেজ এল; স্বাগতম্।
> পড়েছে মুসলমান, বন্দেমাতরম্
> ধ্বনি ওঠে ঘটিরাম ডিপুটির ঘরে.......।'[৪০]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আলোচ্য কবিতার শিরোনাম 'আনন্দমঠ' ছিল 'সমর সেনের কবিতা' সংকলনে। পরিবর্তিত হয়েছে পরবর্তীকালে। যাইহোক এই 'জাতীয়বাদী' কল্প কাহিনীর পুনরাবৃত্তি সমর সেন বারবার দেখেছেন তাঁর জীবদ্দশায়। 'আনন্দমঠে'র হিঁদুয়ানির এবং অহিংসার ধ্বজাধারীদের বিশ্বাসঘাতকতার বিষময় ফল সমর সেন প্রত্যক্ষ করেছিলেন ১৯৪৬ সালের আশার এবং আশাভঙ্গের দিনগুলিতে। এই 'আনন্দমঠে'র স্মৃতি দীর্ঘদিন কবির মনে জাগরূক ছিল। এমন কি তিনি যখন কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন, তখনও

'বন্দেমাতরম্' শব্দটি তাঁকে ছেড়ে যায় নি। ১৯৭২ সালে 'বন্দেমাতরম্' নামে এক প্রবন্ধ লেখেন উনিশ শতকের বিষ কিভাবে বিশশতকের সত্তর দশকের রক্ত দূষিয়ে দিয়েছে। পণ্ডিতেরা হয় তথ্যগত অনেক বিচ্যুতি আবিষ্কার করতে পারেন, কিন্তু আমাদের জাতীয়বোধের কতখানি অবনমন ঘটেছে, সে সম্পর্কে তিনি 'আনন্দমঠে'র প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। 'ইংরেজদের আমলে হিন্দুদের মধ্যে শক্তিভাব কিছু প্রবল ছিল। জাতীয়তার সঙ্গে শক্তিপূজা, 'আনন্দমঠ' ইত্যাদি......শক্তির আরাধনা আবার শুরু হয় সন্ত্রাসবাদীদের সময়ে। মার্কসবাদের প্রভাবে রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে এটা কমে যায়। সম্প্রতি যে আবার বেড়েছে সেটা অবশ্য খুব আনন্দের কথা নয়, কেননা সেটা বেড়েছে বিশেষ করে মস্তান ও তার সাকরেদদের মধ্যে, রাজনীতির ব্যবস্থাপনায় যাদের প্রভাব সবাই জানেন।'[৪১]

এহেন 'আনন্দমঠে'র '৭৬-এর মন্বন্তরের যে অসাধারণ বর্ণনা আছে—তার সঙ্গে সমর সেন বর্ণিত '৪৩-এর দুর্ভিক্ষের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র দেশের অশেষ দুর্গতিকে চিত্রিত করেছেন : 'মা যা হইয়াছেন—।......কালী অন্ধকার সমাচ্ছন্ন কালিমাময়ী। হৃতসর্বস্বা এই জন্য নগ্নিকা। আজি দেশের সর্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কাল মালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন—হায় মা।'[৪২] বঙ্কিমচন্দ্রের সন্তান বর্ণিত 'স্বর্ণসীতা'র কিছু অংশ কবি সমর সেনের কলোপযোগী পাঠান্তরে ভেদের ফলে পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায়—'আজ তাম্রসীতা, উলঙ্গিনী, দুর্ভিক্ষ কন্যা আমাদের দেশ/কিম্ভূত-কিমাকার জীবে আচ্ছন্ন নিঃসঙ্গতা/অস্থিচর্মসার সন্তানের ভিড়ে নীরবে বসে।........কৃষ্ণবর্ণ, লোলজিহবা, করাল বদন! পদপ্রান্তে নিরুদ্দেশ ধান আর গম/আর পুঞ্জীভূত পুরুষের প্রাণহীন দেহ,' (জাতীয় সংকট/খোলাচিঠি/পৃ. ১৬), বঙ্কিমের হৃতসর্বস্বা নগ্নিকা—উলঙ্গিনী দুর্ভিক্ষকন্যায় পরিণত, পদ প্রান্তে শস্যবিহীনা দেশের শ্মশানের ব্যঞ্জনা এবং কঙ্কালমালিনীর পরিবর্তে পুরুষের প্রাণহীন দেহ আর ছিন্ন শিশুর রক্তজবায় তাঁর পূজার নৈবেদ্য লক্ষণীয়। আরও লক্ষণীয় 'তাম্রসীতা' শব্দটি—যার মাধ্যমে বঙ্কিম অপেক্ষাও আমাদের আলোচ্য কবিকে সুচতুর, সম্পূর্ণতির শব্দ সচেতক হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে।

সমর সেনের 'গৃহস্থ বিলাপ' কবিতায় বর্ণিত, দুর্ভিক্ষের চিত্রেও অলক্ষ্যে যেন বঙ্কিম-চন্দ্রেরই 'আনন্দমঠে'র পদচিহ্ন গ্রামের স্মৃতি ভেসে ওঠে। সময় বিশেষে বঙ্কিমচন্দ্রকে উপলক্ষ করে সমর সেন কটাক্ষ করতে পিছপা হন নি। বিশেষত ব্রিটিশ রাজের স্পষ্টপ্রবক্তা বঙ্কিমকে 'খটিরাম ডিরুটি' নামে উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত, দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' তে বর্ণিত অপদার্থ ডেপুটি চরিত্রটির কথাও আমাদের মনে আসে। এছাড়া দু-একটি বস্তুর নামকেও অনেক সময় বঙ্কিমচন্দ্রের নামের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছেন। 'বঙ্কিমী সে লাঠি'' (রোমন্থন) নানাকথা/পৃ. ৯—স্মরণীয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অমিয় চক্রবর্তী একদা মন্তব্য করেছেন : 'আধুনিক কাব্যে উল্লেখের পনেরো আনাই অবশ্য রবীন্দ্রনাথের রচনা নিয়ে কেননা তাঁর সৃষ্টি আমাদের মানসিক, এমন কি যেন

জৈবিক সত্তার অন্তর্গত।'[৪৩] একথা সমর সেনের ক্ষেত্রে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। এ প্রসঙ্গে কবি সমর সেনের বিভিন্ন মন্তব্য লক্ষণীয়। ১. 'রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি ছিল অমোঘ। নানা খামতি সত্ত্বেও এই বিরাট মানুষকে সরিয়ে আর কারো সেখানে দাঁড়াবার প্রশ্নই ছিল না।'[৪৪] ২. (রবীন্দ্রনাথ) নিজ বলে পরকে আপন করেছেন, একটি জাতির কবিতা সৃষ্টি করে গিয়েছেন।........নিজে লেখায় বরাবর মোড় নিয়েছেন, অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, নিত্য নতুন বিস্ময় জাগিয়েছেন, কিন্তু সাধারণ লেখকরা তাঁর ভাব ও ভাষার টুকরো ভাঙিয়ে জীবন যাপন করতে লাগলেন।'[৪৫] ৩. 'আমাদের কাব্য প্রকৃত ঐতিহ্যহীন। এক হিসেবে ভারতের বিপুল সংস্কৃত সাহিত্য রবীন্দ্রনাথে শেষ বারের জন্য স্বধর্মে পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল।'[৪৬] ৪. 'রবীন্দ্রনাথ প্রাক্তন বিদ্রোহীদের কেবল প্রশ্রয় দেন নি, এমনকী 'গুরুদেব'কে যিনি গালিগালাজ করতেও কসুর করেন নি—সেই ব্যক্তিও তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন,.......'[৪৭] ৫. 'রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় একটি দুর্লভ প্রসার আছে।'[৪৮] ৬. 'রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মহাসমস্যার ব্যাপার। তাঁর বিরুদ্ধে একদা-বিদ্রোহীরা তিরিশের দশকে ঘোরতর রবীন্দ্রভক্ত হন। একদিকে 'রাশিয়ার চিঠি' ও পরে 'সভ্যতার সংকট' বামপন্থীদের মধ্যে আলোড়ন আনে। অন্যদিকে আধুনিকদের টেক্কা দিয়ে লেখা 'শেষের কবিতা' উত্তেজনা ও উৎসাহের খোরাক যোগায়। তারপর 'চার অধ্যায়'। দুটিই আমার ভালো লাগেনি। 'শেষের কবিতা' চালিয়াতি মনে হয়েছিল। 'চার অধ্যায়' সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের একটি পত্রিকায় আট-দশ লাইনের একটি তীব্র সমালোচনা পড়ে বুদ্ধদেববাবু খুব চটে জিজ্ঞেস করেছিলেন 'চ্যাংড়া' সমালোচকটিকে? ওটা যে আমার লেখা চেপে গেলাম। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের বিরূপ সমালোচকেরাও নিজেরা কিছু লিখে তাঁর কাছে এক ছত্র সার্টিফিকেট পাবার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকতেন। রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতাগুলি অন্য জগতের লেখা।'[৪৯]

—এমনিতর বিভিন্ন সময়ের মন্তব্য থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, সমর সেনের মতো অনুজ কবিরা রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরি গ্রহণ বা বর্জন কোনোটিই করতে পারেন নি। সূর্যের মতো চরাচর ব্যাপ্ত রবীন্দ্রনাথের পরিচয়, স্বয়ম্প্রভ বিরাট ইতিহাস, তাঁর প্রশংসা পত্রের মোহ মর্মে লালন করে, তাঁকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা অবান্তরই বটে। তবে রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ বা বর্জন যে ধরনের সমস্যাই নতুন কালের কবিদের চঞ্চল করে থাকুক না কেন, তার মূল উৎস ছিল সে কালের চরিত্র। কাল চরিত্রের তাগিদেই অনুজ কবিরা অনুভব করলেন—জীবনের চতুর্দিকে যখন উত্তেজনার আগুন গনগন করছে, বেঁচে থাকার—বাঁচিয়ে রাখার সংকট যখন সর্বব্যাপী; তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কাছে অনেক দূরের আকাশ। রবীন্দ্রনাথের কবিতা আকাশকুসুম। আশ্চর্য স্বপ্নের দেশ যেন। কাল চরিত্রের ধাক্কায় অনুজ কবিদের স্বপ্ন ভঙ্গ হ'ল। সমর সেনও এর ব্যতিক্রম নন।

সমর সেন রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে রবীন্দ্র-প্রতিসারী কবিতে পরিণত হতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এককালের কণ্ঠস্বরকে অন্যকালের কণ্ঠস্বরে অন্যভাবে এবং

প্রায়শই বিপরীত ভাবে টেকনিকের মারফৎ সমর সেন উচ্চরণ করেছেন। এই টেকনিকটা সমর সেনের একান্ত আপন। রবীন্দ্র বাণীর মুখ তিনি তাঁর সময়ের দিকে এমন কৌশলে উপস্থাপিত করেছিলেন যে, কালান্তরের প্রেক্ষিতে মুহূর্তে কবি-ভাষার বা কবির অলৌকিক কথার লৌকিক অর্থান্তর ঘটে গেল। পরবর্তীকালের মূল্যবোধ এবং জীবনদর্শন কবি সমর সেনকে চিনিয়ে দিয়েছিল কোন্ কোন্ রবীন্দ্র-সুভাষিত রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধেই মারাত্মক ক্ষেপণাস্ত্র হতে পারে। তিনি নির্মম নিষাদের মতো সেই বাণগুলি নিজের আয়ত্বে সংগ্রহ করেছিলেন এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী নির্ভুল প্রয়োগে পারদর্শিতার প্রমাণ দিয়েছেন। সমর সেন তাঁর সমাজ সচেতন সিরীয়াস্ ভাবনাগুলির অনুষঙ্গে রবীন্দ্র-ভাবনার উপযোগিতা যাচাই করেছেন। বিশেষে করে, নিসর্গ ভাবনায়, প্রেম ভাবনায় ও সমাজ ভাবনায় সমর সেনকে রবীন্দ্রনাথের অবদানের তাৎপর্য নতুন অবদানের সাহসী পরিকল্পনায় উত্তেজিত করে তুলেছে। যুগের জটিল জীবন-সমস্যার বিভ্রান্তিকর অভিজ্ঞতাই সমর সেনের কবিতাগুলিকে কান্তিমান সুঠাম শরীরে বয়সোচিত তাচ্ছিল্য এবং বাঁকা ঠোঁটে বয়সোচিত হাসি নিয়ে পরিবর্তিত মূল্যবোধের বিশ্বস্ত চরিত্র হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে।

সমর সেন সময়ের ফসল, চল্লিশের দশকের। তাই সেই অবস্থিতিতে থেকে তিনি রবীন্দ্র কাব্য ঐতিহ্য হতে কিছু নেবার মতো পান নি। অথচ রবীন্দ্র-সৌন্দর্য-বোধ জাত বাক্য তিনি যত্রতত্র ব্যবহার করেছেন। বহু রবীন্দ্র বাক্য ব্যবহারে তিনি এ যুগেরই অপূর্ণতা এবং পঙ্গুতাকে স্পষ্ট করেছেন।

> 'সূর্য অস্ত্র গেল, সূর্যদেব কোন দেশে—
> এখানে সন্ধ্যা নামল,
> শীতের আকাশে অন্ধকার ঝুলছে শূকরের চামড়ার মতো,
> গলিতে গলিতে কেরোসিনের তীব্রগন্ধ
> হাওয়ায় ওড়ে শুধু শেষ হীন ধূলো ঝড়;
> এখানে সন্ধ্যা নামল শীতের শকুনের মতো।'[৫০]

—এখানে 'সূর্যদেব' বোঝাতে একটি অর্থে রবীন্দ্রনাথকেই ইঙ্গিত করেছেন সমর সেন। বলা বাহুল্য, এ সন্ধ্যা বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'র 'সন্ধ্যা ও প্রভাতে'র সন্ধ্যার স্মৃতি মনে আসে। তুলনা এবং বৈপরীত্য বোঝাতেই সমর সেন রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করিয়েছেন। একেই টি. এস. এলিয়ট 'Contrast and comparism' বলেছেন। প্রসঙ্গত এখানে কবিবন্ধু বিষ্ণু দের 'টপ্পা-ঠুংরী' কবিতার কথাও মনে আসে। সেখানে বিষ্ণু দে 'লিপিকা'র 'সন্ধ্যা প্রভাতে'র সুরের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা অনুভব করেছেন। বিষ্ণু দে সন্ধ্যাকে ফুলের মতো ফুটিয়ে তুলে রবীন্দ্রনাথকেই অনুসরণ করেছেন পুরোপুরি

> 'সূর্যদেব এখানে নামল সন্ধ্যা
> কবিতার সন্ধ্যা
> পিলু-বারোয়ার সন্ধ্যা।'

বিষ্ণু দে থেকে সেখানেই সমর সেনের রবীন্দ্র চর্চার পার্থক্য। অনুরূপ ভাবে বর্ণনাতেও

সমর সেন রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'মন্থর পায়ে চলেছে মহিষগুলি/রাঙা পথ হতে রহিরহি ওড়ে 'ধুলি'। —সমর সেন 'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও' বলে কাল সচেতন করে জানিয়েছেন—'দুপুরের খর-সূর্যে ক্লান্ত মহিষের পদক্ষেপ/ইস্পাতের কঠিন পথে' (একটি প্রেমের কবিতা : ঝড়/কয়েকটি কবিতা/পৃ. ১২)। দারুণ গ্রীষ্মে নগরীর প্রাণ যখন তৃষাতপ্ত, চতুর্দিকে অসহ্য গুমোট, আবার বেকার জীবনের হতাশা ও যন্ত্রণায় সে গুমোট যখন প্রকট—তখন সেই মর্মান্তিক জ্বালাময়ী অনুভবেই সমর সেন রাঙাপথ পার হয়ে ইস্পাতের কঠিন পথে পা রেখেছেন।

সমর সেন তাঁর নিসর্গ ভাবনায় একাধিক বার রবীন্দ্রনাথের আবেশে আবিষ্ট হয়েছেন, আবার একাধিকবার রবীন্দ্রনাথের বিপরীত ভাবনার স্বতন্ত্র ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছেন। কবির 'মহুয়ার দেশ' (কয়েকটি কবিতা/পৃ. ২২) কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক আবেশের গন্ধমোড়া যেমন, তেমনি 'মেঘদূত' (কয়েকটি কবিতা/পৃ. ৯) কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের বিপরীত ভাবনায় ভাবিত। এর থেকে কবির চিত্তের ভারসাম্য বিহীন দোলাচল চিত্রের পরিচয় মেলে।

সমর সেন 'সন্ধ্যা ও প্রভাত' (গ্রহণ/পৃ. ১২) কবিতায় রবীন্দ্রনাথের আকাশে মুক্তি খুঁজেছেন। কিন্তু কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'র 'সন্ধ্যা ও প্রভাতে'র সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে এ কবিতার নগর প্রকৃতি বর্ণনায় কবি উচ্চারণ করেছেন—'জীবিকার স্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন।' এটি রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের 'কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান'-র[৫১] সংশোধিত রূপ। আবার 'শবযাত্রা' (নানাকথা/পৃ. ২৬) কবিতায় শুনিয়েছেন জীবিকার স্রোতে ভেসে যাওয়া অনিকেত জীবনের পক্ষে মৃত্যু শেষ কথা নয়। 'কালোস্রোতে ভেসে আসে নবীন জঞ্জাল' স্বরূপ নতুন প্রজন্ম, যা ঘানিটানা অদৃষ্টলিপির খসড়া—তাকে অভিহিত করতে তাঁর ভুল হয় না। এই অস্বস্তিকর জীবনের গুমোট থেকে পরিত্রাণ পেতে পুনরায় তিনি 'বলাকা' কাব্যেরই আরেকটি পংক্তি উচ্চারণ করেছেন— 'পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।' মধ্যবিত্ত অসাড় জীবনের প্রার্থনার সঙ্গে সুরে স্বরে একাকারে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন তিনি রবীন্দ্রনাথের পংক্তিকে এইভাবে।

নিসর্গ ভাবনাশ্রিত সমাজ ভাবনার একটি দলিল 'বিরতি' (গ্রহণ/পৃ. ২১)। রবীন্দ্রনাথের 'এসো করো স্নান নবধারা জলে'—পংক্তিটি যে কোনো নব উদ্দীপনার আগমনী সূচিত করতে পারে যেমন, তেমনি পরস্পর বিরোধী ভাবধারার ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল রমনীর রূপান্তর প্রসঙ্গে—সমর সেন সেখান থেকে বাক্যটি তুলে এনে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ঔপনিবেশিক সভ্যতার বিস্তারে করায়ত্ত স্থানের অধিবাসী, ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে নতুন দীক্ষামন্ত্রে ব্যবহৃত করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সঞ্জীবনী মন্ত্রের পরিবর্তে সমর সেনের হাতে মারণ-মন্ত্রে পরিবর্তিত হয়েছে এটি। ভারতীয় জীবনে নৈতিক অধঃপতন জনিত বেদনার কারণ হিসেবে নব জীবনাদর্শের অনুপ্রবেশটিকে অভিহিত করতে চেয়েছেন আধুনিক কবি।

প্রেমের ধারণাতেও সমর সেন নিসর্গভাবনার মতোই একই কালে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এবং বিপক্ষে। তাঁর নিজের এই মনোভাবটিকে তিনি 'দু-নৌকোয় পা' বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। একদিকে সনাতনের প্রতি হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত সুদৃঢ় আস্থা, অন্যদিকে বর্তমানের সংঘাতে প্রতিমুহূর্তে সে আস্থার স্থান চ্যুতির আশঙ্কা—এই উভয় মনোবৃত্তির মধ্যে জোড়াতালি দিয়ে যে স্বাচ্ছন্দ্যে বাস, তাতে চূড়ান্ত অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন তিনি। কিন্তু তিনি বর্তমানকে ভোলেন নি। জীবন, মনন সবই তাঁর বর্তমান নির্ভর। আর সেখানেই অতীতচারী, রবীন্দ্রনাথ থেকে পার্থক্য। 'রবীন্দ্রনাথ মেঘদূতের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা অনেকটা তাঁর নিজস্ব; প্রত্যেক দুটি মানুষের মধ্যে যে বিপুল গভীর বিরহ', (মেঘদূত ঃ ঝড়/কয়েকটি কবিতা/পৃ. ১০) অর্থাৎ দুটি মানুষের মধ্যে এতটা দূরের যন্ত্রণা সমর সেনও অনুভব করেছেন। কিন্তু তিনি রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে মেঘদূতের পৃথিবী তার বাসযোগ্য আদর্শবান—'মুখে সৌন্দর্য ভোগ ঐশ্বর্যের চিত্রলেখা—যাহাতে মনে করাইয়া দেয়, কাছে আসিতে দেয় না, আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করে, নিবৃত্তি করে না। দুটি মানুষের মধ্যে এতটা দূর।'[৫২] অন্যত্র বলেছেন—'আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে।/তুমি যদি হতে বিক্রমাদিত্য—'[৫৩]। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমকালীন যুগের ইতর কলকাকলীর হাত থেকে পরিত্রাণের প্রত্যাশায় রেবা, সিপ্রা, নির্বিন্ধ্যা নদীর তীরে অবন্তী বিদিশার সৌন্দর্য স্বর্গে প্রবেশের পথ খুঁজেছিলেন। আর সমর সেন নগর জীবনের নানা জটিল পরিস্থিতিতে নানা সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করলেন প্রেমের অ-অনির্বচনীয়ত্ব। 'মৃত্যুহীন অতীতের শেষ হাহাকার।' জীবনে প্রতিনিয়ত প্রতিমুহূর্তে যে সমস্ত শান্তি, সুখ ও সৌন্দর্যের স্বর্গোদ্যানগুলি উপনিবেশে রূপান্তরিত হচ্ছে—তার সুস্থ মুল্যাবোধগুলি নিহত হচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে স্বাধীনতা, সমর সেনের যন্ত্রণা, কান্না প্রতিকার প্রার্থনা তারই বিরুদ্ধে।

প্রেমের বিচিত্র চরিত্র রবীন্দ্রনাথ যেভাবে তাঁর সাহিত্যে চিত্রিত করেছেন তাকে সমর সেন স্বীকার-অস্বীকারের দুই পাল্লায় ওজন করে যেন তার প্রকৃত রহস্য নির্ণয় করতে চেয়েছেন। এই জাতীয় কবিতার শিরোনাম প্রায়শ রবীন্দ্রনাথ থেকেই সংগৃহীত। যেমন—চার অধ্যায় (কয়েকটি কবিতা/পৃ. ১৭), উর্বশী (কয়েকটি কবিতা/পৃ. ২১) স্বর্গ হতে বিদায় (কয়েকটি কবিতা/পৃ. ৩১), মদনভস্মের প্রার্থনা (কয়েকটি কবিতা/পৃ. ৩২) ঘরে বাইরে (গ্রহণ/পৃ. ১০), চিত্রাঙ্গদা (গ্রহণ/পৃ. ১৯) ইত্যাদি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের অমৃতময় প্রেম রূপান্তরিত হয়েছে মৃত্যুময় প্রেমে।

রবীন্দ্রনাথ প্রেমের নানান দৃষ্টিকোণের পরিচয় দিয়েছেন। প্রেমের কবিতায় 'শাজাহান' কবিতাটি অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাকে টেক্কা দিয়ে—তাঁরই রচিত উপন্যাস, 'শেষের কবিতা'র কবি নিবারণ চক্রবর্তী লেখেন 'বাসরঘর' কবিতা। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন 'বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন' বলে। আমাদের সামাজিক মন যে বিবাহোত্তর প্রেমকে শুচি সুন্দর বলে মান্য করে—বাসর ঘর থেকেই তার যাত্রা। আর গণিকালয়ের যে ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকে আমাদের মন পঙ্কিল অশুচি বলে জানে—তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

বর্ণিত বাসরঘরের মৌলিক প্রভেদ যে কিছু নেই সমর সেন তা প্রমাণ দিয়েছেন তাঁর কবিতায়। তিনি রবীন্দ্রনাথ, নিবারণ চক্রবর্তীকে টেক্কা দিয়ে লেখেন—

'তুমি কি আজ আসবে?
—নীল নীল চোখে শরীরের শেষহীন প্রশ্ন,
ভিজে ফুলের মতো নরম প্রেম—
নিশ্চয় আসব—
বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন, তাছাড়া একসঙ্গে রাত্রে শোবার
দুলর্ভ সুযোগ!'[৫৪]

এখানে 'বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন' কথা কয়টিতে ব্যঙ্গের কটূত্ব লক্ষণীয়। এই সঙ্গে মৃত্যুনীল প্রেমের মৃতদেহে চন্দনের ফোঁটাও। সমর সেন কিন্তু তাই বলে রবীন্দ্রনাথের কল্পনার যা যথার্থ সুন্দর এবং মূল্যবান তাকেও প্রত্যাখ্যান করতে পারেন নি। বাসর ঘরের সঙ্গে প্রেমের আমৃত্যু/অমলিন সম্পর্কও তিনি উল্লেখ করেছেন—'আমাদের এটুকরো প্রেম, কৃষ্ণচূড়া দিন,/এ বাসর ঘর,/শ্মশান কুরুক্ষেত্রে শকুনের কোলাহলে/মোলায়েম বাঁশির মতো।' (কয়েকটি কবিতা/নানাকথা/পৃ. ২০। দুর্যোগের কুরুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে মরণজয়ী টুকরো প্রেমটিকে এবং তার বাসর ঘরকে কবি রবীন্দ্রনাথের মতোই বাঁশির সুরে ভরে দিয়েছেন।

সমর সেনের 'ভস্ম অপমান শয্যা ছাড়ো/হে মহানগরী!' (নাগরিক/কয়েকটি কবিতা/পৃ. ২৮) উচ্চারণে আমাদের সততই মনে হয় রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া' কাব্যের 'উজ্জীবন' কবিতার কথা[৫৫] যেখানে বর্ণিত কালিদাসের 'কুমারসম্ভবে'র অকাল বসন্তে দুটি অসম বয়সী, অসম-প্রকৃতির নরনারীর মধ্যে মিলনৌৎসুক জাগাবার চেষ্টার অপরাধে রুদ্ররোষে ভস্মীভূত হয়েছিলেন মদনদেব। ভস্মশয্যার এই ইতিবৃত্তকে গ্রহণ করে সমর সেন মহানগরীর ভস্ম অপমান শয্যাটি প্রস্তুত করেছেন বললে অত্যুক্তি হয় না। 'উজ্জীবন' কবিতায় একদা কবি যেমন ভস্মীভূত পুষ্পধনুর বীরতনুতে বীর্যবান পুনরুজ্জীবন প্রার্থনা করেছেন— সমর সেনও তেমনি প্রার্থনা করেছেন নতুন জন্ম, নতুন জীবন—'জলন্ত আগুনের পাশে আমাদের প্রার্থনা,/সমাজ জীবনের. অস্পষ্ট চকিত স্বপ্ন'। তাঁর মনে একটি সমগ্র জাতির জাতীয় চেতনার অপমানকর, পরাধীন, অসাড়, অশালীন মৃতবৎ অস্তিত্বের পুনকজ্জীবনের প্রশ্নই প্রকট হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের 'স্বর্গ হইতে বিদায়' (চিত্রা/রচনাবলী, ১ম খণ্ড/জন্মশতবার্ষিকী স:/পৃঃ ৫১২) সমর সেনের হাতে হয়েছে 'স্বর্গ হতে বিদায়'। এখানেই উল্লিখিত উর্বশী, রবীন্দ্রনাথ থেকে অনুসৃত। তাছাড়া এখানের 'অমৃতের পুত্রের বুকে চিত্ত আত্মহারা/নাচে রক্তধারা' পংক্তিটির রক্তধারার নাচটি কবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথেরই কবিতার 'পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা/নাচে রক্তধারা'[৫৬] র তালে তালে। আর অমৃতের পুত্র বললেই—রবীন্দ্রনাথের পুরুষ মাত্রই 'অমৃত পুত্র' কে অভিহিত করা যেতে পারে। রবীন্দ্র কাব্য-সাহিত্যে উপনিষদের 'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'—এই বাণী বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত। এবং তিনি শান্তিনিকেতনের প্রবন্ধ মালায় লিখেছেন— 'মৃত্যুর সাক্ষ্য চারিদিকে,

অথচ মানুষ বলে উঠেছে, ওগো শোনো, তোমরা অমৃতের পুত্র, তোমরা মৃত্যুর পুত্র নও।' যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে এ আহ্বান—সাধারণ মানুষের জীবনে তা আয়ত্বে আনা দুঃসাধ্য। সেকথা মর্মে মর্মে সমর সেন জানতেন। তিনি অনুগত উত্তরাধিকারীর মতো যেখানেই চারিদিকে নৈতিক বা দৈহিক মৃত্যুর সাক্ষ্য দেখেছেন সেখানেই অমৃতের পুত্রদের স্মরণ করেছেন। একই সঙ্গে এখানে ঐতিহ্যের প্রবাহ রক্ষা এবং সে প্রবাহ যে কালের নিয়মে জীবনের বর্তমান প্রবাহ থেকে কত দূরবর্তী তার প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন কবি।

রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা' কাব্যের 'মদন ভস্মের পূর্বে' এবং 'মদন ভস্মের পরে' কবিতা দুটিতে প্রেমের যে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মূর্তরূপ লক্ষিত হয়, তা অনায়াসে সমর সেনের কাব্যে হয়েছে কুসুমের কারাগার। যদিও তিনি রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' কাব্য থেকে এই বাক্যাংশ গ্রহণ করেছেন। সেখানে আছে :

'দাও খুলে দাও, সখী, ওই বাহুপাশ
চুম্বন মদিরা আর করায়ো না পান।
কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস,
ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরান।'[৫৭]

আর সমর সেন জানিয়েছেন—'সমস্ত দিন কাটে দুঃস্বপ্নের মতো:/রাত্রে ধূসর প্রেম ঃ কুসুমের কারাগার' (মদন ভস্মের প্রার্থনা/কয়েকটি কবিতা/পৃঃ ৩২)।

সমর সেন রবীন্দ্র সাহিত্যের সুভাষিত সংগ্রহে শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়েছেন। উদ্ধার করেছেন রবীন্দ্র পংক্তিকে পুরোপুরি ক্ষেত্রবিশেষে ঐতিহ্য প্রবাহ রক্ষার তাগিদেই। আকৃতি, প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রসের ও বিপরীত ভাবনার পরিচয় হলেও কিছু ইমেজ তৈরীর ব্যাপারে তিনি রবীন্দ্রনাথের সাহায্য নিয়েছেন।

১. 'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও? (একটি প্রেমের কবিতা/কয়েকটি কবিতা/পৃঃ ১২) এবং স্বর্গ হতে বিদায়/ পৃঃ ৩১

'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও।'[৫৮]

২. 'দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার
এল তার ভেসে - আসা তারাফুল নিয়ে কালোজলে;'[৫৯]

সমর সেন—

অ. 'অন্ধকারের নিঃশব্দ নদীতে যখন ভাটা এল ভোরের দিকে, এলোমেলো দীর্ঘশ্বাসে ঠাণ্ডা হাওয়া দিল অনেক, অনেক দূর থেকে,' (শেষরাত্রে/কয়েকটি কবিতা/পৃঃ ২৩)

আ. 'দিনের ভাটার শেষে
গলিত অন্ধকারে মরামাঁঠ ধূ ধূ করে,
চরাচরে মরাদিনের ছায়া পড়ে।' (For thine is the Kingdom/গ্রহণ/পৃঃ ২৭)

৩. 'পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ;'[৬০]

সমর সেন—অ. 'আজ বহুদিনের তুষার-স্তব্ধতারপর
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।' (সন্ধ্যা ও প্রভাত/গ্রহণ/পৃঃ ১২)

আ. 'কঠিন পাহাড় মেঘ হলে। বুঝি,...।' (শেষ সন্ধ্যা/গ্রহণ/পৃঃ ৩৬)

৪. 'রথের চঞ্চল বেগ হাওয়ায় উড়ায়
আমার পুরোনো নাম।'[৬১]

সমর সেন—

এরোপ্লেনের চঞ্চল বেগ হাওয়ায় ওড়ায়
বকমুখ মন্ত্রীর নাম।' (বকধার্মিক/গ্রহণ/পৃঃ ৩২)

৫. 'পাহাড় তলিতে অন্ধকার মৃত রাক্ষসের চক্ষুকোটরের মতো;'[৬২]

সমর সেন—

'শূন্যমাঠে কোটরহীন চোখের মতো গ্যাসের আলো......।'
(ক্রিসমাস্/গ্রহণ/পৃঃ ২৮)

৬. 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই—ছোটো সে তরী'[৬৩]

সমর সেন—

'এদিকে স্থান নেই, স্থান নেই রব,
ছোট এ ফ্যাক্টরী।' (হসন্তিকা/নানা কথা/ পৃঃ ১৪)

৭. 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে
ঝলমল করে চিত্ত।'[৬৪]

সমর সেন—

'এ হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে
ঝলমল করে অনেক পার্টির চিও।' (পরিস্থিতি/নানাকথা/পৃঃ ১৬)

৮. 'কলে-পড়া জন্তুর মতন
মূর্ছায় অসাড়।'[৬৫]

সমব সেন—

'কলে বিকল মূষিকের সঙ্গে.....।' (নানাকথা/পৃঃ ৩৩)

৯ 'মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি,
হে রাখাল, বেণু তব বাজাও একাকী।।'[৬৬]

সমর সেন—

'মধ্যদিনে গান বন্ধ করে পাখি।
কারখানায় সংঘবদ্ধ জমে অনেকের ভিড়,
হাতে বিপ্লবের রাখি!' (জাতীয় সংকট/খোলাচিঠি/পৃঃ ১৭)

১০. 'রাত কত হল?
উত্তর মেলে না।'[৬৭]

সমর সেন—

'কেটেছে বিশ বছর;
রাত কত হল
এ প্রশ্নের মেলেনি উত্তর।' (উড়ো খৈ ঃ ৫/বাবুবৃত্তান্ত/পৃঃ ১৪৮)

এইভাবে দেখা যায়, সমর সেন মনে, ভাবে যারপর নাই রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করত তাঁকে—বৈপরীত্য বোঝাতে, প্রকাশ করতে উৎসুক হয়েছেন। ব্যঙ্গ-বিষাদে মুহূর্মুহূ নব উদ্দীপনার আগমনী সূচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু কবিতার শিরোনাম, কবিতা-নাটক-উপন্যাস থেকে শব্দাবলী গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথের কাছেই ঋণী থেকেছেন তিনি। এ গুলির সঙ্গে 'রবীন্দ্রনাথত্ব' এমন ভাবে জড়িত—যে এগুলি শুধুমাত্র কবিতায় আর শব্দ মাত্র থাকে নি, জীবন্ত তাৎপর্যে যেন স্পন্দিত হয়েছে। 'রক্তকরবী', 'চিত্রা,' 'বলাকা,' 'বনের পাখি', 'লাল কাঁকরের পথ', 'উর্বশী', 'সাড়ে তিনটের ঘণ্টা', 'কালের যাত্রা', 'কেতকীর গন্ধ', 'চার অধ্যায়', 'অলকা', 'স্বর্গ হতে বিদায়', 'মদন ভস্ম','ঘরে বাইরে', 'সন্ধ্যা ও প্রভাত', 'চিত্রাঙ্গদা', 'এবার ফিরাও মোরে', 'বৈশাখের মৈনাক মেঘ', 'রামগিরি', 'লাবণ্যের প্রেম', 'স্বাধীকার প্রমত্ত', 'নষ্টনীড়', 'বহুরূপী ঠাকুরদা' ইত্যাদি শিরোনাম-শব্দ বা পংক্তি ব্যবহারে সমর সেন স্বীকরণ করে নিয়েছেন সাবলীল ভাবে। আসলে পূর্বসূরীদের পংক্তি ধৃত শব্দ বা শব্দাবলীর স্মরণ মাধ্যমে কবি মূলত দুটি উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছিলেন। প্রথমত, এগুলি এমন ভাবে পেশ করতে হবে, যাতে কবিতায় বিদ্রূপাত্মক anti-climax তৈরী হতে পারে; দ্বিতীয়ত, সম-সাময়িক বাংলা কাব্যের প্রকরণে অতৃপ্ত হয়ে ঐতিহ্য খুঁজতে সচেষ্ট হওয়া এবং দেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করা। প্রসঙ্গত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য স্মরণীয় : 'বিষ্ণু দে, সমর সেন ও চঞ্চল কুমারের অধিকাংশ কবিতাতে অন্যান্য কবিদের, বিশেষত, রবীন্দ্রনাথের পদের উদ্ধৃতি আছে, এবং সেগুলো সম্পূর্ণ নতুন ধরনের পদের সঙ্গে গলাগলি করে দাঁড়িয়ে থাকে। উদ্দেশ্য অবশ্য নতুন পুরাতনের বৈপরীত্যবোধ জাগান। উদ্ধারটা স্মৃতির এবং বোধ জাগান চেতনার কাজ। দুটি কাজের সমন্বয়-সাধন, দুই রাজ্যে অবাধ বিচরণ আজকালকার স্বাভাবিক চিত্ত বৃত্তি, অতএব কাব্য প্রয়াসের অধীন।'[৬৮]

সমর সেন রবীন্দ্রনাথকে একটি ব্যক্তিমাত্র-একটি কবিমাত্র জ্ঞান না করে জাতীয় সংস্কৃতির সৌধ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন—তাই জাতীয় চেতনার সংকট ও শুভাশুভের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথকে প্রতিমুহূর্তের পরিবর্তিত অভিজ্ঞতার নিরিখে দর যাচাই করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিশ শতাব্দীর সাধারণ মানুষের প্রভেদ স্পষ্ট কথায় বোঝাতে গিয়ে ২২শে শ্রাবণ, কবির মৃত্যুদিনের কথা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঘটনাটিকে 'মহৎ লোকসান' বলে মনে হয়েছিল তাঁর। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন—

'শ্রাবণের কলকাতায়
অনেকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ায়,

আজ ২২শে শ্রাবণ।
মহৎ লোকসান লোকে স্বচ্ছন্দে ভোলে।.......
আমরা নোংরা মানুষ, দেশে-দেশে বিকার ছড়ায়,
মহৎ মানুষেরা একে-একে নিরুদ্দেশ যাত্রী,
বর্বর নখরে ললিত প্রাণ ধীরে-ধীরে ছিন্ন করে
শ্মশানের পাশে জেগে থাকে নরান্তক, নির্বিকার কাল,
মিশরের মরুভূমিতে স্থবির মূর্তিব মতো।'[৬৯]

—এই যন্ত্রণা থেকেই সমর সেনের রবীন্দ্র-আনুকূল্য ও প্রতিকূলতার জন্ম।

'চিত্রাঙ্গদা' (গ্রহণ/পৃঃ ১৯) কবিতায় সমর সেন প্রথম লাইনেই—'শোনো শিশুর কান্নার মতো পাখির শব্দ' বলে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কেও স্মরণ করেছেন। কবির বক্তব্য চিত্রাঙ্গদার জীবনে কোনও প্রকৃত জননীত্ব নেই, অথচ ধার করা জননীত্ব রয়েছে। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের চিত্রাঙ্গদা, রাজলক্ষ্মী পণ্যা নারী হয়েও শ্রীকান্তের প্রেয়সী ও বঙ্কুর জননী। কিন্তু আমাদের কবির নাগরিক প্রেমের পৃথিবী কেবলমাত্র গণিকা প্রেমের মতো অল্পায়ু। তার না আছে মহনীয়তা না আছে বীর্য। রাজলক্ষ্মীকে স্মরণ করতেই যেন সমর সেন শরৎচন্দ্রের রচনা পুনর্লিখন করেছেন। পাখির শব্দের তাৎপর্যে শিশু কান্নার কথা জানিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র একদা : '........ সে যে মানব শিশু নয়, শকুন শিশু অন্ধকারে মা কে দেখিতে না পাইয়া কাঁদিতেছে, না জানিলে কাহারো সাধ্য নাই, একথা ঠাহর করিয়া বলে।'[৭০]

বিষ্ণু দে

সমসাময়িক কবিদের মধ্যে বিষ্ণু দের উপস্থিতি সমর সেনের কাব্যে নেহাৎ মন্দ নয়। আবার কোনো কোনো সময় সমর সেনের উপস্থিতিও বিষ্ণু দের কাব্যে বর্তমান। প্রসঙ্গত সমর সেনের সঙ্গে সুমিতা চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকারের কথা উল্লেখ করতে হয়। সুমিতা চক্রবর্তীর প্রশ্নের উত্তরে সমরবাবু জানিয়েছেন বিষ্ণু দের কবিতা তাঁর ভালো লাগে। সুমিতা চক্রবর্তী জিজ্ঞেস করেছেন : 'একজন সমালোচকের মতে আপনার ও বিষ্ণু দের দুজনেরই লেখায় একটা সময়ে পরস্পরের প্রভাব পড়েছিল। কথাটা কি ঠিক? উত্তর : ঠিকই মনে হয়।'[৭১] অন্যত্র আবার সমর সেন বলেছেন—'বিষ্ণুবাবুর একটি মহৎগুণ এই যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নিরপেক্ষ। ..... তাঁর সাম্প্রতিক লেখায় আমাদের আশা নিরাশা ও বিক্ষোভ সংযত ছন্দে প্রকাশ পেয়েছে এবং এসবের পিছনে গভীর সূত্রের সন্ধান তিনি করেছেন। বাস্তবজীবনে দেশ বিদেশের কাব্যের প্রতিচ্ছবির সন্ধান কবি কিশোরের থেমেছে।'[৭২]

সমর সেন কথিত বিষ্ণু দের এই বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর নিজের ক্ষেত্রেও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তিনিও তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ চিত্রণে কবিতায় নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন। ঐতিহ্য খুঁজতে বাংলা কাব্যের প্রকরণে ঈশ্বর গুপ্ত পর্যন্ত্য অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু অচিরেই বুঝেছিলেন এটা একমাত্র পথ নয়। বিদেশী কাব্যের প্রকরণে তাঁরও

ঐতিহ্য অনুসন্ধান সম্পূর্ণ হয়। সমালোচক অমলেন্দু বসুর মতে—'বিদ্রূপাত্মক কাব্যরচনা কালেই সমর সেন পারিপার্শ্বিক ও সমসাময়িক বাংলা কাব্যের প্রকরণে অতৃপ্ত হয়ে ঐতিহ্য খুঁজতে সচেষ্ট হলেন এবং বিষ্ণু দে'র মতোই মনে করলেন সমুচিত ঐতিহ্য মিলবে ঈশ্বর গুপ্তে। .... দুজন কবিরই ঐতিহ্য বিচার ত্রুটিপূর্ণ এবং যদিও তাঁরা কেউই এ-বিষয়ে পরে আলোচনা করেননি (ততদিনে তাঁরা নিজেরাই ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন)। আমার ধারণা তাঁরা অচিরেই বুঝতে পেরেছিলেন যে ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্বহীন চালাক পদ্যগুলিতে সৃজনী কাব্যের ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।'[৭৩]

অর্থাৎ বিষ্ণু দে এবং সমর সেন মনোভঙ্গির দিক দিয়ে যে কাছাকাছি ছিলেন, তাতে আর সন্দেহ থাকে না। এর ফলে উভয়ের কাব্য-কবিতায় পরস্পরের উপস্থিতি সমালোচকরা উপলব্ধি করেছিলেন। অনেক বিষয়েই তাঁরা সহমনোভাব পোষণ করতেন। বিদ্রূপের ভঙ্গিমা তো এক ছিলই। পরন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতা, প্রাচীন কবিতা-গান ইত্যাদি প্রয়োগ মাধ্যমে রাবীন্দ্রিক মনোভাব ও প্রাচীন মনোভাবকে বর্তমানের সঙ্গে মূল্যায়ন করেন। বিদ্রূপের ভঙ্গিমায় নাগরিক উপকরণ গ্রহণেও উভয়ে এক। এ সমস্ত দেখেই বিনয় ঘোষ একদা মন্তব্য করেছেন : '....... বিষ্ণু দে ও সমর সেন-এর কাব্যালোচনার সময় কে কার কার্বণ কপি বোঝবার উপায় নেই। আঙ্গিকের দিক থেকে দুজনের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও ভাব ও বিদ্রূপ-প্রকাশের ভঙ্গিমার মধ্যে দুজনেরই অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। .... 'চোরাবালি'র কবি ও 'কয়েকটি কবিতা' ও 'গ্রহণ'-এর কবি সমর সেন-এর অনেক দিক থেকে মিল আছে।'[৭৪]

এই মিল খুঁজতে দেখি সমর সেনের কবিতায় বিষ্ণু দের অনেক কাব্যপংক্তি-শব্দ অনায়াসে জায়গা করে নিয়েছে।

১. 'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনতে কি পাও
উদ্দাম উধাও
ট্রেন এল বলে হাওড়ায়।'[৭৫]

রবীন্দ্রনাথের 'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও'—পংক্তিটিকে বিষ্ণু দে যেভাবে ব্যবহার করেছেন সমর সেন ঠিক সেভাবে ব্যবহার না করলেও আসল উদ্দেশ্য পরিস্ফুটনে উভয়েই এক। সমর সেনও জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের কাল শেষ হয়েছে। তাঁদের কাল নতুন দিনের আশাভঙ্গ আর স্বপ্ন ভঙ্গ নিয়ে উপস্থিত।

'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও।
রাত্রে, ধূসর সমুদ্র থেকে হাহাকার আসে,'
(একটি প্রেমের কবিতা/কয়েকটি কবিতা পৃঃ ১২)

২. বিষ্ণু দে—

'এত লোককে গোপন সঞ্চারী
জীবন যে পথে বসিয়েছে জানিনি মানিনি আগে,
পিঁপড়ের সারি

গৌড়জনে ভিড়াক্রান্ত মধুচক্র হে শহর,
হে শহর স্বপ্ন ভরাতুর'।[৭৬]

সমর সেন—

'কত ধূসর চোখে অশ্লীল, নাগরিক আনন্দ,
পিচের পথে অগণিত মানুষের ক্লান্ত পদক্ষেপ।'
(ভোরের কলকাতা/কয়েকটি কবিতা/পৃঃ ২৪)

৩. বিষ্ণু দে—

'নামল সন্ধ্যা,
সূর্যদেব, এখানে নামল সন্ধ্যা,
পিলু বারোয়ার সন্ধ্যা,
কবিতার সন্ধ্যা।'[৭৭]

সমর সেন —

'সূর্য অস্ত গেল, সূর্য দেব কোন দেশে —
এখানে সন্ধ্যা নামল,
শীতের আকাশে অন্ধকার ঝলছে শূকরের চামড়ার মতো,'
(মৃত্যু/কয়েকটি কবিতা/পৃঃ২৬)

৪. বিষ্ণু দে —

'তোমার দীর্ঘ সুঠাম শরীরে, পাৎলা ঠোঁটে,
লালের আমেজে শাড়ি জড়ানোর হালকা ঢঙে,'[৭৮]

সমর সেন —

'আর কত লাল শাড়ী আর নরম বুক, আর টেরিকাটা মসৃণ মানুষ
(নাগরিক/কয়েকটি কবিতা/পৃঃ২৯)

৫. বিষ্ণু দে —

'ট্রামের বাসের কারের ফেরিওয়ালার রলরোলে
এই ক্লাইভ ডালহৌসি লায়নস্ রেঞ্জের ডেলিপ্যাসেঞ্জারদের
ক্লান্ত নীরবতায় ....।[৭৯]

সমর সেন —

'যদি কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে বসন্ত বাতাসে
— স্কুল আর কলেজ হলো শেষ, ক্লাইভ স্ট্রিট জনহীন,
দশটা-পাঁচটার দীর্ঘশ্বাস গিয়েছে থেমে,'[৮০]

৬. বিষ্ণু দে —

'চাঁদের আলোয় চাঁচর বালির চড়া।'[৮১]

সমর সেন —

'রাত্রে, চাঁদের আলোয় শূন্য মরুভূমি জ্বলে'

(মরুভূমিতে মৃত্যু/কয়েকটি কবিতা/পৃঃ ৩০)

৭. বিষ্ণু দে —

'পশ্চাতে ধায় মরণ-চাঁদের আলো
দিগন্ত ফেণা, ...।'[৮২]

সমর সেন—

'আর দিগন্তে জ্বলন্ত চাঁদ ওঠে
হে শহর হে ধূসর শহর।'

(স্বর্গ হতে বিদায়/কয়েকটি কবিতা/পৃঃ ৩১)

৮. বিষ্ণু দে —

'আমি নহি পুরুরবা। হে উর্বশী,
ক্ষণিকের মর অলকায়
ইন্দ্রিয়ের হর্ষে, জানো, গড়ে তুলি আমার ভুবন?'[৮৩]

সমর সেন —

'আমি নহি পুরুরবা হে উর্বশী'
মোটরে আর বারে
আর রবিবারে ডায়মণ্ডহারবারে
কয়েক টাকায় কয়েক প্রহরের আমার প্রেম',

(স্বর্গ হতে বিদায়/কয়েকটি কবিতা/পৃঃ ৩১)

৯. বিষ্ণু দে —

'জলস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান,'[৮৪]

সমর সেন —

'জীবিকার স্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন,
আশেপাশে ব্যর্থতায় চিরকাল মৃত্যু আসে আর যায়।'

(সন্ধ্যা ও প্রভাত/গ্রহণ/পৃঃ ১২)

বলা অনাবশ্যক, রবীন্দ্রনাথের 'কালো স্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমানে'র সংশোধিত রূপ এগুলি।

১০. বিষ্ণু দে —

'সিনেমা, দোকান, কাফে, অলিগলি মোড়ে
লক্ষ লক্ষ রক্তবীজ পাণ্ডুরোগী ঘোরে
নষ্টদৈব ছিন্ন ভিন্ন একতা আতুর —'[৮৫]

সমর সেন —

অ. 'বক্র দেহ নায়কের দল
বিগলিত বিষণ্ণতায় ক্ষুরধার স্বপ্ন দেখে;
ময়দানে নষ্টনীড় মানুষের দল।
ফরাসি ছবির আমন্ত্রণে,'

(সন্ধ্যা ও প্রভাত/পৃঃ১২)

আ. 'চায়ের দোকানে বিনষ্ট দল,
শুধু মনান্তরের কর্কশ কোলাহল।'

(কয়েকটি দিন/গ্রহণ/পৃঃ ১৩)

১১. বিষ্ণু দে —

'কিন্তু আমি যে শ্রান্ত বড়ই ক্লান্ত বড়,
কার্নিভাল্ এ জীবনে আমার ঘুম পায় আজ।'[৮৬]

সমর সেন —

'কার্নিভাল শুরু হলো, রেস খেলা শেষ,
কঙ্কালবর্ণ কুয়াশায় দেখো চেয়েছে নগর।
এখনো আলোছায়া দোলে কারো-কারো চোখে,'

(ক্রিসমাস/গ্রহণ/পৃঃ২৮)

১২. বিষ্ণু দে —

'মরীয়া লিবিডো আজ কাউন্সিলের প্রবল গলায়
ওড়েনি, ওড়েনি আজো কঠিন সঙ্গীন
সর্বকাম পরিত্যাগী কর্পোরেশনের ব্যূহদ্বারে।'[৮৭]

সমর সেন —

'পথে ঘাটে রৌদ্রের করাল উত্তাপ
নাসারন্ধ্রে দুর্গন্ধ, স্তূপীকৃত জঞ্জাল,
শুনছি ধর্মঘটে করপোরেশন বেহাল',

(ব্রতচারী/নানা কথা/পৃঃ ১৫)

১৩. বিষ্ণু দে —

'স্মৃতি তার কদম্ব ছায়ায়, যমুনার নীল জলে বৃথা মাথা কোটে।
তবু এই শিথিল প্রহরে
নূপুর মঞ্জীরে ঘোর শঙ্খ রবে মেতে ওঠে কার ধ্বনি!'[৮৮]

সমর সেন —

'বাঁশি কি স্তব্ধ একেবারে,
আর যাবে না যমুনার জলে,

নীল চোখে, নীল মেঘলা শরীরে,
বিলম্বিত পদক্ষেপে, উদ্ধত যৌবনে?'
(ঘরোয়া/নানা কথা/পৃঃ ১৮)

১৪. বিষ্ণু দে —
'দুর্ভিক্ষ এসেছে রুদ্র মড়কের রাসভ বাহনে।
ঠগে ঠগে গাঁ উজাড়, বর্গী এল শ্রাবণ প্লাবনে।'[৮৯]

সমর সেন —
'দুর্ভিক্ষ লেগেছে দেশে, তাই বর্গিরা বাড়ে;
দুঃস্বপ্নের ষড়যন্ত্র ছিন্ন করে
শৌখিন সৌন্দর্য দেখি বারে বারে আসে
ধান ক্ষেতে, অমসৃণ বিস্তীর্ণ বালির স্তূপে,
কখনো-বা আদিগন্ত বৃষ্টির, বন্যার জলে।'
(সারণের গান/নানাকথা/পৃঃ২২)

১৫. বিষ্ণু দে —
'দৈনিকে দেখ কাজ খালি কোথা ক'ষে,'[৯০]

সমর সেন —
'চাকরি খালির বিজ্ঞাপনে বেকারের সকাল শুরু,'
(নানা কথা/পৃঃ ৩০)

১৬. বিষ্ণু দে —
'কফির পেয়ালা হাতে,
শহরের স্তব্ধ প্রাতে,
বিস্বাদ হৃদয়ে
বিষণ্ণ আলোয় ব'সে বিহ্বল রাত্রির
স্মৃতি দেখি আর ভাবি মনে;'[৯১]

সমর সেন —
'আজ চলুন, শহরে বেরোই,
এখানকার সন্ধ্যা দেখুন,
কাফির রং,
কোন খোঁয়ারি দেবতার পানীয় যেন।'
(নানাকথা/পৃঃ ৩২)

১৭. বিষ্ণু দে —
'অশ্বের খুরে, লাঙলের ফলা টেনে,
হাতুড়ির ঘায়ে, কাস্তের বাঁকা শানে,

ভাটিয়ালী গানে, কপিল মুনির দ্বীপে;
কলিঙ্গে আর কঙ্কনে গুর্জরে
চম্পা, তোমার সাত ভাই গান করে।'[৯২]

সমর সেন —
'তাই সক্রিয় আশা মৃত্যুহীন জাগে অনেকের মনে;
অপরের শস্যলোভী, পরজীবী পঙ্গপাল
পিষ্ট হবে হাতুড়িতে, ছিন্ন হবে কাস্তেতে।'
(নানাকথা/পৃঃ ৩৪)

১৮. বিষ্ণু দে —
'বর্মা থেকে ফেরার কানাকানি
করছে, যাব ওয়ার্ধা একেবারে।'[৯৩]

সমর সেন —
'মহাত্মা স্তব্ধপ্রায়, ওয়ার্ধায় উর্ধ্ববাহু;'
(বসন্ত/নানাকথা/পৃঃ ৩৫)

১৯. বিষ্ণু দে —
'নদীতে জোয়ার খেয়া পারাপার
বন্ধ হয়েছে, হাট লোপাট।
শুধু আছে মেঘে বজ্র আবেগ
আকাশ ছড়ানো বিজন বাটে।'[৯৪]

সমর সেন —
'জল আনতে কেউ যায় না ঘাটে
কি সবজি কিনতে শূন্য হাটে।
দুষমণেরা হাঁটে অনেক ঠাটে।
শকুনের ছায়া পড়েছে মাঠে।'
(পঞ্চমবাহিনী/নানাকথা/পৃঃ ৩৭)

২০. বিষ্ণু দে —
'দ্বৈতাদ্বৈতে কম্বু রেখায় প্রাণের কাজের
ইতিহাস চলে অমোঘ আবেগে,.............।'[৯৫]

সমর সেন —
'জানি না অন্তহীন বৃত্তে কি কম্বু রেখায়।
স্তব্ধতা সংহত হয় গুমোট প্রতীক্ষায়।'
(ইতিহাস/খোলা চিঠি/পৃঃ ৮)

২১. বিষ্ণু দে —

'অমর প্রাণের অবজ্ঞা হেনে আমাদের জয়হাস্য,
ভাঙা ছুরি জানি অকর্মন্য, অসহায় হাতিয়ার,
তবু জানি এই দধীচির হাড়ে এই ভাঙা হাতিয়ারে
ইতিহাসে আজ পাতা কেটে দেব, লিখব প্রাণের ভাষ্য।'[৯৬]

সমর সেন —

'..........এ দেশ যাদের,
যারা লাঙলে তিলেতিলে সোনা ফলায়,
অন্নের প্রাণের কাঙাল,
নয়নাভিরাম নীল মেঘ দেখে যারা ফসলের দিন গোনে,
কারখানায় কলে যারা দধীচির হাড়ে সভ্যতার বনিয়াদ গড়ে
শহরে শহরে।'

(খোলা চিঠি/পৃঃ ১২)

২২. বিষ্ণু দে —

'হেমন্তের কুষ্ঠরোগে গতপত্র অরণ্যের মতো।'[৯৭]

সমর সেন —

'ধুলো ওড়ে, নেড়া বট মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে
গতপত্র ক্লান্ত ভঙ্গিতে।'

(জন্মদিনে/সংকলিত সমর সেন/পৃঃ ১১)

অনুরূপভাবে কিছু শব্দ, যেমন — 'কবি কিশোর', 'সোনালি ঈগল,' 'পরমা গতি,' 'আকবরশাহী,' ইত্যাদি বিষ্ণু দের কাব্য থেকে সরাসরি অপরিবর্তভাবে সমর সেনের কাব্যে এসেছে। কোথাও বা পরিবর্তিত হয়ে 'ইস্পাতের ঈগল,' 'পরমা যতি,' 'নোকর শাহী' ইত্যাদি রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

সমর সেন প্রাচীন ঐতিহ্য এবং দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে নাড়ীর টান অব্যাহত রাখার সহজ কৌশল হিসেবে প্রচলিত বাগ্‌বিধি বা প্রবচনের প্রয়োগেও নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। পুরাণ থেকে, ইতিহাস থেকে, লৌকিক ছড়া বা কাহিনী থেকে চ্যুত প্রবাদ-প্রবচনের সংগ্রহটি সমর সেনের কবিতায় রীতিমতো সমৃদ্ধ। উপযুক্ত মুহূর্তে, উপযুক্ত স্থানে এগুলি নিয়ম নিষ্ঠভাবে অনুসৃত। কখনো কখনো কবি সংশোধিত রূপেও এদের ব্যবহার ঘটিয়েছেন।

'অরণ্যে রোদন' (গ্রহণ/পৃঃ ১১), 'পিরীতি বালুর বাঁধ < বড়োর পিরীতি বালুর বাঁধ' (গ্রহণ/পৃঃ ১৯), 'বিধি হলে বাম' < বিধিবাম (গ্রহণ/পৃঃ ২১), 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' (গ্রহণ/পৃঃ ২১), 'সবার উপরে আমিই সত্য তার উপরে নেই' < সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই, (গ্রহণ/পৃঃ ২৮), 'পাকা ধানে মই'(গ্রহণ/পৃঃ

৩১), 'দিনগত পাপক্ষয়' (নানা কথা/পৃঃ ১৩), 'ধামাধরা' (নানা কথা/পৃঃ ১৬), 'পাণ্ডব বর্জিত এ দেশ'< পাণ্ডব বর্জিত দেশ (নানা কথা/পৃঃ২১), 'হাট নষ্ট' (নানা কথা/পৃঃ ২১), 'ঘোর কলি' (নানা কথা/পৃঃ ২২), 'ডালভাঙা ক্রোশ' (নানা কথা/পৃঃ ২৮), 'ঘানি টানা' (নানা কথা/পৃঃ ২৭), 'ঘুঘু ডাকা' (নানা কথা/পৃঃ ২৮), 'নিজের নাক কেটে লোকের যাত্রাভঙ্গ' < নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ, 'কথায় চিঁড়ে ভেজায়' < কথায় চিঁড়ে ভেজান, 'লপেটা চাল' (নানা কথা/পৃঃ ৩৩), 'গাঁট কাটা গুণ্ডা' (নানা কথা/পৃঃ ৩৬), 'বিষে বিষ অক্ষয়' < বিষে বিষক্ষয় (নানা কথা/পৃঃ ৪০), 'অনেক ঘাটের জল খেয়ে' < অনেক ঘাটের জল খাওয়া (নানা কথা/পৃঃ ৫০), 'কূপমণ্ডুক' (তিন পুরুষ/পৃঃ ৮), 'সবে ধন নীলমণি' (তিন পুরুষ/পৃঃ ১৯), 'বকধার্মিক' (তিন পুরুষ/পৃঃ ২১), 'ঘুণ ধরা আমাদের হাড়'< ঘুণ ধরা হাড় (তিন পুরুষ/পৃঃ ২১), 'দু নৌকায় স্বচ্ছন্দে পা' < দু নৌকায় পা (তিন পুরুষ/পৃঃ ২৪), 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই' (তিন পুরুষ/পৃঃ ২৬) ইত্যাদি।

পাশ্চাত্য ঐতিহ্য ও সমর সেন

পৌরাণিক কাহিনী থেকে, সাহিত্যের ইতিহাসের পুরোনো কবিদের কাব্য থেকে এবং লোক প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচন সমূহ থেকে— নানা অবসরে নানা চরিত্র-চিত্র সংগ্রহের মধ্য দিয়ে যেমন সমর সেন দেশের লোক জীবনের সঙ্গে সংযোগ রেখেছেন, তেমনি বিদগ্ধ মানুষের জগৎকে ছুঁয়ে থেকেছেন পশ্চিমী ভাবনার রসদ যোগান দিয়ে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ত্রিশের দশকে বাংলা কাব্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং তরুণ প্রতিষ্ঠা-প্রত্যাশী কবিরা-প্রায় প্রত্যেকেই কম বেশী পাশ্চাত্য কবিদের কাব্যাদর্শে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই পাশ্চাত্য কবিদের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করেছেন ঃ 'এলিয়ট অডেন প্রভৃতি আধুনিক ইংরেজ কবির মনে বর্তমান কালের দুর্যোগের যে আঘাত লেগেছে সেটা সত্য এবং প্রচণ্ড। সেই সংঘাতে চিন্তার তরঙ্গ উঠে আগেকার কালের অভ্যস্ত ধারার কাঠামো ভেঙ্গে ফেলেছে। ভঙ্গী বদল হয়েছে কিন্তু তাঁদের রচনায় এ যুগের বাণী উঠেছে জেগে কতক স্পষ্ট রূপ নিয়ে কতক অস্পষ্ট ব্যঞ্জনায়। তাঁরা যথার্থ কবি এই জন্যে বাণী তাঁদের মনে আলোড়িত হয়ে উঠলে সেটা ব্যক্ত না করে থাকতে পারেন না বলেই লেখেন।'[৯৮] এই সূত্রেই বলতে হয় পাশ্চাত্য কাব্যের প্রভাবকে আত্মসাৎ করে বাঙালী কবিরা নিজেদের কাব্যের পুষ্টিসাধন করেছেন। এটা কোনো দোষ নয়। ইংরেজি সাহিত্য ও ভাষার কৃতী ছাত্র, কবি সমর সেনও তাঁর কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাবকে স্বীকরণ করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর নিজের মন্তব্য :

> 'ভারতীয়দের মধ্যে বাঙালি প্রথম বিদেশী ভাষার সাহায্যে বিদেশী শিক্ষা পায়, কিন্তু আমাদের সাহিত্যের প্রাণধারা জাগ্রত ছিল বলে ভাবের সমন্বয় সম্ভব হয়। মাইকেল মধুসূদনের অসাধারণ কাব্য এ সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে

> সেকালের শিক্ষা আমাদের মনে অনেক আজগুবি জিনিসের সৃষ্টি বরাবর করে চলেছে, এবং অনেক সময়ে আমাদের চিন্তাধারায়, আমাদের ব্যবহারে একটা নিরালম্ব, শূন্যজীবী ভাব এনেছে। ক্রান্তিকালে এ ভাবটা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। মেকী মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রতিভাবানেরা প্রতিবাদ করেছেন, কিন্তু বিদেশী ভাব গ্রহণে তাঁরা কুণ্ঠিত বোধ করেন নি, কারণ সাহিত্যের জনযুদ্ধে বয়কট আন্দোলন বোধ হয় চলে না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বিদেশী প্রভাবের অভাব নেই। তিনি নিজ বলে পরকে আপন করেছেন, একটি জাতির কবিতা সৃষ্টি করে গিয়েছেন।'[৯৯]

অনুরূপভাবে, এই পাশ্চাত্য প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ কবিরা আপন প্রবন্ধে স্বীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁরা স্বাগত জানিয়েছেন পাশ্চাত্য কবিদের। তাঁদের ব্যক্তিগত প্রবন্ধে আবার ইংরেজ কবি, টি. এস. এলিয়ট বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর কবিতা কেন্দ্রিক আলোচনায় এই এলিয়ট সম্পর্কে জানিয়েছেন যে, ১. কাব্য রচনার জন্যে বুদ্ধি-বিদ্যা, শিক্ষা-দীক্ষা, সাধনা-সংযমের প্রয়োজন। ২. সম্প্রসারণই কবির লক্ষ্য হওয়া উচিত। ৩. কাব্যের ব্রত উদ্‌বোধন, পাঠক চৈতন্যের উদ্‌বোধন। ৪. কাব্য দর্শনের মূলকথা হল—মানব মস্তিষ্কের সেই চিন্তা শক্তি, যার চেষ্টা বিসংবাদ ঘোচায়, যার অধ্যবসায় 'বচন' বিরোধের মধ্যে ন্যায় সঙ্গতি আনে। ৫. প্রবহমান ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজস্ব প্রণালীর সংযোগ সাধনাই কাব্য রচনার আদর্শ হওয়া উচিত। ৬. বিষয় নির্বাচনে কবির স্বাধীনতা যদিও অনন্ত, তবু বিষয় বৈচিত্র্যের সঙ্গে কবিতার মৌলিকতা বা সাফল্য বিজড়িত নয়। ৭. কবিতা চিত্রময় হয়ে উঠবে এবং প্রতীকের ব্যবহারও বাঞ্ছিত (এ প্রসঙ্গে মালার্মের কথা উল্লেখিত)। ৮. কবি নিজস্ব কাব্যাদর্শ তুলে ধরবেন কাব্য চর্চার মধ্য দিয়ে। —এই বৈশিষ্ট্যগুলি এলিয়টে বর্তমান। সেই সঙ্গে এখানে আধুনিক কালের পরিবর্তিত জীবন বোধের উপরও জোর দিয়েছেন। এমনকি, চলমান জীবন থেকে আহৃত নানা উপকরণে সমৃদ্ধ চিত্রকল্প ও প্রতীক নির্মাণের অনবদ্য দক্ষতায় এলিয়টের কবিতা শিক্ষিত পাঠকদের তীব্রভাবে আকর্ষণ করেছে।[১০০]

এলিয়ট সম্পর্কে বাঙালি কবিদের মধ্যে বিষ্ণু দের দৃষ্টিভঙ্গিটি হ'ল এরকম— 'এলিয়টের কাছে বাংলা লেখকদের ঋণ গ্রহণ মুখ্যত আত্ম-সচেতনতার ক্ষেত্রে। আত্মসচেতনতা হয়ে উঠল কবিমার্গে প্রত্যক্ষ সত্তাসম্পন্ন। ঋণের অন্যান্য দিক এরই জ্ঞাতি সম্পর্কীয়, যথা বিশেষ কবিতা ভালো কাব্য হয় তখনই যখন তা বিশেষ একটি ভালো কবিতাও বটে। সাহিত্যের ইতিহাস যে স্বকীয় রচনায় ও তার বিবেচনায় প্রাণবান ব্যাপার, সে বোধও এলিয়টের সাহায্যে তীব্র হল।'[১০১]

এই এলিয়ট সম্পর্কে সমানভাবে আগ্রহশীল ছিলেন সমর সেনও। তাঁর কণ্ঠ প্রায়শই উচ্চকিত। 'বাংলার অতি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তখন ইয়েট্‌স্‌, এলিয়ট, পাউণ্ডের প্রভাব। বিশেষ করে এলিয়টের কবিতা ও গদ্য রচনাবলীর। 'শুদ্ধ' কবি হিসেবে ইয়েট্‌স্‌কে

খাতির করতেন সুধীনবাবু। আমার বেশী অনুরাগ ছিল এলিয়টের প্রতি। 'Poetry is not a turning loose of emotion' কথাটি এখনো মনে পড়ে বাংলা কবিতা পড়লে।'[১০২] অন্যত্র আবার বলেছেন—'আমাদের বখাটে generation এর শ্রেষ্ঠ কবি এলিয়ট।'[১০৩]

মানব স্বভাবের ধর্মই এই যে, যাকে ভালো লাগে, তার প্রসঙ্গতার কথা জীবনের নানা প্রহরে ও অবসরে উত্থাপন এবং আলোচনা। এলিয়টের প্রতি সমর সেনের ভালো লাগা সম্পর্কেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাঁর অল্প বয়েসের ভাবনা-চিন্তায়, চিঠিপত্রে এর চিহ্ন বর্তমান, বি. বি. সি.-তে এলিয়টের কোনো বক্তৃতা বা কবিতা পড়ার খবর জানলে আগ্রহভরে তিনি সেটা অগ্রিম জানাতেন তাঁর প্রিয়-পরিচিতজনদের। মন্তব্য করতেন এলিয়টের আবৃত্তির ধরন ইত্যাদির প্রসঙ্গ তুলে। লক্ষ্য করতেন—বিষ্ণু দে অপেক্ষা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের আবৃত্তির সঙ্গে এলিয়টের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য কতখানি। আবার প্রগতিপন্থী কোনো কবিতা সংকলন পড়ে হতাশাগ্রস্ত মন্তব্য করেন 'দ্য রক'-এর কোরাস থেকে উদ্ধৃত 'waste and void, waste and vo!' শব্দাবলীর মাধ্যমে। এলিয়টের কাব্যানুভূতির প্রতিক্রিয়া সমর সেনের উপলব্ধিতে সতত উপস্থিত ছিল। এলিয়টের মতন তিনিও মনে করতেন—আবেগের অসংযম, বাধাবন্ধনহীন প্রকাশই কবিতা হয় না। এই অর্থে তাঁর ব্যক্তিত্বকে ব্যক্ত করেন না কবি। ব্যক্তিত্ব অর্থে আবার তিনি আবেগ ও অনুভূতিকে বোঝাতে চাননি। পক্ষান্তরে তাদের আতিশয্যের কথা বুঝিয়েছেন। 'Poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion; it is not the expression of personality, but an escape from personality.' [১০৪]

সমর সেন নাগরিক জীবনকে দেখার মতন চোখ, বোঝার মতন মন তৈরী করেছিলেন এলিয়টের কবিতা অনুসরণ করে বললে ভুল হয় না। যদিও তিনি স্বীকরণ করে নিয়েছিলেন। শহর জীবনের সমস্ত বিকার, বিক্ষোভ, ক্লান্তি, যৌন অনাচার, নিঃসঙ্গতাকে নিপুণভাবে ছবির পর ছবি সাজিয়ে যেভাবে ফুটিয়ে তুলে ছিলেন—খুব স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে এলিয়টের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। এলিয়টের 'প্রফ্রুক', 'পোর্ট্রেট' বা 'প্রোলগ'-এর কবিতার ধোঁয়া-ধূলো-কুয়াশা মণ্ডিত হলুদ রঙে ভরে থাকার মতনই তাঁর কবিতা।

> 'ম্লান হয়ে এল রুমালে
> ইভিনিং-ইন-প্যারিসের গন্ধ—
> হে শহর হে ধূসর শহর!
> কালিঘাট ব্রিজের উপরে কখনো কি শুনতে পাও
> লম্পটের পদধ্বনি
> কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
> হে শহর হে ধূসর শহর!
>
> মোটরে আর বারে

আর রবিবারে ডায়মণ্ডহারবারে
কয়েক টাকায় কয়েক প্রহরের আমার প্রেম,'
(স্বর্গ হতে বিদায়/কয়েকটি কবিতা/পৃঃ ৩১)

এলিয়েটের 'East Coker' কবিতার শেষ পংক্তি '........... .. In my end is my begining'[১০৫] -এর গতিকে সমর সেন রবীন্দ্রনাথের 'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও' পংক্তিতে পরিবর্তিত করেছেন। এবং 'হে শহর হে ধূসর শহর' ধূয়া পদটিও এলিয়টেরই 'O city city'-র মতন আবর্তন ঘটিয়ে উচ্চারণ করেছেন তিনি। এই সঙ্গে এলিয়টের 'A crowd flowed over London Bridge......'[১০৬] অতি অনায়াসেই হয়েছে 'কালিঘাট ব্রিজের উপর ....'। আবার

'To luncheon at the Canon Street Hotel
Followed by a weekend at the Metropole.'[১০৭]

অক্লেশে সমর সেনের হাতে হয়েছে—'মোটরে আর বারে/আর রবিবারে ডায়মণ্ডহারবারে/কয়েক টাকায় কয়েক প্রহরের আমার প্রেম'।

সমর সেন শুধুমাত্র এলিয়টের কাব্য পংক্তি উচ্চারণ করেই ক্ষান্ত হননি সেই সঙ্গে তিনি এলিয়টের 'Objective correlative' রীতিটিকেও নির্দ্বিধায় আত্মসাৎ করেছেন। নানান বিরোধী চিত্রকল্প, নানা এলোমেলো ভাবনা সহকারে এই 'Objective correlative' রীতি বা বিষয়ীগত অনুষঙ্গগুলির সুন্দর প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। বৈপরীত্য প্রদর্শনকালেও কবি এক সাদৃশ্যকে খুঁজে পেয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, **আকাশের দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে কৃষ্ণচূড়ার উদ্ধত আভাস** দেখেন। দেখেন — **বৃষ্টির আগে শব্দহীন গাছে সবুজ স্তব্ধতা নামা**।[১০৮] বৈপরীত্যের ব্যবহারে অনুষঙ্গ তৈরী এবং তাদের মধ্যে এক আন্তর সম্পর্ক স্থাপন পদ্ধতিটি তাঁর প্রথম পর্বের কবিতায় সমধিক।

ঐতিহাসিক চেতনা এবং ঐতিহ্য চেতনায়ও এলিয়টকে খুঁজে পাওয়া যায় সমর সেনের কবিতায়। এলিয়ট মনে করতেন : 'This historical sense, which is a sense of the timeless as well as of the temporal and of the timeless and of the temporal together. is what makes a writer traditional.'[১০৯] সমর সেনও তাই মনে করতেন। তিনি দেশী-বিদেশী কবি-সাহিত্যিকদের তাঁর কাব্যে এই জন্যেই গতায়াত করতে দিয়েছিলেন। ছোট একটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। 'উর্বশী' চরিত্রটি সংস্কৃত সাহিত্য থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন গ্রহণ করেছিলেন প্রথমে। পরে রবীন্দ্রনাথ একে অনন্ত যৌবনা, বন্ধনহীনা এক বিদ্রোহের প্রতীকে চিত্রিত করেছিলেন। সঙ্গে ছিল বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের কমনীয়তা। বিষ্ণু দের কবিতায়ও তাকে পাওয়া গিয়েছিল সে প্রসঙ্গেই। কিন্তু সমর সেনে এসে সেই উর্বশী-বর্ণহীন, বৈচিত্র্যহীন মধ্যবিত্তের জীবনে গতানুগতিকতার প্রতীকে পর্যবসিত।

কবির নৈর্ব্যক্তিকতা এবং আত্মসচেতনতা—এই দুটি বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যও সমর সেন অকৃপণভাবে এলিয়টের কাছ হ'তে গ্রহণ করেছেন। কবি মেজাজে আজীবন মার্কসবাদের

চিন্তায় পরিশীলিত ছিলেন, তথাপি তিনি মধ্যবিত্ত মানসিকতা থেকে নিজেকে টেনে বার করে আনতে পারেননি। এজন্যে তাঁর মনে বারেবারেই ক্ষোভ উষ্মীভূত হয়েছে। তাঁর এই সচেতনতা কবিতায় নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিমায় ফুটেছে। এই ভঙ্গিমাটিকে সাবলীলতার সঙ্গে তিনি রপ্ত করেছেন। এলিয়ট মার্কস্‌বাদী চিন্তার প্রতিকূলে অবস্থিত হলেও, সমর সেন তাঁর স্বকাল এবং পার্শ্বস্থ অবক্ষয়কে ধরতে গিয়ে আধুনিক কবিদের পক্ষ অবলম্বন করে সেই এলিয়টকে সামনে রেখেই সওয়াল করেছেন। তিনি কবিতার গাঠনিক সংহতিকে অভিহিত করতে এলিয়টেরই উক্তির প্রতিধ্বনি করেছেন সময় বিশেষে। নতুন ইংরেজি কবিতার অগ্রদূত হিসেবে হপ্‌কিন্‌স ও এলিয়টের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন এই বলে : "To be really progressive in our time and in our country, where only a fraction is literate, is to preserve the integrity of what is good in our past tradition, to be true to oneself and at the same time to realise that poetry is a medium through which the individual tries to adjust his relations to society, to be conscious of the complex forces which are changing our world. To be able to preserve one's personal integrity as a poet will help progressive cause in the long run. People consider Hopkins and Eliot to be among the real pioneers of modern English poetry."[১১০] এই আত্ম সচেতনতা থেকেই কবির উচ্চারণ 'আমি রোমান্টিক কবি নই, মার্কিস্ট।/................ দু-নৌকোয় স্বচ্ছন্দে পা দিয়ে চলি'।

এখানে গোটা সমাজ মানসের প্রতীকে 'আমি' কে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন কবি। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত সমাজে সুবিধাবাদীর চর্চাই অব্যহত থাকে। বাংলা-সাহিত্যে প্রধানত সেই মধ্যবিত্ত সমাজের কবি-সাহিত্যিকরাই তথাকথিত সাধারণ মানুষদের জন্যে জীবনাতিপাত করে ফেলন, এটা বোঝাতে চান তাঁরা—একথা সমর যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন যে, এটা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। এটা সমসাময়িক যুগ ধর্ম। আবার কবি নিজে সেই মধ্যবিত্ত গোত্রেই অবস্থান করেন। ফলে নিজের মনোভাবকেও তিনি দু নৌকায় পা বলে অভিহিত করেছেন। এই আত্মসচেতনতার দিশারীও এলিয়ট।

এলিয়টের ভাবসংক্ষেপ বৈশিষ্ট্যকেও সমর সেন স্বীকরণ করেছেন। কবিতায় বাক্ সংহতি প্রাধান্য তাই বারেবারে লক্ষিত হয়। 'কয়েকটি কবিতা'র 'আমন্ত্রণ' কবিতায় যেখানে 'বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন' চরণ ব্যবহার করেছেন—সেখানে একদিকে যেমন কবি ব্যঙ্গের কটুতায় তীক্ষ্ণতাকে বুঝিয়েছেন, তেমনি অন্যদিকে তিনি মৃত্যুনীল প্রেমের মৃতদেহে চন্দনের ফোঁটাকেও একই সঙ্গে অভিহিত করেছেন মিতভাষণের আশ্রয় নিয়ে। এমনিতর অজস্র উদাহরণ মেলে তাঁর কাব্য জুড়ে।

সমর সেন এলিয়টের মতনই জীবন সংলগ্ন বস্তুনিচয়কে সমগ্রতায় উপস্থাপনা করেছেন। ক্ষুধা-দুর্ভিক্ষের পাশাপাশি হরিৎপ্রান্তরে শ্যামবর্ণ মানুষের গ্রাম্য গানকেও প্রাধান্য দিয়েছেন সমানভাবে। তিনি নিজে মনে করতেন : "The bad poet dwells partly in a world of objects and partly in a world of words, and he never can get

them to fit.' [১১১]

এছাড়া সমর সেন এলিয়টের ভাবনাকে কাব্য শরীরে স্বীয় ভাবনায় ও ভাষায় সাজিয়ে তুলেছিলেন। কখনো কখনো এলিয়টের কাব্য পংক্তির হুবহু অনুবাদও করে নিয়েছেন।

১. এলিয়ট —

'April is the cruellest month, [১১২]

সমর সেন —

'— উজ্জ্বল, ক্ষুধিত জাগুয়ার যেন
এপ্রিলের বসন্ত আজ।'

(চার অধ্যায়/কয়েকটি কবিতা/পৃঃ২০)

২. এলিয়ট —

'After the torchlight red on sweaty faces [১১৩]

সমর সেন —

'...... স্বেদাক্ত মুখের উপরে টর্চের লাল আলোর পর'

(কয়েকটি দিন/গ্রহণ/পৃঃ১৪)

৩. এলিয়েট —

'My friend, blood shaking my heart
The awful daring of a moment's surrender
Which an age of prudence can never retract
By this, and this only [১১৪]

সমর সেন —

'রক্তের জোয়ার হৃদয় কাঁপায়
নশ্বর সমর্পণের দারুণ সাহস ছাড়া
ভীরু মজ্জায় আর কিছু নেই।'

(গ্রহণ/পৃঃ ৩৪)

৪. এলিয়ট —

'I have lost my sight, smell, hearing, taste and touch :' [১১৫]

সমর সেন —

'লুপ্ত পাহাড়, লুপ্ত বোধ,
শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ।'

(রোমন্থন/নানাকথা/পৃঃ ১২)

৫. এলিয়ট —

'This is the dead land
This is cactus land' [১১৬]

সমর সেন —

অ. 'কুটিল ফনিমনসা হাসে, সাবলীল ঝাউগাছ স্তব্ধ,
প্রতিপদের চাঁদে বালু জ্বলে,'

(ঘরে বাইরে/নানাকথা/পৃঃ ২২)

আ. 'মরুভূমি আমাদের ঘেরে;

রসহীন ফণিমনসায়, রুক্ষ বালুতে
প্রাণের প্রতিরোধে চক্রান্ত চলে।'

(শবযাত্রা/নানাকথা/পৃঃ ২৫)

ই. 'ক্ষণে-ক্ষণে বালুতে নামে,
হলুদ বালি দিনরাত্রি জ্বলে, দূরে ফণিমনসার ঝাড়।"

(নানাকথা/পৃঃ ৩২)

ঈ. 'আমাদের বাগানে বাড়ে ফণিমনসার ঝাড়'

(পঞ্চম বাহিনী/নানাকথা.পৃঃ ৩৮)

এ. '............এ-প্রান্তরের দ্বিগ্বিদিকে
স্তূপীকৃত স্তম্ভিত বালুর উত্তাপে
আবহাওয়া লাল হয়,'

(জাতীয় সংকট/খোলাচিঠি/পৃঃ ১৩)

ঐ. 'অন্তহীন বালুতে
কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ সারিসারি উট
আদিগন্ত চলে।'

(ঐ/পৃঃ ১৭)

৬. এলিয়ট —

'This is the land. We have our inheritance.' [১১৭]

সমর সেন —

'এ-প্রান্তর আমাদের উত্তরাধিকার।'

(জাতীয় সংকট/খোলাচিঠি/পৃঃ ১৪)

৭. এলিয়ট —

'Let us go then, you and I,
When the evening is spread out against the sky
Like a patient etherised upon a table;' [১১৮]

সমর সেন —

'আজ চলুন, শহরে বেরোই,
এখানকার সন্ধ্যা দেখুন,

কফির রং,
কোন খোঁয়ারি দেবতার পানীয় যেন।'

(নানাকথা/পৃঃ ৩২)

৮. এলিয়ট —

'I think we are in rat's alley
Where the dead man lost their bones.' [১১৯]

সমর সেন —

'সাংসারিক চাপ বাড়ে, কারণে অকারণে আক্রোশ জমে,
অবশ্য পিঞ্জরিত সিংহ নই,
কলে বিকল মুষিকের সঙ্গে
সম্ভবত সাদৃশ্য আরো বেশি।' ইত্যাদি।

(নানাকথা/পৃঃ ৩৩)

এই সূত্রেই বলা চলে, সমর সেন এলিয়টীয় রীতি অনুযায়ী বাংলা রীতির বাক্যগঠনকে ঋজুতা, দৃঢ়তা এবং শাণিত ভঙ্গিমায় উপস্থাপনা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। পরিবর্তে তাঁর কাব্যে বাংলার শিথিল. দীর্ঘ সূত্র ভাবভঙ্গি পরিত্যক্ত হয়েছে। বারেবারে বাক পর্বের বা পুরো চরণের পুনরুক্তি ঘটিয়ে তিনি এলিয়টের অত্যন্ত প্রিয় রীতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

অন্যান্য আধুনিক কবিদের মতন সমর সেনও নাগরিক জীবনের অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য প্রতীকী 'ঝড়'কে আবাহন করেছেন। অথচ বর্ষণের আবাহন অনুপস্থিত, যেমনটি এলিয়টে বর্তমান।

এলিয়ট —

'Where the hermit-thrush sings in the pine trees
Drip-drop drip drop drop drop
But there is no water.......' [১২০]

সমর সেন —

'গম্ভীর পাহাড় থেকে দুরন্ত ঝড় এল;'

(একটি বুদ্ধিজীবী/গ্রহণ/পৃঃ ১৫)

কিন্তু অনেক বাঙালী কবিকেই ঝড়ের পরে বর্ষণের নব জলধারা মৃত সঞ্জীবনী প্রক্রিয়ায় স্তোত্র রচনায় উৎসাহ দিয়েছে। এদিক থেকে আধুনিক কবিরাও পিছনে ছিলেন না। প্রসঙ্গত বিষ্ণু দের নাম উচ্চারণ করা যেতে পারে। তিনি লেখেন —

'পাতায় পাতায় দগ্ধ পথে গলা পিচে ইঁটে
বৃষ্টি পড়ে আকাশে মাটিতে

ধুয়ে যায় প্রাণ পায় একই দূরে সমুদ্রের বৈশাখী বৃষ্টিতে' [১২১]

বস্তুত এলিয়টের প্রভাব ছিল সমর সেনের উপর ঠিকই — কিন্তু তিনি এলিয়টের হুবহু অনুসরণ করেছেন এমন ভাবাও ঠিক নয়। সময়বিশেষে এলিয়ট যখন চার্চের শরণাপন্ন হয়েছেন, তখন সাম্যভাবাপন্ন তিনি নির্বিঘ্নে অতিক্রম করে গেছেন এলিয়টের চার্চ অনুগামী মানসিকতার দুর্গতি। আরও বলা যেতে পারে, সমর সেনদের সমস্যা — বাংলাদেশের সামাজিক জীবনের সমস্যা ততটা নয়, তা অনেকটাই শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর সমস্যা। এবং উপনিবেশের খণ্ডিত ধারণার চাপেই তাঁদের সমস্যা আরো তীব্র হয়ে ওঠে। সামন্ত অতীতে তাঁদের মানসিক আশ্রয় নেই, আবার বর্তমানেও তাঁদের পুরোপুরি আস্থা নেই—এহেন অবস্থায় তাঁরা আরো বেশী বিচ্ছিন্নতা অনুভব করেছিলেন। এবং সেখানে দাঁড়িয়েই স্মরণ করেছিলেন এলিয়টদের।

এলিয়টের পাশাপাশি সমর সেন অন্যান্য আরো অনেক ইংরেজ কবির ভাবলোকে গতায়াত করেছেন। করেছেন সাহিত্যিকদের ভাবলোকেও। কিন্তু এলিয়ট ছাড়া এমন ব্যাপক অনুবর্তন কারুর ঘটেনি তাঁর কাব্যে। তিনি অডেনের —

'Is it making of love or counting of money;
Or raid on the jewls, the plams of a thief?'[১২২]

অনায়াসে করেন 'স্যাকারিনের মতো মিষ্টি/একটি মেয়ের প্রেম!' (মুক্তি/কয়েকটি-কবিতা/পৃঃ ১৯)। এবং অডেনের

'XXII', Poems -র

'Get there if you can and see the land you once
were proud to own
Though the roads have almost vanished and the
expresses never run;
Smokeless chimneys, damaged bridges, rotting wharves
and choked canals.'

মনে রেখে সমর সেন উচ্চারণ করেছেন :

'চূর্ণ শহরের স্ফুলিঙ্গে
রক্ত দন্ত কুকুর জাগে; মনে পড়ে,
নরকে যাত্রা কাল।

মনে হয়, কোন অন্ধজন
এ-অন্ধলোকে নিরন্তর ঘুরে ফেরে,
বক্রগতি, বিষণ্ন বিধুর।'

(যাত্রা/গ্রহণ/পৃঃ ৩৫-৩৬)

ডি. এইচ. লরেন্সের 'Reddes than death' কে অনুরূপভাবে সমর সেন নিজের ছকে রূপ দেন 'অগ্নিবর্ণ' কবিতায়। জীবন্ত যৌবনের জ্বালা ভরা ক্ষুধার অনুভবে।

এলিয়ট এবং অন্যান্য কবিদের উপাদান সমর সেনের কবিতায় যতটুকু পাওয়া যায়, তার তুলনায় অনেক কম উপাদান তিনি গ্রীক ও রোম পুরাণ কথা এবং বাইবেল থেকে

সংগ্রহ করেছেন। বাইবেলের যেমন, গ্রীক পুরাণের মর্ত্য মানবী লেডা ও দেবতা জুপিটারের প্রেম কাহিনী, মিশরের স্থবির মূর্তি, ফ্রান্সের ফিনিক্স পাখির গান ইত্যাদির উল্লেখ এখানে করতে হয়। এসব দেখেই সমালোচক একদা মন্তব্য করেছিলেন ঃ 'তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রাকরণিক ঐতিহ্য সম্ভবত পেয়েছিলেন বিদেশী কাব্যে।'[১২৩]

তবে আমরা পুরোপুরি একথা বিশ্বাস করতে রাজি নই। এলিয়টীয় পদ্ধতি বলে যেগুলি উল্লিখিত হয়েছে এখানে — তার মধ্যে কয়েকটি রীতি আমাদের বাংলা সাহিত্যে একেবারে বিরল নয়। বিশেষ করে, ভাবসংক্ষেপ, গম্ভীর ও তরল রসের একত্র সমাবেশ এবং দেশে প্রচলিত সব রকম ভাষা ব্যবহার আমাদের প্রাচীন বাংলার দিক্‌পাল সাহিত্যিকদের অজানা ছিল না। এই জন্যেই সমর নিজ ভাষায় ঐতিহ্যে স্বতন্ত্র। তাঁর মানসিকতার জন্যে এলিয়টকে তিনি বেশী প্রাধান্য দিয়েছিলেন সত্যি। কিন্তু ঠিক যেভাবে 'A good poet will usually borrow from authors remote in time, or alieninlanguage, or diverse in interest'[১২৪] তিনি সেভাবেই অন্য কবি-সাহিত্যিকদের ভাবধারাকে গ্রহণ করত স্বীকরণ করে নিয়েছিলেন।

উল্লেখপঞ্জী

১ সমর সেন। বাংলা কবিতা। "কবিতা"। ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। বৈশাখ, ১৩৪৫।

২ —। Amor stand upon you : Ezra Pound." কয়েকটি কবিতা"। পৃ. ১৭

৩ অমিয় চক্রবর্তী। রাত্রি; পালা বদল। "কবিতা সংগ্রহ"। ২য় খণ্ড। দে'জ। ১৯৭৯। পৃ.২৭

৪. Richards, I. A. Principles of Literary criticism. 1924. (reprint 1990) Universal Book Stall P 211

৫. Middleton Murry. J. Pure poetry In English critical essays; twentieth century. 1931 (reprint 1964). Oxford University Press. P 316

৬. —. P 318

৭. — P 320

৮ —. P 318

৯. Eliot, T.S. The Sacred Wood : Essayson Poetry & Criticsm.

১০. Bywater, Ingram. Aristotle on the Art of Poetry । উদ্ধৃতি। নীলরতন সেন। প্রসঙ্গ আধুনিক বাংলা সাহিত্য। সাহিত্যলোক। ১৯৮৭। পৃ. ২২৩-২৪

১১. অঞ্জন সেন। কবিতার ভাষা : কয়েকটি সূত্র। "কবিতার ভাষা"। গাঙ্গেয় পত্র। ১৯৮৬। পৃ. ৩৬

১২. শিশির দাশ। গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব। দে'জ। ১৩১২ বঙ্গাব্দ। পৃ. ৩২

১৩ হীরেন্দ্র নাথ দত্ত। বাংলা গদ্যের স্বভাব ধর্ম। "বাংলা গদ্য জিজ্ঞাসা"। সমতট প্রকাশনী। ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ। পৃ. ১৩৬

১৪. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

১৫. সমর সেন। বাংলা কবিতা। "কবিতা"। ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। ১৩৪৫ বৈশাখ।

১৬. শঙ্খ ঘোষ। নিঃশব্দতার ছন্দ। "অনুষ্টুপ"। ২২শ বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা। ১৯৮৮।
১৭. Eliot, T. S. The Music of poetry. "Selected Prose" P 62
১৮. সমর সেন। পুনরুজ্জীবন : ১। "গ্রহণ"। অনুষ্টুপ সং। ১৯৮৯। পৃ. ৯-১০
১৯. তদেব। "ঘরে বাইরে"। অনুষ্টুপ সং। ১৯৮৯। পৃ. ১১
২০. তদেব। পঞ্চমবাহিনী : ১। "নানাকথা"। অনুষ্টুপ সং। ১৯৮৯। পৃ. ৩৬
২১. Eliot, T. S.—'Tradition and Individual Talent', 'Selected Prose'. Penguin Books Ltd. Harmondsworth. 1963. P. 23.
২২. দীপ্তি ত্রিপাঠি — 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়'। চতুর্থ সং। দেজ পাবলিশিং। ১৯৮৮। পৃঃ ২২১
২৩. সমর সেন— 'ঘরে বাইরে' : 'কয়েকটি কবিতা'। অনুষ্টুপ সং। ১৯৮৯। পৃ ১১
২৪. তদেব। 'মদন ভস্মের প্রার্থনা'। পৃ. ৩২
২৫. বিদ্যাপতি।— 'পদাবলী'। খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমান বিহারী মজুমদার সম্পাদিত। ১৩৫৯। পৃঃ ৪৭৫
২৬. সমর সেন— 'পঞ্চমবাহিনী' 'নানাকথা'। অনুষ্টুপ সং। ১৯৮৯। পৃ ৩৭
২৭. ভারতচন্দ্র রায়—'অন্নদামঙ্গল' . 'গ্রন্থাবলী'। ৩য় সং। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। ১৩৬৯। পৃ. ১৭।
২৮. সমর সেন— 'পূর্বলেখ' : বিষ্ণু দে' (সমালোচনা)। 'সরণি' ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৪৯। পুনর্মুদ্রণ, 'সংকলিত সমর সেন' (সব্যসাচী দেব ও সোমেশ চট্টোপাধ্যায়)। 'অনুষ্টুপ'। ১৯৯০। পৃ. ১০৫
২৯. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—'গীত' : 'পারমার্থিক ও নৈতিক'। 'গ্রন্থাবলী'। বসুমতী কর্পোরেশন লিঃ। পৃ. ১৪১
৩০. সমর সেন— 'গৃহস্থবিলাপ' : 'চার'। 'তিনপুরুষ'। অনুষ্টুপ সং। ১৯৮৯। পৃ. ২০
৩১. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত— 'নায়কের উত্তর' : 'রসাত্মক কবিতা'। 'গ্রন্থাবলী'। পৃ ২১৭
৩২. তদেব। 'ইংরাজী নববর্ষ' : 'সামাজিক ও ব্যঙ্গ'। 'গ্রন্থাবলী'। পৃ. ১৪৩
৩৩. তদেব। পৃ. ১৪০
৩৪. সমর সেন— 'বাবুবৃত্তান্ত'। দে'জ পাবলিশিং। ২য় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত স। ১৯৮৮। পৃ. ৪৯
৩৫. অমলেন্দু বসু— 'সমর সেনের কবিতা'। 'চতুরঙ্গ'। শ্রাবণ ১৩৭৪। পুণর্মুদ্রণ। 'অনুষ্টুপ'। ২২ বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা ১৯৮৮। পৃ. ৯৪
৩৬. সমর সেন—'পূর্বলেখ : বিষ্ণু দে' (সমালোচনা)। 'সংকলিত সমর সেন'। পৃ ১০৪।
৩৭. মধুসূদন দত্ত—'মেঘনাদ বধ' : ১ম সর্গ। 'গ্রন্থাবলী' (কাব্য)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। ১৩৪৭। পৃ. ২৮।
৩৮. তদেব। 'ব্রজাঙ্গনা'। 'গ্রন্থাবলী' (কাব্য)। পৃ. ৩
৩৯ তদেব। 'মেঘনাদ বধ' : ৮ম সর্গ। 'গ্রন্থাবলী' (কাব্য)। পৃ. ২২১।
৪০. সমর সেন—'বাবুবৃত্তান্ত' : এক। 'তিনপুরুষ'। পৃ. ১৫।
৪১. তদেব। 'বন্দেমাতরম্' : 'বাবুবৃত্তান্ত'। পৃ. ৮৬-৮৭।

.৪২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—'আনন্দমঠ'। 'রচনাবলী' সাহিত্যসংসদ। ১৩৭৬। ১ম খণ্ড। পৃ ৭২৯।
৪৩. অমিয় চক্রবর্তী—'ঝর্ণা ছন্দের কাব্য' (গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা)। 'কবিতা'। কার্তিক ১৩৪৭। পুনর্মুদ্রণ', 'অনুষ্টুপ'। ২২ শ বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা, ১৯৮৮। পৃ. ২৫।
৪৪. সমর সেন—'বিষ্ণু দে : সমসাময়িক দৃষ্টিতে'। লেখাটি প্রথমে প্রকাশিত হয় ইংরেজিতে 'স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায়। পরে 'অনুষ্টুপ'। ১৭ বর্ষ, বসন্ত সংখ্যা ১৯৮৩-তে প্রকাশিত। পুনর্মুদ্রণ, 'সংকলিত সমর সেন'। পৃ. ৮৭।
৪৫ তদেব। 'পূর্বলেখ : বিষ্ণু দে'। 'সংকলিত সমর সেন'। পৃ. ১০৪-১০৫।
৪৬ তদেব। 'বাংলা কবিতা'। 'কবিতা'। বিশেষ সংখ্যা। বৈশাখ, ১৩৪৫। পুনর্মুদ্রণ, 'সংকলিত সমর সেন'। পৃ. ৬০
৪৭. তদেব। 'বিষ্ণু দে : সমসাময়িকের দৃষ্টিতে'। 'সংকলিত সমর সেন'। পৃ ৮৬।
৪৮. তদেব। 'উত্তর ফাল্গুনী : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত' (গ্রন্থসমালোচনা)। 'কবিতা'। ৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। পৌষ ১৩৪৮। পুনর্মুদ্রণ, 'সংকলিত সমব সেন'। পৃ. ১০৩।
৪৯. তদেব। 'বাবুবৃত্তান্ত'। ২য় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সং। ১৯৮৮। পৃ. ২৫।
৫০. তদেব। 'মৃত্যু'। 'কয়েকটি কবিতা'। পৃ. ২৬
৫১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'শাজাহান'। 'বলাকা'। 'রচনাবলী'। প.ব. সরকার ১৩৮২। ২য় খণ্ড। পৃ. ৪৪৭।
৫২ তদেব। 'মেঘদূত'। 'প্রাচীন সাহিত্য'। 'রচনাবলী'। জন্মশতবার্ষিকী সং। ১৩শ খণ্ড। পৃ. ৬৬২ (৯)।
৫৩. তদেব। 'পত্র'। 'পুনশ্চ'। 'রচনাবলী', ৩য় খণ্ড। পৃ. ১৪।
৫৪. সমর সেন—'আমন্ত্রণ'। 'কয়েকটি কবিতা'। পৃ ২৪-২৫।
৫৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'উজ্জীবন'। 'মহুয়া'। 'রচনাবলী'। প ব. সবকার। ২য় খণ্ড। ১৯৮২। পৃ. ৭৭০।
৫৬ তদেব। 'উর্বশী'। 'চিত্রা'। 'রচনাবলী'। জন্মশতবার্ষিকী সং। ১ম খণ্ড। ১৩৬৮। পৃ. ৫১১।
৫৭. তদেব। 'বন্দী'। 'কড়ি ও কোমল'। 'রচনাবলী'। ১ম খণ্ড। পৃ. ১৯১।
৫৮ তদেব। 'বিদায়'। 'মহুয়া'। 'রচনাবলী'। প.ব. সরকার। ২য় খণ্ড। ১৯৮২। পৃ. ৮৩৮।
৫৯ তদেব। '৩৬ সংখ্যক কবিতা। 'বলাকা'। 'রচনাবলী'। ২য় খণ্ড। পৃ. ৪৭৭।
৬০. তদেব। পৃ. ৪৭৮।
৬১. তদেব। 'বিদায়'। 'মহুয়া'। পৃ. ৮৩৮।
৬২. তদেব। 'শিশুতীর্থ'। 'পুনশ্চ'। 'রচনাবলী'। জন্মশতবার্ষিকী সং। ৩য় খণ্ড। পৃ. ৯৪।
৬৩. তদেব। 'সোনার তরী'। 'রচনাবলী'। ১ম খণ্ড। পৃ. ৩৪৪।
৬৪. তদেব। 'পথের বাঁধন'। 'মহুয়া'। 'রচনাবলী'। প.ব. সরকার। ২য় খণ্ড। ১৯৮২ পৃ ৭৯২।
৬৫. তদেব। 'বাঁশি'। 'পুনশ্চ'। 'রচনাবলী'। জন্মশতবার্ষিকী সং। ৩য় খণ্ড। পৃ. ৬৪।
৬৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'প্রকৃতি : ১৬'। 'গীতবিতান'। সংরণ। বিশ্বভারতী। পৌষ ১৩৮০। পৃ. ৪৩৩।
৬৭. তদেব। 'শিশুতীর্থ'। 'পুনশ্চ'। 'রচনাবলী'। জন্মশতবার্ষিকী সং। ৩য় খণ্ড। পৃ. ৯৪।
৬৮. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—'নানা কথা' (অন্যান্য কয়েকটি বই এর সঙ্গে)। পরিচয়। ফাল্গুন ১৩৪৯। পুনর্মুদ্রণ, 'নানাকথা' (পরিশিষ্ট ২)। অনুষ্টুপ সং। ১৯৮৯। পৃ. ৫৪-৫৫।

৬৯. সমর সেন—'নানা কথা'। অনুষ্টুপ সং। ১৯৮৯। পৃ. ৩৩-৩৪।
৭০. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—'শ্রীকান্ত' ১ম পর্ব। অখণ্ড সং। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রা লি। পৃ. ১০৫।
৭১. সুমিত চক্রবর্তী—'সমব সেনের সঙ্গে আধঘন্টা'। (সাক্ষাৎকার)। 'এ সময়'। এপ্রিল—জুলাই, ১৯৮৪। পুনর্মুদ্রণ, 'কালের দর্পণে সমর সেন'। অনুষ্টুপ। ২২ শ বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা। ১৯৮৮। পৃ. ২৯।
৭২. সমর সেন—'পূর্বলেখ : বিষ্ণু দে' (সমালোচনা)। 'সংকলিত সমর সেন'। পৃ. ১০৬।
৭৩. অমলেন্দু বসু—'সমর সেনের কবিতা'। পুনর্মুদ্রন, 'অনুষ্টুপ'। ২২ শ বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা। ১৯৮৮। পৃ. ১০১।
৭৪. বিনয় ঘোষ—'সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা'। 'নতুন সাহিত্য ও সমালোচনা'। ১৯৪০। পুনর্মুদ্রণ, 'অনুষ্টুপ্'। ২২শবর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা। পৃ. ৫০।
৭৫. বিষ্ণু দে—'টপ্পা-ঠুংরি'। 'চোরাবালি'। সিগনেট প্রেস। ১৩৬৭। পৃঃ ৮০।
৭৬. তদেব। পৃ. ৮০।
৭৭. তদেব। পৃ. ৭৭।
৭৮. তদেব। 'শিখণ্ডীর গান'। পৃ. ৬৬।
৭৯. তদেব। 'টপ্পা-ঠুংরি'। পৃ ৭৮-৭৯।
৮০. সমর সেন—'নাগরিক'। 'কয়েকটি কবিতা'। অনুষ্টুপ সং। ১৯৮৯। পৃ. ২৯।
৮১. বিষ্ণু দে—'ঘোড়সাওয়াব'। 'চোরাবালি'। পৃ ১১।
৮২ তদেব। 'মহাশ্বেতা'। পৃ ৬১।
৮৩. তদেব। 'উর্বশী ও আর্টেমিস'। শ্রেষ্ঠ কবিতা। নাভানা। পরিবর্ধিত ৫ম সং। ১৯৮৫। পৃ ১৬।
৮৪. তদেব। 'টপ্পা-ঠুংরি'। 'চোরাবালি'। পৃ. ৭৯।
৮৫. তদেব। 'চতুর্দশ পদী'। 'পূর্বলেখ'। 'বছরপঁচিশ'। বিশ্ববাণী। ১৩৮০। পৃ. ৪৬৯।
৮৬. তদেব। 'শিখণ্ডীর গান'। 'চোরাবালি'। পৃ. ৬৬।
৮৭. তদেব। 'প্রথম পার্টি'। পৃ ৫৮-৫৯।
৮৮. বিষ্ণু দে—'পদধ্বনি'। 'পূর্বলেখ'। 'বছর পঁচিশ'। পৃ. ৫০৭।
৮৯. তদেব। 'চতুর্দশ পদী'। পৃ. ৪৭২।
৯০. তদেব। 'বেকার বিহঙ্গ'। 'চোরাবালি'। পৃ. ৫৫।
৯১. তদেব। 'খোঁয়াবি'। পৃ. ৪৫।
৯২. তদেব। 'সাতভাই চম্পা'। 'বছর পঁচিশ'। পৃ. ৪৫৬।
৯৩. তদেব। 'এ ভরা বাদরে স্বদেশ প্রেম'। পৃ. ৪৩৫।
৯৪. তদেব। 'সপ্তপদী'। 'পূর্বলেখ'। পৃ. ৫১০।
৯৫. তদেব। 'কোডা'। 'সাতভাই চম্পা'। পৃ ৪৪৯।
৯৬. তদেব। 'প্রতিরোধ'। পৃ. ৪৩১।
৯৭. তদেব। 'কবি কিশোর'। 'চোরাবালি'। পৃ ৪০।
৯৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—কামাক্ষীপ্রসাদকে লেখা চিঠি (১৯৪০-এ)। 'দেশ'; সাহিত্য সংখ্যা। ১৩৮২। পৃ. ২২।
৯৯. সমর সেন—'পূর্বলেখ : বিষ্ণু দে'। (সমালোচনা)। 'সংকলিত সমর সেন'। পৃ. ১০৪।

১০০. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—'ঐতিহ্য ও টি.এস.এলিয়ট'। 'স্বগত'। 'প্রবন্ধ সংগ্রহ'। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ফাউন্ডেশন; যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। ১৩৯০। পৃ. ১৪০-১৫৭।

১০১. বিষ্ণু দে—'এলোমেলো জীবন ও শিল্প-সাহিত্য'। ১ম সং। ইস্ট এন্ড কোং। ১৯৫৮। পৃ. ৮৩।

১০২. সমর সেন—'বাবুবৃত্তান্ত'। পৃ. ২৬।

১০৩. তদেব। বুদ্ধদেব বসুকে ২৪।৫।৪১-এ তারিখে লেখা চিঠি। 'চিঠিপত্র' ১৮। 'অনুষ্টুপ'। ২২শ বর্ষ। ২য়-৩য় সংখ্যা। ১৯৮৮। পৃ ২৩।

১০৪. Eliot, T.S—'Tradition and Individual Talent'. 'Selected Prose.' Penguin Books 1963. p-29.

১০৫. Eliot, T.S –'East Cokes' : V. 'Four Quarters'. 'Collected Poems' : 1909-1962. Faber & Faber. 1963. p.204.

১০৬. Ibid. 'The Burial of the Dead'. 'The West Land' p. 65.

১০৭ Ibid. 'The Fire Sermon' p.71.

১০৮ সমর সেন—'বিস্মৃতি'। 'কয়েকটি কবিতা'। পৃ ১৫।

১০৯. Eliot, T.S –'Tradition and Individual Talent'. 'Selected Prose'. p. 23.

১১০. Samar Sen–'In Defence of the Decadents'. 'New Indian Literature'. No -2. 1939. Review and Articles'. 'সংকলিত সমর সেন'। পৃ. ১৬৫-৬৬।

১১১. Eliot, T S.—'Swinburne as Poet' 'The Sacred Wood': Essays on Poetry and Criticism. 7th reprint. Methuen & Ltd. P. 150

১১২. Eliot, T. S.—'The Burial of the Dead'. 'The West Land'. 'Collected Poems'. P 63

১১৩. Ibid. What the Thunder said". P. 76

১১৪. Ibid. P 78

১১৫. Ibid. 'Gerontion'. 'Poems : 1920'. P 41

১১৬. Ibid. 'The Hollow Men'. P. 90

১১৭. Ibid. 'Ash-Wednesday : II'. P. 98

১১৮. Ibid. 'The Love Song of J. Alfred Prufrock'. P. 13

১১৯. Ibid. 'A Game of Chess'. P. 67

১২০. Ibid. 'What the Thunder said' 'The West Lond'. P. 77

১২১. বিষ্ণু দে—'চৈতে বৈশাখে'। 'সন্দীপের চর'। 'বছর পঁচিশ'। পৃ. ৪০২-৪০৩

১২২. Auden, W. H.—'Five Songs: I.' Paid on Both Sides'; Part-II : 1927-1932. 'Collected Poems'. Ed. by E Mendelson. Faber & Faber. 1976. P. 59

১২৩. অমলেন্দু বসু—'সমর সেনের কবিতা', পুনর্মুদ্রণ, 'অনুষ্টুপ'। ২২শ বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা। ১৯৮৮। পৃ. ১০২।

১২৪. Eliot, T. S.—Philip Massinger. The Sacred Wood : Essays on Poetry and Criticism. P. 125

সপ্তম অধ্যায়

কবিতার পাঠান্তর

> "চলিতসভ্যতার মোড়ে বিপরীত মতামতে ধাঁ ধাঁ লাগে,
> কোন ঘাটে তরী ভিড়াই?"
>
> (নববর্ষের প্রস্তাব : নানাকথা)

সমর সেনের কবিতার পাঠভেদ কবির শিল্পী মনের অসন্তোষকেই নির্দেশ করে। অবশ্যই এই অসন্তোষ শিল্পের চূড়ান্ত রূপসৃষ্টির তাগিদেই দ্রষ্টার মনে দানা বাঁধে। প্রসঙ্গত আমাদের জানা দরকার, শিল্পীদের পাঠান্তর শুধুই কি শিল্পের চূড়ান্ত রূপসৃষ্টি? এর উত্তরে, পাঠভেদের কারণ হিসেবে, শিল্পী মনের বিচিত্র মানস প্রতিক্রিয়াকে কয়েকটি সূত্রে ব্যাখ্যা করা চলতে পারে;

১. শিল্পীমন অনেক সময় প্রথম চিন্তায় তৃপ্ত নয়। কারণ, প্রথম চিন্তায় মনের মধ্যে থাকে আবেগের প্রাবল্য। ভাব বা বিষয় তখনও দানা বেঁধে ওঠে না। অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস এবং আকুলতা অধিকাংশ সময়ই প্রাথমিক চিন্তার মধ্যে প্রাধান্য পায়।

২. দ্বিতীয় চিন্তায় আবেগের ওপরে শিল্প বুদ্ধি এসে যোগ দেয়। শিল্পী মন অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসকে কাটিয়ে সংযত ভাবে গ্রহণ বর্জনের দ্বারা ছন্দ-ভাব-ভাষার একটি সুষ্ঠু প্রকাশের পথে অগ্রসর হয়।

৩. বহুক্ষেত্রে তৃতীয় চিন্তায় বিদ্রোহও হয় অনুসৃত।

শিল্পীমন ভাঙা-গড়ার দ্বারা প্রথম ও দ্বিতীয় চিন্তার সমস্ত ক্রম পরিণতিকে হয়তো অস্বীকার করে নতুন সিদ্ধির পথে অগ্রসর হয়। পূর্ববর্তী কোনো ভাব ভাষা-ছন্দ রূপাঙ্গিকের সঙ্গে এ সৃষ্টির হয়তো মিল খুঁজে পাওয়া দুরূহ হয়ে ওঠে। সৃষ্টিশীল শিল্পী মানসে আপন রচনা সম্পর্কে এরূপ নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলে। মোট কথা, শিল্পী মন যতক্ষণ না তৃপ্ত হচ্ছে ততক্ষণ অদল-বদলের কাজ চলে। তখন কবির সঙ্গে আমরাও ভাবি, বিপরীত মতামতে ধাঁধাঁ লাগে, কোন ঘাটে তরী ভিড়াবো?

কবি সমর সেনের অধিকাংশ কবিতাই প্রথমে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। বিশেষ করে 'কবিতা' পত্রিকায়। পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠের সঙ্গে অল্পকিছু জায়গায় কাব্য গ্রন্থের পাঠের যেমন অমিল আছে, তেমনি 'সমর সেনের কবিতা' সংকলনে ধৃত পাঠ অনেক সময়ই কিছুটা পরিবর্তিত। আবার 'সমর সেনেব কবিতা' সংকলনের বিভিন্ন সংস্করণেও পাঠভেদ ঘটেছে সামান্য ভাবে দু-এক ক্ষেত্রে। কবি নিজেই তাঁর সমস্ত কবিতা থেকে বাছাই করে 'সমর সেনের কবিতা' সংকলনটি সংকলিত করেন ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। এই সংকলনে অন্তর্ভূক্ত কবিতাবলীর রচনাকাল ১৯৩৪-১৯৪৬। অর্থাৎ বারো

বছরের মধ্যে। আর এই সংকলনের ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয় পরিবর্ধিত হয়ে, কবির মৃত্যুর পরে। এই শেষ সংস্করণে পাঠ পরিবর্তন অনেক বেশী। অনেক বর্জিত অংশও সেখানে পুনরায় গৃহীত হয়েছে। নানা বদলের মধ্যে কখনো কখনো কোনো কোনো কবিতা এতটাই সরে গেছে মূলের থেকে যে তা আলাদা একটি কবিতাই হয়ে উঠেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পাঠান্তর নির্দেশের আলোচনা করা যেতে পারে।

কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ, 'কয়েকটি কবিতা'[১]র উনপঞ্চাশটি কবিতার মধ্যে বারোটি কবিতা 'সমর সেনের কবিতা' সংকলনে স্থান পায়নি। এবং এই কাব্যসংকলনে 'কয়েকটি কবিতা' গ্রন্থনাম ব্যবহৃত হয়নি। পরিবর্তে '১৯৩৭-১৯৪০' পর্বের কবিতাগুলি অনুল্লিখিত কাব্য থেকে উৎকলিত হয়েছে। 'কয়েকটি কবিতা' কাব্যের প্রথম কবিতা-'গোধূলি,' 'সমর সেনের কবিতা'র কোনো সংস্করণেই অন্তর্ভুক্ত হয়নি। দ্বিতীয় কবিতা 'নিঃশব্দতার ছন্দ'-র ১৫ পংক্তি 'সহসা বুঝতে পারি'—সংকলনের ২য় এবং পরবর্তী-সংস্করণ-গুলিতে হয়েছে 'সহসা বুঝিতে পারি'। অনুরূপে, 'একটি রাত্রের সুর' কবিতার ১৬ সংখ্যক চরণ 'বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়ে' পাঠান্তরে হয়েছে 'অবাক হয়ে' এবং ১৮ সংখ্যক চরণ 'কীসের হাহাকার :—' হয়েছে 'কিসের হাহাকার :'। এছাড়া ২০ সংখ্যক চরণ 'সহসা শিহরণ,—' পরিবর্তিত হয়েছে 'সহসা শিহরণ—' এ।

'কয়েকটি কবিতা'র 'চারটি কবিতা' শিরোনাম পাঠভেদে দাঁড়িয়ে 'তিনটি কবিতা'। অর্থাৎ সংকলনে 'চিত্রা' কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত হয়নি। 'রাত্রি' কবিতার ২য় চরণের 'আশ্চর্য আভাস—' সংকলনে হয়েছে 'আশ্চর্য আভাস;' 'রক্তকরবী'র ১ম পংক্তির 'মোটরের আর্তনাদ' 'মোটরের আওয়াজ' -এ এবং ৮ম পংক্তির 'আজ সমস্তক্ষণ—', 'আজ সমস্তক্ষণ'-এ পরিণত। 'মেঘদূত' কবিতার ১১শ পংক্তির 'সদল বলে আর্তনাদ করবে' পাঠভেদে দাঁড়িয়েছে 'সদল বলে গাইবে'। 'ঝড়' কবিতার সূচনায় ডি. এইচ. লরেন্সের 'I wish were spring in the world' উদ্ধৃতিটি সংকলনে পরিত্যক্ত। এবং এই কবিতার 'মেঘদূত' শিরোনাম, সংকলনে হয়েছে '১'। 'সিনেমায়' কবিতাটি সংকলনে বর্জিত। 'একটি প্রেমের কবিতা' শিরোনাম সংকলনে '২'। আর এ কবিতারই ৫ম চরণের 'শুধু যেন শুনি—' হয়েছে 'শুধু যেন শুনি'। 'ঝড়' শিরোনাম সংকলনে পরিবর্তিত হয় '৩'। এ কবিতার ১ম চরণের 'দিয়ে দেখি—' হয়েছে 'দিয়ে দেখি'। ৯ম চরণের '.....আমার মনে শান্তি নেই' পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়িয়েছে 'আমার মনে শান্তি নেই'। অনুরূপভাবে 'সাড়া' কবিতা সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। 'দুঃস্বপ্ন' কবিতার ৮ম চরণের 'মধ্যরাত্রে।—' ১০ম পংক্তির 'বর্ণহীন আকাশ—' ও ১৩ শ পংক্তির 'কান পেতে শুনি—' পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে যথাক্রমে 'মধ্যরাত্রে।' 'বর্ণহীন আকাশ' এবং 'কান পেতে শুনি'। 'প্রেম' কবিতার ৭ম পংক্তির 'আর সমস্ত রাত্রি ভরে—' সংকলনে 'আর সমস্ত রাত্রি ভরে' -তে পরিণত। 'মুক্তি' কবিতার ১২ শ চরণ 'নির্জন দ্বীপের মতো সুদূর, নিঃসঙ্গ' সংকলনে দেখা যায় 'নির্জন দ্বীপের মতো সুদূর, নিঃসঙ্গ'। আমাদের ধারণা এটি মুদ্রণ প্রমাদ। 'Amor stands upon you' শিরোনামটি সংকলনে 'তুমি

সেখানেই যাও' শিরোনামে পরিবর্তিত।

সংকলনের 'চার অধ্যায়ে'র '১' সংখ্যক কবিতাটির শিরোনাম ছিল 'একটি রাত্রি'। অনুরূপভাবে '২', '৩' এবং '৪' সংখ্যক কবিতাগুলির শিরোনাম ছিল যথাক্রমে 'আর একটি রাত্রি', 'একটি নিউরেটিক কবিতা' এবং 'মুক্তি'। এখানের প্রথম কবিতার ২য় চরণের 'চোখবুজি—' ৭ম চরণের 'বারে বারে চমকে উঠি—', ৮ম চরণের 'শুধু মনে পড়ে—' এবং ১১শ চরণের 'আর তোমার পাশে—' পাঠভেদে হয় যথাক্রমে 'চোখবুজি', 'বারে বারে চমকে উঠি;' 'শুধু মনে পড়ে' এবং 'আর তোমার পাশে'। দ্বিতীয় কবিতা, 'আর একটি রাত্রি'র ৯ম চরণের 'অনুভব করি,' হয় 'অনুভভ করি'। তৃতীয় কবিতার ১ম চরণের 'কে যেন বলল—' পরিবর্তিত রূপে হয় 'কেন যেন বলল'। এছাড়া ৩য় চরণের '—অন্ধকারের দিঘিতে' ১০ম চরণের 'ঝরা পাতার কান্না,' ও ১৪ শ চরণের 'কোনো রাত্রে—'। যথাক্রমে পাঠভেদে দাঁড়ায় 'অন্ধকারের দিঘিতে,' 'ঝরা পাতার ক্লান্তি,' এবং 'কোনোরাত্রে'। আর চতুর্থ কবিতা, 'মুক্তি'র ১৬শ চরণের 'মন্থর মুহূর্তগুলি মরে' সংকলনে দাঁড়িয়েছে 'মন্থর মুহূর্ত গুলি মরে;'-তে। সেই সঙ্গে ১৭শ চরণ 'মৃত্যুমুখর রক্তের কান্নায়;'—পংক্তিটি সংকলনে বর্জিত। ১৯শ চরণের 'মরে-যাওয়া কুকুরের' অক্লেশে হয়েছে 'মরপা কুকুরের।' এবং সংকলনের 'উচ্ছ্বাস, ক্ষুধিত জাগুয়ার যেন' আদিতে ছিল '—উজ্জ্বল, ক্ষুধিত জাগুয়ার যেন'। এই কাব্যের 'ক্লান্তি' কবিতাটি আবার সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয় নি।

'উর্বশী' কবিতার ১০ম চরণ 'আর কতদিন।' পাঠভেদে দাঁড়ায় 'আরো কত দিন!'-এ কাব্যগ্রন্থের 'শেষ বসন্ত' কবিতা সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। 'মহুয়ার দেশ' কবিতার ১৮ শ চরণেব 'বিশাল শব্দ' এবং ১৯শ চরণের 'সবুজ সকালে,' 'পদদুটির শেষে' ',' চিহ্নের ব্যবহার ও অব্যবহার লক্ষ্য বস্তুই বটে। অর্থাৎ পাঠভেদে 'বিশাল শব্দ' এবং 'সবুজসকালে' হয়। 'LO THE FAIR DEAD' নামের প্রধান শিরোনামে যে পাঁচটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল 'কবিতা' পত্রিকায়[২], এদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শিরোনাম ছিল। পরন্তু তাদের ক্রমিকসংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করণও হয়েছিল, যাতে কবিতাগুলি যে একই কবিতার পাঁচটি অংশ বোঝা যায়। কিন্তু 'কয়েকটি কবিতা' গ্রন্থে 'শেষ রাত্রে.' 'ভোরের কলকাতা' 'আমন্ত্রণ' 'নাগরিকা' ও 'মৃত্যু' শিরোনামে—এগুলি 'কবিতা' পত্রিকাতেও ছিল; স্বতন্ত্র ভাবে মুদ্রিত হয়। যদিও ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহৃত হয় নি। এবং 'শেষরাত্রে' কবিতার সূচনায় এ এজরা পাউণ্ডেরই 'Lo The Fair Dead' উদ্ধৃতিটি ব্যবহৃত হয়। আবার 'সমর সেনের কবিতা'—সংকলনে এই কবিতাগুলির স্বতন্ত্রতা বিলোপ করে 'মৃত্যু' শীর্ষক কবিতার পাঁচ পর্ব হিসেবে ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে সাজান হয়। আলাদা আলাদা শিরোনাম যেমন এখানে বর্জিত, তেমনি বর্জিত এজরা পাউণ্ডের উদ্ধৃতিটি পর্যন্ত।

'শেষরাত্রে' কবিতার ৫ম চরণের 'অসহ্য সৌন্দর্য—' ও ১১শ চরণের 'অস্পষ্টগুলি—' পাঠভেদে যথাক্রমে 'অসহ্যসৌন্দর্য;' এবং 'অস্পষ্টগুলি' দাঁড়িয়েছে। সংকলনে কবিতার

৭ম চরণের শেষে যে স্তবক বিন্যাস চোখে পড়ে, সেটি আদিতে বা 'কয়েকটি কবিতা' গ্রন্থে ছিল না। 'ভোরের কলকাতা'-র ৬ষ্ঠ চরণের 'কত ধূসর চোখে' পাঠান্তর হয়ে হয় 'কত উৎসুক চোখে'। 'আমন্ত্রণ' কবিতার ৩য় চরণের 'মোটয়ের উদ্ধতবেগ :-', ৫ম চরণের 'তুমি কি আজ আসবে?', ৬ষ্ঠ চরণের '—নীল, নীলচোখে', ১৪শ চরণের 'অধ্যাপকদের আর্তনাদে', এবং ১৭শ চরণের 'তোমার কাছে আমার দুর্লভ সুযোগ—' পাঠভেদে হয়েছে যথাক্রমে, 'মোটরের উদ্ধত বেগ;', 'তুমি কি আজ আসবে?—', 'নীল, নীল চোখে', 'অধ্যাপকদের বক্তৃতায়', ও 'তোমার কাছে আসার দুর্লভ সুযোগে' 'নাগরিকা' কবিতার ৬ষ্ঠ চরণ 'চোখ যায়—' এবং ৮ম চরণের '—যদি এখনি' রূপান্তরিত হয়েছে 'চোখ যায়' ও 'যদি এখনি'-তে। আর 'মৃত্যু' কবিতার ১ম চরণের 'ধূসর পথে অন্ধকার' এবং ৬ষ্ঠ চরণের 'শূকরের চামড়ার মতো,' সংকলনে হয়েছে 'পিচের পথে অন্ধকার' ও 'শূয়রের চামড়ার মতো'। এই কাব্যের 'বসন্ত' কবিতাটি সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। 'অগ্নিবর্ণ' কবিতার ৮ম চরণের 'প্রতীক্ষায় কম্পমান' পাঠান্তরে 'প্রতীক্ষায় স্পন্দমান'। 'নাগরিক' কবিতার ১৬শ পংক্তির 'মাঝখানে ধূসরপথ', ২১তম পংক্তির 'কোন দ্বীপ থেকে,—', ২২তম পংক্তির 'ফেনায় ধূসর-সবুজ জল', ২৬তম পংক্তির 'ইঁটের অরণ্য,—', ৩৬তম পংক্তির 'বসন্ত বাতাসে', ৩৭তম পংক্তির '—স্কুল আর কলেজ' ও ৫০তম পংক্তির 'শুধু অনুভব করি—' পাঠ ভেদে হয়ে গেছে সংকলনে 'মাঝখানে গেরুয়া পথ,', 'কোনো দ্বীপ থেকে,' 'ফেনায় ধোঁয়াটে সবুজ জল', 'ইঁটের অরণ্য,' 'বসন্ত বাতাসে—', 'স্কুল আর কলেজ' এবং 'শুধু অনুভব করি'। এই কবিতার ৩৫তম পংক্তির পরে কোনো স্তবক বিভাজন আদিতে ছিল না। 'সমর সেনের কবিতা' সংকলনের ১ম সংস্করণেও ছিল অনুপস্থিত। কিন্তু ২য় এবং তার পরবর্তী সংস্করণ থেকে এই স্তবক বিভাজন স্পষ্ট হয়।

'মরুভূমিতে মৃত্যু' কবিতাটির শিরোনাম পরিবর্তিত হয়েছে সংকলনে 'স্বর্গ হতে বিদায়' নামে। এবং সেখানের '১' সংখ্যক কবিতার শিরোনাম, 'অলকা' বর্জিত। অনুরূপভাবে 'কয়েকটি কবিতা'-র 'অকালবসন্ত' শিরোনামের কবিতাটি পুরোপুরি অগ্রস্থিত। 'রামগিরিতে কতদিন শীর্ষক কবিতাটি শিরোনাম বর্জিত হয়ে '২' সংখ্যক-এ স্থান পেয়েছে। 'স্বর্গ হতে বিদায়' ও এর মতোই শিরোনাম ছাড়া '৩' সংখ্যাকেও '১৯০০' শীর্ষক কবিতাটি শিরোনাম ছাড়া '৪' সংখ্যক অবস্থান করেছে। আবার এখানের 'অলকা' কবিতার ৩য় পংক্তির 'ধূসর শহর' এবং ৭ম পংক্তির 'রাত্রে, চাঁদের আলোয়' পাঠভেদে সংকলনের '১' সংখ্যকে দাঁড়িয়েছে 'মুখর শহর' ও 'রাত্রে চাঁদের আলোয়'-তে। '১৯০০' কবিতার ৩য় পংক্তির 'উড়ন্ত পাখির মতো', এবং ৯ম পংক্তির 'উড়ন্ত সাপের মতো—' সংকলনেব '৪' সংখ্যকে হয়েছে 'উড়ন্ত পাখির মতো'। ও 'উড়ন্ত পাখির মতো'। 'মদন ভস্মের প্রার্থনা' কবিতার ৬ষ্ঠ চরণের 'রাত্রে ধূসর প্রেম ঃ' হয়েছে পাঠ ভেদে 'রাত্রে নিবিড় প্রেম'। সেই সঙ্গে লক্ষিত হয় 'কয়েকটি কবিতা' কাব্যের '১৯৩৭' শীর্ষকের চারটি কবিতা—'১৯৩৭', 'পোষ্টগ্রাজুয়েট', 'বসন্তের গান' এবং 'যদি কোনোদিন'

'সমর সেনের কবিতা' সংকলনে সংকলিত হয়নি। এই কাব্যের শেষ কবিতা 'একটি বেকার প্রেমিক'-এর ৯ম পংক্তির 'মাঝে মাঝে বলি—' পাঠান্তরে সংকলনে দেখা যায় 'মাঝে মাঝে বলি :'. হিসেবে।

মোট তিনটি গুচ্ছ সমন্বিত হয়ে প্রকাশিত হয় কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'গ্রহণ'।[৩] ভিতরে বই-এর নাম লেখা আছে 'গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা'। যাইহোক প্রথম দুটি গুচ্ছে দু'টি করে এবং শেষ গুচ্ছে দশটি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়। 'সমর সেনের কবিতা' সংকলনে এ কাব্য গ্রন্থের উল্লেখ নেই। অথচ '১৯৩৭-১৯৪০' সালের পর্ব বিভাগে এ কাব্যের কবিতাবলী অন্তর্ভুক্ত। বলাবাহুল্য সেখানে গুচ্ছ বিভাগের কোনো ইঙ্গিত মেলে না।

এ কাব্যের প্রথম কবিতা 'অখ্যাত নায়ক', 'সমর সেনের কবিতা'-র প্রথম থেকে তৃতীয় পর্যন্ত ও পঞ্চম সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। কিন্তু চতুর্থ ও ষষ্ঠ সংস্করণে গ্রন্থিত হয় এটি। আলোচ্য কবিতার ৪র্থ পংক্তির 'মোটারের সীটে' এবং ১০ম পংক্তির 'ফিরিঙ্গির ভিড়,' পাঠভেদে সংকলনে হয়েছে যথাক্রমে 'মোটরের সীটে' এবং 'ফিরিঙ্গিদের ভিড়'। 'পুনরুজ্জীবন' কবিতাটি কোনো সংস্করণেই অন্তর্ভুক্ত হয় নি। একাব্যের 'ঘরে বাইরে' কবিতার সূচনায় যে উদ্ধৃতি—'I have been born, and once is enough' লক্ষিত হয়, সেটি সংকলনে বর্জিত। উল্লিখিত কবিতার ৭ম পংক্তির 'সময়ের চূর্ণ পাহাড়ে' আদিতে 'কবিতা' পত্রিকায়[৪] প্রকাশ কালে ছিল 'ইতিহাসের চূর্ণ পাহাড়ে'। ১৪শ পংক্তির 'অরণ্যে প্রেম;' পাঠভেদে হয়েছে 'স্বয়ংবরা প্রেম;'। সংকলনে এই কবিতার ২৫তম পংক্তির পরে যে স্তবক বিভাজন বর্তমান, আদিতে তা ছিল না। আবার ৩৩তম পংক্তির 'অষ্টপ্রহর কাঁপে' অংশটি 'কবিতা' পত্রিকায়[৫] প্রকাশিত হয়েছিল 'চব্বিশ প্রহর কাঁপে'-এই বলে। এবং ৩৭ তম পংক্তির 'কালের গলিত গর্ভ' ছিল ঐ 'কবিতা' পত্রিকাতেই 'ইতিহাস গলিত গর্ভ'। 'সন্ধ্যা ও প্রভাত' কবিতাটি 'কবিতা' পত্রিকায়[৬] ছিল 'কয়েকটি দিন' শিরোনামে। অন্যদিকে, 'গ্রহণ' কাব্যের 'কয়েকটি দিন' নামক আরেকটি কবিতার ৭ম পংক্তির 'সন্ধ্যায় শৃগাল', ১১শ পংক্তির 'নববর্ষের নাগারক' যথাক্রমে পাঠভেদে দাঁড়ায় 'সন্ধ্যায় শেয়াল', 'নববর্ষের নাগর'। 'একটি বুদ্ধিজীবী' কবিতায় ৭ম পংক্তির 'জরার যন্ত্রণা', হয়েছে 'জরার যন্ত্রণা;'।

'চিত্রাঙ্গদা' কবিতার দ্বিতীয় স্তবকটি, অর্থাৎ—

'বিকেলের পড়ন্ত রোদে আসন্ন বসন্তের গান
ক্লীবের কুন্তল কানে, বিজয়ী অর্জুন আজ
পণ্য যুবতী সংকুল পথে সঙ্গোপনে ঘোরে,
কালের ক্ষুধিত ক্ষত ম্লানমুখে।'[৭]—অংশটি সংকলনে বর্জিত।

একাব্যের 'সংক্রান্তি' কবিতাটি সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। 'বসন্ত' কবিতাটিও অনুরূপে চতুর্থ এবং ৬ষ্ঠ সংস্করণে বর্জিত হয়েছে। কাব্যগ্রন্থের 'For Thine is the Kingdom' শিরোনামটি সংকলনে পাঠভেদে হয়ে যায় 'একমাত্র তোমাকে সত্য বলে মানি'। এই

কবিতার ১৫শ চরণের 'বাঁশি বাজে' ও ২৭ তম চরণের 'এই বলে মানি ঃ' পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে 'বাঁশি বাজে;' এবং 'এই বলে মানি'। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয়, ১৬শ পংক্তির পর যে স্তবক বিভাজন সংকলনে দেখা যায়, তা কাব্য গ্রন্থে ছিল না। 'বিতর্ক' কবিতার শিরোনাম সংকলনে হয়েছে 'নিরালা'। বিশেষ করে 'বিতর্ক' কাবিতার ১ সংখ্যক কবিতাটি সংকলনে অন্তর্ভুক্ত। ২ সংখ্যক কবিতাটি যথা—

'যদিচ ধূর্ত কাম, লোল বুদ্ধি লোভ
আর অদৃশ্য গুঁড়িমারে কতো রোগ পালে-পালে,
পিছনে কঙ্কাল দূত,
তবু বিলাপের কাল চিরকাল থাকে না,
আমি মানি, এর পরে ঠিক বন্যা নয়,
হয়ত অনেক যন্ত্রণার পর,
নগর মন্থনে নীলকণ্ঠ আকাশের তলে
এক শ্রেণীহীন সাম্য রাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত পৃথিবী।
অথচ নিঃসংকোচ শরীর, স্বচ্ছ চোখ,
প্রায় ব্রজবুলির মতো মধুর নতুন প্রেম,
এই সব ক্লান্ত রোমন্থন
আর নিষ্ফল বিকারের শেষে
চকিত মৃত্যুর চরম লজ্জা বুঝি ভালো।
নর্দমায় স্বচ্ছ জল কখনো মেলে না,
সবচেয়ে ভালো
জন্মমৃত্যুর এই মধ্যস্থ পৃথিবীতে
নিরপেক্ষ মড়কের বীজ হয়ে আসা।''[৮] —অংশটি

কিন্তু সংকলনে বর্জিত হয়। আর 'অজ্ঞাতবাস' কবিতার সূচনায় প্রথম চরণ—'মনে পড়ে,' সংকলনের সব সংস্করণেই সংযোজিত। এটি কাব্যে বা আদিতে ছিল না। এই কবিতারই ২৩তম চরণ 'পলায়নজীবিকা,' পাঠভেদে সংকলনে হয় 'পলায়ন জীবিকা আমার,' 'বক ধার্মিক' কবিতার ২১ তম পংক্তির 'পণ্ডিচেরী যাব!', ২২তম পংক্তির '—সকালে' এবং ২৩তম পংক্তি 'যদি দেখি—' পাঠান্তরিত হয়ে হয়েছে যথাক্রমে—'পণ্ডিচেরী যাব!—', 'সকালে' ও 'যদি দেখি'। এ কাব্যের নাম কবিতার ১২শ পংক্তির 'জনহীন বাসে চেপে' রূপান্তরিত হয় 'প্রায়-খালি বাসে চেপে'-তে। এ কবিতারই ২৫তম পংক্তির পরে যে স্তবক বিভাজন সংকলনে লক্ষিত, তা আগে ছিল না। 'কানাকড়ি' কবিতাটি আবার 'সমর সেনের কবিতা'র চতুর্থ ও ষষ্ঠ সংকরণে বর্জিত। অন্য দিকে এ কাব্যের 'যাত্রা' কবিতাটি কোনো সংকলনেই অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

কবির তৃতীয় কাব্য, 'নানাকথা'[৯] পনেরোটি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হলেও পরবর্তীকালে 'সমর সেনের কবিতা'য় কাব্য-নামটি বাদ পড়ে। অবশ্য '১৯৪০-১৯৪২' সাল পর্বের

কবিতাগুলিই এ কাব্য গ্রন্থের কবিতা। সেই সঙ্গে উল্লেখ্য, 'সাফাই,' 'ঘরোয়া' ও 'সারণের গান' কবিতা তিনটি সংকলনে বর্জিত।

কাব্যের প্রথম কবিতা, 'রোমন্থন'-এর ৭ম পংক্তির 'জীবন যাত্রা,' পাঠভেদে দাঁড়ায় 'জীবন যাত্রা'। 'হসন্তিকা' কবিতার '২' সংখ্যক অংশের ২য় পংক্তির 'ভোঁতা বর্শায়' পদটি সংকলনে হয় 'ভোঁতা বর্ষায়'। আমাদের মনে হয় এটি মুদ্রণ প্রমাদ। '৩' সংখ্যক কবিতায় ২য় স্তবক প্রথম প্রকাশ কালে 'ভারতবর্ষ' শিরোনামে[১০] প্রকাশিত হয়। পরে এই শিরোনাম কোথাও অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এবং প্রথম প্রকাশকালে ৪র্থ পংক্তির 'উদ্ধৃত পাহাড়ে এক' অংশটি পাঠভেদে কাব্যে ও সংকলনে নির্দ্বিধায় হয়েছে 'স্থবির পাহাড়ে এক'। 'হসন্তিকা'র '৩' সংখ্যক কবিতায় ৩য় স্তবকের ১ম পংক্তিতে উক্ত 'মোটারে' ও 'ফ্যাক্টরী' পদ দুটি যথাক্রমে হয়েছে পাঠভেদে 'মোটরে' এবং 'ফাক্টরী'। আবার '৪' সংখ্যক কবিতার ৬ষ্ঠ পংক্তি 'আমার দেশে দু'ধারে স্তব্ধ ধূসর মাঠ' সংক্ষেপিত করণের ফলে দাঁড়িয়েছে 'আমার দেশে দু'ধারে ধূসর মাঠ'। 'পরিস্থিতি' কবিতার ১৪ শ পংক্তির 'অলীকস্বর্গ থেকে' অংশটি সংকলনের একমাত্র ষষ্ঠ সংস্করণে পাঠান্তরিত 'অলীক স্বপ্ন থেকে'। 'কয়েকটি মৃত্যু' কবিতার '১' সংখ্যক অংশের ৬ষ্ঠ পংক্তি 'আর একটি গুণ,—' রূপান্তর ঘটে হয়েছে 'আর একটি গুণ—' এ। 'ঘরে বাইরে' কবিতার দ্বিতীয় অংশ 'স্থানীয় ফ্লাড রিলিফ' পর্বের ৬ষ্ঠ পংক্তির 'মন্ত্রী কী করেন' পাঠভেদে দাঁড়ায় 'মন্ত্রী কী বলেন'। এই পর্বেরই ৯ম পংক্তি 'যাতায়াতী খরচ যত' এবং ১০ম পংক্তির 'পৈত্রিক রসদ' হয়ে গেছে যথাক্রমে 'যাতায়াতী খরচ কত' ও 'পৈটিক রসদ'। 'নানাকথা' কাব্যের 'খোঁয়ারি,' কবিতার শিরোনাম সংকলনে বর্জিত। এবং এই কবিতার প্রথম থেকে তৃতীয় স্তবক পর্যন্ত অর্থাৎ—

'মুছে গেল রাতের জঞ্জাল;
এবার এককাপ চা, ঠাণ্ডা স্নান,
সূর্য ওঠে কুয়াশা ছিঁড়ে, মিনার জ্বলে.
আবার শুরু হয় নগরের প্রাণ।
          কানে বাজে কাল রাতের গান
শব্দহীন মন,
বিরস এ দিন আমার।
শ্বেতপাথরে সূর্যের আলো লাগে,
নবাবী আমল, শৌখিন প্রাণ,
সন্ধ্যায় লাল মসজিদে আজান
কানে বাজে কাল রাতের গান
  *   *   *
আশ্চর্য ব্যাপার সব অভ্যাসে পরিণত,
সবি নিয়তির খেলা, বিষচক্রে জীবন টিমে।

আর কতদিন এ নগর
হাততালি দেয় শৌখিন নগর।'[১১]

—অংশটি সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। অন্যদিকে চতুর্থ ও পঞ্চম স্তবক সংকলনের 'শবযাত্রা' নামক কবিতার '১' সংখ্যক রূপে সন্নিবেশিত। যদিও চতুর্থ স্তবকের ৮ম থেকে ১০ম পর্যন্ত পংক্তি, অর্থাৎ—

'উজ্জীবনের উৎস নেই,
এ গাম্ভীর্য সমাহিত শান্তির নয়,
অবক্ষয়ের উচ্ছিষ্ট মাত্র।' —অংশটুকু সংকলনে বর্জিত।

'সমর সেনের কবিতা' সংকলনের 'শবযাত্রা' কবিতার '২' সংখ্যক লেখাটিই ছিল আদি 'শবযাত্রা' কবিতার '১' সংখ্যক অংশ। অনুরূপভাবে আদির '২' সংখ্যাক কবিতাটি পরে হয় '৩' সংখ্যক কবিতা। '৩', '৪', '৫', '৬', ও '৯', সংখ্যক কবিতাগুলি যথাক্রমে হয়েছে '৪', '৫', '৬', '৭', ও '৮', সংখ্যক কবিতা। অবশ্য আদি 'শবযাত্রা'র '৭' ও '৮' সংখ্যক কবিতাগুলি পরবর্তীকালে বর্জিত। অর্থাৎ—

'৭

ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মানুষ, ছিন্ন পত্র হাওয়ায়,
এ প্রাচীন জরদগব দেশে
বিরোধী স্বার্থের হীন সন্ধিতে
জন সমুদ্র চক্রান্তের সেতুবন্ধে বাঁধা,
আর স্লোগানে আর স্বদেশি গানে
সরবে মাঝে-মাঝে রাস্তার মোড় ভরে।
আমাদের সব আশা আজ আকাশ কুসুম।
লোকে লোকারণ্য, কত লোক,
রক্তাক্ত শরীর,
অনেক পঙ্গু আর কবন্ধের ভিড়,
পায়ে-পায়ে অনেক প্রাণহীন দেহ লাগে,
অগণন জনগণ অচিরাৎ মিশে যাবে এ-ভিড়ে
রক্তাক্ত শরীর

বিতর্ক বৃথা; আজ হৃদয় সংকীর্ণ গলি,
পুঞ্জীভূত জঞ্জাল, দুর্বার দক্ষিণের দিন
ফেরে না আর ফাল্গুনের অপরাহ্নে
চকিতে আলোড়িত করে ধোঁয়াটে শহর;

দিনরাত্রি লোহিত ধূলোয় রুদ্ধমুখ আকাশ;
বিতর্ক বৃথা; আজ হৃদয় সংকীর্ণগলি'[১২]

—অংশটি সংকলনে গৃহীত হয় নি। আর এ কবিতার আদিতে যা ছিল '২' সংখ্যক, পরে যা হয়েছে '৩' সংখ্যক—সেই অংশের ১৭শ পংক্তির 'আবার সঙ্গোপন ঘরে' পাঠভেদে 'আবার সঙ্গোপনে ঘরে' -তে রূপান্তরিত।

এ কাব্যের নাম কবিতা, অর্থাৎ 'নানা কথা'র '১' সংখ্যক অংশের ১৭শ ও ১৮শ পংক্তি— 'বলি, দুর্ধর্ষ কসাকেব গান কখনো স্তব্ধ হবে না;
ক্ষণে-ক্ষণে দিকে-দিকে অট্টহাসি শুনি।'

সংকলনে পরিত্যক্ত। সেই সঙ্গে সংকলনে ১৯শ পংক্তির পরে যে স্তবক বিভাজন লক্ষিত হয়, সেটি আদি কবিতায় ছিল না। এ কবিতার '৩' সংখ্যক অংশের ১ম পংক্তি 'বহুদিন আশা ছিল,—আশার ছলনা ঃ 'পরিবর্তিত হয়েছে 'বহুদিন আশা ছিল—আশার ছলনা-' এ। আর ৩য় পংক্তির 'মোট দু-তিনটি' হয়েছে 'মোট দু তিনটি'। '৪' সংখ্যক কবিতার আবার ১০ম ও ১১শ পংক্তি দুটির মাঝে আদিতে যে তারকা চিহ্ন দিয়ে স্বতন্ত্র করা ছিল. সেটির পরবর্তীকালে শুধুমাত্র ১০ম পংক্তির শেষে তারকা চিহ্ন বর্তমান। দুটি পংক্তির মাঝে বড়ো ফাঁক নেই। অর্থাৎ—

'বোধ হয় কখনো লাগবে না।

এ লক্ষ্মীছাড়া দেশ ছাড়ুন মশাই,'

এটির পরিবর্তিত রূপ হল :

'বোধ হয় কখনো লাগবে না।......
এ লক্ষ্মীছাড়া দেশ ছাড়ুন মশাই.'

এছাড়া এই অংশের ২১তম পংক্তি 'কলে বিকল মূষিকের সঙ্গে' পাঠান্তরিত রূপ হয়েছে 'কলে বিকল ইঁদুরের সঙ্গে'। এ কবিতার '৬' সংখ্যক অংশের ১৩শ পংক্তির 'পশ্চিম আকাশের সোনালী ফসল' ৩৩তম পংক্তির ও 'জানি, এরা নয়'। পাঠভেদে দাঁড়ায় 'পশ্চিম আকাশে সোনালী ফসল' ও জানি, ওরা নয়'। অনুরূপে লক্ষিত হয় 'পঞ্চম বাহিনী' কবিতার '১' সংখ্যকের ৪র্থ পংক্তির 'মোটার'. ১৬শ পংক্তির 'ইয়ে কালাবুরখায়', ২১তম পংক্তির 'বাংলার শের' পাঠান্তরে হয়েছে যথাক্রমে 'মোটর', 'ইস্ কালে বুরখেমে', 'বংগালকী শের' ইত্যাদি। '৩' সংখ্যক অংশে আবার ১ম পংক্তির 'মেকলের শিক্ষাপ্রাপ্ত' সংক্ষেপিত হয়েছে শুধু 'মেকলের' -তে। এবং ১৫শ পংক্তির 'চরম চিত্তশুদ্ধিতে' অংশটুকু রূপান্তরে দাঁড়ায় 'পরম চিত্ত শুদ্ধিতে'। প্রসঙ্গত এও উল্লেখ যে, কাব্যগ্রন্থে কয়েকটি কবিতার পাদদেশে প্রকাশিত রচনা কালের নির্দেশ থাকলেও সংকলনে সেগুলি বর্জিত।

সমর সেনের চতুর্থ কাব্য 'খোলা চিঠি'[১৩] সাতটি কবিতা সমন্বয়ে আত্মপ্রকাশ করে। অপরাপর কাব্যের মতো এ কাব্যটির নামও 'সমর সেনের কবিতা' সংকলনে অনুল্লিখিত।

অবশ্য '১৯৪২-১৯৪৩' পর্বের কবিতাগুলিই এ গ্রন্থের কবিতা। '২২ শে জুন' নামের কবিতাটি সংকলনে স্থান পায়নি।

কাব্যের, প্রথম কবিতা 'পোড়ামাটি' সংকলনে হয়েছে 'পোড়োমাটি'। এবং কবির উৎসর্গ ছিল 'অ.মি.কে.'—সেটিও পাল্টে পরে করেন 'অশোক মিত্রকে'। 'ইতিহাস' কবিতার ১৫শ পংক্তির 'জল ঝলকায়,—' হয়েছে 'জলঝলকায়—'। 'একটি শহর কবিতার শিরোনাম সংকলনে 'স্টালিনগ্রাড' এ পরিবর্তিত। আর এক কবিতার ১৩শ পংক্তির 'লোলগর্বে আসে' রূপান্তরের পরে হয়েছে 'লোলপর্বে আসে',। এ কাব্যের 'নাম' কবিতার ৬ষ্ঠ পংক্তিকে যেমন সংকলনে দুটিতে বিভক্ত করে প্রকাশ করেছেন, অর্থাৎ—'বিমান ঘাঁটিতে হঠাৎ হাজিরা দেয়; এখনো পড়েনি বাজ, চলে কুচকাওয়াজ', সংকলনে হয়েছে :

'বিমান ঘাঁটিতে হঠাৎ হাজিরা দেয়;
এখনো পড়েনি বাজ, চলে কুচকাওয়াজ'

তেমনি এ কবিতারই ৪৩ তম পংক্তি 'আজ ছিন্ন ভিন্ন প্রাণপলাশ, রক্তকরবী; অন্ধকার সূর্যের খনি ধ্বনি প্রতিধ্বনি' সংকলনে দুটি পংক্তিতে বিভক্ত হয়ে উপস্থাপিত হয়েছে।

'আজ ছিন্ন ভিন্ন প্রাণপলাশ, রক্তকরবী,
অন্ধকার সূর্যের খনি ধ্বনি প্রতিধ্বনি'।

২৪ তম পংক্তির 'এ দেশ,—' পাঠভেদে দাঁড়িয়েছে 'এ দেশ-' এ। ৩৭তম পংক্তিতেও অনুরূপভাবে 'ফসলের দিন গোনে,' রূপ পাল্টে সংকলনে হয়েছে 'ফসলের দিন গোনে'-তে। ৫০ তম পংক্তি 'নির্মম সঙিনে' পাঠান্তরে দাঁড়ায় 'নির্মম সঙ্গিনে'। 'আত্মসমালোচনা' কবিতার ষষ্ঠ পংক্তি 'এদেশকে নির্বিকারে বলাৎকার করে' পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে 'এদেশকে নির্বিকারে করে বলাৎকার'।

'জাতীয় সংকট' কবিতার শিরোনামটি সংকলনে হয়েছে 'ক্রান্তি'। এবং এই কবিতার '১' সংখ্যক শিরোনামটি 'কবিতা'[১৪] পত্রিকায় প্রকাশ কালে ছিল 'আগস্ট ১৯৪২' নামে। পরবর্তীকালে এটি বর্জিত হয়। ঐ একই পত্রিকায় '২' সংখ্যক অংশের শিরোনাম ছিল 'খোঁয়াড়'। এটিও পরে বর্জিত। অনুরূপভাবে '৩' সংখ্যক '৭' সংখ্যক পর্যন্ত অংশের প্রত্যেকেরই 'কবিতা'[১৫] পত্রিকায় প্রকাশ কালের শিরোনাম '১৯৪৩'। বলা বাহুল্য, এ শিরোনামটিও পরে বর্জিত। এ কবিতার '৩' সংখ্যক অংশের ৬ষ্ঠ চরণের 'দুর্ভিক্ষের নিদারুণ ছাপ' অনায়াসে হয়েছে 'দুর্ভিক্ষের করাল ছাপ'। '৪' সংখ্যকের ১০ম চরণের পরে তারকা চিহ্ন (***) মাধ্যমে যে স্তবক বিভাজন কাব্যে লক্ষিত, তা সংকলনে পরিত্যক্ত। ২৬ তম পংক্তির 'চকিতে,—' পাঠন্তরে হয় 'চকিতে—'। ৪৩তম পংক্তি—'কিম্ভূত কিম্মাকার জীবে আচ্ছন্ন নিঃসঙ্গতায়' সংকলনে বর্জিত। এবং পরবর্তী পংক্তি 'অস্থিচর্মসার সন্তানের ভিড়ে নীরবে বসে।' পাঠভেদে সংকলনে 'লঙরের সামনে অস্থি চর্মসার সন্তানের ভিড়ে নীরবে বসে'। '৫' সংখ্যক অংশে ৭ম পংক্তির পরে যে

স্তবক বিভাজন কাব্যগ্রন্থে লক্ষিত, সেটি সংকলনে পরিত্যক্ত। '৭' সংখ্যকে ৯ম পংক্তির 'ইতিহাস পতি!' এবং ১৫শ পংক্তির 'প্রচ্ছন্ন কামান!' যথাক্রমে হয়েছে 'ইতিহাস গতি' ও 'প্রচ্ছন্ন কামান।'

পঞ্চম ও শেষ কাব্যের নাম 'তিন পুরুষ'।[১৬] দুটি গুচ্ছে বিভক্ত তেরোটি কবিতার সমন্বয়ে এই গ্রন্থ। প্রথম গুচ্ছটির কোনো নাম নেই। এতে তিনটি কবিতা আছে। অন্যদিকে বাকি দশটি কবিতা নিয়ে অপর গুচ্ছটির নাম 'তিনপুরুষ'। সংকলনে অন্যান্য কাব্যের মতো এটিরও গ্রন্থনাম বর্জিত। অবশ্য '১৯৪৩—১৯৪৪' পর্বে একাব্যের কবিতাবলীর সন্নিবেশ ঘটেছে। 'তিনপুরুষে'র 'একটি পুরনো কবিতা' ও 'কালের যাত্রা' কবিতা দুটি সংকলনে পরিত্যক্ত।

'একটি পুরনো কবিতা'—আদিতে 'দুর্দিন' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রতিরোধ' শারদীয় ১৩৪৯-এ।[১৭] ১৯৪২-এ লেখা কবিতাটি অব্যবহিত পরে প্রকাশিত 'খোলা চিঠি' (১৯৪৩) তে প্রকাশিত হয়নি। অনেক পরে এই কবিতাটি 'তিনপুরুষে' ছাপার কালে 'দুর্দিন' থেকে ভিন্ন হয়ে প্রকাশিত হয়। 'দুর্দিন' কবিতার তিনটি স্তবক তেরোটি পংক্তি ছিল। কিন্তু 'একটি পুরনো কবিতা'য় দুটি স্তবক। প্রথম স্তবক অর্থাৎ ছয়টি পংক্তি সেখানে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এবং কবিতার শেষ পংক্তি 'হিট্‌লার, টোজোর এ গুপ্ত জাতভাই' বদলে যায়। 'একটি পুরনো কবিতা'য় শেষ লাইনটি আগের একটি লাইনকেই পুনরায় অনুসরণ করে। অর্থাৎ 'লবেজান সামুরাই!' পংক্তিটিই পুনরাবৃত্ত হয়।

'আকাল' কবিতার শিরোনাম পাঠান্তরে সংকলনে 'আকাশ'-এ দাঁড়িয়েছে। অনুরূপভাবে কাব্যের 'বাবুবৃত্তান্ত' শিরোনামটিও সংকলনে পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে 'আনন্দমঠ'। 'বাবুবৃত্তান্তে'র 'এক' সংখ্যক কবিতার ৩য় চরণের 'যবন কালে ধরেছি উপনিষদ' পাঠভেদে হয় 'যবনকালে সেজেছি বৈষ্ণব'। এই স্তবকের ৮ম পংক্তি থেকে ১৪ শ পংক্তি পর্যন্ত অংশ সংকলনে বর্জিত। সংকলনে 'দুই' সংখ্যক স্তবকটিও পুরোপুরি বর্জিত।

'বিকলন' কবিতার ৮ম চরণের 'গভীর রাত্রে, দেবী, চাঁদ ওঠে' পাঠভেদে সংকলনে হয় 'গভীর রাত্রে চাঁদ ওঠে': 'গৃহস্থ বিলাপ' কবিতার 'এক' সংখ্যক অংশের ১৪ শ পংক্তির 'নদীর উদ্দামবেগ' যেমন পাঠভেদে হয় 'পদ্মার উদ্দামবেগ', তেমনি ১৭শ পংক্তি 'দেবী তাঁকে স্বপ্নে করেছেন বরদান' হয় 'দেবী তাঁকে স্বপ্নে বর দেন'। এই কবিতার 'তিন' সংখ্যক অংশে ৪র্থ পংক্তির পরে যে স্তবক বিভাজন লক্ষিত তা পরবর্তীকালে বর্জিত হয়। কিন্তু 'চার' সংখ্যক অংশে ৮ম পংক্তির পরে কাব্যে কোনো স্তবক বিভাজন ছিলনা, অথচ সংকলনে স্তবক বিভাজন বর্তমান।

'নাচিকেত' কবিতায় পাঠ ভেদের ফলে ৬ষ্ঠ চরণের 'কাঁধে হাত রেখে, দেখো, চলে' হয় 'কাঁধে হাত রেখে চলে'। কাব্যগ্রন্থের 'সাফাই' কবিতার প্রতিটি স্তবকের 'এক' 'দুই' ইত্যাদি করে যে শিরোনাম লক্ষিত হয়। সংকলনে স্তবক বিভাজন বর্তমান থাকা সত্ত্বেও কোনো শিরোনাম ব্যবহৃত হয়নি। অবশ্য সেখানে মূল শিরোনাম 'সাফাই' এর পরিবর্তে

'নষ্টনীড়' ব্যবহৃত। এই কবিতার 'তিন' সংখ্যক অংশটি সংকলনে '২২শে জুন' কবিতার '১' সংখ্যক অংশ রূপে অন্তর্ভুক্ত। আর 'চার' সংখ্যা কবিতাংশটি সংকলনের প্রথম তিনটি সংস্করণ ও পঞ্চম সংস্করণে বর্জিত। চতুর্থ এবং ৬ষ্ঠ সংস্করণে অবশ্য '২২শে জুন' কবিতার '২' সংখ্যক অংশ হিসাবে সংযোজিত হয়েছে। 'সাফাই' কবিতার 'এক' সংখ্যক স্তবকের ৫ম পংক্তি 'বাংলার ঘরে গুপ্তচব এ-জিজ্ঞাসা' পাঠান্তরে হয়েছে 'বাঙলার ঘরে ঘরে গুপ্তচর এ-জিজ্ঞাসা' এবং ষষ্ঠ পংক্তির 'ভিটে ভাঙার পালা কি এবার এল!' পাঠভেদে হয়েছে 'ভিটে ভাঙার পালা কি এল এবার?' তেমনি 'দুই' সংখ্যকের ৩য় পংক্তির 'সবুজ ধানে,—' দাঁড়ায় 'সবুজ ধানে—'। এই কবিতার 'তিন' সংখ্যকের ২০ তম ও ২১ তম পংক্তি দুটি সংকলনের '২২ শে জুন' কবিতার '১' সংখ্যকে এক পংক্তিতে পরিণত হয়েছে। অনুরূপভাবে, ২৩ তম ও ২৪ তম পংক্তি দুটিও সংকলনে এক পংক্তিতে পরিণত হয়েছে।

'২২ শে জুন ১৯৪৪' কবিতাটি সংকলনে শুধু '২২শে জুন' শিরোনামে বিধৃত। কিন্তু কাব্যের 'এক' সংখ্যক স্তবকটি সংকলনে বর্জিত। এই স্তবকের ২য় পংক্তি 'দেশ বিদেশি পল্টনে দিগ্বিদিক ভরে'—'কবিতা'[১৮] পত্রিকায় প্রকাশ কালে ছিল 'টম হাতে খায়, হরি কাটা চামচে ধরে'। 'দুই' সংখ্যক স্তবকটি, সংকলনের প্রথম তিনটি এবং পঞ্চম সংস্করণে '২' সংখ্যক কবিতাংশরূপে বিন্যস্ত ছিল। কিন্তু চতুর্থ ও ষষ্ঠ সংস্করণে আবার এটি '৩' সংখ্যাকে স্থান পায়। এই স্তবকের ৮ম পংক্তির 'মানুষের খুন' পদটি উক্ত 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশ হয় 'মানুষের খুন!' হয়ে। এবং সংকলনে হয় 'মানুষের খুন।' অনুরূপভাবে 'কবিতা' পত্রিকার প্রকাশ কালে এই স্তবকের ১১শ পংক্তির 'পলিমাটি হাসে।' পদটির পাঠান্তর হল 'পলিমাটি জমে;'-তে। 'তিনপুরুষ' কাব্যে আলোচ্য কবিতাটির 'তিন' সংখ্যক স্তবকটি সংকলনের চতুর্থ ও ষষ্ঠ সংস্করণের '৩' সংখ্যক স্তবকের দ্বিতীয় অংশরূপে লক্ষিত। কিন্তু প্রথম থেকে তৃতীয় এবং পঞ্চম সংস্করণে এটি '২' সংখ্যকের দ্বিতীয় অংশরূপে অন্তর্ভুক্ত। আবার 'চার' সংখ্যক স্তবকটি সংকলনের প্রথম থেকে তৃতীয় এবং পঞ্চম সংস্করণে বর্জিত। চতুর্থ ও ষষ্ঠ সংস্করণে এটি '৪' সংখ্যক স্তবকরূপে অন্তর্ভুক্ত। এই স্তবকের ৩য় পংক্তির 'গোধূলির ছাপ' পদটি পরিবর্তিত হয়ে সংকলনের চতুর্থ ও ষষ্ঠ সংস্করণে হয়েছে 'গোধূলির ছায়া'। ৮ম পংক্তির 'ক্রমে আসে নতুন প্রভাত'—অংশটি 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশ কালে ছিল 'রাত্রি ছেঁড়ে আলোর করাত'। ঐ একই 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত এই স্তবকের ১১শ পংক্তির 'অচেনা যাত্রীরা—' পাঠান্তরের ফলে হয়েছে 'অচেনা যাত্রীরা'। ১৫শ পংক্তি 'এখনো তোমাকে ডাকে রঙিন গলিতে' পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে 'তোমাকে এখনো ডাকে রঙিন গলিতে'। এবং ১৪শ পংক্তির 'গয়না' শব্দটি সংকলনের চতুর্থ ও ষষ্ঠ সংস্করণে হয় 'গহনা'।

উপসংহারে একথাই বলা যেতে পারে, নিজের কবিতার উপর এমন সার্জারি করার সাহস সাধারণত কোনো কবির মধ্যে দেখা যায় না। কিন্তু সদা অতৃপ্ত কবি সমর সেন তা অক্লেশে করেছেন। খুব ভালো হত যদি কবি স্বয়ং এ সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রাখতেন।

তিনি তা রাখেন নি। কেন তিনি এমন কঠোর সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নিজেকে বিদ্ধ করলেন তা আমাদের জিজ্ঞাস্য হলেও, উত্তর জানার আজ আর কোনো উপায় নেই।

উল্লেখপঞ্জী

১. সমর সেন—'কয়েকটি কবিতা'। ১ম সং। কবিতা ভবন। মার্চ ১৯৩৭। অনুষ্টুপ সং। অনুষ্টুপ প্রকাশনী। জানুয়ারী ১৯৮৯।
২. বুদ্ধদেব বসু (সম্পাঃ)—'কবিতা' পত্রিকা। ১ম বর্ষ। ৩য় সংখ্যা। চৈত্র ১৩৪২
৩. সমর সেন 'গ্রহণ'। কবিতা ভবন। ফেব্রুয়ারী ১৯৪০। অনুষ্টুপ সং। অনুষ্টুপ প্রকাশনী। জানুয়ারী ১৯৮৯।
৪. 'কবিতা'। ৩য় বর্ষ। ১ম সংখ্যা। আশ্বিন। ১৩৪৪
৫. তদেব।
৬. 'কবিতা'। ৩য় বর্ষ। ৩য় সংখ্যা। চৈত্র ১৩৪৪
৭. সমর সেন 'চিত্রাঙ্গদা'। 'গ্রহণ'। পৃ. ১৯
৮. তদেব। 'বিতর্ক ২'। পৃ. ২৯
৯. তদেব। 'নানা কথা'। ১ম। কবিতা ভবন। মে ১৯৪২। অনুষ্টুপ সং। অনুষ্টুপ প্রকাশনী। জানুয়ারী ১৯৮৯।
১০. 'অগ্রণী' পত্রিকা। ২য় বর্ষ। ২য় সংখ্যা। ফেব্রুয়ারী ১৯৪০।
১১. সমর সেন— 'খোঁয়ারি'। 'নানা কথা'। পৃ. ২৩-২৪
১২. তদেব। 'শবযাত্রা' '৭' ও '৮'। পৃ. ২৮-২৯
১৩. তদেব। 'খোলা চিঠি'। ১ম সং। কবিতা ভবন। জুলাই ১৯৪৩। অনুষ্টুপ সং। অনুষ্টুপ প্রকাশনী। জানুয়ারী ১৯৮৯।
১৪. 'কবিতা'। ৮ম বর্ষ। ৩য় সংখ্যা। পৌষ ১৩৪৯
১৫. 'কবিতা'। ৮ম বর্ষ। ৪র্থ সংখ্যা। চৈত্র ১৩৪৯
১৬. সমর সেন—তিন পুরুষ। ১ম সং। সংকেত ভবন। জুন ১৯৪৪। অনুষ্টুপ সং। অনুষ্টুপ প্রকাশনী। জানুয়ারী ১৯৮৯।
১৭. সমর সেনের লেখা চিঠি দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে, ৪-৯-৪২ তারিখে। 'চিঠিপত্র' : ২২। 'অনুষ্টুপ'। ২২ বর্ষ। ২য়-৩য় সংখ্যা। ১৯৮৮। পৃ. ১১৯
১৮. 'কবিতা'। ৯ম বর্ষ। ৪র্থ সংখ্যা। আষাঢ় ১৩৫১

গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা গ্রন্থ

অঞ্জন সেন—কবিতার ভাষা। গাঙ্গেয়পত্র। কলকাতা। ১৯৮৬।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—কল্লোলযুগ। ডি এম লাইব্রেরী। কলকাতা। ১৩৬৬

—রচনাবলী। গ্রন্থালয়। কলকাতা। ১৯৭৪। ১ম খণ্ড।

অমিয় চক্রবর্তী—কবিতা সংগ্রহ। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। ১৯৭৭। ১ম খণ্ড

—কবিতা সংগ্রহ। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। ১৯৭৯। ২য় খণ্ড

অরুণকুমার সরকার—তিরিশের কবিতা এবং পরবর্তী। প্যাপিরাস। কলকাতা। ১৯৮১

অশ্রুকুমার সিকদার—আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়। পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত ২য় সং। অরুণা প্রকাশনী। কলকাতা। পৌষ ১৩৮৬

আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পা)—আধুনিক বাংলা কবিতা সংকলন। কলকাতা। ১৯৪০

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—গীত : পারমার্থিক ও নৈতিক। গ্রন্থাবলী। বসুমতী কর্পোরেশন। কলকাতা।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার (সম্পা)—পদাবলী। কলকাতা ১৩৫৯

জীবনানন্দ দাশ—কবিতার কথা। ৪র্থ সং। সিগনেট প্রেস। কলকাতা ১৩৮৭

—কাব্যগ্রন্থ। বেঙ্গল পাবলিশার্স। কলকাতা। ১৩৭৮। ১ম, ২য় খণ্ড

জীবেন্দ্র সিংহরায়—আধুনিক কবিতার মানচিত্র। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। ১৯৮৬

ধনঞ্জয় দাশ—মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক। প্রাইমা পাবলিকেশনস্। কলকাতা। ১৯৭৫। ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড

দীনেশচন্দ্র সেন-ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য। জিজ্ঞাসা। কলকাতা। জুন, ১৯৬৯

দীপ্তি ত্রিপাঠী—আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়। ৪র্থ সং। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। ১৯৮৮

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ। আশা প্রকাশনী। কলকাতা ১৩৮১। ১ম খণ্ড

নন্দরাণী চৌধুরী—জীবন অন্বেষায় কবি সমর সেন। পিপলস্ বুক পাবলিশিং। কলকাতা। ১৯৮২

নরেশ গুহ—তাড়ার সমুদ্রঘেরা। আনন্দ পাবলিশার্স। কলকাতা। ১৯৭৬

নীলরতন সেন—প্রসঙ্গ আধুনিক বাংলা সাহিত্য। সাহিত্যলোক। কলকাতা ১৯৮৭

নৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস। ওরিয়েন্ট

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্র জীবনী ও প্রবেশক। ৩য় সং। বিশ্বভারতী। কলকাতা। ১৩৬৮

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—রচনাবলী। ১ম খণ্ড। সাহিত্য সংসদ। ১৩৭৬

বাসন্তী চক্রবর্তী—রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্য। ওরিয়েন্ট বুক। কলকাতা। মাঘ, ১৩৮৭
বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়—আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা। প্রকাশ ভবন। কলকাতা। এপ্রিল, ১৯৬৯
বিষ্ণু দে—এলিয়টের কবিতা। সিগনেট প্রেস। কলকাতা। ১৩৬০
—এলোমেলো জীবন ও শিল্প-সাহিত্য। ইস্ট এণ্ড কোং। ১৯৫৮
—চোরাবালি। সিগনেট প্রেস। কলকাতা। ১৩৬৭।
—জনসাধারণের রুচি। বিশ্ববাণী প্রকাশনী। কলকাতা। ১৯৭৪
—নাম রেখেছি কোমল গান্ধার। ৩য় সং। সিগনেট প্রেস। কলকাতা। ১৩৭০
—বছর পঁচিশ। বিশ্ববাণী। কলকাতা। ১৩৮০
—শ্রেষ্ঠ কবিতা। পরিবর্ধিত ৫ম সং। নাভানা। কলকাতা। ১৯৮৫
বিনয় ঘোষ—মেট্রোপলিটন মন : মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ। ওরিয়েন্ট লংম্যান। কলকাতা। ১৯৭৩
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—নির্বাচিত কবিতা। ২য় পরিবর্ধিত সং। কথাশিল্প। কলকাতা। ১৯৮৬
বুদ্ধদেব বসু—আধুনিক বাংলা কবিতা (সম্পা)। ৫ম পরিবর্ধিত সং। এম সি সরকার। কলকাতা। ১৯৭৩
—কবিতা সংগ্রহ। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। ১৯৮০। ১ম খণ্ড
—কাব্য সংগ্রহ। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। ১ম খণ্ড
—কালের পুতুল। ২য় সং। নিউ এজ পাবলিশার্স। কলকাতা। ১৯৮৪
—রচনাসংগ্রহ। গ্রন্থালয়। কলকাতা। ১৯৮৫। ১ম খণ্ড
—রচনাসংগ্রহ। গ্রন্থালয়। কলকাতা। ১৯৭৬। ৩য় খণ্ড
—রচনাসংগ্রহ। গ্রন্থালয়। কলকাতা। ১৩৮৪। ৪র্থ খণ্ড
—রচনাসংগ্রহ। গ্রন্থালয়। কলকাতা। ১৯৮৫। ৫ম খণ্ড
—রচনাসংগ্রহ। গ্রন্থালয়। কলকাতা। ১৯৮৯। ৮ম খণ্ড
—রচনাসংগ্রহ। গ্রন্থালয়। কলকাতা। ১৯৮৯। ৯ম খণ্ড
—হঠাৎ আলোর ঝলকানি। পরিমার্জিত ৩য় মুদ্রণ। বেঙ্গল পাবলিশার্স। কলকাতা। ১৯৫৮
ভারতচন্দ্র রায়—অন্নদামঙ্গল। গ্রন্থাবলী। ৩য় সং। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। কলকাতা। ১৩৬৯
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—কাব্যসম্ভার। মিত্র ও ঘোষ। কলকাতা। ১৩৭৩
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—রচনাবলী। জন্মশতবার্ষিকী সং। প. ব. সরকার। কলকাতা। ১৩৬৮। ১ম, ২য়, ৩য়, ১১শ, ১৪শ খণ্ড।
—রচনাবলী। অচলিত সংগ্রহ। বিশ্বভারতী। কলকাতা। ১৯৬২

—রচনাবলী। প. ব. সরকার। কলকাতা। ১৯৮২। ২য় খণ্ড
—গীতবিতান। বিশ্বভারতী। কলকাতা। ১৩৮০
মধুসূদন দত্ত—গ্রন্থাবলী (কাব্য)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। কলকাতা। ১৩৪৭
—রচনাবলী। সাহিত্য সংসদ। কলকাতা। ১৯৬৫
মঞ্জুভাষ মিত্র-আধুনিক বাংলা কবিতায় ইউরোপীয় প্রভাব। নবার্ক। কলকাতা। ১৯৮৬
মীনাক্ষী দত্ত—কবিতা পত্রিকা (সংকলন)। প্যাপিরাস। কলকাতা। ১৯৮৮। ১ম, ২য় খণ্ড
মোহিতলাল মজুমদার—সাহিত্য বিতান। পরিবর্ধিত ২য় বিদ্যোদয় সং। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী। কলকাতা। এপ্রিল, ১৯৭৪
শঙ্খ ঘোষ—উর্বশীর হাসি। প্যাপিরাস। কলকাতা। ১৯৮১
—কবিতা সংগ্রহ। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। পৌষ, ১৩৮০
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—শ্রীকান্ত। অখণ্ড সং। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং। কলকাতা। ১ম পর্ব
শিশির দাশ—গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। ১৩৯২
সব্যসাচী দেব ও সোমেশ চট্টোপাধ্যায় (সম্প)—সংকলিত সমর সেন। অনুষ্টুপ প্রকাশনী। কলকাতা। জানুয়ারী, ১৯৯০
সমর সেন—কয়েকটি কবিতা। অনুষ্টুপ সং। অনুষ্টুপ প্রকাশনী। কলকাতা। জানুয়ারী, ১৯৮৯
—খোলাচিঠি। অনুষ্টুপ সং। অনুষ্টুপ প্রকাশনী। কলকাতা। জানুয়ারী, ১৮৮৯
—গ্রহণ। অনুষ্টুপ সং। অনুষ্টুপ প্রকাশনী। কলকাতা। জানুয়ারী, ১৯৮৯
—তিনপুরুষ। অনুষ্টুপ সং। অনুষ্টুপ প্রকাশনী। কলকাতা। জানুযারী, ১৯৮৯
—নানা কথা। অনুষ্টুপ সং। অনুষ্টুপ প্রকাশনী। কলকাতা। জানুযারী, ১৯৮৯
—বাবুবৃত্তান্ত। দে'জ দ্বিতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সং। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। জানুযারী, ১৯৮৮
—সমর সেনের কবিতা। ১ম সং। সিগনেট প্রেস। কলকাতা। ১৯৫৪
—সমর সেনের কবিতা। ২য় সং। সিগনেট প্রেস। কলকাতা। ভাদ্র, ১৩৭৩
—সমর সেনের কবিতা। ৩য় সং। সিগনেট প্রেস। কলকাতা। ১৩৭৬
—সমর সেনের কবিতা। পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত ৪র্থ সং। সিগনেট প্রেস। কলকাতা। জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪
—সমর সেনের কবিতা। ৫ম সং। সিগনেট প্রেস। কলকাতা। ১৩৮৮
—সমর সেনের কবিতা। ৬ষ্ঠ সং। সিগনেট প্রেস। কলকাতা। ১৩৯০
সঞ্জয় ভট্টাচার্য—আধুনিক কবিতার ভূমিকা। সবিতা প্রকাশ ভবন। কলকাতা। ভাদ্র, ১৩৬৬
—কবি জীবনানন্দ। ভারবি। কলকাতা। ১৯৭০
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—কাব্য সংগ্রহ। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। ১৯৭৬

—কুলায় ও কালপুরুষ। সিগনেট প্রেস। কলকাতা। ১৩৬৪
—স্বগত। সিগনেট প্রেস। কলকাতা।। ১৩৬৪
—প্রবন্ধ সংগ্রহ। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ফাউন্ডেশন; যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। ১৩৯০
হিরণকুমার সান্যাল—পরিচয়-এর কুড়ি বছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্র। প্যাপিরাস। কলকাতা। ১৯৭৮
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—বালা গদ্য জিজ্ঞাসা। সমতট প্রকাশনী। কলকাতা। ১৩৮৮

বাংলা পত্রিকা

অগ্রণী। কলকাতা। ২য় বর্ষ। ২য় সংখ্যা। ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০
অনুষ্টুপ (অনিল আচার্য সম্পা)। অনুষ্টুপ প্রকাশনী। কলকাতা। ১৭ বর্ষ। বসন্ত সংখ্যা। ১৯৮৩
—। প্রাক শারদীয় সংখ্যা। অনুষ্টুপ প্রকাশনী। কলকাতা। ২০ বর্ষ। চতুর্থ সংখ্যা। ১৯৮৬
অনুষ্টুপ (পুলক চন্দ সম্পা)। সমর সেন বিশেষ সংখ্যা। অনুষ্টুপ প্রকাশনী। কলকাতা। ২২ বর্ষ। দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যা। ১৯৮৮
—। শারদীয় সংখ্যা। অনুষ্টুপ প্রকাশনী। কলকাতা। ২৪শ বর্ষ। ১ম সংখ্যা। ১৯৮৯
অনীক। সমর সেন সংখ্যা। মুর্শিদাবাদ। ২৪শ বর্ষ। ৬ষ্ঠ সংখ্যা। ডিসেম্বর, ১৯৮৭
অমৃতলোক । সমর সেন স্মরণ সংখ্যা। মেদিনীপুর। ১২শ বর্ষ। জানুযারী, ১৯৮৮
কৃত্তিবাস (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পা)। ১ম সংখ্যা, জুলাই, ১৯৫৩
কলমের ফ্রন্ট। কলকাতা। ৮ম বর্ষ। ৯ম সংখ্যা। ১৯৮৮
কবিতা (বুদ্ধদেব বসু সম্পা)। কবিতাভবন। কলকাতা। ১ম বর্ষ। ৩য় সংখ্যা। চৈত্র ১৩৪২
—কবিতা। কবিতাভবন। কলকাতা। ৩য় বর্ষ। ১ম সংখ্যা। আশ্বিন ১৩৪৪
—কবিতা। কবিতাভবন। কলকাতা। ৩য় বর্ষ। ৩য় সংখ্যা। বৈশাখ ১৩৪৫
—কবিতা। কবিতাভবন। কলকাতা। ৪র্থ বর্ষ। ১ম সংখ্যা। আশ্বিন, ১৩৪৫
—কবিতা। কবিতাভবন। কলকাতা। ৭মবর্ষ। ১৯৪১
—কবিতা। কবিতাভবন। কলকাতা। ৮ম বর্ষ। ৩য় সংখ্যা। পৌষ ১৩৪৯
—কবিতা। কবিতাভবন। কলকাতা। ৮ম বর্ষ। ৪র্থ সংখ্যা। চৈত্র ১৩৪৯
—কবিতা। কবিতাভবন। কলকাতা। ৮ম বর্ষ। ৪র্থ সংখ্যা। আষাঢ় ১৩৫১
চতুরঙ্গ (হুমায়ুন কবির সম্পা)। কলকাতা। শ্রাবণসংখ্যা। ১৩৭২
—। কলকাতা। শ্রাবণ সংখ্যা। ১৩৭৪
—। কলকাতা। সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭।
দেশ (সাগরময় ঘোষ সম্পা)। সাহিত্য সংখ্যা। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রকাশন। কলকাতা। ১৩৭৯

দেশ (সাগরময় ঘোষ সম্পা)। সাহিত্য সংখ্যা। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রকাশন। কলকাতা। ১৩৮২
পরিচয়। কলকাতা। পৌষ, ১৩৫২
শব্দ ও শাব্দিক (৫০)। ১৩শ বর্ষ। ২য় সংখ্যা। ১৯৮৮

অপ্রকাশিত রচনা

রাধেশ্যাম সাহা—প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন ও আধুনিক বাংলা কবিতা (১৯৩৫-১৯৫০)। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ ডি (আর্টস্) থিসিস। ১৯৮৭

ইংরেজী গ্রন্থ

Boudelaire, Charles—Intimate Journal. Tr by Christopher Isherwood. Methuen & Co ltd. London. 1949
—Spleenet Ideal : Les Fleur's Dumal. Ed by Marthiel & Jackson Matheus. Tr by Edua St Vincent Millay. James Laughlin. New York. 1955
Cordwell, Christopher—Illusion and Reality. Reprint Ed. People's Pub House. New Delhi. 1981
Dange, S A—Literature and the People. People's Pub House. Bombay. 1943
Eliot, T S—Collected Poems : 1909-1962. Faber & Faber. London. 1963
—Selected Prose. Reprint Ed. Penguin Books. Harmondsworth. 1963
—The Sacred Wood : Essays on Poetry and Criticism. 7th reprint Ed. Methuen & Co Ltd. London.
Karl Marx—The Critique of Political Economy. Selected Works. Progress Publishers. Moscow. 1968
Lenin, V I—Party Organization and Party Literature : Collected Works. Foreign Language Pub House. London. 1962. Vol–10
Mayakovsky, V—I Myself : mayakovky. Ed & Tr by Herbert Marshall. Dennis Dobson. London. 1965
Mendelson, E (Ed)–Collected Poems. Faber & Faber. London. 1976
Middleton Murry, J—In Jones, P M (Ed)—English Critical Essays : twentieth century. Reprint Ed. Oxford University press. London. 1964
Richards, I A—Principles of Literary Criticism. Reprint Ed. Oxford University Press. New Delhi. 1990
Samar Sen, Debabrata Panda & Ashis Lahiri (Ed)—Naxalbari and After : A Frontier Anthology. Kathashilpa. Calcutta. 1978
Sudhi Pradhan—Marxist Cultural Movement in India. National Book Agency. Calcutta. 1979. Vols–I & II

ইংরেজী পত্রিকা

Frontier. Calcutta. April 11, 1970
The Modern Review. Calcutta. Vol XXIV, No 1; July, 1918
Now. Calcutta. October, 1964